~ www.amarboi.com ~

~ www.amarboi.com ~

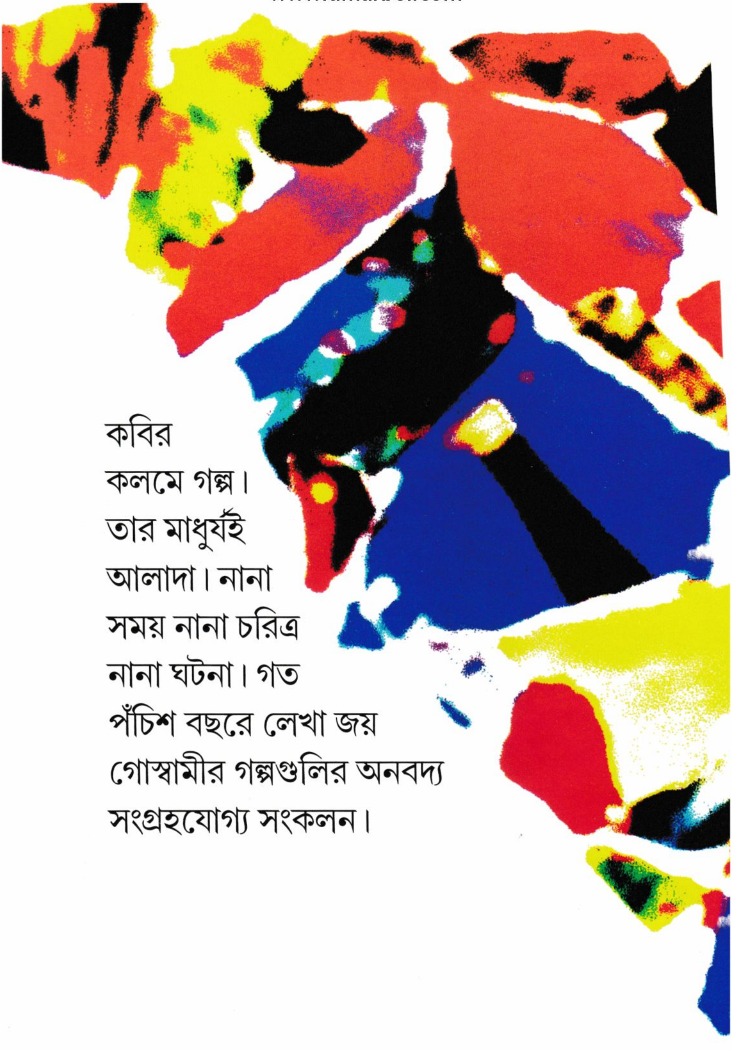

কবির
কলমে গল্প।
তার মাধুর্যই
আলাদা। নানা
সময় নানা চরিত্র
নানা ঘটনা। গত
পঁচিশ বছরে লেখা জয়
গোস্বামীর গল্পগুলির অনবদ্য
সংগ্রহযোগ্য সংকলন।

9789389377514

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন ঘটনাচক্রে মানুষ জড়িয়ে পড়ে। আর সেই মানুষও হয় নানা প্রকার ও নানা চরিত্রের। সেই চরিত্রগুলির মধ্যে লেখকও একজন। তাই নিজের দেখা চরিত্রগুলির মধ্যে নিজেকেও তিনি মিশিয়ে দেন। আলাদা করতে পারেন না। নিজেকেও দূর থেকে দেখেন একটি চরিত্র হিসাবেই—তার সমস্ত দোষত্রুটিসমেত।

গল্পকার হবেন এ ভাবনা বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। আবার হয়তো বা ছিলও চাপা পড়ে, চেতনার অন্তস্তলে। প্রথম তাগাদা দিয়ে 'গল্পকার' বানালেন রমাপদ চৌধুরী। প্রথম লেখা 'মল্লার যেখানে নামে'। ব্যস, চোখ পড়ল সাগরময় ঘোষের। শুধু চোখে পড়া নয়, মনেও ধরল নিশ্চয়ই। শুরু হল প্রবাদপ্রতিম সম্পাদকের তাড়া দেওয়া। ফল, 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সংশোধন বা কাটাকুটি'।

পেরিয়ে গেছে পঁচিশটি বছর। এই সিকি শতাব্দীতে লেখকের ঝুলিতে জড়ো হয়েছে বেশ কিছু গল্প। এই সংকলন সেই লেখাগুলির বিনিসুতোয় গাঁথা এক মালা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ISBN : 978-93-89377-51-4

~ www.amarboi.com ~

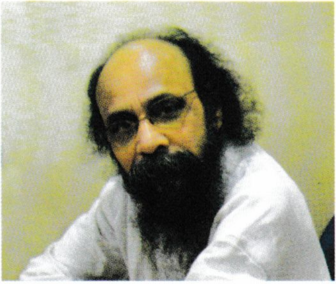

জয় গোস্বামীর জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৪, কলকাতায়। শৈশব, কৈশোর কেটেছে রানাঘাটে। এখন কলকাতাবাসী। শিক্ষা : একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত, রানাঘাটেই। দেশ পত্রিকাতে চাকরি করেছেন ১৬ বছর। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার। ১৯৯০-এ 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য এবং ১৯৯৮-এ 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, 'বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা' কাব্যগ্রন্থের জন্য। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯৭) 'পাতার পোশাক' এবং সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০০০) 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' কাব্যগ্রন্থের জন্য। আমেরিকার আইওয়া আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে আমন্ত্রিত হয়েছেন ২০০১ সালে। ২০০৯ সালে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও সিডনিতে। ২০১০ সালের মে মাসে বেইজিং ও সাংহাইতে আয়োজিত 'অলমোস্ট আইল্যান্ড ডায়লগ'-এ যোগ দিয়েছেন চিন দেশের কবি-লেখকদের সঙ্গে।

সারাজীবনের সাহিত্যকৃতির জন্য ২০১১ সালে পেয়েছেন ভারতীয় ভাষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'রচনাসমগ্র' পুরস্কার এবং একই বছরে পেয়েছেন IIPM-এর দেওয়া 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড।'

২০১২ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বঙ্গসম্মান ও বঙ্গবিভূষণ। নভেম্বর ২০১৪ পঞ্চম মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি ফেস্টিভ্যালে গিয়ে গ্রহণ করেছেন 'পোয়েট লরিয়েট' সম্মান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

২০১৫তে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন সাম্মানিক ডি. লিট.।

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গল্পসমগ্র

জয় গোস্বামী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

~ www.amarboi.com ~

GALPA SAMAGRA
A collection of bengali short stroies By Joy Goswami
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 499.00

ISBN : 978-93-89377-51-4

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৯, কার্তিক ১৪২৬

প্রচ্ছদ : শান্তনু দে

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪৯৯ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

~ www.amarboi.com ~

সুদেষ্ণা বসু
শৈবাল মিত্র
বন্ধু যুগলের করকমলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখকের অন্যান্য বই

ভগ্নাংশ নির্ণয়
পুরী সিরিজের কবি
রানাঘাট লোকাল
জয়ের সুনীল
জয়ের সুভাষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

কতরকম ঘটনাচক্রে যে জড়িয়ে পড়ে মানুষ। আর মানুষের চরিত্রও কত বিচিত্র প্রকারের হয়। সেইসব চরিত্রের মধ্যে তো একটি চরিত্র আমিও। নিজের দেখা চরিত্রদের মধ্য থেকে নিজেকেই বা বাদ রাখি কী করে? নিজেকেও তো আমি দূর থেকে একটি চরিত্র হিসেবেই দেখি তার সব দোষত্রুটি সমেত।

এইসব নিয়েই আমার গল্প লেখা।

আমার জীবনের প্রথম লেখা গল্প 'মল্লার যেখানে নামে।' এই গল্প ছাপা হয় রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। গল্পটি আমাকে তাগাদা দিয়ে লিখিয়েছিলেন কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকার সাহিত্যের বিভাগটি তখন রমাপদবাবুই সম্পাদনা করতেন। তখন বলতে আমি ১৯৯৪ সালের কথা বলছি। আজ থেকে হিসেব করলে পঁচিশ বছর আগে আমি জীবনের প্রথম গল্পটি লিখি।

'মল্লার যেখানে নামে' প্রকাশিত হওয়ার পরেই গল্প লেখার জন্য আমাকে তাড়া দিতে শুরু করলেন সাগরময় ঘোষ। সকলেই জানেন দেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। আমি তখন দেশ পত্রিকায় কর্মরত। রোজই দেখা হয় সাগরদার সঙ্গে। আর তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়ে ধমক লাগান। এইভাবে লেখা হয় আমার জীবনের দ্বিতীয় গল্প : সংশোধন বা কাটাকুটি। গল্পটি ছাপা হয় দেশ পত্রিকার একটি বিশেষ গল্প সংখ্যায়। আজ যখন আমার গল্পসমগ্র বেরোতে চলেছে তখন প্রবাদপ্রতিম এই দুই ব্যক্তিত্বের কথা আমার মনে পড়ল। রমাপদ চৌধুরী ও সাগরময় ঘোষ তাগাদা না দিলে আমি কখনো গল্প লিখতাম কি?

এই সমগ্রে যত গল্প নেওয়া হয়েছে তার অনেক গল্প প্রকাশ পেয়েছে সংবাদ প্রতিদিন কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকায়। রোববার-এর সম্পাদক

~ www.amarboi.com ~
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের আমি গুণমুগ্ধ এবং অনিন্দ্য আমার বিশেষ স্নেহভাজন। অনিন্দ্যকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইলে সে নিশ্চয় লজ্জা পাবে। তবু আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা তার প্রাপ্য।

এদিকে ওদিকে এই পঁচিশ বছর ধরে যত গল্প লিখেছি সব গল্প এই বইয়ে একত্রিত করা হল। গল্পগুলি খুঁজে খুঁজে এক জায়গায় আনার পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করেছে দে'জ পাবলিশিং-এর শুভঙ্কর দে, অর্থাৎ আমাদের অপু। তার প্রাণবন্ত উৎসাহেই এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। অপুকে তথা দে'জ পাবলিশিংকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় গোস্বামী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূ চি

মল্লার যেখানে নামে ১৩
সংশোধন বা কাটাকুটি ২৬
জুরাসিক পার্ক ৫১
যাদবের ইউনিফর্ম ৮৮
সোনালি তরল ১০৬
ঘাসফুলের কবি ১২২
তুমি জানো, শ্রীজাতকিশোর? ১৫০
বুবুলটি উড়ে যাও ১৬৩
কড়ি ও কোমল ১৯২
জয় বিশ্বকাপ ২০৪
ওগো সুন্দর ২১৫
গানের শিউলিগাছ ২৩০
সন্ধ্যাসঙ্গীত ২৩৫
বসন্ত উৎসব ২৪৬
স্পর্শ ২৫২
একটি হাসির গল্প ২৫৯
গ্লান ২৭০
ঈর্ষা ২৭৪
ছোটোবেলা নামক শহরে ২৮৪
২৮৯ মাঠে ফেরা
২৯৮ ডেড বল
৩০৬ রামনগরের গোপাল
৩১৯ পাখির ডাক
৩২৯ ধুলোচশমা
৩৩৫ গোপাল ও তার মাদুলি
৩৩৯ ঘোড়াবাবু
৩৪৪ পরেশ মাস্টার ও তাঁর থিয়েটার
৩৫১ অনুকূল পবন উদয় হয়েছে
৩৫৭ ভবিষ্যৎবাণী
৩৬৪ প্যাঁচা মোক্তারের ছেলে
৩৭০ রঙিন মাছের দোকানদার
৩৭৭ অমূল্য মুখুজ্জ্যের অভিনয়
৩৮৬ গীতিকারের স্ত্রী-কন্যারা
৩৯৬ মরা ডাক্তারের বউ
৪০৪ বড় দারোগার বাবা
৪১৪ ঘোড়াওয়ালার সংসার
৪২০ ল্যাটামামা
৪২৪ অন্নজল আর নরক

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

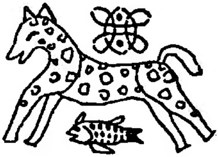

মল্লার যেখানে নামে

সেই মেয়েটা। আবার। কবি রাগতে জানেন না। যদিও মাঝে মাঝে তাঁর প্রায় রাগ-গোছের কিছু একটা হয়। এবং তিনি গিলে ফেলেন।

এখনও হল, সেই মেয়েটাকে দেখে। সেই মেয়েটা, মিনিবাসের সামনের দিকে, জানলার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। দেখামাত্র রাগ হল। বা প্রায় রাগগোছের কিছু একটা। কিন্তু কবি তো রাগতে জানেন না। কী করা যাবে। কবি, কপ করে গিলে ফেললেন। যদিও একদিন মাত্র রেগে গেছিলেন। সেদিন হাত-পা থরথর করে কেঁপেছিল, ঘাড় দপদপ করছিল, চোখ রক্তবর্ণ হয়েছিল, গলা উঠেছিল সপ্তমে।

কিন্তু সে ওই একদিনই। এখন সেসব হবার কথা নয়। হলও না। কিন্তু মেয়েটা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে তাঁকে। ভুরু কুঁচকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেও এর কাছে নিস্তার পাওয়া যায় না। এগিয়ে আসবেই। তার ওপর কবি আজকে বসার জায়গা পাননি। আর দেরিও হয়েছে বেরোতে, তাই লাইনে দাঁড়িয়ে জায়গা নেওয়ার জন্য অপেক্ষার জো নেই। মিনিবাসের ভ্যাপসা পিছন দিকে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ঝোলা ব্যাগ সামলাচ্ছেন কবি। হে ভগবান, মেয়েটা যেন তাঁর দিকে এগিয়ে না আসে। কেন না সারাদিনের মধ্যে এই বাসযাত্রার সময়টুকু, এই ৪৫ মিনিটই, কবির নিজের সময়। বাকিটা অন্যের। গৃহিণীর। কন্যার। আপিসের। ক্লান্তির। ওষুধের। বাজারের। সভা সম্মেলনের।

লেখার? না। সেটা নেই প্রায়। যা হয় মনে মনে। বাড়ি থেকে বেরোনোমাত্র মাথা চালু হয়। অফিসের দরজা পর্যন্ত চলে। এই সময়টা কবি পারতপক্ষে লোক সংসর্গ এড়িয়ে চলেন। ভিড় চারপাশে থাক, ক্ষতি নেই। কিন্তু তাঁকে কথা না বলালেই হল। আর, এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সময়টাতেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আর মেয়েটা এগিয়ে এসে কথা বলে। ওই তো আজও এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

—চিনতে পারছেন তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কপ।

—সেদিন জীবনানন্দ বিষয়ে আপনার বক্তৃতা শুনতে গেছিলাম। খুব ভালো লেগেছে আমাদের।

—এই রে। কপ। আমি বক্তৃতা দিতে...অস্বস্তি হয়। খেই হারিয়ে ফেলি। ভুলে যাই।

—ওঃ আর আপনার, ওই ভুলে যাওয়াটা কিন্তু দারুণ।

কপাকপ। কবি গলা ঝাড়লেন। ইচ্ছে করে তো আর কেউ ভুলে যায় না। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ভুলে যাওয়া যে কি জিনিস...আমার সবটা লিখে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সময় কোথা যে লিখব।

—আর ওই যে, 'সমুদ্র' পত্রিকার কথা বললেন্ না আপনি...

—হ্যাঁ, সমুদ্র, কাব্যবিচার সংখ্যা...

—হ্যাঁ কাব্যবিচার, ওর প্রতিটি ইস্যুই আমার পড়া।

—সে কি, সে পত্রিকা তো বেরোত বহুকাল আগে, আমরাই তখন স্কুলে পড়ি। তুমি পড়লে কী করে?

—কারণ ওই পত্রিকাটি বার করতেন আমার জেঠু। আমাদের বাড়িতে সবগুলোই আছে।

—তার মানে, নীহারেন্দু সেন? তোমার জ্যাঠামশাই?

—হ্যাঁ।

—তোমার নামটা...যেন কী?

—পারমিতা। পারমিতা সেন। আপনাকে বলেছিলাম।

—কিছু মনে কোরো না। ভুলে গেছিলাম। আজকাল একটুতেই বড় ভুলে যাই। বয়স হচ্ছে তো।

মেয়েটি আকাশ থেকে পড়ল। ধেত। মোটেই আপনার কিছু বয়স হয়নি। কবিরা তো একটু ভুলে যাবেই।... তার ওপর আপনার মতো কবি।

কপ। কপ। কপ। জনসমক্ষে কবিকে কবি বলার মানেটা কী, এই একফোঁটা মেয়েটা কি সেটা জানে? কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলার চাইতেও খারাপ। সবাই তাকাতে শুরু করেছে কবির দিকে। কবি জানেন, তাঁর মতো ছাপোষা কবির কানাকড়িও মূল্য নেই বাইরের সমাজে। মাঝখান থেকে হাটে রোজ হাঁড়ি ভেঙে যায়। কবি বুঝলেন তার কান গরম হয়ে উঠছে। কবি একটা পাঁচ টাকার নোট পকেট থেকে বার করতে করতে গলা ঝেড়ে বললেন, 'তুমি যেন কোথায় নামবে!'

—হাজরা। কিন্তু রোজ রোজ আমার টিকিট কাটছেন, এটা মোটেই ফেয়ার হচ্ছে না।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলে কী!—কবি যথাসাধ্য ভারিক্কি হতে হতে বললেন, ধরো, তোমার জ্যাঠামশাই যদি

~ www.amarboi.com ~

তোমার সঙ্গে থাকতেন এখন। তিনি কি তোমাকে টিকিট করতে দিতেন, বাচ্চা মেয়েটার থোঁতা মুখ ভোঁতা করা হচ্ছে মনে করে, কবি একটু স্বস্তি পাচ্ছিলেন। কিন্তু মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, মোটেই না। জেঠুর সঙ্গে আপনার একটুকুও মিল নেই। জেঠু খুব গম্ভীর আর সবসময় মোটা মোটা বই পড়ে। আর আপনার লেখা পড়েই বোঝা যায় আপনি মোটেই গম্ভীর নন।

কবি বাঁচবার জন্য, কুটো আঁকড়ালেন। কুটো মানে কনডাক্টর। হ্যাঁ ভাই, একটা ডালহৌসি এবং একটা হাজরা।

—অবশ্য জেঠুর কাছেই প্রথম আপনার বই দেখেছিলাম। এখন আপনার সব বই-ই আমার আছে। আচ্ছা, ওই যে বইটা, লুকোও তৃণ, ওই কবিতাগুলো কতদিন আগে লেখা...

—সেসব তো...অনেক দিন আগে...ঠিক, মনে নেই...

কবি পায়ের নিচে জমি পাচ্ছেন না। সব লোক দেখছে হাঁ করে তাঁদের দুজনকে। আবার কুটো আঁকড়ালেন তিনি।... হ্যাঁ ভাই ৩০ পয়সা খুচরো, হ্যাঁ আছে...

মেয়েটার থামবার লক্ষণ নেই, কি সুন্দর নাম। লুকোও তৃণ। আচ্ছা, তৃণ তো লুকিয়েই আছে। সে তো মিশেই আছে মাটিতে। তা হলে তাকে আবার লুকোতে বলা হবে কেন? প্রেমের কবিতা বলেই কি?

কবি পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছলেন। গড়িয়া থেকে হাজরা যেন অনন্ত পথ মনে হচ্ছে।

—অত কি আর মনে আছে? কবে কী লিখেছি। তা তুমি, তুমি তো দেখছি খুব পড়ো-টড়ো, পড়াশুনো কতদূর করেছ? কবি আবার ভারিক্কি হলেন।

—এবার এম. এ. পরীক্ষা দেব।

—বাঃ। বেশ। পড়ছ তো মন দিয়ে? সাহিত্যটাহিত্য এসব তো আছেই...আগে হচ্ছে লেখাপড়া।...ইতিমধ্যে কবি বসবার জায়গা পেয়ে গেছেন। মেয়েটি বসতে চায়নি, কবিও জোর করেননি। সে কবির পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

—দ্যাখো না, তোমাকে দেখছি, আর ভাবছি, আমার মেয়েটার কী হবে। কী করবে ও!

—আপনার মেয়ে। আপনার মেয়ে আছে বুঝি?

—আছেই তো।

—ও, কত বড়।

—এই ১০ বছর হল।

মেয়েটি হেসে ফেলে, মোটে ১০ বছর।

—হ্যাঁ, কিন্তু ১০ বছরের তুলনায়, সে খুবই স্বাধীন। সে একেবারেই পড়তে বসে না। এবং তাকে বকতে গেলে সে উলটে আমাদের বকুনি দিয়ে দেয়।

—বাঃ, কি সুন্দর। আমার এক্ষুনি আপনার বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছে। যাব কিন্তু একদিন। আপনি কখন থাকেন?

~ www.amarboi.com ~

—এসো। কপ। কিন্তু আমার তো থাকার ঠিক নেই। কপ। অফিসে ফোন করে দেখতে পারো।

সেই বাড়ি আসার প্রসঙ্গ চলে এল। কেন বাড়ি আসা, কবি জানেন। বাড়ি আসবে। লেখার প্রশংসা হবে। তারপর একসময় ঝোলা থেকে বেরোবে একটা বাঁধানো খাতা। কিংবা ডায়েরি। তারপর খুব লাজুক লাজুক মুখে, জানেন, আমিও না একটু একটু লেখার চেষ্টা করি। আপনার সামনে বার করার কথা ভাবাই যায় না। কিছু হয়নি এগুলো। তবু, আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা দেখাতে পারি। তাই, আপনার সময় নষ্ট হবে, তবু যদি একটু দ্যাখেন...

কবি তখন বলবেন, না না, কী হয়েছে তাতে, দেখি, সময় নষ্ট হবে কেন...

ব্যস, তারপর খাতাভরতি রাশি রাশি কাঁচা অপাঠ্য দুর্বল কবিতা...

শুনতে শুনতে কান মাথা ভারি করতে হবে...।—রাসবিহারী ছাড়ল বোধ হয়। তুমি এবার একটু একটু করে এগিয়ে পড়ো, কেমন! ভিড় ঠেলতে হবে তো।

—হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর একটা কথা, এর মধ্যে কোথাও কবিতা পড়া আছে কি আপনার? কোনো কবি সম্মেলন?

—না না, কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু নেই। এখন আর কোথাও যাচ্ছি না।

—না, জানেন আমি যাই। যেখানে কবিতাপাঠ হয়, আমি যাই। কতবার, কত সম্মেলনে আপনার কবিতা শুনেছি। তবু যাই। আচ্ছা, আসি কেমন?

এসো।

দুই

মেয়েটা নেমে গেছে। কিন্তু যা করার করে দিয়ে গেছে। চিন্তাভাবনা একেবারে চটকে দিয়ে গেছে। আজ আর মাথায় কিছু আসবে না। কী মেয়ে রে বাবা। টানা কথা বলবে। আগের দুদিন তো গড়গড় করে কবিতার লাইন অবধি মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। আর, নেহাত বাসের মধ্যে তাই, নইলে কবি মাটিতে মিশে যেতেন। আর এমনভাবে কথা বলে যেন বয়সটা কোনো ব্যাপারই নয়। যেন বন্ধু। কতদিনের চেনা। তার ওপর বলে কিনা কবি সম্মেলনে যায়, এ ব্যাপারে একটা ডাহা মিথ্যে বলেছেন কবি ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে। রবিবারেই আছে একটা কল্যাণীতে। সেটা অবশ্য বলাও যেত। অত দূর ঠেঙিয়ে নিশ্চয়ই যাবে না মেয়েটা, তবু বলেননি। কবি সম্মেলন। ওই এক ভয়ানক জিনিস। সারা বছর অন্তত ১২৫টা হবে। তার মধ্যে ২৫টায় যেতেই হয়। কবি না বলতে পারেন না। গিয়ে কখন নাম ডাকবে তার জন্য হাঁ করে বসে থাকা। শেষে নিজের পালা এলে দু-খানা কবিতা পড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফেরা রাজ্যের ক্লান্তি আর বিরক্তি মাথায় নিয়ে। এই মেয়ে নাকি আবার সেসব সম্মেলনে গিয়ে বসে থাকে। ছিঃ। ভাবলেই রাগ হয়ে যায়। ঠিক রাগ নয়। প্রায় রাগ গোছের একটা কিছু হয়। কেননা কবি তো রাগতে জানেন না। রাগ গিলে ফেলেন।

~ www.amarboi.com ~

শুধু একদিন গিলে ফেলেননি। উগরে দিয়েছিলেন রাগ। শুধু একদিন। সে দিন শরীরটা ছিটকে উঠে ঝড় তুলেছিল। থরথর করে কেঁপেছিল। চোখে এসেছিল রক্ত। গলা উঠেছিল সপ্তমে। আর তিনদিন অফিস যেতে পারেননি তার জেরে। আর, সেই সবই ঘটেছিল এক কবি সম্মেলনে।

কবির গৃহিণী এ কারণে তাঁকে কম তিরস্কার করেননি। কম মিনতিও করেননি। তবু, সব তো আর মানুষের নিজের হাতে থাকে না। ঘটে যায়। সুতরাং, কবি সম্মেলন শব্দটা ভাবলেই ঘাড়ের দপদপানিটা ফিরে আসে আবার। জিভে তেতো লাগে।

সেদিনও তাই ঘটে গেছিল। এক কবিসভায় অনেকের সঙ্গে এক মন্ত্রীও উপস্থিত। সদ্য স্লোগান-সর্বস্ব কবিতা লিখতে ও বই ছাপাতে শুরু করা এক মন্ত্রী। কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। সভার শেষে পাকা গোঁফ, চশমাপরা লোকটি নিজেই এগিয়ে এসে কবির হাতে নিজের দু-তিনটি বই ধরিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো আপনি পড়বেন, আর আপনি তো 'স্বদেশ' পত্রিকায় লেখেন। স্বদেশে এই বইগুলো নিয়ে লিখবেন, বুঝলেন।—গলার স্বরে বেশ একটা কর্তৃত্বের আওয়াজ।

কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ করুণ করুণ গলায় বললেন, পড়ব নিশ্চয়ই, তবে স্বদেশে রিভিউ করানোর জন্য পত্রিকার দপ্তরে বই জমা দেবেন। ওঁরা ঠিক করবেন রিভিউয়ের ব্যাপারটা কী হবে!

হঠাৎ লোকটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, আপনারা ভেবেছেন কী। স্বদেশ পত্রিকা যাকে কবি বলে মনে করবে, সে-ই কবি। আর অন্যরা নয়। আমরা আপনাদের মতো 'স্বদেশ' পত্রিকার গোলামি করি না, আমরা মানি না ওসব...

কবি খানিক হকচকিয়ে আবার চেষ্টা করলেন, শুনুন, পত্রিকার সম্পাদক আছেন, সম্পাদকীয় দপ্তর আছে, এসব তাঁদের ঠিক করার কথা।

লোকটি কর্ণপাত না করে চিৎকার করে চলল, দপ্তর দেখাবেন না আমাকে। আপনাদের মতো স্বদেশ পত্রিকায় দালালি করে কবি হইনি। সাধারণ মানুষ আমাদের চেনে। আর আপনারা হচ্ছেন গোলাম, চিরকাল গোলাম হয়েই থাকবেন।

হাত পা ছুঁড়ে বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটি, হঠাৎ কবির ধৈর্যচ্যুতি হল—এক মিনিট, ভালো করে শুনুন, এক নম্বর, স্বদেশ পত্রিকায় কী বই রিভিউ হবে এবং কে করবে, সেটা ঠিক করবেন সেই পত্রিকার সম্পাদক। আপনি নয়। দু নম্বর, আমি কোন পত্রিকায় কি লিখব সেটাও ঠিক করব আমি, আপনি নয়। বুঝতে পেরেছেন?

এই কথাগুলো বলতে বলতে কবির গলা সপ্তমে পৌঁছোল। কান-মাথা আগুন হল। হাত পা কাঁপতে লাগল। এমনকী ওই মন্ত্রী লোকটিও একটুক্ষণের জন্য থমকে গেল। লোকজন ছুটে এল, আরে, কাকে কী বলছেন। আস্তে আস্তে।

কবি দেখলেন, লোকটি পুনরায় তর্জন করতে করতে ফ্ল্যাগ আঁটা একটি সরকারি গাড়িতে উঠে পড়ছে। আর কবির চেনা লোকেরা যেন কিছুই হয়নি এমন উদাসীনভাবে আকাশ গাছপালা দেখছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গৃহিণী বলেন, বোকার মতো কেউ মন্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে যায়? কী ঘটালে বলো তো!

কবি বলেন, ঝগড়া তো করিনি আমি। ও-ই তো এসে স্বদেশে রিভিউ করার জন্য আমাকে হুকুম করছিল। এ তো অন্যায়।

গৃহিণী বলেন, অন্যায়, কিন্তু কেউ তো প্রতিবাদ করল না। অত বড় সব কবি, সাহিত্যিক, অত আমলা, আবৃত্তিকার সবাই তো ছিল। কেউ তো আপত্তি করেনি।

—একজন করেছিলেন। শুভেন্দু চৌধুরি। উনি ওঁকে বলেছেন আপনি অন্যায় করেছেন। পরের দিন বলেছেন। আমি শুনেছি।

আঃ হা—ওই একজনের প্রতিবাদটাই দেখলে আর অত বড় বড় লোকের চুপ করে থাকাটা দেখলে না। কী নেই তাদের। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। নামখ্যাতি আছে। তোমার কি আছে। মাথা গোঁজার জায়গাটা অবধি নেই। কী আছে তোমার, বলো।

কবি বলেন—আমার শব্দ আছে।

—রাখো। যারা ছিল ওখানে, তাঁদের কাউকে ভাড়াবাড়িতে থাকতে হয় না। বউয়ের অসুখ কিংবা মেয়ের ইস্কুলে ভরতির জন্য টাকা ধার করতে হয় না। তাদের কাউকে নার্সিংহোমের বেয়ারা অপমান করে না তোমার মতো। তাও তারা কিছু বলতে যায়নি। তারা নিজেকে বাঁচাতে জানে। আর শব্দ? সে তো ওই বানিয়ে বানিয়ে লেখা কতকগুলো প্রেমের কবিতা। কী দাম আছে তার।

—দেখি দাদা, নামব।

কবির চটকা ভাঙল। পাশের লোকটি উঠে গেল। কবি জানলা পেলেন। এলগিন রোডে মস্ত জ্যাম। লোকে নেমে যাচ্ছে।

কবি ভাবলেন, গৃহিণী ঠিকই বলেছেন। বানিয়েই লেখা। ওই মেয়েটা একটু আগে জানতে চাইছিল, লুকোও তৃণ-র কবিতাগুলো কবে লেখা। তখন কবির ২৪/২৫ বছর বয়স। তখন কবি গালে হাত দিয়ে ভাবছেন, কেউ আসবে। একটি নারী। যার সঙ্গে সাত পা হাঁটতে পারা যাবে। যার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে কয়েক পলক। সারা দিন, মনে মনে কথা বলা যাবে যার সঙ্গে। লেখা যাবে লম্বা লম্বা চিঠি। কেউ আসবে।

কেউ আসেনি। সে কোথাও ছিলও না। তবু সে আসবে মনে করে লেখা হয়ে গেছে গোছা গোছা কবিতা। তাই নিয়েই ওই লুকোও তৃণ বই। বানিয়েই লেখা। ঠিকই।

তারপর একসময় মেয়েরা এল। কবি তালকানায় ভেসে চললেন। শেষে গৃহিণী তাঁকে জল থেকে ডাঙায় তুললেন জামা ধরে। চালাঘর বেঁধে স্থিত করালেন। নইলে যে কী হত।

এখন প্রেম নিভে গেছে। শরীরও নিস্তার দিয়েছে। কেন না, টাকার কথা ভাবলে আর যৌনতা থাকে না, এখন এসব দিক দিয়ে কবি নিশ্চিন্ত। প্রেম নেই, তার পুড়িয়ে দেওয়াও নেই। বাসনা নেই, তার রক্তবর্ণ অশান্তিও নেই। দিবারাত্রি কোথাও কিছু ছাই হয় না এখন। কোথাও কিছু ধিকিধিকি জ্বলে না। আঃ, শান্তি। এখন পৃথিবীর দিকে

~ www.amarboi.com ~

তাকানো যায় সহজে। জানলার বাইরে তাকালেন কবি, লম্বা মিছিল চলেছে। ট্রাফিক থেমে আছে। টুপটাপ লোক নেমে বাস হালকা হচ্ছে। কনডাক্টর একটা ফাঁকা সিটে বসে বিড়ি ধরাল।

কিন্তু, প্রেম চলে গেছে বলে, চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি তা নয়। দু-দুবার ঘটেছে। বাসেই একবার সামনে দাঁড়ানো একটি মেয়ের কপালে কেবলই চুল এসে পড়ছে। হঠাৎ কবি ভাবলেন, আঙুল দিয়ে কপাল থেকে চুলটা সরিয়ে দিলে কেমন হয়। ভেবেই, ভয়ে হিম হয়ে গেলেন। আর একদিন অবশ্য মুখ নয়, হাত। হাতও নয়, আঙুল। সিটে বসে কবি দেখলেন, সামনের সিট ধরে আছে একটি ফরসা হাত। তার কড়ে আঙুলটা কাঁপছে। কবি, ওই কড়ে আঙুলের দিকে তিনবার তাকিয়ে ফেলেছিলেন। এবং মরমে মরে গিয়েছিলেন। ওই দু-দিনই। আর হয়নি। সামনে মিছিল সমাপ্তপ্রায়। রৌদ্রক্লান্ত লোকগুলির হাঁটা কিছু ধীর। কনডাক্টর বাসের ক্লিনারকে বলল, হাঁটছে দ্যাখ। যেন তাজবেঙ্গল থেকে খেয়েদেয়ে বেরোল।

সম্প্রতি এক শিল্পপতির লেখা উপন্যাসের প্রকাশ উৎসব ছিল তাজবেঙ্গলে। ঘোর পান-ভোজন ছিল। কবির যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পরে ঝোলা কাচতে গিয়ে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণপত্র দেখে গৃহিণীর বিলাপ হল এই, এই, বললে না। তাজবেঙ্গলে যাওয়া যেত। নিজে তো আর কখনও নিয়ে যেতে পারবে না।

একজন যেমন মন্ত্রিত্বের জোরে কবি, আর একজন তেমনি টাকার সূত্রে লেখক। কিন্তু শিল্পের দেবী এদের কৃপা করেননি। অন্য দিকে, একদা শত দারিদ্রের মধ্যেও মাথায় কবিতা এলেই খুশি থাকতেন কবি। টাকাপয়সা থাকা-না-থাকা বিষয়ে সমাজ কী বলল, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। আজ সেই সমাজ ঢুকে পড়েছে বাড়িতে। এ হল নিজের কাছে হার। শব্দ? শব্দ আছে। কিন্তু শব্দ হাতে নিয়ে কি তাজবেঙ্গলে ঢোকা যায়? এইসব গ্লানি থেকে বাঁচবার উপায় কী? মল্লার যেখানে নামে সেইখানে চলে যাওয়া। মল্লার কোথায় নামে? তা তো কবি জানেন না। কিন্তু তিনি যেতে পারেন। বাঁচবার জন্য মাঝে মাঝে যান।

১০ বছরের মেয়েটা কেবল ফিল্মের গান করে সারাদিন। মাইক থেকে শোনা গান। যাতে মেয়ের কানে একটু ভালো জিনিস ঢোকে, তাই নানান ক্যাসেটের মধ্যে বাড়িতে আনা হয়েছে, গান শিখি গান গাই। ছোটোদের শেখানোর জন্য, কয়েকটি রাগের বন্দেশ তান-সরগম ছাড়া ছোটো করে গেয়ে দেখানো হয়েছে এখানে। তারই একটি হল মিয়াঁ কি মল্লার। অরুণ ভাদুড়ির গলা। কথাগুলি নিতান্ত সাধারণ। আকাশের মাদল ধম ধম বাজছে—আর বাদল নটবর ছমছম করে নাচছে। ক্ষণপ্রভা, অর্থাৎ বিজলি হল নর্তকীর আঁচল। কোনো কবিত্ব নেই এতে। কিন্তু যেই সুরে পড়ল, আর তাকে চেনা যায় না। বা-জে ধমোধমো—এখানে মল্লার নেমে যায়। কিন্তু, কোথায় কোন কোন পর্দায় তা জানার দরকার নেই। কারণ, কবি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পান, রাত্রির আকাশ বৃষ্টিতে নিরন্ধ্র। মল্লার নেমে যাচ্ছে আর পাহাড়ের অতল থেকে উঠে আসছে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের শব্দ : বাজে

~ www.amarboi.com ~

ধমোধমো। পাতাল থেকে উঠছে, আর অন্তরায়, তারসপ্তকের চূড়ার কাছে চমকাচ্ছে ক্ষণপ্রভা। ভূগর্ভ থেকে মহাকাশ পর্যন্ত একটি ঋজু শিরদাঁড়ায় ভুবনকে যুক্ত করে ওঠানামা করছে মল্লার। এইসময় জগৎ ভুলে চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে থাকে কবির। কবি মিনতি করতে থাকেন : হে পৃথিবী, আমিও সাধারণ, বাইরে থেকে যেমন তেমন লোক আমিও। আমাকে সুরে পড়তে দাও। আমাকে সুরে ফেলো, দ্যাখো, আমিও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারি। আমিও ধারণ করতে পারি জগৎ।

মেয়ে ছুটে আসে, কী হল, কী হল, তুমি কাঁদো কেন। মেয়ের মা ছুটে আসে, কী গো, শরীর খারাপ লাগছে না তো!

ঘোর ভেঙে যায়। দিনের আলো আর রোদ ফিরে আসে। মুছে যায় মল্লার আর রাত্রি।

বাস আবার চলতে শুরু করেছে। কবি কিছুটা গিয়ে, ময়দানের মুখে নেমে পড়লেন। দুপুরের ময়দান। আজ আর অফিস নয়। আজ নিজের সঙ্গে থাকতে হবে।

আলি আকবর খাঁ সাহেব কিছুদিন আগে, কাগজে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, রাগ আয়ত্ত করতে গেলে স্বর আয়ত্ত করতে হয়। আর একটা স্বর আয়ত্ত করতে ১০/১২ বছর সময় লাগে। সাতটা স্বর আছে। তার মানে, একজন মানুষ তার জীবৎকালে ৪/৫টির বেশি স্বর আয়ত্ত করতে সাধারণত পারে না।

কিন্তু যদি সে দীর্ঘায়ু হয়।

তা হলেও, ৭ কে ১২ দিয়ে গুণ করো, ৮৪। সেই বয়সে শরীর জরার কবলে চলে যাবে। ইচ্ছে করলেও আর পারফর্ম করা যাবে না। সংগীত অধরাই থেকে যাবে। তা সত্ত্বেও মানুষ রেওয়াজ করে চলে স্বরকে আয়ত্তে আনতে। সাত স্বর।

আর, সম্প্রতি এক তরুণ গায়ক তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি আজকাল রেকর্ডিং ও প্রোগ্রাম নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, তালিম-রেওয়াজ, এ সবের আর সময় পান না। এই গায়কের গোল্ড ডিস্ক হয়েছে।

কবি দেখলেন, একটি সোনার চাকতি আকাশ থেকে ছুটে আসছে গায়নরত তরুণের দিকে। তার শিরচ্ছেদ করে চলে যাচ্ছে, কর্তিত গলা থেকে রক্তফোয়ারা উঠছে, আর শ্রোতাদের করতালিতে বধির হয়ে গিয়ে মাটিতে গড়ানো গায়কমুণ্ড এর কিছুই খেয়াল করছে না।

তবু, কী করে হয় এমন? হয়। কেন না, খানিকটা জন্মগত ক্ষমতা থাকেই কারও কারও। সুর ধরবার ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতাকে রেওয়াজের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে তুলে নিয়ে যাওয়া তো অনেক পরিশ্রম। অনেক কষ্ট। তার চেয়ে অনেক কম কষ্ট, প্রচার, বিজ্ঞাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে মন দেওয়া। মার্কেটিং ইত্যাদিকে অভিজ্ঞ অভিভাবক সংগ্রহ করা। ১২ ঘণ্টা ধরে একটাই তান ঘর বন্ধ করে অভ্যাস করার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম তাতে। সাফল্য এতে চট করে আসে। শুধু, শূন্যস্থানে ভরে দিতে হবে নিজেকে। ঠিক জায়গায় যোগাযোগ থাকলেই ডোনেট করতে হবে নিজেকে। আর কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবি দেখলেন, মঞ্চে গড়ানো গায়কমুণ্ড এবার গানের বদলে কথা বলছে। আর গ্রহণ করছে হর্ষধ্বনি।

কিন্তু, লেখার ক্ষেত্রেও তো ঘটতে পারে এমন। ঠিক এইরকম। ভয়ে শিউরে উঠলেন কবি।

লিখতে গেলে, শব্দের সঙ্গে থাকতে হয়। দিনের পর দিন। ভাষাকে দিয়ে সংবাদের বেশি কাজ করাতে গেলে, তার সঙ্গে জীবন কাটাতে হবে। কবি তরুণ বয়সে নিজের কাছে সংকল্প নিয়েছিলেন, শব্দের সঙ্গে থাকব। জীবন কাটাব। কেন না, যে ভাষায় তুমি কবিতা লিখছ, সেই ভাষা বয়সে তোমার চেয়ে কয়েকশো বছরের বড়। এবং এখনও সে প্রতিদিন জন্মে চলেছে। তার তো একটা চাপ আছে। সে তোমায় ছাড়বে কেন! ভাষা তো চাইবে তোমাকে নিজের দিকে টেনে আনতে। তুমি আবার ভাষাকে নিজের দিকে টানবে। এই টানাপোড়েনের মধ্যে থেকে, কখনও ভাষা তোমার ভেতর থেকে ঠিক কথাটা বলিয়ে নেবে, কখনও বা ভাষাকে দিয়ে বলিয়ে নেবে তুমি। এই যুদ্ধ আর বোঝাপড়া চলবে আমরণ।

তার জন্য তো, ওই স্বরের মতোই শব্দকে আয়ত্ত করতে হবে। তার রং। তার নানা রকম ছায়া। তার বিভিন্ন দিকে আলো পাঠানোর ক্ষমতা। জানতে হবে। জানতে জানতে ফুরোবে আয়ুষ্কাল।

সেই সংকল্পের এখন কী অবস্থা। যেহেতু কবি আজ যা লিখবেন, তা-ই ছাপা হবে, তাই লেখার সময়টাই সবচেয়ে কম। সময় শুধু সংসারের। দপ্তরের। সম্মেলনের সেমিনারের। উপরোধ রক্ষার। সৌজন্য বহনের। অন্যকে অসন্তুষ্ট না করার। লেখা ছিল বলেই একদিন তৈরি হয়েছিল এইসব সৌজন্য সম্পর্ক। আজ এই সৌজন্যগুলোই বেড়ে চলেছে। লেখার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

লেখা তবু ছাড়ে না। সে হানা দেবেই। সে হল জড়বুদ্ধি সন্তানের মতো। কিছু বুঝবে না, কিছু শুনবে না। অফিসে কাজ করছ। হঠাৎ টেবিলের তলা থেকে একটা হাত বেরোল। দাও। অন্য কেউ দেখতে পাবে না, তুমি দেখতে পাবে। ভিড় বাসে দু-হাতে হ্যান্ডেল ধরে টাল রাখছ, হঠাৎ পিঠ বেয়ে উঠে কাঁধের কাছে কামড়ে ঝুলছে, দাও। ঝাঁকি দিলে পড়বে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর, রাত্রে সবে ঘুম আসছে, বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে বলবে—দাও, দাও, দাও। লেখা এমন জিনিস সে দিন মানবে না, রাত্রি মানবে না। যখন খুশি এসে বলবে, লেখো, আমাকে লেখো, আমাকে লেখো। তখন তাকে না লিখে নিস্তার নেই।

গৃহিণী বলেন, অত বড় প্রফেসর, তোমার লেখা ইংরেজি করবে বলে তোমায় ডেকে পাঠাল। তুমি গেলে না। অত গুমর কীসের।

—গুমর না, গিন্নি, আত্মসম্মান। মুখের আলাপটুকুও নেই ওর সঙ্গে। হঠাৎ...

—ইংরেজি করলে হয়ত কিছু টাকাপয়সা দিত। টাকাপয়সা না থাকলে আত্মসম্মান কীসের। সম্পর্কগুলো রাখতে হয়। এটুকু না করলে লেখো কীসের জন্য।

~ www.amarboi.com ~

—আমি নিজের জন্য লিখি।

—ঢং। তবে ছাপতে দাও কেন। ছাপিয়ে কেউ পয়সা দিলে হাত পেতে নাও কেন, শুনি। অত যদি আত্মসম্মান...

ঠিকই তো। এই দুপুরের ময়দানের দিকে তাকিয়ে কবি ভাবলেন। আমি তা হলে কীসের জন্য সত্যিই লিখি। অন্য কবিদের জন্য? না। সমালোচকদের জন্য? সাহিত্যিকদের জন্য?—না।

অন্য কবিরা সব জানেন। সমালোচকরা জানেন। আমার তো কত কিছু জানা হয়নি আজও। তাঁদের জানাবার জন্য তবে লিখব কেন আমি।

কেন লেখো, কেন লেখো, কেন?

কবি বললেন, তুমি কখনও হয়ত বুঝবে না, গিন্নি আর ওই অধ্যাপক। যিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অনুবাদ করবার জন্য, তিনিও হয়ত বুঝবেন না। তবু বলি, আমি পারি না বলে লিখি। আর, যদি অনুমতি করো, তবে এও বলি, আমি পারি বলেই লিখি। জানি যে, আমার শব্দ ছাড়া অন্য কিছু নেই। জানি যে, শব্দেরও কোনো ক্ষমতা নেই। তবু অন্য কোনো বিদ্যা আমি শিক্ষা করিনি জীবনভর। তাই এর জন্য কেউ অর্থ দিলে, আমি হাত পেতে তা গ্রহণ করি। সংসার প্রতিপালনের জন্য গ্রহণ করি। যদিও জানি, যে রত্নাকরের পাপের ভাগ কেউ নেবে না।

প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে ছাতি হাতে ঝোলা কাঁধে হাঁটতে হাঁটতে কবি ময়দানের গাছেদের দিকে তাকালেন : বলো তো, বলো তো দুপুরের গাছেরা, আমি এই গ্রীষ্মের মাঠে, ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন আজ।

দুপুরের গাছেরা বলল, লিখবে বলে। লিখবে বলে।

কবি বললেন, বলো তো, আমাকে বলো তো গাছেরা, আমি কার জন্য লিখব? আমি কার জন্য লিখি!

দুপুরের গাছেরা বলল, যে তোমার মতোই রোজ একটু একটু করে শেখে, তার জন্য। তাদের জন্য। তুমি তাদের সঙ্গেই নিজেকে ভাগ করে নাও। তুমি তাদের জন্যই লেখো। যাদের সঙ্গে তোমার এখনও দেখা হয়নি।

তিন

সকালের কল্যাণী লোকালে বসে আছেন কবি। জানলার ধারে প্রায় ফাঁকা ট্রেন। রবিবার। খড়দা ছেড়েছে। বাইরে গাছ, পুকুর, মাঠ সরে সরে যাচ্ছে। আজ বিকেলে ওখানে বইমেলায় কবিতাপাঠ। কবি একা যাচ্ছেন ট্রেনের সময়টা একা পাবেন বলে। গৃহিণী পইপই করে বলে দিয়েছেন, খবরদার! কারও সঙ্গে মাথা গরম করবে না। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে শেখো। পশুপাখিরা পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারে। তুমি করতে পারো না।

কবি ভাবলেন, একটা পাখির সঙ্গে পতঙ্গ কি কখনও যুদ্ধ করতে পারে? বদলে সে কী করতে পারে? সে নিজের গায়ের রংটা ঘাসের মতো করে ফেলতে পারে।

~ www.amarboi.com ~

কবি দেখলেন, বড় একটা জলা ঘাসজমি। একটা মস্ত ছাতারে পাখি এসে বসল সেখানে। পাখির মাথাটা মানুষের। চশমাপরা, পাকা গোঁফ। দূরে দূরে কনস্টেবলের টুপি পরা ছোটো ছোটো পাখি। কিছু দূরে ঘাসের মধ্যে কাঠির মতো একা পোকা নিশ্চল হয়ে আছে। বড় পাখিটা উড়ে যেতেই কাঠি থেকে একটা মুখ বেরোল। সকালে উঠে এই মুখটাই রোজ আয়নায় দেখেন কবি।

এই তো, পেয়েছি। বাব্বাঃ। কবি দেখলেন, সেই মেয়েটা। নীহারেন্দু সেন যার জ্যাঠা।

ট্রেন একটা স্টেশনে থেমেছে।

—কল্যাণী যাচ্ছেন তো! জানি! আমাকে বলেননি কিন্তু। খবর পেয়েছি।

—ও, তুমি এদিকে কোথায়?

—আমি কল্যাণী। মাসির বাড়ি যাব। রাতে থাকব। বিকেলে আপনার কবিতা শোনা হবে।

ঈশ্বর! কবি হতাশ হতেও ক্লান্ত বোধ করলেন। পুরো রাস্তাটা মাটি।

—স্টেশনে দেখলাম, আপনি হনহন করে ঢুকে গেলেন গেটে। আমার তখন টিকিট কাটা হয়নি। পরে প্ল্যাটফর্মে আসতেই ট্রেন সিটি দিল। উঠে পড়লাম পেছনের দিকে। তারপর প্রত্যেকটা স্টেশনে থামছে, আর আমি ছুটে ছুটে এগিয়ে যাচ্ছি। শেষে ধরে ফেললাম।

মেয়েটি তার আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

এ কি পাগল! আজ ট্রেনে লোক নেই। কেউ তেমন খেয়াল করবে না এসব কথাবার্তা, এটাই বাঁচোয়া।

—প্রোগ্রাম তো বিকেলে। কোথায় উঠবেন। চলুন আমার মাসির বাড়িতে বিশ্রাম নেবেন।

কবি ধীরে ধীরে বললেন, সেটা করার উপায় নেই, কারণ, আমার বন্ধু থাকেন জুলিয়ান ডে স্কুলের সামনে। ওঁরা অপেক্ষা করবেন।

জুলিয়ান ডে। সে তো চিনি। আচ্ছা একটা কথা, আমি কি ওই পর্যন্ত আপনার সঙ্গে একটু যাব?

কবি না বলতে পারেন না। হাল ছেড়ে বললেন, আচ্ছা যেয়ো এবং তারপর আবার কুটো আঁকড়ানোর মতো বললেন—হ্যাঁ, আমি কিন্তু স্টেশন থেকে পুরোটা হেঁটে যাব। ভাবতে ভাবতে যাব তো। অনেকটা পথ কিন্তু।

আপনার ভাবনায় আমি মোটেই বাধা দেব না। কথা বলব না। শুধু সঙ্গে সঙ্গে যাব। আপনার সঙ্গে সাত পা হাঁটাই অনেক।

কবি থমকালেন, সাত পা হাঁটা মানে?

—বলে না, সাত পা হাঁটলে বন্ধু হয়। সেই আর কি। তাছাড়া ভিড় বাসে তো মুখের দিকে তাকানো যায় না। মুখের দিকে না তাকালে কি কথা বলতে ইচ্ছা করে? চোখের দিকে না তাকালে?

~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি অপলক চেয়ে আছে। সোজা। কবি মেয়েটির কোনো ভাষাই বুঝতে পারেন না।

—আজ কিন্তু আপনি লুকোও তৃণ থেকে কবিতা পড়বেন।

—ও বইটা আনিনি।

—আমি এনেছি। এই প্রথম লেখাটা পড়বেনই পড়বেন। মেয়েটি ব্যাগ থেকে বই বার করে পাতা খোলামাত্র বই থেকে দু-তিনটি বাসের টিকিট আর একটা ভাঁজ করা কাগজ ঝরে পড়ে। মেয়েটি ঝাঁপিয়ে উড়ে যাওয়া বাসের টিকিট কুড়োতে থাকে।

কবি বাধা দেন—আঃ, ধুলোর মধ্য থেকে ওই টিকিট কুড়োচ্ছ কেন। নোংরা ওখানে। টিকিট তো কাজে লাগবে না। এই নাও এই কাগজটা রাখো। পড়ে গেছিল।

মেয়েটি টিকিটগুলো ব্যাগে রেখে বলল, এগুলো মামুলি বাসের টিকিট নয়। তিনটে আছে। যে তিন দিন আপনার সঙ্গে বাসে দেখা হয়েছে, আপনি কেটে দিয়েছিলেন।

তুমি কি উন্মাদ! এগুলো কেউ রাখে?

—হ্যাঁ রাখে। আর যে ভাঁজ করা কাগজটা আমার হাতে দিলেন, এটা কী জানেন?

—কী?

—একটা চিঠি। এই বই পড়ে লেখা।

—এই বই!

—হ্যাঁ, কোনো লেখা পড়লে লেখকের সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে হয় তো। সারাদিন ধরে কথা চলে। মনে মনে। তর্ক। আপত্তি-পছন্দ। চলে তো? তারই কিছু লিখে রাখা। পোস্ট করতাম না। কী আশ্চর্য দেখুন, ঠিক কীভাবে এই চিঠিটা আপনার হাতে পড়ে গেল। আপনার হাত ছুঁয়ে ফিরে এল। দেখতে চাইবেন না কিন্তু।

কবি শুধু কোনোক্রমে বলতে পারলেন। তুমি কি লেখো? কবিতা লেখো কি তুমি?

মেয়েটি হাসল, বলল, না না লিখি না। লিখতে পারি না আমি। কবিতা পড়ি। কবিতা শুনি। মানুষ যেমন গান শোনে, তেমনি। কবিতার মধ্য দিয়ে নিজেকে যেভাবে বুঝতে পারি, পৃথিবীকে যেভাবে বুঝতে পারি, আর কিছুতেই তেমন পারি না। সব কবিতাই তেমন হয় না ঠিকই। কিছু কিছু হয়। আপনার এই প্রথম কবিতাটা তেমন। পড়বেন তো। বলুন আজ পড়বেন তো?

পাতাটা খুলে বইটা এগিয়ে ধরল মেয়েটি।

কবি দেখলেন, মেয়েটির কপালে উড়ে পড়ছে একটা চুলের গুছি। কবি দেখলেন, তাঁর বইয়ের মলাটে কাঁপছে মেয়েটির ফরসা কড়ে আঙুল।

এবং কবি দেখলেন, মল্লার নামছে। বাইরে রোদ্দুর, ছুটে চলা ট্রেন। তার যাত্রীদল, সব মুছে গেছে। চারিদিক শুধু রাত্রির আকাশ প্রবল বৃষ্টিতে নিরন্ধ্র। মল্লার নামছে। অরুণ ভাদুড়িকে বারণ করছেন কবি। অরুণ ভাদুড়ি শুনছেন না। পাহাড়ের অতল খাদ থেকে উঠে আসছে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের শব্দ, ধম্ ধম ধ্বনি। চূড়ার কাছে চমকাচ্ছে ক্ষণপ্রভা। ভূগর্ভ থেকে মহাকাশ পর্যন্ত যুক্ত করে দিচ্ছে একটি চলন্ত শিরদাঁড়া। মল্লার। মল্লার।

~ www.amarboi.com ~

আর মেয়েটি দেখল, কবির চেয়ে কুড়ি বছরের ছোটো মেয়েটি দেখল, 'পড়বেন তো, বলুন,' আর একবার বলামাত্র মেয়েটি দেখল—কবি উঠে দাঁড়িয়েছেন। কবির চোখে লেগেছে রক্তের ছিটে, কবির হাত পা থরথর করে কাঁপছে, কবি উন্মাদের মতো চিৎকার করে বলছেন, আর একটা কথা বললে তোমার জিভ ছিঁড়ে নেব আমি। যখন আমার পঁচিশ বছর বয়স ছিল তখন কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে তুমি!

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংশোধন বা কাটাকুটি

'সেই কাণ্ড করেছ, আবার? উফ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না...'

কবি চমকে ফিরে তাকালেন।

গৃহিণী।

—'কী করলে দ্যাখো তো একবার। সারা ঘর জলে থইথই। বিছানাটা অবধি ভিজে গেল...'

কবির হুঁশ ফিরল। তাই তো। স্নান করতে করতে তোয়ালে পরে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। সারা শরীর থেকে জল ঝরছে। মাথার চুল থেকে। হ্যাঁ, কাগজের ওপরেও পড়েছে।

—যাও। বাথরুমে ঢোকো শিগগির। দু-মিনিট পরে যেন ওইসব কাটাকুটি না করলে চলত না। মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত তাতে।

কবি বাথরুমে ফিরলেন আবার। সত্যিই কাজটা অন্যায় হয়েছে। এমন কাজ তিনি আগেও করেছেন। ছোটো দুখানা ঘর। লাগোয়া বাথরুম। ঘরে আলো ঢোকে না। সকাল থেকে টিউব জ্বালিয়ে রাখতে হয়। জল পড়লে শুকোতে সময় লেগে যায়। কিন্তু স্নান করতে করতে মাথায় একটা কারেকশন আসতেই, ওই অবস্থায় বেরিয়ে খাটের ওপর ফেলে রাখা সদ্য লিখতে শুরু করা কবিতাটির ওপর ঝুঁকে পড়া থেকে নিজেকে আটকাতে পারেননি তিনি। কাগজ যে ভিজে গেল, সে খেয়ালও ছিল না। কেটে, মার্জিনে লিখেছিলেন মোটে একটা শব্দ। 'আছিল'।

নিজের ওপর রাগ হল কবির। সত্যিই, মাথায় একবার লাইন এলে বা কারেকশন এলে, জগতের কোনো কিছু তাঁর খেয়াল থাকে না। সারাদিন যত লাইন মাথায় আসে, তার চেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেশি আসে কারেকশন। ওই লাইনটার বদলে যদি এই লাইনটা হয়। ওই শব্দটার বদলে কি এই শব্দটা ঠিক? এমনকী এই চিহ্নের বদলে ওই চিহ্ন! দাঁড়ির বদলে জিজ্ঞাসা? নাকি বিস্ময়বোধক! একটা কবিতা যখন মাথায় আসে, তখন লেখার আগে দু-চার দিন সেটা মাথায় নিয়ে ঘোরা যায়। এটা বেশ নেশার মতো। গোপনে গোপনে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু কাগজে একবার লিখিত হয়ে যাবার পরই, যখনই তার সংশোধন মনে আসবে, আর তা কেবলই আসবে, তখন তা প্রতিবার ছুটে গিয়ে কাগজে না বসানো পর্যন্ত রেহাই নেই নিজের কাছ থেকে। শুধু কাগজে বসানো নয়, ছাপতে চলে যাওয়ার পর যদি মাথায় আসে কারেকশন। আর এমন কপাল, তাই-ই আসে, তখন প্রুফে গিয়ে বসাতে হয়। প্রেসের লোকেরা রেগে যায়। স্বাভাবিক। এক কাজ তিনবার করে করানো। তারপর যদি ছাপতে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে আসে, তখনও আরেক কাণ্ড। সবাইকে ধরে-বেঁধে আবার বদল করা। ওই সময়টা যেন নেশার মতো। অন্যের অসুবিধে হচ্ছে কি না সেদিকে কোনো নজর থাকে না।

এই কারণেই প্রেসের শ্যামাপদবাবু থেকে, অফিসের সহকর্মী থেকে, নিজের গৃহিণী পর্যন্ত অনেকের কাছেই বারবার মুখঝামটা খেয়েছেন কবি। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বদলাতে পারেননি। বাথরুমে ঢুকে পুনর্বার কল খুলে চান করতে করতে কবি শুনলেন, গৃহিণীর সরোষ নির্দেশ, 'চায়না, ঘর দুটো মুছে দে তো।'

চায়না। এই চায়নার জন্যই হল গন্ডগোলটা। দুদিন হল এ বাড়িতে কাজে ঢুকেছে মেয়েটা। সামনের বস্তির পিছনে যে রেললাইন, তার ধারের একটা ঝুপড়িতে নাকি এসে উঠেছে ওরা মা-ভাইদের সঙ্গে, মাসখানেক আগে। দোতলায় মিহিরবাবুর বাড়ি যে বউটা কাজ করে, তার নাকি পাঁচবাড়ি কাজ, তার সময় নেই, তাই এই মেয়েটাকে এনে দিয়ে গেল। বলল, নতুন এসেছে। গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, আগে বাড়ি কোথায় ছিল? মেয়েটা বলল, আমাগো বাড়ি আছিল বনগাঁয়।

সদ্য এসেছে তো, তাই ভুলতে পারছে না। আজও সকালে, কবি যখন লিখছিলেন মানে, আলো কম বলে বাথরুমের ধারে পশ্চিমমুখো খোলা প্যাসেজটায় যেটুকু আলো আর প্রকৃতি আর পাখি-নারকেল গাছ চিলতে মেঘ এইসব দেখতে পাওয়া যায়, সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনকার মতোই ভাবছিলেন, ভাগ্যক্রমে দু-চারটে লাইন পাওয়া যায় কি না। ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেছিলেন, আর লিখতে শুরু করার পর শুনেও ছিলেন, চায়না বলে মেয়েটা বলছে গৃহিণীকে, আমাগো বাড়ি তো আছিল বনগাঁয়। সেইখানে এত ধুঁয়াধুলা না। এত্ত আওয়াজও না।

কবি ভাবছিলেন, ভুলতে পারছে না বেচারা। জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসে আর নিজের গ্রামকে ভুলতে পারছে না।

কবিও কি পেরেছেন? না। তাঁর নিজের বাড়িও তো ছিল গ্রামেরই সীমায়। তিনি ভুলে যাবেন! এ মেয়েটা লোকের বাড়ির কাজের লোক। তিনিও কাজ করেই খান। লিখেও খান কিছুটা। লিখে খেলে নাকি লেখা হয় না, সবাই বলে। না হোক। খাওয়া তো হয়। তাই বা

~ www.amarboi.com ~

কে দেয়। লেখাপড়ার চাকরি তাঁর। এর চাকরি ঘর মোছা বাসন মাজা। দুজনেই তো গ্রাম ছাড়া। সেখানে তো এক।

লেখাটায় দুটো লাইন লিখেছিলেন, আমার বাড়ি ছিল বসিরহাটে? আমার বাড়ি ছিল কি বনগাঁয়? স্নান করতে করতে হঠাৎ মনে হল 'আমার বাড়ি আছিল বনগাঁয়' করলে কেমন হয়? কেমন-টেমন জানি না, করতেই হবে। আমার বাড়ি ছিল বসিরহাটে। আমার বাড়ি আছিল বনগাঁয়। সেক্ষেত্রে শেষের জিজ্ঞাসার চিহ্ন দুটো তুলে দিতে হবে।

যেমন মনে হওয়া তেমনি কাজ। বাথরুম খুলে তৎক্ষণাৎ শোবার ঘরে। আর ওই সব বিপত্তি। সেদিক দিয়ে চায়নাই তো দায়ী। চায়না 'আছিল বনগাঁয়' না বললে তো ওটা কবিতায় লাগাতেন না কবি। ছিল আর আছিল। একটা ঘটি এক্সপ্রেশন একটা বাঙাল এক্সপ্রেশন? হতে পারে। কারণ দু-ধরনের লোকই তো গ্রাম মফস্‌সল ছেড়ে এসেছে শহরে। কাজ খুঁজতে। নানা দিক থেকে নানা জাতি এসে মিলে যায় এখানে। নানারকম মেয়েরাও আসে। যেসব মেয়ে কাজ পায় না, তারা, শেষমেশ নিজের শরীরকেই জীবিকা করে। নিজের শরীর ভেঙেই খায়। আচ্ছা, যদি সন্তান এসে পড়ে, কী করে এরা। খবরের কাগজে যে প্রায়ই সন্ধান চাই শীর্ষক বিজ্ঞাপন বেরোয়, তাতে থাকে যেসব সদ্যোজাত পরিত্যক্ত শিশুর ছবি, যাদের বাবা-মা-র সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, তারা কি অনেক সময় এই সব মায়ের সন্তান? এরা কি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, তার আগেই গর্ভপাত ঘটায়। উঃ ভগবান! কত সব ব্যাপারই যে ঘটে পৃথিবীতে! কবি যেন শিউরে উঠলেন অজানা ভয়ে। অবশ্য শরীরকে ভাঙিয়ে যারা খায়, শরীরকে বিক্রি করে, তারা কী আর করবে। শরীর ছাড়া তো কোনো মূলধন নেই তাদের।

কবিও কি অনেকটা সেইরকম নন! লেখা ছাড়া আর কোনো বিদ্যা তো তিনি জানতেন না। তাই লেখা দিয়েই প্রধানত উপার্জন করতে হয় তাঁকে। এইখানে কি ঐ সব মেয়েদের সঙ্গে কোথাও একটা মেলে না তাঁর? কেন না, শরীর যখন শরীরের কাছে আসে তখন তো তা নিভৃত আনন্দকেই প্রকাশ করতে চায়। গোপনে। কেবল আনন্দ নয়। শরীর তো অনেক সময় দুঃখকে প্রকাশ করবার জন্য শরীরকেই টানে কাছে। তেমনই, যে-কবিতা, একসময় ছিল কবির নিভৃত দুঃখ-আনন্দের সংগোপন প্রকাশ, আজ তাকেই প্রকাশ্যে পসরা করবার পালা। তাছাড়া, এখন তো আর কোনো কিছু লিখে দিনের পর দিন ফেলে রেখে সেটা পুরনো হতে দেবার অবকাশ নেই। লেখার পরপরই তা চলে যাবে প্রেসে। এই অবস্থায়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা সংশোধন করা যায়, তার চেষ্টা করে চলেন কবি। এই করতে করতেই ভাষার সঙ্গে সম্পর্কের সীমাটা তবু দেখতে পাওয়া যায়। জানতে পারা যায় আজও কতটা তিনি জানেন না—এই ভাষা শব্দ ছন্দের বিষয়ে, এই জীবনের বিষয়ে। সরোদিয়া যেমন, কেবল সুর দিয়েই জীবনের মধ্যে ঢুকতে পারেন, সেই অন্ধের হাতে যেমন সরোদ ছাড়া অন্য কোনো যষ্টি নেই, কবির কাছেও তেমনি অন্ধের লাঠি হল শব্দ। শব্দ দিয়ে সে জীবনের মধ্যে তার রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে প্রবেশপথ পায়। আর কী উপায়ে এইসব নিরুপায় লোক পৃথিবীকে জানবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এমনও কেউ কেউ আছে, যারা শব্দকে অন্য ভাবেও ব্যবহার করে। অন্যকে ছিন্নভিন্ন করবার কাজে। অপরকে ধ্বংস করবার কাজে। অপরের ত্রুটি ধরবার আনন্দ থেকে তার শুরু। তাদেরও বেশ প্রতিপত্তি আর কীর্তিগাথা আছে এই ধরাধামে। কিন্তু কবি নিজের ভাগ্যকে প্রণাম করেন, হাতে একটা সরোদ কিংবা একটা বেহালা, কিংবা একটা বাঁশি জলে ভাসতে ভাসতে তাঁর হাতে এসে পড়েছিল বলে। ভাগ্যিস তিনি সেটাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। রাজা কবির হাতে সেতার ধরিয়ে দিয়ে অন্যকে দিয়েছেন ঘাতকের ভূমিকা। একই দরবার। একই শ্রোতা দর্শক। একই সভাসদ। রাজা জানেন কে কোনটা পারবে। ঘাতক এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে দর্পভরে রাজদরবার পেরিয়ে যায়—আর লোকে সভয়ে কুর্নিশ করে, আর বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে, কি কীর্তি। একেবারে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে? অ্যাঁ। দেখলে, এই হল হিরণ্যকশিপু। অন্য জন বলে, কে বলেছে, এই তো ঘটোৎকচ। তৃতীয় জন বলে, তোমরা ছাই জান, এ রাসপুটিন ছাড়া কেউ নয়। আলোচনা করতে করতে বাড়ি যায় সব।

তার কয়েক প্রহর পরে যন্ত্রী জাগে। একটা একটা পর্দায় আঙুল পড়ে তার,আর এতক্ষণ ভয়ে যে কান্না লোকে কাঁদতে পারেনি, সেইসব কান্না ঝরঝর করে বেরিয়ে আসে চোখ ধুয়ে দিয়ে। প্রকাশ্যে নয়, নিভৃতে। নিজের নিজের গোপন কোনায়। সুর তো সমস্ত জায়গায় পৌঁছোয়। এই রাজদরবার কবির হাতে একটা বাঁশি দিয়েছে। সমস্ত আঘাতের পর একটা ফুঁ লাগে। একটা ফুৎকার মাত্র। অমনি 'বাজাও রে মোহন বাঁশি...রিঝ-মন ভেদন, বাঁশরি বাদন-ন...'

সুর তার প্রত্যেক কণায় কণায় উঠে গিয়ে অশ্রুলাভ করে। কবির বড় ভাগ্য যে লাঠির মাথায় পুঁটলি বেঁধে এই জীবনে এতটা হেঁটে আসার পর এই কাজ পাওয়া গেছে।

স্নান শেষ করতে করতে কবি দেখলেন, পিছনেই রাজা। বাথরুমের মধ্যে।

রাজার মুখে কথা ফুটল। 'দেখলে তো কি অশান্তিটা হল। কী দরকারটা ছিল তোমার।'

—'তার মানে?'

—'শুনতে পাচ্ছ না?'

কবি শুনলেন, বাইরে তর্জন চলছে থেকে থেকেই।—'কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থেকে থাকে। ভাগ্যিস চায়না কাজ করে চলে যায়নি, নইলে আমাকেই মুছতে হত।'

রাজা লাফিয়ে উঠে বাথরুমের ভাঙা জানলাটার ওপর উঠেছে। যেন ওটা তমাল গাছের ডাল, আবার কথা ফুটল, 'চান করে বেরিয়েই কারেকশনটা করতে পারতে।'

কবি বললেন, 'এখন কি আর সে যুগ আছে। কারকেশনটা করব কি করব না মনে করে দোনামোনায় আমি চান করতে গেলাম আর তুমি এসে কারেকশনটা লিখে দিয়ে গেলে—দেহি পদপল্লবমুদারম। আর গিন্নিও চিনতে পারল না। এখন দিনকাল অন্যরকম। নিজের কারেকশনটা নিজেকেই করতে হয়।'

রাজার মুখে দুষ্টু হাসি। রাজা একটি বালক। রাজার খালি গা। মাথায় ময়ুর পাখা। কোমরে বাঁধা উত্তরীয়ের মধ্যে গোঁজা একটা আড়বাঁশি।

~ www.amarboi.com ~

'তুমি কিন্তু তোমার গিন্নিকে বড্ড জ্বালাও!'

এইবার কবির রাগ হয়ে গেল, 'জ্বালাই মানে? তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। যখন তখন মাথায় কারেকশন আনবে। মনে লাইন আনবে। এনে আমাকে বিপদে ফেলা। যাও তো এখন। আমি অফিসে যাবার সময় বাড়িতে লোক আসা পছন্দ করি না।

রাজা হুস করে ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে জানলার বাইরে চলে গেল। তারপর কাচের ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল, 'মাথায় লাইন না এলে খেতে কী? চাকরি পেতে কী করে? গিন্নিকে খাওয়াতে কী? মেয়েকে হোস্টেলে দিতে পারতে!... দুয়ো, দুয়ো...'

রাখালরাজা অন্তর্হিত হল।

আর কবি মর্মাহত হলেন। ছিঃ। শেষে রাখালরাজাও এই কথা বলল। নাঃ, আজ থেকে আর লেখা নিয়ে ভাববেন না। পত্রিকা থেকে যা চাইবে, বসে লিখে অবিলম্বে দিয়ে দেবেন। কারেকশন ফারেকশন বাদ। ও সব করে তো ঘণ্টা হয়। শ্যামাপদবাবুর অসুবিধে। বুড়ো মানুষ। রাগ করেন, এটাও কবির তরফে অন্যায়। গিন্নির অসুবিধে হয়। রাতে ঘুম আসবার পর অতবার উঠে লাইট জ্বালানো। গিন্নি মেয়াদি অনিদ্রায় ভোগেন। ঘর তো দুটো মোটে। এ ঘরে আলো জ্বালালে, কলম নিলে, বই পাড়লে—খুটুর হল, খাটুর হল—ও ঘরে তো ঝামেলা হবেই। গিন্নির সবে আসা ঘুম দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের জন্য ভাঙল। উঃ ভগবান! রাতে একটু দু-চোখের পাতা এক করবার জো নেই। সংসারের কোনো সুখই তো দিলে না। একটু ঘুমোব, তারও উপায় নেই!

সত্যি তো। সবাইকে বিরক্ত করার কী দরকার। লোকের তারিফ পাবার জন্য তো নয়। নিজেরই মধ্যে কেমন একটা অপূর্ণতা ঘুরে বেড়ায়। নিজের মধ্যেই কেউ বলে, যে-কাজ করতে এসেছ তা নিখুঁত করে করো। নিখুঁত নির্ভুল তো আর হয় না কবিতা। তবু সেই সীমার যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায়। ভেতরে কেউ বলে এসব। কে বলে? তাকে চুপ করিয়ে দিতে হবে এবার।

—কী ব্যাপার? ঘটের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—'অ্যাঁ!'

—'চানে ঢুকে তো এক ঘণ্টা লাগালে। এখনও আপনমনে বিড়বিড় করছ যে। লেখা শেষ হয়নি?'

—'ও কিছু না। প্রায় হয়ে এসেছে।'

—'আমারও হয়ে এসেছে। নাও, খেতে বসবে চলো।'

শোবার ঘরেই আসন পেতে মেঝেয় বসে কবির খাওয়া। খাবার টেবিল তাঁদের নেই। কবির সম্বন্ধী নন্তুবাবু বলেছেন ভাড়ায় একটা খাবার টেবিল আর চারটে চেয়ার এনে দেবেন। ভাড়া হবে মাসে একশো কুড়ি টাকা। এছাড়া ভাড়া করা দুটো ফ্যান আর একটা আলমারিও রাখছেন তাঁদের আলমারি কেনার সঙ্গতি নেই। টেবিলেরও কী দরকার, কবি বললেন। বেশ তো চলছে।

~ www.amarboi.com ~

গৃহিণী বলেন, 'না দরকার। শ্যামলদা শেফালিদির বাড়ি দ্যাখো না। কী সুন্দর টেবিল। ওরা কত গোছানো।'

কবি বলেন, 'সবাই তো সমান হয় না গিন্নি। তাছাড়া ওরা তো দুজনেই চাকরি করে।'

গৃহিণী আরও একটি অবরুদ্ধ রাগের প্রকাশভূমি পান—'দুজনেই চাকরি করে। আমিও তো চাকরি করতাম। তুমিই তো দিলে না।'

কবি আহত, 'আমি দিলাম না। তোমারই তো শরীর দিল না।'

—'ও মাঝে মাঝে অমন সবারই হয়। তারপর একসময় ঠিক হয়ে যায়।'

—'হল না তো একবারও। প্রত্যেকটা কাজের সময়ই কয়েক মাস পরপরই শরীর ভেঙে পড়তে লাগল তোমার। তুমি ও সব পারো? বস্তিতে বস্তিতে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ওই সব কাজ...'

—'তবু। ইমুনাইজেশনের সময় কত বাচ্চাকে ধরতে পারা যায়। স্কুল চালালে, কত বাচ্চা আসে। জানো এক বার একটা বস্তিতে একটা বাচ্চা আমায় কী বলেছিল? বলেছিল, আমায় একটু কোলে নেবে!'

—'জানি, তারপর সেই বাচ্চাটিকে বস্তি থেকে তুলে তুমি বাড়িতে এনে রাখতে চেয়েছিলে। ওর মাকেও প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলে।'

—'তুমি দিলে না।'

কবি আবার অপ্রস্তুত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন—'আমি দিলাম না। মানে? আমাদের কি সে অবস্থা আছে? মিস্টুর হোস্টেলের খরচ। এতগুলো টাকা বাড়ি ভাড়া। সব করে, আরেকটা বাচ্চা কি আমাদের আনলে চলত বলো!'

গৃহিণীর চোখ হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে, 'ঠিক চলত। তুমিই চাও না। বাচ্চা চাও না। নিষ্ঠুর তুমি! নিষ্ঠুর!'

কবি এগিয়ে গিয়ে গৃহিণীর কাঁধ স্পর্শ করেন। 'শোনো, ব্যাপারটা বুঝে দ্যাখো।'

ঝাঁকুনিতে নিজের শরীর ছাড়িয়ে নেন—'খবরদার! তুমি ছোঁবে না আমাকে। ছোঁবে না।' বলতে বলতে বুকের কাছের পাঞ্জাবিটা মুঠো করে ধরে ঘুসি মারতে থাকেন কবির বাঁ কাঁধে। পুরোবাহু সমেত বাঁ কাঁধটা অসাড় লাগে। কবি রান্নাঘরের সীমায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করেন ছুড়ে মারার মতো কোনো থালাবাটি কাছাকাছি আছে কি না। নেই দেখে, নিশ্চিন্ত হয়ে, ডানহাতের তালু দিয়ে ধীরে ধীরে মাথায় চাপড় মারেন, আর বলেন, শান্ত হও, শান্ত হও—গৃহিণী স্থবির দৃষ্টি নিয়ে বসে পড়েন।

কদিন আগের এ ঘটনা।

কবি খেতে খেতে ভাত ভাঙেন। গৃহিণী বলেন, 'আগে মাছ নয়। আগে উচ্ছেসেদ্ধটা। এই যে।'

কবি, ও হাঁ হ্যাঁ বলে, উচ্ছে-সেদ্ধ খান।

—'এ বার ডালটা [illegible]

কবি নিশ্চুপে খান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গৃহিণী বলে, 'ক্লাস ওয়ান হওয়ার কথা।'

—'অ্যাঁ! হ্যাঁ!'

'পাঁচ বছর তো! পূর্ণ হয়ে গেছে।'

কবি তাড়াতাড়ি খান। 'হ্যাঁ পাঁচ বছর, না! তাই তো!'

কবি খাওয়া শেষ করেন।

গৃহিণী বলেন, 'এই যে তোমার প্রেসারের ওষুধ'।

'হ্যাঁ।'

মাথায় প্রায় সমাপ্ত কবিতাটা হানা দিচ্ছে। কী নাম দেওয়া যায় লেখাটার! ছোটোখাটো কিছু একটা দিতে হবে। লোকেরা? নাকি মানুষজন। নাঃ, লোকজন। এটাই চলতে পারে।

জল খেয়ে কাঁধ-ঝোলায় বইপত্র নিয়ে, ছাতা ভরতে ভরতে কবি কবিতার নাম সন্ধান করেন। গৃহিণী তাঁর দিকে সারাদিনের খরচ এগিয়ে দেন, কুড়ি টাকা।

গৃহিণী বলেন, 'আজ একটু বেরোব।'

—'কোথায় যাবে?'

—'দেখি কোথায় যাই।'

—'চাকরি খুঁজতে।'

'খুঁজিই যদি! বাড়িতে কী করব? পাঁচ বছর আগে হলে...'

কবি রাস্তায় বেরোলেন।

দুই

কবি হাঁটছেন।

পাঁচ বছর। পাঁচ বছর অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকার পক্ষে। কর্মহীন থাকার পক্ষে। ভুলে যাবার পক্ষেও।

বাসের লাইন আজ ছোটো। কিসের যেন সরকারি ছুটি আজ। তাঁদের অফিস বেসরকারি। লাইনে দাঁড়িয়ে কবি তাড়াতাড়িই জানলার ধারে একটা সিট পেয়ে গেলেন। নিশ্চিন্ত। এবার রাস্তাটুকুর মধ্যে কবিতাটা মনে মনে সাজিয়ে নিতে পারবেন। নাঃ, কারেকশন নয়, এখানেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার মনে মনে পড়ে বুঝে নেওয়া। কাটাকুটি পরে আবার।

বাস ছেড়েছে। ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপর উঠেছে। হঠাৎ জানলার বাইরে একটা মুখ। রাখালরাজা। মাথায় চূড়া। বাঁশিটা হাতে। জানলার বাইরে দিয়ে বাসের পাশে পাশে সমান বেগে উড়ে চলেছে। পতপত উড়ছে উত্তরীয়।

—'রেগে গেছ নাকি তখন? চানের সময়।'

—নাঃ। রাগ করে কী হবে। আর কারেকশন করেই বা কী হবে?

—এই তো রাগের কথা।'

~ www.amarboi.com ~

—'না, রাগ নয়। সবার শুধু অসুবিধে সৃষ্টি করা। কেউই তো আর পরিশ্রমের মানে বুঝতে চায় না। লক্ষই করে না ও সব। আরেঃ!'...

কবি দেখলেন একটা ডবলডেকার পাশে পাশে চলেছে। রাখালরাজা কোথায় গেল? কবি জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। দোতলায় একটা জানলা এক হাতে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। কবিকে দেখে হাত নাড়ল। বাঁদর নাকি? আজ আর রাগটা পড়ছে না।

ডবলডেকার ধীরে চলে। মিনিবাস জোরে। কবিকে নিয়ে মিনিবাসটা এগিয়ে যেতেই আবার দুহাত ভাসিয়ে দিয়ে জানলার বাইরে রাখালরাজার হাওয়া সাঁতার। ময়ূরপাখা কাঁপছে হাওয়ায়। বাঁশিটা কোমরে গুঁজতে গিয়ে হাত থেকে স্লিপ করে পড়ে গেল নিচে ধাবমান মারুতির ছাদে। ডাইভ দিয়ে ধরে নিল সে। তুখোড় ছেলে।

জানলার বাইরে উড্ডীন রাখালরাজা কোমরে বাঁশিটা গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'কেন ও কথা বলছ।'

—'কী কথা!'

—'এই যে বললে, পরিশ্রমের মানে বুঝতে চায় না কেউ। কেউ লক্ষ করে না ও সব। কেউ লক্ষ করবে বলেই কি তুমি লেখো! অন্যের তারিফ পাবে বলে?'

—'না। ঠিক তা নয়, মানে...'

—'দুপুরে, রোদ্দুরের মাঠে, আমি যখন বাঁশি বাজাই, পাখিও যখন গান বন্ধ করে, কে শোনে সেই বাঁশি? কেউ কি শোনে? কেউ শুনবে বলেই কি বাজাই?'

—'রুদ্র শোনে।'

—'রুদ্র? হ্যাঁ। তা ঠিক।'

প্রান্তর প্রান্তের কোণে, রুদ্র বসি তাই শোনে। কবি ভাবেন, প্রান্ত বলার পর আবার কোণ বলার কি দরকার ছিল। প্রান্ত মানেই সীমা, ধার। তারও আবার কোণ। উঁহু। ঠিক মেনে নিতে পারছেন না...

রাখালরাজা জানলার ওপিঠ থেকে ফুট কাটে, যেন কত জানে,—'তাহলে মিল হত কী করে?'

—হ্যাঁ, মিলের জন্যই আনা। এটা তো ভালো জিনিস নয়। একটু কারেকশন করতে পারতেন।'

—'উঃ। আবার সেই কারেকশন। যে এটা লিখেছে, সে তোমার চেয়ে কত হাজার গুণ বড় কবি তা জানো?'

—'জানি।'

—'আর সে কত হাজার কারেকশন করেছে তাও নিশ্চয় জানো?'

—'জানি।'

—'দেখবে, কিন্তু খুঁজবে না। তুমি তো ভুল খুঁজছিলে। প্রান্তর প্রান্তের কোণে রুদ্র বসি তাই শোনে—এর কোনো বিকল্প হয়। হতে পারে।'

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবি লজ্জা পান। সত্যিই এর কোনো বিকল্প হয় না। এ অবধারিত।

রাখালরাজা বলে, 'ত্রুটি সন্ধান করতে গেলেই কিন্তু মরবে। চোখ কালো হয়ে যাবে। জীবনে আর ভালো দেখতে পারবে না। অন্ধ চোখ ঘুরতে ঘুরতে একদিন পাঁকে গিয়ে পড়বে।... তবে, এটা ঠিক রুদ্র কোণে বসেই হয়ত শোনে না! না, শোনে না।'

রাখালরাজা নিশ্চিত হয়।

—'কোথায় বসে শোনে তবে?'

—'ওপরে। দ্যাখো, প্রান্তর প্রান্তের কোণ থেকে সুরটা উঠে যাচ্ছে, চড়ায় উঠে যাচ্ছে কত। কত ওপরে। মানে দূরত্বে। দূরে আর ওপরে উঠে যাচ্ছে সুর। তার মানে, রুদ্র আছে সেইখানে। তারসপ্তকের ওপরে তার আসন। সেইখানে সে আছে।'

—'রুদ্র কে?'

—'যে শোনে সে রুদ্র। নিঃসঙ্গ রৌদ্রপীড়িত দুপুরবেলায় বাঁশি যে শুনতে পায়।'

—'যে রুদ্র সে প্রবল। সে নিঃসঙ্গ। সে মগ্ন। সে কবি।'

—'ওই দ্যাখো। কন্ডাক্টর আসছে।'

কবি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, কনডাক্টর। কবি একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলেন, ঢাকুরিয়া গ্রেট ইস্টার্ন, একটা।

কনডাক্টর বিরক্ত—'খুচরো দিন। ২ টাকা ৭০।'

—'নেই তো ভাই।'

—'নেই তো আগে বলেননি কেন? ছুটিছাটার দিন প্যাসেঞ্জার নেই। রাখুন। পরে দেখছি।'

কবি অপ্রতিভ মুখে জানলার দিকে তাকান। রাখালরাজা অন্তর্হিত। তা থাকবে কেন। দরকারের সময় থাকবে না। তুখোড় ছেলে।

বাসটা কার্জন পার্ক পেরিয়ে যাচ্ছে। কবি উঠলেন, দশটাকার নোটটা হাতে। অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়ালেন কনডাক্টরের সামনে। কনডাক্টর ভাঙিয়ে খুচরো আর টিকিট দিচ্ছে। হেল্পার দরজায় হাঁকছে, গেটিস্টন, গেটিস্টন। অপরাধীর মতো মুখ নিয়েই নেমে পড়লেন কবি।

অফিসে পৌঁছে কবি দেখলেন, টেবিলে চিঠিপত্রের সঙ্গে বিশেষ জরুরি লেখা একটি খাম। বিশ্বনাথ হাজরা জানিয়েছেন তাঁর কবিতায় ছাপার ভুল হয়েছে দুটি। একটি মৌনপ্রতিমা শব্দটি হয়েছে যৌনপ্রতিমা, অন্যটা মরুরমণী শব্দটি হয়েছে সরুরমণী। বেশ ক্ষুদ্র ও দুঃখিত চিঠি। হবারই কথা, সম্পাদককেও এই মর্মে চিঠি দেওয়া হল বলে জানিয়েছেন বিশ্বনাথবাবু। সহকর্মী শ্যামল রায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে প্রুফ দেখেছিল? আপনি?'

কবি মানলেন, হ্যাঁ। তিনিই দেখেছিলেন প্রুফ। দায় তাঁরই।

শ্যামলবাবু বললেন, 'কী করছিলেন কী প্রুফ দেখতে দেখতে? নিজের লেখার

~ www.amarboi.com ~

কারেকশন ভাবছিলেন বুঝি! ওই আপনার প্রবলেম মশাই। ওই একই ইস্যুতে তো আপনারও কবিতা ছাপা হয়েছে। কই, সেখানে তো মিসটেক নেই!’

মাথা নিচু করে, অপরাধীর মতো মুখে, নিজের টেবিলে ফিরে এলেন কবি। সত্যিই নিজের লেখার প্রুফ আর অন্যের প্রুফ কি তিনি সমান সতর্কতায় দ্যাখেন না। এই অভিযোগ কি সত্যি!

না, সত্যি নয়। কিন্তু প্রমাণ করার কোনও উপায় নেই। ভুল ভুলই। পরের ইস্যুতে চিঠিপত্রের কলমের শেষে, ভ্রম সংশোধন বের করতে হবে একটা। কারেকশন নোট।

টেবিলের ওপর দু-থাক খাম। এর মধ্যে আছে ডাকে আসা লেখা। এর মধ্যে কয়েকটি উঠবে ফাইলে, প্রধান নির্বাচকের কাছে যাওয়ার জন্য। আর কয়েকটি যাবে টেবিলের তলায়।

প্রতিদিন, টেবিলের তলা থেকে কত অপরিচিতের অভিশাপ উঠে আসছে কবির দিকে।

টেবিলের তলা থেকেই নয় শুধু। টেবিলের ওপর থেকেও। আর অপরিচিতই নয়, পরিচিত অভিশাপও থাকে। টেবিলেই রয়েছে নতুন একটা পত্রিকা, ডাকে আসা। তাতে মাধব সেনের একটা গদ্য রয়েছে। মাধব সেন, নানাক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই, কবিদের খোঁচা দেন বা আক্রমণ করেন। পাকে প্রকারে, স্পষ্টতায়। নাম করে বা না করে। ব্যক্তিগত জমায়েতে বা বন্ধুসমাবেশে। মুখোমুখি হয়ে পড়লে অবশ্য দুজনেই বন্ধুত্বের মুখোশ ব্যবহার করে থাকেন। এই ব্যক্তির চোখ দেখেই বোঝা যায় সব। ব্যক্তিটি সর্বদা অসন্তুষ্ট, উপদেশাত্মক এবং আস্ফালন-প্রিয়। রচনায় ও স্বভাবে। এই গদ্যটিতে একটু চোখ রেখে কবি দেখলেন সকলকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। এবং এসময় কেমন লেখা উচিত এই নির্দেশনামা রয়েছে। তাঁকেও বিদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। এঁরাই হলেন ঘাতকশ্রেণির। কবি পত্রিকাটি বন্ধ করে রাখলেন নিজের ব্যাগে। এই গদ্যটি পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিকই। কিন্তু, অনেক তরুণ কবির লেখা রয়েছে এতে। বাড়ি গিয়ে পড়তে হবে।

কবির পাশের চেয়ারটি ফাঁকা। তাঁর প্রবীণ সহকর্মী আজ আসেননি। বদলে সেই চেয়ারে এসে বসে আছে রাখালরাজা। মাথায় শিখীপাখা। কোমরে গোঁজা বাঁশি।

কবি গম্ভীরভাবে বললেন, ‘অফিসে কাজ করছি, এখন বিরক্ত কোরো না।’

রাখালরাজার ভ্রূক্ষেপ নেই—‘তারপর, কন্ডাক্টর ভাঙিয়ে দিল দশ টাকার নোট।’

—‘দিল। কোনো দিন কোনো কাজে একটু হেল্প করতে দেখলাম না। সেই কত বছর আগে এক বার চান করতে যাবার সময় ঐ দেহিপদপল্লবটুকু ছাড়া। মজা দ্যাখো না?’

রাখালরাজা চোখ পাকায়—‘অ্যাই, বাজে কথা বোলো না। এই সেদিনই তো বেড়া বাঁধার সময় উলটোদিক থেকে দড়ি এগিয়ে দিয়েছি।’

—‘কবে আবার?’

—‘ওই তো যেবার কাদা বাঁধতে, আর কাছারির খাতায় নাম লিখতে। সেবার অবশ্য মেয়ে হয়ে এসেছিলাম।’

~ www.amarboi.com ~

ফোন বেজে উঠল।

কবি ধরলেন। গৃহিণী।

—'হ্যাঁ। বলো।'

—'ও এসেছিল।'

—'কে?'

—'গোপাল।'

কবি ঢোক গেলেন—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ, শোনো না, ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। পাঁচ বছর তো। খেতে দিলাম।'

'ভালো তো!'

—'যাবার সময় না, হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল। ধরতে পারলাম না।'

—'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বাড়ি যাই। তারপর সব শুনব। কেমন?'

—'শোনো না। একলা বাড়িটায় বড় পাগল পাগল লাগছে। শিপ্রাদির কাছে যাব একবার? বলব চাকরির কথা?'

—'আগে আমি বাড়ি যাই। তারপর কথা হবে।'

—'আচ্ছা। তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

কবি ফিরে দেখলেন রাখালরাজা উধাও। সিটের ওপর শুধু তার ময়ূরপাখাটি। ফেলে গেছে। কবি সেটি তুলে নিজের ব্যাগে রাখলেন।

'নমস্কার।'

কবি তাকিয়ে দেখলেন একটি যুবক।

—'আমার নাম বিকাশ মজুমদার।'

—'আচ্ছা।'

—'আমি এই চিঠিটা পেয়েছি।'

খাম খুলে একটি চিঠি এগিয়ে দেয় যুবকটি।

—'হ্যাঁ। পুজোসংখ্যার চিঠি। লেখা এনেছেন?'

—'না।'

—'সে কী? কেন?'

—'তিনটে লিখেছিলাম। একটাও ভালো হয়নি। জিজ্ঞেস করতে এসেছি আর কিছুদিন সময় পাওয়া যাবে? চিঠিতে তো আছে এ মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা।'

কবি হেসে ফেললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। বসুন না।'

ছেলেটি বসল না। ছেলেটির মাথার চুল ছোটো ছোটো। কথায় একটু বাঙাল টান। কবি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

—'আমার বাড়ি বনগাঁয়।'

কবির মনে পড়ল ময়নার কথা। আমার বাড়ি আছিল বনগাঁয়। বাড়ি গিয়ে লেখাটা শেষ করতে হবে। কবি লক্ষ করলেন ছেলেটির পায়ে হাওয়াই চটি।

~ www.amarboi.com ~

কবি বললেন, 'আপনি হাওয়াই চটি পরেছেন কেন? বাসে ওঠা তো বিপজ্জনক এটা পরে।'

ছেলেটি বলল, 'আমি তো বাসে উঠি না। আমাকে তুমি বলবেন।'

—'আচ্ছা বেশ, বাসে ওঠো না কেন?'

—'ভালো লাগে না। আমি হেঁটেই ঘুরি।'

কবি অবাক হন। বলেন, 'বাঃ। তুমি অনেক হাঁটতে পারো তো।'

—'লেখাটা কবে দিতে হবে?'

—'পরের সপ্তাহে পারবে?'

—'আচ্ছা। জমা দেবার পর দরকার হলে একটু কারেকশন করা যাবে তো?'

আবার কারেকশন?

কবি হাসলেন, আবার। 'যাবে, আমাকে জানিও। কেমন? বোসো না।'

—'আজ যাই। নিচে বন্ধু আছে। কলেজ স্ট্রিট যাব।'

—'কে বন্ধু? আমি চিনি?'

—'শান্ত, শান্তব্রত।'

কবি চিনতে পারলেন। মুখটা ভেসে উঠল। চশমাপরা। ঝকঝকে কালো। চশমার নিচে জ্বলজ্বলে চোখ। হাসিটা শিশুর মতো।

ফোন বাজল। হাতে ফোন কবি হাঁকলেন, 'মুরারীদা-আ'।

মুরারীদা আরেকজন অগ্রজ সহকর্মী। ওদিকে যে ফোন আছে তার সামনেই বসেন। অধিকাংশ ফোন তাঁরই আসে।

উলটো দিক থেকে মুরারীদার উত্তর ভেসে এল, 'ধরছি ভাই। হ্যালো...'

কবি ছেলেটির দিকে ফিরলেন। ছেলেটি বলল, 'আজ যাই।'

—এসো।

কবি তরুণ কবির মাথায় ময়ূরপাখা দেখতে পেলেন। মনে মনে ভাবলেন এরা এখন পৃথিবী জয় করতে পারে।

আবার ফোন বাজল।

—'হ্যালো।'

—'শ্যামল রায়ের ভিজিটার আছে রিসেপশনে।'

ফোন রেখে কবি হাঁকলেন, 'শ্যামলবাবুর নিচে লোক।'

'নিচে লোক' এই দপ্তরের একটা চালু টার্ম। দপ্তরটি তিন তলায়। এক তলায় রিসেপশন। তাই সংক্ষেপে বলা হয় 'নিচে লোক'।

সিটে বসে একটা খাম খোলামাত্র আবার ফোন বাজল।

গৃহিণী।

—'বলো।'

—'ও এসেছিল আবার।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—'কে?'

—'গোপাল। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

—'যাচ্ছি। শরীর কেমন আছে?'

—'মনে হচ্ছে ফুলছে আবার। নিশ্বাসের কষ্টও হচ্ছে।'

—'ওষুধ খেয়েছ?'

—'নাঃ। কী হবে খেয়ে?'

ওরকম কোরো না। খেয়ে নাও, কেমন। আমি যাচ্ছি সন্ধের আগেই।'

—'আচ্ছা।'

কবি ঘড়ি দেখলেন। ডঃ সেনগুপ্তকে আজ পাওয়া যাবে না। পরশু বসবেন। কী করা যায়। সকালের দিকে বাড়িতে ধরা যায় কাল। কোনো অজানা কারণে স্ত্রীর শরীর ফুলে যাচ্ছে ক্রমশ। সেইসঙ্গে রাগ বেড়েছে খুব। অস্থিরতাও। সেইসঙ্গে নিশ্বাসের টান ও একাধিক মেয়েলি উপসর্গ। সবটা ঠিক ঠিক জানেনও না কবি।

জানেন না? নিজের স্ত্রীর অসুস্থতার কথা? সে কী? অপরাধীর মতো মুখ হল কবির। নিজেরই কাছে। গত পাঁচ বছর ধরে এমনই। পাঁচ বছর। পাঁচ বছর খুব কি লম্বা সময়!

কবি দেখলেন তাঁর অগ্রজ সহকর্মী শুভ্রাংশু চৌধুরী ঢুকলেন। ঢুকে নিজের সিটের দিকে না গিয়ে উলটোদিকে শ্যামলবাবুর সিটের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখো তো শ্যামল আমার ধারাবাহিকটা কি ছাপতে চলে গেছে?'

—'শুভ্রাংশুদা, আজকেই ফার্স্ট প্রুফটা এসেছে।'

—'দাও তো ভাই প্রুফটা একটু।'

কবি জানেন শান্ত লাজুক শুভ্রাংশু চৌধুরী রেগে গেলে, অন্যমনস্ক হলে অথবা উদ্বেগে থাকলে রোজকার চেনা কাছের লোককেও ভাই বলেন। শুভ্রাংশু চৌধুরী প্রুফটা এনে তার মার্জিনে খুব খুদে খুদে অক্ষরে কিছু লিখতে লাগলেন।

ফোন বাজতে লাগল।

শুভ্রাংশু চৌধুরী কবিকে বললেন, 'ফোনটা একটু ধরবে ভাই?'

আবার ভাই। তার মানে উদ্বেগে আছেন।

কবি ফোন ধরে বললেন, 'হ্যালো... হ্যাঁ... না উনি আজ আসেননি।'

প্রুফ ফেরত দেওয়ার পর কবি জিজ্ঞেস করলেন শুভ্রাংশু চৌধুরীকে, 'তথ্যের কোনো গোলমাল ছিল বুঝি?'

শুভ্রাংশু বলেন, 'না না। এক জায়গায় ভাষাটা একটু কমজোর মনে হচ্ছিল কাল লেখাটা জমা দেবার পর থেকেই। যতটা পারলাম ঠিক করে দিলাম তো।'

শুভ্রাংশু চৌধুরীর মুখে সেই উদ্বেগের ছাপটা এখন আর নেই। তিনি বলেন আবার, 'যাকগে পরে বই হবার সময় তো আবার কারেকশন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। তখন দেখে দেব।'

~ www.amarboi.com ~

আবার কারেকশন! এতকাল ধরে এত পাঠক জয় করে আসার পরেও এখনও এত সংশোধন করতে হয় শুভ্রাংশু চৌধুরীকে! আজীবন কারেকশন করে চলাই তা হলে লেখকের ভবিতব্য। সারাজীবন সে ভুল করবে। সারাজীবন সে সংশোধন করবে। জীবনটাই লেখকের এই! শুভ্রাংশুর ক্ষেত্রে, এই ষাট পেরিয়েও কবি একটা জিনিস দেখেছেন বারবার। তাঁর কোনো লেখা নিয়ে হয়তো উচ্ছ্বাসের বন্যা চারদিকে। লেখক চুপ করে আছেন। কিন্তু বাড়ি ফিরতে ফিরতে কবিকে নিভৃতে বলেছেন তিনি, ঠিক ঠিক হয়নি জানো। একটু অন্যভাবে লিখতে হত। আচ্ছা বইয়ের সময় দেখব। আসলে লেখকই কেবল বুঝতে পারেন, কী চেয়েছিলেন তিনি আর কী পেয়েছেন। অন্যরা সেটা বুঝতে পারেন না। ঘাতকদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তারা সবই জানে। সবই বুঝতে পারে।

আবার ফোন বাজল। অফিসে এই এক মুশকিল। এবার তুললেন শুভ্রাংশু চৌধুরী। 'হ্যালো' বলেই, বললেন, 'হ্যাঁ'। তারপর কবির দিকে তাকালেন। 'তোমার।'

কবি ধরে বুঝলেন গৃহিণী।

—'শোনো, আজকের কাগজের দুয়ের পাতায় একটা বাচ্চার ছবি আছে। ছ-মাসের বাচ্চা। বাপ-মার সন্ধান চাইছে। এখন লিলুয়া হোমে আছে। কপালে কাজলের টিপ পরা। দেখেছ?'

—'না।'

—'চলো না গো, ওই বাচ্চাটিকে আমরা নিয়ে আসি। আমরা মানুষ করব।

—'আমি আগে বাড়ি যাই। বাড়ি গিয়ে এ নিয়ে কথা বলব।'

—'আমি তো জানি বাড়ি এসে তুমি কী বলবে। তুমি 'না' বলবে। না বলবে তুমি। 'না' ছাড়া আর কী তুমি বলেছ সারাজীবন?'

—'আচ্ছা। এখন রাখছি!'

ফোন রেখে কবি বললেন, 'শুভ্রাংশুদা আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি চলে যাব।'

তিন

সত্যিই একটু আগে বেরলেন কবি। যাবার জন্য নিচে এসে দেখলেন, রিসেপশনে তাঁর চেনা একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

—'কি শান্তনু, কার কাছে এসেছ!'

—'আপনার কাছেই এসেছি।'

—'বলো কী খবর!'

ছেলেটি এদিক-ওদিক তাকায়। 'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

—'চলো। যেতে যেতে শুনব।'

রাস্তায় বেরিয়ে ছেলেটি বলে, 'আচ্ছা, আমার লেখা কি কিছু হয় না?'

কবি তাকালেন, ছেলেটির মুখ বিপন্ন ব্যথিত দেখাচ্ছে। শেষ বিকেলের আলো পড়েছে তার করুণ সুন্দর মুখে।

~ www.amarboi.com ~

—'কী ব্যাপার', কবি হাসলেন। কেউ বুঝি খারাপ বলেছে তোমাকে!'

—'না আপনি বলুন তো, কিছু হয় না, না? আপনি আমাকে স্নেহ করেন বলেই ভালো বলেন, উৎসাহ দিতে? আসলে আমার কি লেখা বন্ধ করাই উচিত?'

কবি দাঁড়ালেন। 'চলো রাস্তার ওপারে ওই চায়ের দোকানটায় একটু বসি। তারপর কথা বলব।'

দুটো চা আর টোস্ট সামনে নিয়ে কথা শুরু হয় আবার।

—'তোমার লেখা সত্যিকারের ভালো কি না, আমি কি তা জানি?'

—'মানে?'

—'আমি যেটুকু বুঝি, তার ভিত্তিতেই ভালো বলেছি তোমাকে। কিন্তু আমার বোঝাটাই তো আর একমাত্র নয়, সর্বোচ্চ নয়। ভালোর ধারণাও তো অবিরল সংশোধিত হয়। কারেকশন হয় তার। না? সত্যিকারের ভালো যে কি তাই বুঝতেই তো জীবন কাটে। সেটাই ধরতে চেষ্টা করি আমরা। তুমি তোমার মতো করে করো। আমি আমার মতো করে।'

—'আপনি আর আমি? কত তফাত!'

—'কী তফাত বলো তো। তুমি আমার পনেরো বছর পর লিখতে শুরু করেছ। আমি তোমার পনেরো বছর আগে শুরু করেছি। এইটুকুই তো তফাত। কিন্তু একই আলো-অন্ধকারের মধ্যে পথ আর দৃষ্টি খুঁজে চলেছি তো আমরা।'

ছেলেটি অবাক হয়ে বলে, 'আপনি এইরকম বলছেন, অথচ অন্য কেউ তো অন্যরকম বলে!'

—'সেটাই স্বাস্থ্যকর। প্রত্যেক মানুষই তো আলাদা। সে তো তার মতো করেই বুঝতে চাইবে পৃথিবীকে।'

—'আর কেউ যদি বুঝে যায় সবটাই! অন্য সকলকেই।'

—'সে তবে জ্ঞানী।'

—'কিন্তু জ্ঞানী বলেই কারুর অন্যকে অপমান করার অধিকার জন্মায়!'

—'এই দ্যাখো, তুমি কিন্তু বলছ না কী হয়েছে। কেউ নিশ্চয়ই কিছু বলেছে তোমায়! কে বলেছে?'

—'মাধব সেন।'

কবি একটু নিভে গেলেন। 'কী বলেছেন উনি?'

—'সেদিন অফিসে আপনাকে আমাদের 'দুর্গ' পত্রিকাটি দিতে গেলাম না!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

—'দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, সামনের সিগারেটের দোকানটার কাছে মাধব সেন আর অমল বসু। আমি বললাম, মাধবদা ভালো আছেন, পত্রিকা পেয়েছেন তো? উনি বললেন, হ্যাঁ, তা তো পেয়েছি। কিন্তু কী খবর তোমার? অ্যাঁ! তুমি চ্যানেল চেঞ্জ করেছ শুনেছি। আজকাল আর আসোটাসো না, বড় গাছে নৌকো বেঁধেছ? হ্যাঁ? আমি বললাম—বড় গাছ মানে? উনি বললেন, খুব চালাক হয়েছ, বড় গাছ মানে জানো না! কিন্তু লেখা তো কিছু

~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে না। দুর্গ পত্রিকায় তোমার তিনটে লেখাই খুব খারাপ হয়েছে। পড়া যায় না। এত খারাপ লিখছ কেন আজকাল?'

কবি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী বললে?'

—'আমি বললাম, ভালো হয়নি বুঝি! নিজে তো বুঝতে পারিনি। তাই ছাপতে দিয়েছিলাম। তবে মাধবদা, 'সংকেত'-এ আপনার দুটো কবিতাই খুব ভালো লেগেছে।'

—'বাঃ! এই তো তোমার জয়।'

—'তার মানে!'

—'মাধব সেন মাধব সেনের নিজের রুচিতে বলেছেন ও কথা। তুমি তোমার রুচির প্রমাণ রাখলে।'

—'না, মানে, আমি বলছি, 'দুর্গ'য় দেবার আগে আমি তো আপনাকে দেখিয়েছি লেখাগুলো। আপনি বলেছিলেন ঠিক আছে।'

—'ওই যে বললাম, আমার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী বলেছিলাম। মাধব সেনের বিচারেও যে সেটা ভালো হবে তা কি বলতে পারি!'

—'আপনি ভালো আছেন, জিজ্ঞেস করলে কেউ যদি বলে, চ্যানেল চেঞ্জ করেছ, বড়গাছে নৌকো বেঁধেছ, সেটা কী রকম!'

—'কেন বুঝতে পারছ না, সেটা তাঁর রুচি।'

—'বড়গাছ মানে কী জানেন?'

—'কী?'

—'আগে ওঁর কাছে মাঝে মাঝে যেতাম। আজকাল আর যাই না। আপনার কাছে আসি। উনি সেই খবরটা পেয়েছেন। সেই ইঙ্গিত করছিলেন।'

—'ব্যস, ব্যস। আর নয় শান্তনু, এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বলব না আমরা।'

—'কেন? আপনি রাগ করলেন?'

—'না রাগ নয়। আত্মরক্ষা। সতর্কতা। কারণ, এ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের মনকে পাঁকে টেনে আনতে হবে। নিন্দা-কুৎসার পাঁকে। এমনিতেই আমাদের মন, জীবন-জীবিকা নির্বাহের কারণে, সবসময় পাঁকের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে। অবিরল সংশোধন করে করে তাকে বাইরে আনতে হয়। উন্নয়ন করতে হয় তার। লেখার দিকে আনতে হয়। আমরা যারা লিখি, মন ছাড়া তো কোনো সম্বল নেই আমাদের, স্বেচ্ছায় কি তাকে নষ্ট করে কেউ?'

—'তা হলে আমি কী করব?'

—'কেউ লেখা খারাপ বললে, স্বাভাবিক ভাবে নেবে। পৃথিবীর সবার তোমার লেখা ভালো লাগবে তা কখনও হয়। পাগল! আর মাধব সেনের সঙ্গে দেখা হলে, ভালো আছেন বলে সরে যাবে।'

মাধব সেনদের চোখ উচ্চাশায় অন্ধ, ঈর্ষায় অন্ধ। ঠিক, কিন্তু এত অল্পবয়েসি একটি তরুণের ওপর তার প্রয়োগ ঘটবে?

~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি অসহায়ের মতো বলে, 'আমি তো তাই বলেছিলাম, সেটুকুই তো মাত্র বলেছিলাম আমি।'

কবি জানেন না, এরপর কী বলবেন ছেলেটিকে। অপমানের আঘাতে সে ছটফট করছে। ছেলেটি বুদ্ধিমান। সান্ত্বনা দিলেও ধরতে পারে। কবি বুঝতে পারলেন না তাঁর কী বলা উচিত। তাঁরা এখন দাঁড়িয়ে আছেন বড় রাস্তার ধারে। সামনে দিয়ে ব্যস্ত সন্ধের ট্রাফিক ছুটে যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে। ছেলেটির মুখে পড়েছে রাস্তার হোর্ডিং-এর আলো। সে এখনই টিউশনি করতে যাবে। কী বলবেন একে। কবি নিজে কী করেছেন এরকম অবস্থায়? হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কবি বললেন, 'শোনো, যে তোমাকে যাই বলুক, তুমি বাড়ি গিয়ে সাদা কাগজের সামনে বসবে। আরেকটা কবিতা লিখবে।'

—'মানে, এই মানসিক অবস্থায় কবিতা হয়!'

—'তা আমি জানি না। আমি যতবার আঘাত পেয়েছি, যতবার আনন্দ পেয়েছি, সাদা কাগজের সামনে গিয়ে বসেছি। সাদা কাগজের সামনে বসলে দেখবে, সেটাই জলধারা। নিজের মুখ দেখা যায়। পৃথিবীর মুখ দেখা যায়।

'যত আঘাত পাও,—সাদা কাগজের সামনে গিয়ে বোসো। আমি তাই বসি। আমি আর আমার কলম। এর বেশি আমি কিছু পারি না। এর বেশি আর কিছু শেখাতেও পারি না তোমাকে...'

সন্ধে একেবারে পার করে ভিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে বাস থেকে পথে নামলেন কবি। নামতে গিয়ে পাঞ্জাবির বোতাম ছিঁড়ল। ছাতার হ্যান্ডেল আটকে গেল লোকের জামায়, ভিড়ের মধ্যে বেধে গেল কাঁধঝোলা। লোকের তিরস্কার আর খিঁচুনি সহ্য করে অপরাধীর মতো নামতে পারলেন কবি। নিজের কাছে কবি যতই শব্দ কাগজ সাদা পাতা, সংশোধন—অহোরাত্র এইসব বলে চলুন না কেন, বাইরে তো তিনি একজন চিঁড়েচ্যাপটা ভিড়ের লোক। সেখান থেকে তিনি বাঁচবেন কী করে?

কিন্তু তার থেকে বাঁচলে তিনি লিখবেনই বা কী করে? জীবন কোথা দিয়ে আসবে তবে?

বাসস্টপ থেকে বাড়ি অনেকটা ভেতরে। মোড়ের রিকশাওয়ালারা প্রায়ই চেনা। একটা বাচ্চা ছেলে ডাকল তাঁকে, 'বাবু যাব?' এর নাম ফুচকা।

কবি হাত নেড়ে বললেন, 'না।' খানাখন্দে ভরা রাস্তা। এতখানি ভিড়ের চাপ নেওয়ার পর এখন আর ঝকাং ঝকাং ঝাঁকুনি সইবে না। তার চেয়ে সন্ধের হাওয়ায় আস্তে আস্তে হেঁটে যাওয়াই ভালো।

হাঁটতে হাঁটতেই কবি শুনলেন, সামনের ক্যাসেট-এর দোকানের বক্সে গমগম করে উঠল একটি কণ্ঠ, পেটকাটি চাঁদিয়াল...। সুমন চট্টোপাধ্যায়। অনেকবার শোনা গানটি আরেকবার কবির কানে ঢুকতে লাগল। রিকশাচালক এক বাচ্চা ছেলের কথা বলছে এই গান। সেই ছেলেটাও কি ওই ফুচকার মতোই সিটের ওপর এঁকেবেঁকে রিকশা চালায়?

~ www.amarboi.com ~

প্যাডেলে ভালো করে পা পায় না বলে? গানের মধ্যে আকাশে নানা সব ঘুড়ি উড়ছে। চালাতে চালাতে বাচ্চা ছেলেটা দেখছে। আর সওয়ারবাবুর অফিস যাওয়ার তাড়া বকুনি হয়ে ঠেলে দিচ্ছে তাকে বারবার। ঘুড়ি উড়ছে। 'মুক্তির ঘুড়ি তাকে খবর পাঠাচ্ছে'।

কবিও প্রায়ই ফুচকার রিকশায় যান। কবিও কি কোনো দিন অমন তাড়া দেননি ফুচকাকে? দিয়েছেন, সেইসব সময়ে তিনি কবি নন। বিরক্ত প্যাসেঞ্জারবাবু মাত্র। হাজার হাজার অফিসবাবু কি প্রতিদিন অমন তাড়া দিচ্ছে না? গানটির গতি এমন যে রিকশা চালানোর বেগ আর তাড়া খাওয়ার সভয় দ্রুততা, একইসঙ্গে ফুটে ওঠে এক চঞ্চল ছন্দে। অথচ মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। মন রেগে ওঠে।

'মুক্তির ঘুড়ি তাকে খবর পাঠাচ্ছে', চার মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লেখা। চারমাত্রার এই মাত্রাবৃত্ত এখন আর সাধারণত কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু কেমন কাজ পাওয়া যায়। বাঃ!

কিন্তু কবি নিজেও তো চারমাত্রার ছন্দে লেখেননি অনেকদিন। হঠাৎ কবির মনে হল এই ফুচকাকে নিয়ে তিনিও তো লিখতে পারতেন। ও তো তাঁরও প্রতিদিনকার নিজের অভিজ্ঞতা। না। পারেননি তিনি। অপরাধীর মতো মুখ নিচু করলেন কবি নিজের কাছেই। কবি দেখতে পেলেন, গানের অচেনা সেই রিকশাবালকের মাথায় সুমন চট্টোপাধ্যায় যুক্ত করে দিয়েছেন একটি ময়ূরপাখা। কবির মনে পড়ল দুটি লাইন, 'এই যে দেখছি আদ্যিকালের দেয়াল ফুঁড়ে/জংলা গাছের বাচ্চা খেলে হাত পা ছুড়ে।' কি আশ্চর্য ছবি। কবিও তো গ্রামের কাছেই থাকতেন। কত ভাঙা পুরনো বাড়ি, তার দেওয়ালে অশ্বত্থ বটের চারা কি তিনি দ্যাখেননি, দ্যাখেননি সদ্য গজানো বুনো গাছ? কিন্তু এ জিনিস তিনি পারেননি। ভাঙা দেওয়াল স্থবির। জড়। ঠিকই। গাছ সজীব, কিন্তু সেও তো নিশ্চল। ভাঙা কঠোর দেওয়ালের মধ্যে তার বন্দিত্ব এক ঝটকায় মুক্তি আর চলমানতা পেয়ে গেল এইখানে; জংলা গাছের বাচ্চা খেলে হাত পা ছুড়ে। হাত-পা ছোড়া একটি শিশুর উপমায় একটি সদ্য-বেরোন গাছের চারা। তাও দেওয়ালের বিপরীতে। এমন অসামান্য কল্পনা কখনও হাতে আসেনি তাঁর। না তিনি পারেননি।

পারেননি তো কী হয়েছে! আরেকজন তো পেরেছেন। একজন কবির না-পারাকে সংশোধন করে নিয়েছেন আরেকজন কবি। এই তো কবির কাজ। সকলে মিলে তৈরি করে তোলা একটা মস্ত কবিতা। এইভাবেই তো ভাষা বাঁচে। কবিতা বাঁচে। কবি ভাবলেন, তখন তাঁর মনে পড়েনি। মনে পড়লে শান্তনুকে তিনি বলতেন, 'আমরা যদি এই আকালেও স্বপ্ন দেখি/কার তাতে কি!' বলতেন, তুমি আমি আমরা সবাই আমাদের সাধ্যমত লিখি, আমাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে লিখি। আমাদের হাতে যদি মহৎ কবিতা না আসে, কার তাতে কী!

কবির মন খুশি হয়ে উঠল। কবি সন্ধের হাওয়ায় ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। তাঁর মনেও রইল না, আজ তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, সন্ধের আগেই ফিরবেন।

ঘরে ফিরে স্নানে ঢুকলেন কবি। বেরিয়ে আজ সকালের 'লোকজন' কবিতাটির সংশোধন নিয়ে আবার বসতে হবে। সংশোধন। এই এক অমোঘ প্রক্রিয়া। নিজেকে

~ www.amarboi.com ~

সংশোধন। নিজের কবিতাকে সংশোধন। কাটতে কাটতে সেই মুহূর্তে যা নিশ্চিত ও যোগ্য, সেই ভাষাকে খুঁজে এনে ব্যবহার করা। কিছুকাল পরেই হয়ত আর তত যোগ্য মনে হবে না, এই মুহূর্তের পক্ষে বিকল্পহীন ভাষাটাকে। পরের দিনই হয়ত নতুন সংশোধন আসবে, তা আসবে হয়ত নতুন কবিতার চেহারায়। তখন আবার একইভাবে তাকেই খুঁজতে চলা। অবিরাম কাটতে কাটতে সত্যের শতচ্ছিন্ন, তবু, সত্যরূপটা একদিন ধরা যাবে। আর আজকের পৃথিবীতে আজকের সময়ে, সত্য কি শতচ্ছিন্ন নয়? আমাদের শতচ্ছিন্ন মনের মতোই?

স্নান শেষ হল। নিজের কাছে নিজের একটা বিচার দাঁড় করাতে পেরে, খানিকটা গরিমা নিয়েই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন কবি।

চার

সামনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে, রাতে শোওয়ার আগে কবি 'লোকজন' কবিতাটা ঘষামাজা করছিলেন। গৃহিণী ঢুকলেন, 'কি এখনও শেষ হয়নি তোমার লেখা? সারাদিনে আমার সঙ্গে একটু কথা বলবার ফুরসত তোমার হবে না? ফোনে তো বললে গিয়ে কথা বলব।'

কবি মুখ তুললেন, 'অ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।'

কবির হাতে কলম। কবির চোখে লেখাপড়ার গোল চশমা। কবির কোলে লেটার প্যাড। প্যাডে আঁকিবুকি।

গৃহিণী বললেন, 'শোনো, ও আজ আবার এসেছিল। গোপাল। আজ সারাদিন দুষ্টুমি করেছে।'

কবি বললেন, 'আজ খেতে দিয়েছিলে তো!'

—'সে তো কখন দিয়েছি। সকালে নকুলদানা বাতাসা জল। আর দুপুরে দিয়েছি লুচি গোকুলপিঠে।'

—'বাঃ, ভালোই তো দিয়েছ।'

গৃহিণীর চোখমুখ জ্বলজ্বল করে, 'আজ সারাদিন হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকছে। পালাচ্ছে। হঠাৎ দেখি ইস্কুলের ড্রেস। পিঠে ব্যাগ। পাঁচ বছরের ছেলে। এত বড়! ধরতে গেলাম, পালাল। ঘরে গিয়ে দেখি, নেই।'

—'তাই নাকি?'

—'দেখবে এসো।'

রান্নাঘর আর বারান্দার মাঝখানের একটু কোণে গৃহিণীর ঠাকুর পাতা আছে। কাঠের একটা বড় বাক্স। সামনেটা দরজার মতো ফাঁকা। সেটাই সিংহাসন। তার মধ্যে সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা। পাথরের ছোটো শিবলিঙ্গ। আর একপাশে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে ছোট্ট গোপাল। মাথায় উষ্ণীষ। হাতে নাড়ু। গোপালের জন্য আলাদা ছোটো সিংহাসন। পেতলের। তার সামনে স্টিলের ছোটো থালা গেলাস। গেলাসে জল। থালা

~ www.amarboi.com ~

দুটোর একটায় বাতাসা, অন্যটায় লুচি, গোকুলপিঠে। দু-তিনটে বড় বড় কালো পিঁপড়ে উঠেছে তাতে।

কবি নিশ্চিন্ত, 'ঐ তো। সব ঠিকই তো আছে।'

—'না নেই। ঠিক থাকত। ঠিক থাকতে পারত। পাঁচ বছর আগে তুমিই তো সব শেষ করে দিলে।'

কবির মুখ ছাইবর্ণ ধারণ করে। কবি শক্ত হয়ে যান। বলেন, 'শোনো, আমার উপায় ছিল না। মানে আমাদের আর কি। উপায়...'

—'উপায় ছিল না? উপায় কাকে বলে?'

—'তোমাকে তো বলেছি। আমি যা মাইনে পাই তাতে চলত না।'

—'মেয়েটাকে হোস্টেলে পাঠালাম। বুকটা খালি হয়ে গেল। সারাটা দিন আমি কী করে থাকি!'

—'সে তো তুমিই জোর করলে। প্রত্যেকদিন আমি অফিস থেকে ফেরবার পর এক কথা, হোস্টেল দ্যাখো, হোস্টেল দ্যাখো। নইলে আমার কি সাধ্য আছে হোস্টেলে রেখে পড়ানোর!'

—'এখানে থেকে কি মানুষ হত? তুমি তো সারাদিন ওই কবিতা আর কবিতা। কবিতা হল তো কতবার কারেকশন। তারপর অফিস থেকে গদ্য লেখা দিল তো বাড়ি এসে দিনের পর দিন মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকা। আর কাগজ ছেঁড়া। ওদিকে মাইনে কাটা যাচ্ছে, তার অশান্তি। ওইটুকু মেয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে পারে। হোস্টেলে দেব না তো কি করব? আমাকে এক ফোঁটা সময় দিতে না। মেয়েটাকে দেখতে না!' কবি অসহায় বোধ করেন, 'কী করব? আমি কি সময় পাই, বলো?'

—'অথচ কে এসে বলল, অমুক কবি আমাকে খারাপ কথা বলেছে, অমনি তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোঝানোর সময় তো ঠিক পাও। তার মনে শান্তি না দিলে যেন তোমার চলছে না।'

কবি বিস্মিত। 'নতুন ছেলে সব। সদ্য লিখছে। আমি ওদের সাহস দেব না তো কে দেবে?'

—'দেবে। কিন্তু নিজের বউ-মেয়েকে দেখবে না! মেয়েটাকে রোজ মারতাম পড়ার জন্য। মার খেতে খেতে একগুঁয়ে হয়ে যাচ্ছিল। এতটুকু দুটো ঘর। পাশেই বস্তি। একটু খেলার জায়গা নেই চারিদিকে। সমবয়সি একটা-দুটো সঙ্গীসাথী নেই। মানুষ হত মেয়েটা? এখানে থাকলে?'

—'আর তোমার চাকরি? চাকরির কথাটা বললে না?'

—'চাকরি তো ছেড়ে দিলাম। তুমিই তো চাইতে না চাকরি করি আমি। তারপর শরীরটা। শরীরটা তো একটা আপদ আমার। ভেঙে পড়ল। ওই ব্যাপারটার পরে আরও গেল। ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমি বাচ্চাদের নিয়েই থাকতে চেয়েছিলাম। বললাম, বাড়িতে একটা ক্রেস করি। ছোটো ছোটো সব পুতুলগুলো আসবে। তাদের ধরব। খাওয়াব। ঘুম পাড়াব। পড়াব। তুমি রাজি হলে না।'

~ www.amarboi.com ~

কবি আকাশ থেকে পড়লেন। 'তুমি কি পাগল হয়েছ? এইটুকু একখানা ঘরে ক্রেস হয় কখনও! তাদের বাবা-মা-রা রাজি হবে কেন? তাছাড়া বাড়িওয়ালা আপত্তি করত। এ ছাড়া তোমাকে চাকরি ছাড়তে তো আমি জোর করিনি। আর বাচ্চা নিয়ে থাকতেও আপত্তি করিনি।'

রমণী ফুঁসে ওঠেন, 'আপত্তি করোনি মানে? তুমিই তো বললে, নষ্ট করো।' কবির শরীর শিউরে ওঠে, 'চুপ করো! চুপ! সে তো নিজেদেরটা। তোমার ওই হোম। ওই স্ট্রিট চিলড্রেন, এ সবে তো আমি আপত্তি করিনি কখনও।'

—'তা হলে সারাদিন আমি কী করব বলো। যাই তাহলে আবার শিপ্রাদির কাছে?'

কবির মুখ ভেঙেচুরে যায়। নিজেকে এতক্ষণের চেপে রাখা থেকে স্খলিত হন তিনি।

—'শিপ্রাদি? আবার? তোমার মনে নেই সেইসব অপমানের কথা! সেইসব ঠাট্টা? রাত ন-টা পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে হোমের বাজার করানো আর পরদিন সহকর্মী অন্য মেয়েদের দিয়ে তোমাকে অপমান করানো? হোমের বাচ্চা মেয়েগুলো, যাদের কথা তুমি বাড়ি এসেও রাতে শুয়েও সবসময় ভাবতে, তাদের তোমার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া। এর পিছনে ওকে লেলিয়ে দেওয়া। পরস্পরের মধ্যে সেইসব লুকোনো নিন্দে ছড়ানো। মনে পড়ে না তোমার? মনে পড়ে না অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়ে টাকার কথা তুলে তোমাকে ছোটো করা?'

—'পড়ে, পড়ে। মনে পড়ে।'

—'আর শিপ্রাদির সেই বোনের কথা মনে পড়ে না, যে নিজের ইচ্ছেমতো অফিস ছাড়ে, আর অফিসে ঢোকে, যেন সেটা তার পৈতৃক ব্যবসা, আর শাড়িগয়না আর হীরেমুক্তোর নাকছাবি নিয়ে তোমাকে খোঁচা দেওয়া মনে পড়ে না?'

—'আঃ, আর বোলো না।'

—'আর বাড়ি এসে দিনের পর দিন তোমার বালিশ ভেজানো, আর আমাকে লুকিয়ে যাওয়া...তাদের কাছে আবার ফিরবে তুমি, যে শিপ্রাদি তুমি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর ড্রাইভার দিয়ে তোমাকে বারবি ডল উপহার পাঠিয়েছিলেন। যেন, এরপর সমাজসেবা ছেড়ে ঘরে বসে পুতুল খেলাই তোমার কাজ হবে। আমি কি তাদের চাইতেও খারাপ! বলো, আমি কি তাদের চেয়েও নিষ্ঠুর!'

—'চুপ করো। চুপ করো।'

—'আর সেই দীপালি? লোপামুদ্রা? যারা তোমার এই সারল্যকে সবসময় বোকামি বলে আড়ালে হেসেছে। এমনকী সামনেও, হ্যাঁ, সামনেও, আমি আচমকা ঘরে ঢুকছিলাম বলে বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি বুঝতে পারোনি। তুমি কষ্ট পাবে ভেবে তোমাকে বলিওনি, তোমার কাছ থেকে এমনকী টাকা ধার করেছে, নিজেরা অবস্থাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও। আর সেই টাকা হল, আমার প্রকাশকের কাছ থেকে ঋণ করে নেওয়া টাকা, তুমি যখন তা ফেরত চেয়েছ, তখন চিঠি পাঠিয়েছে যে, কী টাকার কথা বলা হচ্ছে তারা বুঝতে পারছে না, আর তুমি তোমাকে মিথ্যেবাদী বলা হল মনে করে, দিনের পর দিন বিষাদে ভুগেছ,

~ www.amarboi.com ~

অফিস থেকে এসে আমি দেখেছি সারাদিন স্নানহীন অবস্থায় তুমি বসে আছ, দাঁত কাটোনি কিছু, বলছ, দীপালি আমাকে মিথ্যেবাদী বলল? বলো, হয়নি এ সব?'

—'হয়েছে।'

—'আর তুমি, বাচ্চাদের সঙ্গে থাকবে বলে, এরপরও, একটার পর একটা অর্গানাইজেশন ঘুরেছ, আর ঠোক্কর খেয়ে ফিরেছ, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদ্দুরে হেঁটে হেঁটে ভাঙা শরীরে ঐ সব ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে আরও ভেঙে ফেলেছ নিজের শরীরটাকে।...এরপরও তুমি আবার ওদের কাছে ফিরে যেতে চাও? আবারও?'

একটানে এতগুলো কথা বলে ফেলে কবি হাঁফান। ভেতরটা খালি লাগে। জিভে তেতো স্বাদ। খারাপ কথা, কুৎসিত প্রসঙ্গ বলতে ইচ্ছে হয় না। মন অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। নিজের স্ত্রীকে তিনি জানেন। তাঁকে বাঁচানোর জন্য, পুনশ্চ আহত হওয়ার আগেই তাঁকে আটকানোর জন্য এগুলো মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া পথ নেই। সত্যিকারের সর্বস্বপণ করা তরুণ-তরুণীরা আছে, যারা সত্যি সত্যিই নিজেদের সবটুকু দিয়ে রাস্তার বাচ্চাদের জন্য, সব হারানো মেয়েদের জন্য কাজ করে চলেছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী গিয়ে পড়েছিলেন ভুল জায়গায়। ভুল জায়গাগুলিতে।'

প্রতি-আক্রমণে তাঁর স্ত্রী কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। এইবার কথা খুঁজে পান। অথবা আপন মনেই যেন নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করতে থাকেন, 'আচ্ছা যাব না। যাব না তো? তা হলে...কী করব! নিজেকে নিয়ে কী করব আমি বল? কী করব...রুনির তো বাচ্চা হয়েছে। ওকে বলব কদিন এসে থাকতে এখানে! আমি ওদের দেখাশুনা করতে পারব!'

—'তোমার বোন? এখানে আসা পরের কথা, তোমার বোন তোমার সঙ্গে কথা বলবে তো। অপমান করে তাড়িয়ে দেবে না তো? পুজোর জামাকাপড় দিতে যাওয়ার সময় যেমন করেছিল? আবার তুমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়বে না তো। মনে রেখো কিন্তু, এ তোমার সেই বোন, তুমি যাকে না দেখে থাকতে পারতে না। শেষে প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে পর্যন্ত খবর নিতে। আর সে তাই নিয়ে বিদ্রুপ করত...'

কবি ক্রমশই সাংসারিক হতে থাকেন। আর আরও অসহায় হতে থাকেন কবিজায়া, দিশাহারার মতো বলেন আবারও, 'তা হলে...। আমি সারাটা দিন কী করব নিজেকে নিয়ে...ঐ বাচ্চাটা...ঐ বাচ্চাটা যদি থাকত...'

কবি অধৈর্য হন, 'আবার সেই কথা। বলছি না, যা রোজগার করি তাতে উপায় ছিল না। আরেকজনকে আনবার...'

—'উপায় ছিল না মানে? আমি রেড লাইট এরিয়ায় কাজ করার সময় ঘুরে দেখিনি? ওইসব মায়েরাও তাদের বাচ্চাকে বড় করে কি না? শুধু নিজেদেরটাই নয়, ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যাওয়া, দুদিন-তিনদিনের বাচ্চাকেও ঘরে এনে বড় করে ওরা। যারা লোকের বাড়ি গিয়ে কাজ করে তারাও মানুষ করে, কষ্ট করে, আর আমি? আমি পারলাম না।'

~ www.amarboi.com ~

কবিজায়া ভেঙে পড়েন কান্নায়। এবং কবির সমাজতাত্ত্বিক অংশটা এইবার নড়েচড়ে বসে। তাঁর বোঝানোর সত্তাটা আত্মপ্রকাশ করতে চায়। 'না, শোনো। তারা অন্যরকম অবস্থানে আছে। মানে অন্যরকম সামাজিক অবস্থান আর কি। যেমন তেমন করে তারা ছেলেমেয়ে আনতে পারে পৃথিবীতে, আমরা তো সেটা পারি না। আমাদের তো অনেক কিছু ভাবতে হয়, অনেক দায়িত্ব নিতে হয়, যেমন তেমনভাবে তো আর...'

—'থামো।' নারী মাথা তোলেন। নিজের হাঁটুতে লেগে তাঁর সিঁদুর টিপ ঘষটে গেছে কপালের বাঁদিকটায়। তাঁর চোখে জল।

—'তুমি জানতে, আমাদের সংসারে আরেকজন এলে তোমার ওপর চাপ পড়বে। তোমাকে উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। আর তার একটাই রাস্তা। তোমাকে আরও গদ্য লিখতে হবে। এবং তাহলেই তোমার কবিতা লেখার ক্ষতি হবে বলে তুমি মনে করো। তাই তুমি চাইলে না। কবি হবে তুমি। হ্যাঁ? স্বার্থপর কবি হবে? কেবল সেইজন্য তুমি বলে চললে নষ্ট করো, নষ্ট করো। বলে চললে দিনের পর দিন...হইনি, আমি রাজি হইনি, আমি দেরি করিয়ে দিচ্ছিলাম, তবু শেষকালে রাজি হলাম, রাজি হলাম আমি!'

নারী আবার ভেঙে পড়েন।

কবি ধীরে ঝুঁকে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলেন, 'শোনো...'

—'সরো। খবরদার ছোঁবে না আমাকে। কবি হবে তুমি? কবি? যে কলমে কবিতা লেখো, সেই কলমে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখলে ডাক্তার সেনগুপ্তকে। সেই কলমে নার্সিংহোমের ফর্ম ভরতি করলে। সেই কলমে আমার কোনো ক্ষতি হলে কারও দায় নেই, এই শর্তে বন্ড সই করলে, সেই কলমে।'...

হঠাৎ কী যেন খুঁজে পান কবিজায়া, 'ও-ই, ও-ই তো ওটা, ওটাই তো এখন তোমার হাতে। ওটা কলম না ছুরি?'

কবি শিউরে উঠে দেখলেন, তাঁর দুটো হাত রবারের দস্তানায় ঢাকা। তাঁর লেখার প্যাডটা হল ট্রে। তাতে অক্ষর নয়, নানা যন্ত্রপাতি। আর তাঁর হাতে, কলম নেই, আছে গর্ভপাত ঘটানোর ডাক্তারি অস্ত্র। তিনি ঘাতক। তিনি একজন ঘাতক। নিজের সন্তানের ঘাতক। যাদের তিনি ঘাতক ভাবেন, তাদের চেয়েও বড় ঘাতক।

রমণীর চুল খুলে গেছে। তাঁর দুই গাল অশ্রুতে ভাসছে। জানলায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আলুলায়িতকেশী নারীটি তখন বলছেন, 'আমি সারাদিন বাড়িতে থাকি, এই দুই কামরার বদ্ধ ঘরে বন্দি থাকি, আর ঐ ছেলেটা, গোপাল, সারাদিনই হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়ায়। আমি জানি আমার পেটে গোপালই এসেছিল। ও লুচি ভালোবাসে। গোকুল পিঠে ভালবাসে। বেগুন ভাজা। ও এসে ঠিক খেয়ে যায়। এক একবার এক একরকম বয়স নিয়ে আসে। ওই খাটের ওপর ছ-মাসের বাচ্চা হয়ে হাত পা ছোঁড়ে কোনো দিন। দু-বছরের ছেলে হয়ে কোনো দিন টলমল দৌড়োয় বারান্দা দিয়ে, ধুপ করে পড়ে যায়, ধবধবে সাদা জাঙিয়া, পিঠে পাউডার, পায়ের পাতা গোলাপি...আমার না-হওয়া বাচ্চাটা সারাদিন ছুটে

~ www.amarboi.com ~

বেড়ায় একা বাড়িতে, আমি তাকে ধরতে পারি না...আর আজ এসেছিল ইস্কুলের পোশাকে একেবারে পাঁচ বছরের বড় ছেলে। ইস্কুল যাওয়ার জন্য তৈরি...ওই যে, ওই যে...'

কবি তাকালেন দরজায়। দরজায় এক নীল বালক। স্কুল ইউনিফর্ম। মাথায় ময়ুরপাখা।

কবি বললেন, 'এ কি। এ তো রাখালরাজা!'

নারী বললেন, ওই তো গোপাল!

নীল বালক মিলিয়ে গেল।

নারী হাহাকার করে ওঠেন, 'বলো, এখন নিজেকে নিয়ে কী করব আমি! কী করব।'

কবি দুই হাত একত্রিত করে মনে মনে বলে চলেন, হে রাজা! হে রুদ্র! আমার পুরুষার্থ জাগ্রত করো। পাঁচ বৎসরের অধিককাল, আমি নারী স্পর্শহীন। আমার মরচে পড়া শরীরে একবার পুরুষকার অবতীর্ণ হোক। এক রাত্রের জন্য আমাকে জাগাও, সন্তানার্থে জাগাও আমাকে।

এই স্তব মনে মনে উচ্চারণ করতে করতে কবি এগিয়ে গেলেন তাঁর নারীর দিকে। শেষ আশ্রয়ের মতো কবি কাঁধ আঁকড়ালেন তাঁর। আকর্ষণ করলেন নিজের প্রতি, 'এসো, আবার আমরা তাকে নিয়ে আসি। আমরা দুজনে, একসঙ্গে আবার যদি ইচ্ছে করি, সে আসবে। এসো, আমাকে সাহায্য করো। তুমি আমার সহধর্মিণী, এসো মিলনধর্মে আমরা আবার সন্তানের দিকে পৌছোই।

নারী বিদ্যুতের মতো ছিটকে সরে যান, 'না, তুমি ছোঁবে না আমাকে। পাঁচ বছর আমি তোমাকে ছুঁতে দিইনি। এখনও দেব না। কখনও দেব না।'

কবি আহত। কিন্তু বিস্মিত হন। 'কেন এরকম করছ? এসো। আমাকে নাও। এবার আর তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব না। এবার তাকে ঘরে আনব। বড় করব।'

—'হয় না। হয় না। পাঁচ বছর আগেই তোমার জানা উচিত ছিল আর হয় না।'

—'কী জানা উচিত ছিল!'

—'তুমি জানতে না তখন, আমার শরীরের অবস্থা কী ছিল। বলো, জানতে না?'

জানতেন। কবি অন্তত এটুকু জানতেন যে তাঁর রমণীর গর্ভস্থান কিছু ত্রুটিযুক্ত ছিল। ভ্রূণনাশের আগে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তার সেনগুপ্ত।

—'পাঁচ বছর আগেই ডাক্তার সেনগুপ্ত বলেছিলেন, ওই নষ্ট করার ধাক্কায় আর কখনও কিছু হবে না। খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল তো। ও তো বড় হয়ে গিয়েছিল। ওর হয়ত শরীর হতে শুরু করেছিল। হাত হচ্ছিল, পা হচ্ছিল, কিন্তু শেষ হতে পারেনি। তাই বলে এখন আর হয় না। কিছুতেই হয় না।'

কবি মরিয়া হয়ে হাহাকার করলেন, 'হয়। হয়। একবার আমরা চেষ্টা করে দেখি।'

'না!'—নারী ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখে অশ্রু জ্বলছে। আঁচল লুটোচ্ছে প্রায়। ঠোঁট ফুলে উঠছে, মুখের রেখা ভাঙতে শুরু করেছে, আটকানো কান্নায়।

'না। এ তোমার কবিতা নয় যে, যতবার খুশি, সংশোধন করবে কাটাছেঁড়া করবে। এটা জীবন, জীবনকে একবার দু-বার কাটাছেঁড়া করলেই তা থেকে যে, রক্তপড়া শুরু হয়

~ www.amarboi.com ~

অনেক সময় তা সারাজীবন বন্ধ হয় না। আমার হয়নি, এই দেখো সারাজীবন আমার রক্ত বন্ধ হয়নি, এই দেখো, আমি তোমার কবিতা নই'... বলতে বলতে দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন নারী। পাশের খাটে তাঁর সজোরে আছড়ে পড়ার শব্দ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় ফোঁপানির শব্দ। কাটাছেঁড়া করা রক্তমাখা একটি কবিতার ফোঁপানো।

কবি আধো অন্ধকার ঘরে, পশ্চিমমুখো জানলায়, স্তব্ধ হয়ে আছেন বহুক্ষণ। কবির সংশোধনের তত্ত্ব আর তার গরিমা কাচের বাসনের মতো খান খান হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে আছে ঘরে। পা ফেললেই পায়ে বিঁধে যাবে সেই কাচ, এই ভয়ে কবি নড়তে পারছেন না। স্তব্ধ হয়ে আছেন বহুক্ষণ। সেইসব কাচ-টুকরো অন্ধকারের মধ্যেও ঝকঝকে প্রিজম হয়ে খণ্ড খণ্ড সব ছবি দেখাচ্ছে। তাকানো যায় না। অমীমাংসিত কলহের ছবি। দমনশীল স্বামী-ভূমিকার ছবি। বাইরে, এই তিনতলা থেকে দেখা যায়, পিচ রাস্তা, তার পাশে বড় নর্দমা, টিউবওয়েল। আরও ওপাশে ডাস্টবিন। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা চায়ের ঝুপড়ি দোকান। বস্তি শুরু হয়েছে ওই দোকানের দিক থেকেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে বস্তিতে রোজকার মতো হল্লা নেই। কী এক কারণে যেন সব নিস্তব্ধ। রাস্তাতেও লোক হাঁটছে না। শুধু দূরে, লেকের পাশের রেললাইনে দুটো মালগাড়ির বগি ঘটাং ঘট শব্দ তুলে ঠুকে গেল। আর সেই দূরাগত শব্দের পরই চারিদিক আরও যেন নিঃশব্দমন্থর হয়ে এল। বোঝা গেল রাত্রি বাড়ছে।

কবি দেখলেন, চাঁদের আলোয় নর্দমা থেকে উঠে এল, অদ্ভুতকার একটি প্রাণী। নজর করলে বোঝা যায়, একটি অসমাপ্ত মানবশিশু। একটি বিশাল ভ্রূণ। মাথাটা অস্বাভাবিক বড়, কেশহীন। চ্যাপ্টা ধরনের। পায়ের দিকটা ব্যাঙাচির মতো যেন লেজ আকারের।

অন্ধকারে ক্রমশ হাওয়ায় ভেসে টলতে টলতে চাঁদের আলোয় উড়তে থাকে সে। তার চোখ ফোটেনি। তার হাতদুটি অসম্পূর্ণ। সেই অসম্পূর্ণ হাতের একটিতে কী যেন একটা আঁকড়ে আছে সে। কী ওটা? লম্বা মতো?

চাঁদের ময়লা আলো একটু উজ্জ্বল হয়। কবি চিনতে পারেন। অসমাপ্ত হাতে আঁকড়ানো ওটা, হ্যাঁ বাঁশিই!

দেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

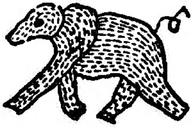

জুরাসিক পার্ক

'সেই থেকে এইভাবে বসে আছ! একটা জানলাও খোলোনি। আছ কী করে, এই গরমে।' বলতে বলতে অতসী মেয়ের স্কুলের ব্যাগদুটো নামায়। অবিনাশ বলে, গরম আর তেমন কী! সে, একটা চেয়ারে পা দুটো তুলে বসে আছে। অতসী চাবি নিয়ে দরজা খুলে এইমাত্র ঢুকেছে। চাবি আর তালাটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলে, আলোটাই বা জ্বালাওনি কেন!

অবিনাশ বলে, আলো তো জ্বলছে না দেখছি, লোডশেডিং বোধহয়।

অতসী ঝংকার দেয়, কোথায় লোডশেডিং। দেখছ না পাশের বাড়িতে আলো জ্বলছে। অবিনাশ দেখল, তাদের বন্ধ কাচের জানলার বাইরে ওপাশের ফ্ল্যাটের ঘরগুলোয় আলো জ্বলে উঠেছে। সে সত্যিই খেয়াল করেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য একটা জিনিস নজর করে সে শক্ত হয়ে গেল। অতসী জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিনাশ বলল, কী করবে?

কী আবার করব। খুলব জানলাটা। এভাবে তো আর সেদ্ধ হতে পারি না।

অতসী, মানে, আমি বলছিলাম, জানলাটা না-খুলে একটু বেরোলে হয় না।

—বেরোব? এখন। অতসী বলে, তোমার কি মাথাটা একেবারে গেছে।

—না, বলছিলাম যে, বাড়িতে তো গরম বলছ, রাস্তায় যদি...। সাবধান, দেখো, সাবধানে...

অবিনাশ তার কথা শেষ করার আগেই অতসী জানলা দুটো খুলে ফেলেছে পরপর। তৃতীয়টার দিকে এগোচ্ছে।

অবিনাশ আবার বলে, দুটো জানলা খুলেছ, এই তো যথেষ্ট। ভালোই তো হাওয়া আসছে। ওটা আবার...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতসী সেদিকে কান দেয় না। তৃতীয় জানলাটাও খুলে দিয়ে বলে, এখুনি মেয়ের মাস্টারমশাই আসবে। এখন বলে কিনা বেরোলে হয় না।

অবিনাশের এতক্ষণে যেন খেয়াল হয় মেয়ের কথা, বলে, কুলটু কোথায়?

অতসী বলে, গ্লোরিদের ফ্ল্যাটে। নিচে। এক্ষুনি এসে যাবে। তা তুমি মোমবাতি অবধি জ্বালোনি কেন। অতসী রান্নাঘরে মোমবাতির খোঁজে ঢোকে। দেশলাই জ্বলে, মোমবাতিও। অতসীর গলা শোনা যায়, নিচে গিয়ে ভোলানাথকে একটু ডেকে আনো। মনে হচ্ছে, ফিউজ গেছে।

অতসী মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢোকে। টেবিলে একটা মোমদানে বসায়, বলে, কী হল, যাও, এক্ষুনি তো শংকর এসে যাবে মেয়েকে পড়াতে।

অবিনাশ বলে, যাচ্ছি, কিন্তু, জানলা খোলা আছে তো।

জানলা তো খোলা থাকবেই। একে পাখা চলছে না, তার মধ্যে জানলা না খুলে কি মরব! তুমি ভোলানাথকে একটু দ্যাখো।

অবিনাশ বলে, না, মানে, ঘরে আলো দেখলে, বাইরে থেকে...মানে...আলোটা তো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে...

অতসী বলে, আলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে তো কী হয়েছে। এক্ষুনি কি বোমা পড়বে নাকি যে সব ব্ল্যাক আউট করে বসে থাকতে হবে!

অবিনাশ বলে, না, মানে, ওরা...

অতসী ধৈর্য হারায়। যাও তো, ওরা টোরা জানি না, সেই একঘেয়ে কথা শুনে...

সারাদিন বাড়ির সামনেই একটা ছোট মোড়া পেতে বসে থাকে ভোলানাথ। সে এই ফ্ল্যাটবাড়ির কেয়ারটেকার। অবিনাশদের যে কোনো অসুবিধা হলেই, ভোলানাথ হাজির। অবিনাশ একতলার সিঁড়িটা শেষ করে নেমে ঘুরল, কিন্তু তার চোখ সম্পূর্ণ মাটির দিকে। এইসময় সন্ধেটা ঘোর হয়ে এসেছে। এসময় মুখ না তোলাই ভালো তাহলে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়ে যেতে পারে। কিন্তু, চোখ নামিয়ে ঘোরার ফলে দোতলার ফ্ল্যাটের মহিলার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল আর একটু হলে। উনি অফিস থেকে ফিরছেন। খুব মাপ টাপ চেয়ে অবিনাশ বাইরে এসে দাঁড়াতেই ভোলানাথ বলল, কী দাদা, কী হল? আবার...?

অবিনাশ বলে, না না, বোধহয় ফিউজটা গেছে। আলো জ্বলছে না। একটু দেখবেন?

ভোলা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে ফিউজ লাগাচ্ছে, নিচে টর্চ ধরে দাঁড়িয়ে আছে অবিনাশ। ভোলা বলছে, দাদা আলোটা ঠিকমত ধরেন। এই নিয়ে তিনবার বলল।

অতসী বলে, দাও, আমাকে দাও—টর্চ ধরবে কী করে, চোখ তো সবসময় জানলার দিকে।

অতসী ঠিকই বলেছে, জানে অবিনাশ। সত্যিই সে বারবার জানলার দিকে তাকাচ্ছিল বলেই, টর্চটা নড়ে যাচ্ছিল।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

ভোলানাথ ফিউজ লাগাতে লাগাতে বলে, সেসব দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। কিছু থাকলে তখন দেখা যাবে।

অতসী বলে। নেই, কিছু নেই। কালই তো সকালে সব দেখা হল।

অবিনাশ জানে ওরা আছে। ওরা সারে সারে নিঃশব্দে লেগে আছে। জানলার বাইরে। পাশের দেওয়ালে। যে কোনো সময় ঢুকে পড়বে।

ফোনটা বাজছে, ধরো।

অবিনাশ গিয়ে ধরল ফোন। শংকর। আজ আসতে পারছে না।

আজকের বদলে রবিবার সকালে আসবে। আপনারা থাকবেন তো? হ্যাঁ থাকব।

কার ফোন?

শংকরের। আজ আসতে পারবে না। রবিবারে।

বেশ তাহলে তুমি আজ মেয়েকে পড়াবে।

আমি? আমি পড়াব!

কেন, একদিন মেয়েকে নিয়ে বসলে কী হয়েছে।

মানে আমার কাছে, তো, ও ঠিক পড়তে চায় না। তুমি বললে শোনে।

আমি আজ পারব না। কাঞ্চন আসবে।

বলতে বলতে আলো জ্বলে উঠল। আর অবিনাশ, মা-আ-গো-ও বলে একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠে দরজা খুলে একলাফে বেরিয়ে গেল।

ভোলানাথ তখনও চেয়ার থেকে নামতে পারেনি। প্রায় উলটে পড়ে যাচ্ছিল্ সে। অতসী চমকে উঠলেও সামলে নিয়েছে। ভোলানাথের চেয়ারটা ধরে ফেলল। ভোলানাথ চেয়ার থেকে নেমে চারিদিকে তাকাতে লাগল। বলল, কই? কোথায়।

অতসী বলল, ছবির পাশে।

দেওয়ালে গণেশের বড় একটা ধরনের ছবি টাঙানো। তার পাশে জিনিসটা রয়েছে।

ভোলানাথ বলল, বউদি, ঝাঁটা দেন।

অতসী বলল, বরং ফুলঝাড়ু দিই। দেওয়ালে ঠক ঠক করলে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

ভোলানাথ বলে, তার দরকার নেই। আবার ঢুকবে। তার চেয়ে নিকেশ করে দিই।

কাজ শেষ করে ভোলানাথ ডাকল, দাদা, দাদা। সাড়া পেল না।

অতসী বলল, নিশ্চয় নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোলা বলল, গিয়ে খবর দিচ্ছি। বউদি একটা কাগজ দ্যান তো। এটাকে ফেলতে হবে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবিনাশ দেখল ভোলা আসছে।

ভোলা বলল, যান। হয়ে গেছে।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করে কোথায় ফেললেন।

—সে আমি ফেলে দিয়েছি পাশের ডাস্টবিনে।

—আর কিছু নেই? দেখেছেন তো?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—হ্যাঁ, আমি দেখে দিইছি। আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান। ওইভাবে দৌড়োলেন, মোটা মানুষ, যদি পড়ে যেতেন।

অবিনাশ ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে চারদিকে তাকায়। চেয়ার টেবিল বই ফুলদানি ক্যাসেট প্লেয়ার সব এলোমেলো। অতসী ফোনে কথা বলছে। মেয়ে চলে এসেছে। নিচের ফ্ল্যাট থেকে ধুপধাপ আওয়াজ শুনেছে। বাবাকে দেখে বলল, তুমি আবার পালিয়ে গেছিলে? হি হি!

অতসী ফোন রেখে বলল, হি হি করতে হবে না। পড়তে বোসো। এতক্ষণ গ্লোরিদিদির সঙ্গে আনন্দ করেছ, কিছু বলিনি। এবার বসে যাও।

মেয়ে একবার তাকাল। তারপর অবিনাশকে বলল, কেমন করে পালালে। খুব জোরে হেঁটে হেঁটে। নাকি আগের দিনের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে। বাপস্। কি লাফ, হি হি!

অবিনাশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়ে তার গা ঘেঁষে আসে। ভুঁড়ির মধ্যে মুখ রেখে বলে, ইস কি ঘামের গন্ধ! তুমি দৌড়োতে পার না কেন! আমি হলে দৌড়তাম। আমি অবশ্য ওদের ভয় পাই না।

অবিনাশ মেয়েকে বলে, কুলটু তোর মাকে বলবি, এই জানলা দুটো বন্ধ করে দিতে।

অতসীর গলা শোনা যায়—দেওয়া হচ্ছে। গরমে সেদ্ধ হয়ে মরা ছাড়া তো আমাদের উপায় নেই। কুলটু, জানলা দুটো বন্ধ করে, বাংলা রচনাটা বাবাকে দেখাও। কী চেহারা হয়েছে। চোখ লাল। ভুঁড়ি উঠছে নামছে। চুল উশকো। কী পাগল নিয়ে বাস!

মেয়ে বলে, না, আমি ভোঁদাই-এর কাছে পড়ব না। ভোঁদাই পড়াতে পারে না।

অতসী বলে, যা বলছি শোন। নয়ত আজ পিঠে পড়বে। আমি চানে ঢুকছি। তারপর অবিনাশকে বলে, যদি ইতিমধ্যে কাঞ্চন এসে পড়ে, তাকে বসতে বোলো। অবিনাশের ডাক নাম ভোঁদাই। মেয়ের ভালো নাম তপস্বিনী। বাবা মেয়ে পরস্পরকে ডাকনাম ধরে ডাকতেই অভ্যস্ত। মেয়ে ঠিকই বলেছে, অবিনাশ মেয়েকে পড়াতে পারে না। কিছুক্ষণ পরেই মেয়ে তার সঙ্গে খেলতে শুরু করে। কিংবা গল্প বলতে।

অবিনাশ মেয়েকে অনুনয় করে, একটু বন্ধ করে দে জানলাটা।

মেয়ে বলে, কি ভিতু রে বাবা। সারাক্ষণ ভয়েই মরল। তারপর বলে তুমি এই গানটা জানো, মুসু মুসু হাসি, দিউ মা লায়নে... বলে গানটা গাইতে গাইতে নাচ শুরু করে।

অবিনাশ বলে, তুই এই গানটা জানিস—হুঁ হুঁ হুঁ, ইয়ে দেখকে দিল ঝুমা, থি প্যারনে অঙ্গরাই। দিওয়ানা হুয়া বাদল...বাথরুম থেকে আওয়াজ, কী হল, পড়তে যেতে বললাম না! কী হচ্ছে।

মেয়ে চিৎকার করে, আমি না। ভোঁদাই। ভোঁদাই নাচছে না।

তোর ভোঁদাই তো ওইরকম। নিজের ভবিষ্যৎ নেই বলে, মেয়ের ভবিষ্যৎটাও নষ্ট করছে।

অবিনাশ চেঁচিয়ে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওকে নিয়ে বসছি পড়াতে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খট করে বাথরুমের দরজাটা খোলে। মুখ বাড়ায় অতসী, বলছি না—এক্ষুনি বসবে...যাও।

অবিনাশ ভয় ভয় মুখ করে বলে যাচ্ছি। অ্যাই কুলটু বই নে।

বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়। শোনা যায়, সারাক্ষণ দুটোর পিছনে চেঁচাতে হবে। এত চেঁচালে গলা থাকে।

বেল বাজল। অবিনাশ বলে, খোল তো কুলটু। কাঞ্চনমামা। খুলে দেখা গেল পারুল, সন্ধেবেলা রান্নাটা করে দেয়।

বাথরুম থেকে আবার আওয়াজ আসে, কে, কাঞ্চন এল।

মেয়ে বেরিয়ে বলে, না, পারুল মাসি।

বাথরুম থেকে আবার আওয়াজ, পারুলকে একটু দাঁড়াতে বল, আমি গিয়ে বলছি কী করতে হবে।

অবিনাশ নিজের ঘরে ঢুকে নিশ্চিন্ত। অবিনাশের ঘরে দুটো জানলা, দুটোই নেটলন লাগানো, জালে ঢাকা। বাইরের বারান্দার দিকে জানলাটা সর্বদা বন্ধ থাকে। কোনো কিছু ঢোকার উপায় নেই।

একটা নিচু খাট। তাতে দু-একটা ছোটোদের বই। পত্রিকা। টিনটিন। ছোটো থেকেই কুলটুকে বই পড়ে শোনাতে হয় অবিনাশকে। যে বই সম্পূর্ণ পড়া হয়ে যায় কিছুকাল পর কুলটু আবার প্রথম থেকে সবটা পড়ে শোনায়। তখন সবটা শুনতে হয়।

সেদিন দাদাই-এর কাছে জুরাসিক পার্ক দেখেছি। আবার ভিডিও-তে।

মেয়ের কথা শুনে অবিনাশ বলল, হ্যাঁ, জানি তো। এখন কী রচনা লিখতে দিয়েছে দেখি।

মেয়ে ভ্রুক্ষেপ করে না, বলে, জুরাসিক পার্ক তো মা আমাকে নিয়ে গিয়ে সিনেমা হলেও দেখিয়েছে।

অবিনাশ বলে, সেও তো জানি। তুমি এখন পড়া বার করো।

তুমি একদিনও দেখলে না কেন ভোঁদাই!

অবিনাশ বলে, আমার সিনেমা দেখলে চোখে ব্যথা হয়। মাথা ধরে।

কুলটু বলে, ভোঁদাই, জানো তো, জুরাসিক পার্ক আমার খুব ভালো লেগেছিল বলে, দাদাই আমার জন্য ভিডিও ক্যাসেট এনে রেখেছিল।

দরজা খুলে উঁকি দেয় অতসী, কি, বাপ মেয়েতে আবার আড্ডা হচ্ছে, পড়ার বই বার করাই হয়নি এখনও।

অতসীর মেজাজ কিছু শান্ত। স্নান করেছে। ভারি স্নিগ্ধ লাগছে।

অবিনাশ বলে, কুলটু, কখন থেকে বলছি না তোকে...কুলটু তার মস্ত নীল ব্যাগ খুলতে শুরু করে এতক্ষণ পরে।

অতসী বলে, শোনো, তোমার মেজোকাকিমা ফোন করেছিলেন।

অবিনাশ সচকিত হয়, কেন!

~ www.amarboi.com ~

মেজোকাকিমা মেজকাকা পরশু দিন বাবার জন্মদিন করছে। সন্ধেবেলা।

অবিনাশ অবাক হয়, বাবার জন্মদিন তো হয়ে গেছে। আট তারিখে।

হ্যাঁ। ঠিকই। কিন্তু তখন তো বাবা বিদেশে ছিলেন। তাই করা যায়নি। পরশুদিন করবে।

অবিনাশ বলে, ছোক্কাকুরাও আসবে নিশ্চয়ই।

কুলটু চেঁচায়, ইয়া, দাদাই-র বাড়ি আবার যাব। আইসক্রিম খাব। অতসী ধমকায়, এখন ওদিকে, এদিকে নয়। এসো তো। দরজা টেনে পাশের ঘরে চলে আসে ওরা। অতসী বলে, সবাই আসবে। সকলেই।

সকলেই কথাটার ওপর একটু বাড়তি জোর দেয় অতসী। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশের কাছে সবটা পরিষ্কার হয়।

অবিনাশ বলে, তুমি যাবে তো?

অতসী বলে, নিশ্চয়ই। বাবার জন্যই যাব। মেজোকাকি বলল, তোরা তো আগের বার ওদের ওখানে আসিসনি। এবার যেন ফেল করিস না। মানে বলা হয়ে গেছে।

অবিনাশ বলে, বাদ দাও বাদ দাও। তুমি মাথা ঠান্ডা রাখো। বাবা থাকবেন তো।

অতসী মুখটা শক্ত করে বসে, আমি একই রকম ব্যবহার করব। মাথা গরম করব কেন? বাবা জানেন, আমি মুখোশ পরে চলতে পারি না।

অবিনাশ বলে, না, মানে বাবা যেন কিছু না ভাবেন।

অতসী বলে, বাবা সমস্তই বোঝেন। তোমার বাবাকে তুমি কিছুই চেনো না। ওরকম একটা লোক। সে বুঝবে না, হয়? এমনি এমনি অত বড় একটা কোম্পানি চালাচ্ছে। ঐ রকম বাবার এইরকম ছেলে হয় কী করে তাই ভাবি!

বেল বাজল। ছুটল অতসী, নিশ্চয়ই কাঞ্চন।

কাঞ্চনই।

ছেলেটি বেশ লম্বা।

ঘরে ঢুকে অপরাধীর মতো হাসল। ভারি কমনীয় মুখ। একটু মেয়েলি। দেরি হয়ে গেল। আপনি বসে পড়েছিলেন না।

অতসী হাত ওলটায়। কোথায় আর বসলাম। মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে জ্যাম। বাড়িতে আলো নেই। তারপর তোমার অবিনাশদার সেই বস্তু, তাই নিয়ে ধুন্ধুমার। তাতে কিছু সময় গেল।

কাঞ্চন হাসে, বলে, সে কি আজকেও ঢুকেছিল!

অতসী বলে, দ্যাখো না। মানুষটা তো তখন কেমন হয়ে যায়। জানো তো, দৌড়ে নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাঞ্চন বলে, আচ্ছা আমি প্রথম প্রথম এসে কিন্তু এতটা দেখিনি। ইদানীং বেড়েছে না?

অতসী বলে, হ্যাঁ, এই দেড়-দু বছরে যেন বাড়ছে।

কাঞ্চন বলে খুব সস্নেহে, অবিনাশদা, আমার চেনা একজন সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, তাঁর কাছে যাবেন একদিন?

~ www.amarboi.com ~

অতসী বলে, সাইকিয়াট্রিস্ট? তাতে আবার হিতে বিপরীত হবে না তো। কি সব ওষুধপত্র দেবে!

কাঞ্চনের জুতো খোলা হয়ে গেছিল। কাঞ্চন বলে, না না, ওষুধ দেবেন কেন প্রথমেই, শুধু কথা বলবেন। ভদ্রমহিলা খুব ভালো। চলুন না একদিন।

অবিনাশ হঠাৎ উৎসাহভরে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। যাব। আমার আর এত ভয় পেতে ভালো লাগে না।

অতসী ঘুরে তাকায় অবিনাশের দিকে। ওর এতক্ষণের চোখ বদলে গেছে। নরম, মায়া ঘেরা। যেন একটু ছলছলে। অতসী অদ্ভুত হেসে বলে, নামেও ভোঁদাই কাজেও ভোঁদাই। সত্যি কী দেখে যে বিয়ে করেছিলাম তখন। বলে, এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে অবিনাশের একমাথা কাঁচাপাকা চুল আদর করে নেড়ে দেয়। অতসীর অত লজ্জাটজ্জা নেই। তারপর বলে, যাও। মেয়েকে রচনাটা তৈরি করে দাও। বসো কাঞ্চন।

অবিনাশ ঘরে ঢুকে মেয়ের খাতার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। ওটা কী কুলটু।

কুলটু একমনে খাতার উপর ঝুঁকে আঁকতে আঁকতে বলল, ডাইনোসর। জুরাসিক পার্ক আঁকছি। অবিনাশ ছটফট করে ওঠে, ছিঁড়ে ফেল। ওটা ছিঁড়ে ফেল।

মেয়ে দু-হাতে খাতা আগলে বলে, না কেন ছিঁড়ব!

ছিঁড়ে ফেল। ছেঁড় শিগগির। বলতে বলতে অবিনাশ মেয়ের হাত থেকে খাতা কেড়ে নিয়ে পাতা দুটো ছিঁড়ে ফেলে। গোল্লা পাকায়। গোল কাগজটা ছুড়ে ফেলে ঘরের কোণে।

মেয়ে রেগে কাঁদতে শুরু করে। তুমি ছিঁড়ে ফেললে কেন? উঁউউ আমি মাকে বলে দেব। দরজা খুলে বেরতে যায় মেয়ে। অবিনাশের সংবিৎ ফেরে। সে মেয়েকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে বলে, আচ্ছা, সোনা, কুলটু আমার। আমার অন্যায় হয়েছে। আমার দোষ হয়েছে।

তুমি আমার আঁকা ছিঁড়ে দিলে কেন? মাকে বলে দেব।

সোনা আমার কুলটু আমার। বাবা, আমি এই নাক মলছি, কান মলছি। আর কখনও ছিঁড়ব না বাবা।

না—আ—কেন ছিঁড়লে। মা-আ, ভোঁদাই আমার আঁকা ছিড়ে দিয়েছে কেন।

চুপ চুপ। শশব্যস্ত অবিনাশ মেয়ের মুখ চেপে ধরে। বলে, মা এখন গান করছে। খুব রেগে যাবে। তাছাড়া, মা যদি শোনে, কুলটু এখন পড়া না করে জুরাসিক পার্ক আঁকছিল মা কিন্তু কুলটুর ওপরেও রাগ করবে।

ওই ঘর থেকে এতক্ষণ হারমোনিয়ামের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এখন গানও শুরু হয়েছে। কাঞ্চনের ভারী, গভীর স্বর।

মেয়ে বোঝে। চুপ করে যায়। অবিনাশ তাকে ধরে নিজের দিকে টানতেই গায়ে এসে এলিয়ে পড়ে। এতক্ষণ শক্ত হয়ে ছিল।

অবিনাশ বলে, তাছাড়া তুই তো জানিস তোর আঁকা আমি কত ভালোবাসি। ব্যাঙ্কে আমার টেবিলের কাচের নিচে রেখে দিয়েছে তোর ড্রইং। দিইনি বল?

কুলটু বলে, দিয়েছ।

~ www.amarboi.com ~

অবিনাশ মেয়েকে বোঝায়। কিন্তু এইগুলো দেখতে আমার ইচ্ছে করে না।

কুলটু বলে, ভয় করে?

হ্যাঁ বাবা, ভয় করে।

সেইজন্য তুমি জুরাসিক পার্ক দ্যাখোনি?

হ্যাঁ। সেইজন্য। তুমি এখন কি রচনা আছে বলো।

রচনা তো নেই। সাম্‌স আছে।

আচ্ছা ঠিক আছে। তাই বের কর।

মেয়ে অবিনাশের গায়ে এলিয়ে বলে, আচ্ছা ভোঁদাই। ওই ডাইনোসররা সত্যি ছিল?

ছিল সোনা।

কবে ছিল?

সে অনেক অনেক বছর আগে।

তা হলে জুরাসিক পার্ক ওরা তৈরি করল কী করে?

এই দ্যাখো। আমাদের কুলটু কিন্তু খুব বোকা হয়ে যাচ্ছে। সেদিন কাঞ্চন মামা বলে দিল না। কম্পিউটার গ্রাফিক্স দিয়ে বানিয়েছে। মেয়ে কম্পিউটার বোঝে। গ্রাফিক্স না বুঝলেও। বলে, আচ্ছা বাবা, ওরা যখন ছিল, তখন মানুষ কী করত। ওরা তো সব মানুষ ধরে খেয়ে ফেলত, তাই না!

অবিনাশ বলে, তখন মানুষ ছিল না। মানুষ তখনও তৈরি হয়নি।

—তা হলে, ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট দোকান গাড়ি কিছুই ছিল না?

না কিছুই ছিল না। শুধু জঙ্গল আর বিরাট বিরাট গাছ। শুধু পাহাড় আর সমুদ্র। মাঝখানে হাজার হাজার মাইল ঘাসজমি আর, পাথুরে মাঠ। সব উঁচু নিচু, কোথাও কোনো মানুষ নেই। শুধু ওই সব অতিকায় প্রাণীরা।

আর পাখি ছিল না ভোঁদাই? পাখি?

ছিল। সেইসব পাখিও ছিল ওইরকম দেখতে। তাদের গায়ে ডানায় অনেকেরই কোনো পালক ছিল না। বিরাট আকারের সব সরীসৃপ পাখি।

ওরা কী করে মরে গেল ভোঁদাই? অত বড় বড় সব জন্তু। ওরা মরে গেল কী করে।

অবিনাশ চুপ করে যায়। বলে, অনেকে অনেক কথা বলে।

কে বলে ভোঁদাই।

এই যারা বৈজ্ঞানিক তারা। যা বলে, তার মধ্যে একটা হল উল্কা। মস্ত বড় একটা উল্কা পড়েছিল। উল্কা জানিস তো?

হ্যাঁ। তারা খসা। সেই দিঘার হোটেলের ছাদে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম আর তারা খসে যাচ্ছিল। তিনটে তারা।

ওগুলো তারা নয়। তারারা পাথর। ধূমকেতুর টুকরো। ওগুলো আকাশে ভেসে বেড়ায়। তারপর একটা-দুটো পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেই রকমই একটা ঢুকে পড়েছিল।

তাতে কী হয়েছিল? ডাইনোসরেরা মরে গিয়েছিল?

~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ কুলটু তাই তো শোনা যায়।

ও ঘর থেকে এখন অতসীর গলাও ভেসে আসছে। এই গান শুনলে, অতসীকে সতেরো বছর ঘর করা বউ বলে মনে হয় না। মনে হয়, অচেনা কোনো মেয়ের গলা থেকে অচেনা কোনো স্বর। এই জায়গাটায় অতসীকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগে অবিনাশের।

মেয়ে বলল, আচ্ছা ভোঁদাই, দিঘায় তো দেখেছিলাম, ওই টুকু টুকু হাউই বাজির মতো আলো। এক একবার পুট করে জ্বলে উঠেই আর দেখা যাচ্ছে না। অত বড় ডাইনোসরেরা তাতেই মরে গেল!

অবিনাশ বলে, ওইটুকু কেন হবে। সে তো মস্ত বড়। ধর দশ মাইল লম্বা একটা উল্কা।

তাতে কী হল। ডাইনোসরদের মাথা ফেটে গেল!

অবিনাশ বোঝায়। শোন, ওই উল্কার খণ্ডগুলো যখনই পৃথিবীতে ঢোকে, পৃথিবীতে তো হাওয়া আছে। বায়ুমণ্ডল। পড়েছিস তো? সেই বায়ুমণ্ডলে এলেই সেগুলো জ্বলে ওঠে। আর জ্বলে ওঠে বলেই তো আমরা দেখতে পাই রাত্তিরে। কিন্তু যেমন জ্বলে ওঠে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নিভেও যায়। পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেগুলো তো বড়সড় ঢিলের মতো। কিন্তু সেই যে উল্কাটা যেটা তখন পড়েছিল। সেটা তো মস্ত বড়। ধর, সাড়ে ছ-মাইল, সাত মাইল একটা শহরের মতো। সেটা যখন বায়ুমণ্ডলে ঢুকে জ্বলে উঠল, তখন আকাশে সেটা তো একটা আগুনের বল!

—সূর্যের মতো?

—সূর্যের চেয়ে অনেক বড় দেখাচ্ছিল নিশ্চয়ই সেটাকে। খুব কাছাকাছি তো। একেবারে মাথার ওপর।

—তারপর কী হল?

—কী হল বলা মুশকিল। কিন্তু নিশ্চয়ই, সারা পৃথিবী প্রচণ্ড আলোয় ভরে গেল। এক সেকেন্ডের জন্য।

—বাজ পড়লে যেমন আলো হয়!

তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি আলো। কারণ তার এক সেকেন্ডের মধ্যে তো পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু করবে।

এক সেকেন্ডের মধ্যে, মাত্তর!

মেয়ে, অবিনাশের কোল ঘেঁষে আসে। হাঁটুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। অবিনাশ বলে, এক সেকেন্ডের মধ্যে। কেন না, তারপরই ওই উল্কাপিণ্ড মাটিতে আছড়ে পড়ল। মাটিতে নয়। বোধহয় সমুদ্রে।

সমুদ্রে?

হ্যাঁ। তাতে ঢেউ হাজার ফুট উঁচু হয়ে উঠল। আর ক্রেটার মানে, আগ্নেয়গিরির মতো জ্বালামুখ তৈরি হয়ে গেল। সমুদ্রের মধ্যে ভূমিকম্প হল। মাটি ফেটে গেল। অনেকগুলো অ্যাটম বোমা একসঙ্গে ফাটলে যা হয় তাই হল, ধুলোর মেঘে সূর্য ঢেকে গেল কয়েকশো বছরের জন্য। তারপর বৃষ্টিই শুরু হল। অ্যাসিডের বৃষ্টি। ওরা শেষ হয়ে গেল।

~ www.amarboi.com ~

—আচ্ছা, ভোঁদাই, ওই যে উল্কাটা পড়ছিল, সেটা কে দেখেছিল আগে?

—দেখেছিল? কে আবার দেখবে? মানুষ ছিল না বললাম না।

—না না মানুষ নয়। ডাইনোসরদের কেউ? কেউ দেখেনি?

—তা আমি কী করে বলব।

—আমি বলব?

—বল।

—পাখিদের কেউ ওটা দেখেছিল। ওটা যখন নামছে তখন দেখেছিল।

—পাখিদের কেউ?

—হ্যাঁ, পাখিরা আকাশে থাকে তো। তাই ওরাই দেখেছিল। আমি বলছি। পাখিরা।

অবিনাশ স্বগতোক্তির মতো বলে, পাখিরা? যাদের ডানায় পালক নেই। যাদের লম্বা লিকলিকে ল্যাজ? যাদের চামড়ায় তৈরি ডানা? যারা অর্ধেক পাখি, অর্ধেক গিরগিটি?

—তারপর কী হল, ভোঁদাই বল না, তারপর কী?

তারপর বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন আছে, সেটা মিশে গিয়ে অ্যাসিডের বৃষ্টিই হতে লাগল, গাছপালা, প্রাণী, তৃণ, সব, সব শেষ হয়ে গেল। পাঁচ হাজার বছরের জন্য পৃথিবীতে কোনো প্রাণ রইল না। তারপর এক সময়, পৃথিবী আপনা থেকেই সুস্থ হয়ে উঠল। আবার প্রাণ এল। ঘাস জন্মাল, প্রাণ জন্মাল।

ডাইনোসররা আর এল না, তাই না?

অবিনাশের গলা নিচু হয়ে আসে, ফিসফিস করে বলে, এল। এল। অন্যভাবে এল।

—তাই বুঝি। ওরা এখনও আছে?

তেমনই নিচু গলায় অবিনাশ বলে চলে, আছে। আছে। জানলার বাইরে। দেওয়ালের গায়ে। সারি সারি ওরা অপেক্ষা করে আছে। সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়ে। সেই আদিমকাল থেকে আছে।

এই দ্যাখো। যা ভেবেছি, দুই পিঠোপিঠি ভাইবোন গপ্পো করে যাচ্ছে। একে কী বলবে কাঞ্চন।

দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে অতসী। পেছনে কাঞ্চন। মুখে হাসি। সত্যিই তো, পাশের ঘরের গান থেমে গেছে কখন যেন। অবিনাশ খেয়াল করেনি। শোনো, চা করছি কাঞ্চনের জন্য। তুমি খাবে?

হ্যাঁ। অবিনাশ ঘাড় হেলায়।

অতসী বলে, এর বেলায় তো হ্যাঁ হবেই। জানো তো কাঞ্চন, ব্যাঙ্কে তো প্রমোশন নেয় না, চিঠি এলে ইগনোর করে। একবার জোর করে পাঠালাম। শ্রীশিক্ষায়তনে পরীক্ষা পড়েছিল। সাদা খাতা জমা দিয়ে ফিরে এল। এসে বলল, কী সুন্দর স্পেসের ‘এল’ কম্পাউন্ড। কী সুন্দর বারান্দায় টবের গাছ বসানো। থার্ড ফ্লোরে সিট ছিল। কী চমৎকার খোলা হাওয়া।

কাঞ্চন হাসে—তাই নাকি!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতসী বলে চলে, একঘণ্টা তো বসে থাকতেই হয়। জিজ্ঞাসা করলাম, এই এক ঘণ্টা কী করলে। বলে, এখানে তো চা বিস্কুট হয়। দু-কাপ চা খেলাম বসে বসে। তারপর এক ঘণ্টা হতেই খাতা দিয়ে চলে এলাম। বোঝো কাণ্ড। এইরকম চা ভক্ত।

অবিনাশ বোঝে, এটা তার সম্পর্কে অতসীর প্রশংসা। অবিনাশের তো প্রশংসা করবার মতো কোনো গুণ নেই। এগুলোই সস্নেহে বলে অতসী, যখন মন ভালো থাকে।

এখন অতসীর মন ভালো আছে। মুখ জ্বলজ্বল করছে। অন্যরকম একটা আলো।

অতসী যখন গান নিয়ে থাকে তখন ওর মুখে এইরকম আলো ছড়িয়ে থাকে।

যখন গান নিয়ে থাকে? না কি যখন কাঞ্চনের কাছাকাছি থাকে?

দুই

এই কথাটা অবিনাশের মনে থেকে থেকেই ঝিকিয়ে ওঠে। অবিনাশ নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কথাটা নিভতে চায় না। এখন যেমন। কাঞ্চন কখন চলে গেছে। মেয়ে আর মেয়ের মা ঘুমিয়ে পড়েছে পাশের ঘরে। কিন্তু অবিনাশ নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমোতে পারছে না। অন্ধকারে চেয়ে আছে।

কথাটা প্রথম তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল ভালো-দি। মিষ্টি হেসে বলেছিল, গান নিয়ে আনন্দে থাকে? না ঐ কাঞ্চনকে নিয়ে? ভোঁদাই তো ভালোমানুষ, অত খেয়াল করে না!

ভাইদা, বলেছিল, আহা, তা থাকুক না। যে গান গায়, সে আর একজন গাইয়েকে পছন্দ করবে, সেটাই তো ন্যাচারাল। তুমি নমিতা, ইন্দ্রাণী, প্রবীর, অরূপশংকর এদের পছন্দ করো না?

ভালো-দি তেমনই শান্তমুখে বলছিল, না মানে, আমি তো খারাপ কিছু বলছি না। সে তো একজন আর একজনকে পছন্দ করতেই পারে। ঠিকই তো আছে। আমাকে সে দিন ওপরের বীণা মাইমা বললেন, তোমার জাকে দেখলাম একজনের সঙ্গে।

ভাইদা বলল, দেখতেই পারেন, সো হোয়াট! ভালো-দি বলল, তেমনই নরমভাবে, না, ঠিকই আছে। আমি তো কিছু বলছি না। তবে ওদের নানা জায়গায় একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। একজন আমায় জিজ্ঞেস করেছিল।

অবিনাশের জানতে ইচ্ছে করেনি কী জিজ্ঞেস করছিল। ওর কেমন একটা লাগছিল। কিন্তু ভাইদা বলল, দেখা যেতেই পারে। তাতে কী হয়েছে।

—না, ঠিকই আছে। কী আবার হবে। তাই বলছিলাম। ভালো-দি তেমনই নির্বিকার মুখ করে পটে চা ঢালতে লাগল। অবিনাশ তাও কিছু বলল না। তখন ভাইদা বলল, কী জিজ্ঞেস করছিল, যেন ভাইদারই জানবার ইচ্ছে। খুব শান্ত মুখে চায়ের কাপটা প্লেট সুদ্ধ অবিনাশের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ভালো-দি বলে, বলছিল এই ছেলেটি কে? আপনার দেওরকে তো দেখেছি। আপনার বাড়িতে প্রায়ই দেখি। এটুকুই জিজ্ঞেস করেছিল। দিস মাচ্।

ভাইদা বলে উঠল, করতেই পারে। করতেই পারে। সো হোয়াট। তুমি বেচারাকে এগুলো বলছ কেন।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাইদার এটা অভ্যাস। দেখতেই পারে। সো হোয়াট। করতেই পারে। বলতেই পারে। এসব বলার পর একটা সো হোয়াট লাগিয়ে দেওয়া।

আর ভালো-দি খুব শান্ত মুখে শেষ পর্যন্ত না, মানে বলে কথা শুরু করে, এমন একটা জিনিস বলবে, তা শুনে শ্রোতা সারারাত ঘুমোতে পারবে না। যদিও কথার মাঝে মাঝে বলবে ঠিকই আছে। ঠিকই তো আছে।

আসলে, কিছুই ঠিক নেই। আসলে এগুলো কিছুতেই হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, এটাই ওঁরা বলতে চান।

অতসী বুঝিয়ে দিয়েছিল একদিন অবিনাশকে। বলেছিল, ওঁরা যা বলেন, আর যা বোঝাতে চান দুটো আলাদা। এরকম লোকের সঙ্গে চলতে তো আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। কিন্তু তোমার দাদা বউদি। কী বলব বলো।

হ্যাঁ। ভাইদা আর ভালো-দি অবিনাশের নিজের দাদা বউদি। দাদা অনিমেষকে ছোটো থেকেই ভাইদা বলা অভ্যাস। অনিমেষ খুবই প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার। ভালো-দি, সাহানা, সেল ট্যাক্সের অফিসার। এক মেয়ে তটিনী। এই সেদিন বিয়ে হয়ে বিদেশে চলে গেছে। ভাইদার কলকাতায় দুটে ফ্ল্যাট। পুরনো মারুতি বেচে স্যান্ট্রো কিনেছে। তবু বাবার তুলনায় ভাইদাও কিছুই হয়নি।

বাবা শুধু নিজের পেশায় বড় হয়েছেন তাই নয়। বাবাকে দেশের লোক মানে। রবিশঙ্করকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে—টিভিতে দেখা গেল স্টেজে বাবা বসে আছেন গুণিজনদের সঙ্গে। কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, বাবার মতামত জিজ্ঞেস করবে কাগজ থেকে। রুসি মোদি কলকাতায় এলে বাবাকে ফোন করেন। বাবা, এই বাহাত্তর বছর বয়সেও নিজের বাল্যবন্ধু গোপাল কাকাকে নিয়ে ইতালি আর সুইজারল্যান্ড ঘুরে এসেছেন। গোপাল কাকার অস্ট্রেলিয়ায় নিজের ব্যবসা আছে। লোকে তীর্থ করে বুড়ো বয়সে। বাবা গোপাল কাকাকে বললেন, ইতালিটা দেখা হল না গোপাল। গোপাল কাকা বললেন চলো তবে। এঁরা এইরকম। দেশবিখ্যাত সমাজসেবক হিসাবে বাবাকে সম্প্রতি রাজ্যসভার সদস্য করতে চাওয়া হয়েছিল। বাবা রাজি হননি।

অবিনাশের কাকারাও কি কম নাকি? ছোটো কাকা ইনকাম ট্যাক্স ল ইয়ার। নিজের ব্যবসা এই পঁয়ষট্টি বছরেও ভালোই চলছে। ছেলেও সি. এ হয়েছে। আর মেজকাকা মেজকাকিমা দুজনেই ডাক্তার। দুই ছেলে তোতন, বিটুন, দুজনেই, বিদেশে থাকে। ফিরবে বলে, প্রতিশ্রুতি পাঠায় মাঝে মাঝে। মেজকাকা মেজকাকির অবশ্য টাকার দরকার নেই, তবু ছেলে দুটোকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে, এ কথা মদ্যপান করে এক-আধবার দুজনেই স্বীকার করে। এই বাড়িতে একমাত্র অবিনাশই কিছু হতে পারেনি। সে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে স্টেট ব্যাঙ্কের ডেপুটি ক্যাশিয়ার। উনিশ বছর চাকরি। ষোলো বছর এক জায়গায় আছে। কলকাতা শহরের মধ্যেই ছোটো একটা ব্রাঞ্চে। প্রমোশন নিতে চায়নি। অবিনাশ কোনো দায়িত্ব নিতে চায় না। রাজি ছিল না বিয়েতেও। কিন্তু বাবাই জোর করে বিয়ে দিয়েছেন। নয়ত অবিনাশকে দেখবে কে? তাদের পরিবারে একমাত্র অবিনাশেরটাই সম্বন্ধ

~ www.amarboi.com ~

করে বিয়ে। নয়ত ভাইদা-ভালো-দির তো বটেও, মেজকাকা-মেজকাকিরও প্রেম করেই বিয়ে। ছোক্কাকুরও। তাদের ছেলেমেয়েদেরও। শুধু অবিনাশের ক্ষেত্রেই বাবা নিজে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণ ঘরের এই মেয়েটির সঙ্গে। কেন না, অবিনাশ কাউকে পছন্দ করার কথা ভাবতে পারত না।

অবিনাশ অনেক কিছুই পারত না, পারে না, সবাই সেটা জানে, অবিনাশের তাতে তেমন অসুবিধে হয় না। অসুবিধে হয় অতসীর।

সে অবিনাশকে বলে, আমি তোমার দাদা-বউদির সঙ্গে সারাক্ষণ ওইরকম মুখোশ পরে চলতে পারি না। অবিনাশ বলে, কখনও দেখাটেখা হলে ওরা যেন বুঝতে না পারে। স্বাভাবিক ব্যবহার কোরো। কেমন!

করি তো। বাড়ির ছোটো বউ হিসেবে যেটুকু সম্মান দেখানোর তা তো আমি চিরকালই দেখিয়েছি। কিন্তু কি জানো, যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ কেবলই ভান করতে হয়। খানিকক্ষণ ভান করার পর মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে।

অবিনাশ বলে, কী যে করব আমি।

অতসী বলে, তুমি আর কী করবে। আর এসব জায়গায় বাবা থাকেনই। বাবা থাকলেই আমাকে গান গাইতে বলেন। ওই সময় ওদের সামনে গান গাইতে যে কি কষ্ট হয় আমার। বলে অতসী চুপ করে যায়। তারপর বলে, আমার এই গান গাওয়া থেকেই তো সবটা শুরু।

অবিনাশ জানে। এই গান থেকেই শুরু। অতসী ভালো-দির মতো ডাকসাইটে সুন্দরী নয়। রোগা ছোটোখাটো একটি মেয়ে। এমনই কোনও বিশেষত্ব নেই। সামনের দাঁতটা একটু উঁচু। কিন্তু তাতে হাসলে সুন্দর লাগে। শ্যামলার চেয়ে একধাপ বেশি কালো গায়ের রং। মাথার চুল কোঁকড়া। আর ভালোদি, এই ৪৩ বছরেও যাকে বলে তন্বী। চুল ছোটো করে কাটা। কাটা কাটা নাক চোখ। সাজতে পারে। ভাইদার সঙ্গে মানায়। ভাইদারও লম্বা, পেটানো চেহারা ছিল। এখন, মদ খেয়ে খেয়ে চোখের তলায় আর পেটে চর্বি জমেছে। ওদের পারিবারিক যে কোনো সমাবেশে, ভাইদা-ভালো-দিকে ঠিক চোখে পড়ে। জুটিটা চমৎকার। আর অবিনাশ অন্য সব জায়গার মতো নিজের বউয়ের পাশেও বেমানান। থলথলে চেহারা, ভয় পাওয়া হাসি, কাঁচাপাকা চুলের ঝাঁক, মাঝে মাঝে কদম ছাঁট হয়ে যাওয়া—তার পাশে, অতসীকে অনেক কমবয়সি লাগে, কিন্তু অবিনাশের ক্ষেত্রে সবটাই এমনই হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ভোঁদাই-এর কাছে, এর বেশি কে কবে আশা করেছে।

সেই অবিনাশই এক সময়, ধীরে ধীরে গুরুত্ব পেয়ে গেল। আসলে, অবিনাশ নয়, গুরুত্ব পেল অবিনাশের বউ। অতসী। অতসী একদিন গান গেয়ে হতবাক করে দিল সবাইকে। এতদিন তাদের পরিবারে, যে কোনো সমাবেশে, গান একজনই গাইত। ভালো-দি। ভালো-দি যে শুধু বাড়ির লোকের মধ্যে গান গাইতে পারে তা নয়। ভালো-দি টিভিতেও দুদিন গান গেয়েছে। ভালো-দির গানের, এমনকি একটা ক্যাসেটও বেরিয়েছে। পুরনো কিছু বিখ্যাত শিল্পীর বাংলা আধুনিক গান, সেই ক্যাসেটেই নতুন করে গেয়েছে ভালো-দি। নিজের খরচে অবশ্য। সকলেই বলে সাহানা, লেখাপড়া আর চাকরির উন্নতির

~ www.amarboi.com ~

দিকে মন না দিয়ে যদি গানের দিকে যেত, বড় হতে পারত। কিন্তু, অতসীর গানের কথাটা কেউই তেমন জানত না। যদিও খুব ছোটবেলা থেকেই রেডিও-রেকর্ডের গান, শুধু শুনে শুনেই অবিকল তুলে নিতে পারত অতসী। অতসীর বড় মাসি মঞ্জু গুপ্তের ছাত্রী ছিলেন কিছুদিনের জন্য। বড় মাসির কাছে গান শিখেছিল অতসী। কিন্তু গানবাজনা নিয়ে লেগে থাকার মতো অবস্থা ছিল না অতসীদের পরিবারে। বিজ্ঞাপনের পাত্র ব্যাঙ্কে চাকরি করে দেখে সেটাই যথেষ্ট মনে করে চিঠি লিখেছিলেন অতসীর বাবা-মা। তারপর, যখন দেখলেন, অবিনাশের বাবার মতো বিখ্যাত মানুষ তাঁদের মেয়ের শ্বশুর হতে চাইছেন, তখন, তাঁরা ভয়ে পিছিয়ে আসতেও চেয়েছিলেন। অত বিরাট পরিবারে মানিয়ে নেবার মতো মেয়ে কি তাঁদের। কিন্তু, ভাবী শ্বশুর তাঁর ছেলেকে চিনতেন বলেই, এই বউমাটিকে তাঁর উপযুক্ত মনে হয়েছিল। সাধারণ পরিবারের মেয়ে চান বলেই, নিজের নাম গোপন করেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। পাত্রী দেখবার সময় একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, গানটান জানো নাকি। অতসীর বাবা বলেছিলেন, ওই বাড়িতে একটু নিজের মনে গান গায় আর কি। বেশিদূর তো শেখাতে পারিনি। অতসী সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিল, এখন কি গাইতে হবে?

ভাবী শ্বশুর লজ্জিত হয়েছিলেন, না, না। এখন কেন। কখনও শুনব। গান গাইলে, গান শুনলে মন ভালো থাকে। তাই না?

বিয়ের পর শ্বশুরকে গান শোনাবার সুযোগ তেমন হয়নি। এক দিন, প্রথম দিন, গলা তেমন বলছিল না। তার কারণ ছিল, কেন না, তখন বিয়ের পনেরো দিন হয়েছে সবে। অবিনাশের সঙ্গে জীবন কাটাতে হবে সেটা সবে বুঝতে শুরু করেছে অতসী। এও বুঝেছে লোকটিকে দোষ দেওয়াও যাবে না। তারপর তো, অবিনাশের তৎকালীন চাকরিস্থল বালুরঘাটে চলে যাওয়া, সেখানে দু-বছর। বিষাদে আচ্ছন্ন দু-বছর। তারপর মেয়েটা হল। তারপর, বাবার চেষ্টায় অবিনাশের কলকাতায় ট্রান্সফার। ফ্ল্যাট কেনা। মেয়ে সাত-আট বছর হতে একদিন পাড়ায় একটা বাড়ির মধ্যে থেকে গান ভেসে আসতে শুনল। কেউ গান শেখাচ্ছেন। জয়শ্রীদি। এক দিন, দু-দিন বসতে লাগল সময় করে জয়শ্রীদির ঘরে। জয়শ্রীদি তার গলা শুনে খুব খুশি। একটু একটু করে চর্চা শুরু হল আবার। তেমন কেউই জানল না তখন। তারপর, যা হয়, হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেয়ে গেল। বাবা, তাঁর আত্মীয়স্বজনদের, ছেলে, ছেলের বউদের, তিন-চার মাসে একবার নিজের ফ্ল্যাটে ডাকেন। অবিনাশের বারো আর অনিমেষের পনেরো যখন তারা মাকে হারায়। তারপর বাবা তাদের বড় করেছেন। কিন্তু, বড় হবার পর যথাসাধ্য দূরত্বও রেখেছেন। বড় একটা ফ্ল্যাটে তাঁর সঙ্গী তিনজন। ড্রাইভার সিরাজুল। আর দুজন গৃহভৃত্য নরেশ ও মলয়। সিরাজুল আছে তিরিশ বছর আর নরেশ কুড়ি বছরের বেশি। নরেশ আর সিরাজুল-এর প্রতিও বাবা তার কর্তব্যের বেশিই করেছেন। ব্যবসায় দাঁড় করিয়েছেন নরেশের ছেলেকে।

বাবা যখন তাঁর আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুদের ডাকেন, মাঝে মাঝেই ডাকেন, তখন এরা তিনজনই সবদিক চমৎকার সামলায়। এক সন্ধে, সবাই একসঙ্গে হওয়ার পর, সকলের

~ www.amarboi.com ~

অনুরোধে ভালো-দি তিনখানা গান গেয়ে চুপ করেছে। খাবার আসতে তখন একটু দেরি। মেজকাকি বললেন, অতসী তো গানটান করো না, না? অতসী তার স্বভাবমতো একটু হেসে চুপ করে রইল। বাড়িতে, অতসী যেমন, বাইরে ঠিক তার উলটো। কথা বলতেই চায় না, একটু হেসে চুপ করে থাকে। রান্না, ঠান্ডা, গরম, বর্ষা, মেয়ের স্কুলের পড়া এইসব নিয়ে দু-চারটে কথা বলে। একটু পরেই সকলের মন অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সবাই অতসী আর অবিনাশের কথা ভুলে যায়। শুধু তাদের মেয়ে, ছুটে ছুটে বেড়ায় এধার ওধার। কিংবা বাবাকে বলে দাদাই টিভি চালিয়ে দাও। দাদাই গিয়ে খুব আনন্দ করে একটা জুরাসিক পার্ক বা লায়ন কিং-এর ক্যাসেট চালিয়ে দেন। সেদিন তেমন চলছে। গানের প্রসঙ্গে অতসী চুপ করে থাকবার পর ছোক্কাকু বললেন, করো না কেন। মেয়েরা একটু গানটান না গাইলে হয়। আপনমনে একটু একটু গুনগুন...

হঠাৎ অবিনাশ একটা বোকার মতো কাজ করে ফেলল। বলে উঠল। করে তো, করে। অতসী গান করে।

অতসী ভুত দেখার মতো মুখ নিয়ে অবিনাশের দিকে তাকায়। অবিনাশ ভ্রুক্ষেপ করে না। বলেই চলে। গান করে। মানে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে। সন্ধেবেলা। প্রথমে সবাই হেসে ওঠে অবিনাশের বলার ধরনে। তারপর হই হই অনুরোধ। করো, করো। অতসী।

অতসীর প্রতিরোধ হাওয়ার কুটোর মতো উড়ে যায়।

অতসী হারমোনিয়ামটা খানিকটা দ্বিধা নিয়ে টেনে নেয়। সুর দিয়ে, একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চোখ বন্ধ করে থাকে। তারপর গেয়ে ওঠে, উঁউঁউঁ প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। অবিনাশ ঠিকমতো বুঝতে পারে না। ঘরে সুর ঢুকে পড়লে কি হাওয়া বদলে যায়, আসবাবপত্র অন্যরকম হয়ে পড়ে, ঘরের আলোর রং পাল্টায়? আর মানুষরা? তাদের কী হয়? বাড়িতে যখন গায়, তখন তো ঠিক এরকম হয় না। না কি হয়। অবিনাশ খেয়াল করে না। অতসী ততক্ষণে দুলাইন গেয়ে আবার প্রথম লাইনে ফিরেছে। কী নামে বল তাঁরে ডাকি, কোন ভরসায় তাঁহারে মাগি প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি।

অবিনাশ দেখল, বাবার চোখের জল চশমার তলা দিয়ে ঝরঝর করে নেমে এসেছে। ঘরের আরও কয়েকজনও দেখল। ছোটো থেকে অবিনাশ অনিমেষ দুজনেই দেখেছে গান শুনতে গেলে একেক সময় বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ে। কিন্তু সে তো আলি আকবর বা কণিকা কিংবা ঋতু গুহ শুনলে হয়। তাই বলে, অতসীর বেলাতেও হবে!

গান শেষ হতে বাবা লাজুকভাবে চশমা মুছতে মুছতে বললেন, দেব, না? আর একটা করবে না?

অতসী ধরল, আমার পরান কোথা যায়। সেই দিন থেকে ছবিটা পাল্টে গেল। বাড়ির সবাই একসঙ্গে হলেই বাবা বলবেনই, এবার অতসীর গান হবে। আর অতসীর গান শুনলেই বাবার মুখটা পালটে যায়। এক দিন তো বলেই দিলেন, বুঝলে, এইরকম গানও যদি গাইতে পারতাম, তাহলে...আমি ভাবি...অতসী কী করে পারে। ধরো। আর একটা ধরো।

~ www.amarboi.com ~

এইখানেই অতসীর মুশকিল হয়। ভালো-দি আর ভাইদার সামনে ওর গান গাইতে ইচ্ছে করে না। অতসী কেবলই দায়ী করে অবিনাশকে। তুমি যদি সেদিন ফাঁস করে না দিতে কেউ তো জানত না।

অবিনাশ জানে, কেউ মানে, তার পরিবারের লোকজন। কেউ মানে, ভালো-দি, ভাইদা। কেউ মানে বাবা।

নইলে, জয়শ্রীদির ওখানে তো কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ। অতসীকে কাঞ্চন ওদের গানের দল ধৈবত-এ নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান করেন ওঁরা। অবিনাশ মেয়েকে নিয়ে বিড়লা অ্যাকাডেমি বা শিশির মঞ্চে হলে বসে দেখেছে, অতসী আরও অনেকের সঙ্গে বসে গান গাইছে। কোরাস। একটা একাও গাইল। অর্ঘ্য সেন এসেছিলেন। ধৈবতের সম্পাদক শেখর গুপ্ত নিয়ে গেলেন অতসীকে। অতসী প্রণাম করে বলল, আপনার রেকর্ড থেকে শুনে শুনে অনেক গান তুলেছি। ভদ্রলোক মুখে একটা পান পুরতে পুরতে বললেন, তাই নাকি। বেশ করেছ। এটি কে? মেয়ে! বেশ। কী নাম।

বাপ মেয়ে মা ট্যাক্সিতে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ বৃষ্টি পড়ল। অতসী গাইতে লাগল আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে। সেদিন কি আনন্দ!

তারপরেই অবিনাশের ওই বলে ফেলা। এখন অতসী বলে, তুমি জানো, আমি ওদের থেকে, যতটা পারি দূরে দূরে থাকি। কিন্তু ওরা তো আমাকে ছাড়ে না। ছোটোকাকিকে বলেছে ফ্ল্যাটটা তো নিয়েইছে। এখন এমন গানটান শুনিয়ে বাবার কাছ থেকে আরও কিছু নেবার মতলবে আছে অতসী।

অবিনাশ বলে, শোনো, মানে একদিন ভাইদা ভালো-দিকে বাড়িতে ডেকে, একটু খাতিরযত্ন করে... মানে... যদি ওরা ভাবে যে... মানে... তুমি গান গাও বলে...

কী ভাববে। আমার দেমাক হয়েছে। ভাবুক। অন্যের ভাবনার ওপর তো আমার হাত নেই।

অবিনাশ বলে, শোনো, মানে আমার নিজের দাদা বউদি তো—সম্পর্ক না রেখে তো পারব না।

—তুমি রাখো। তোমার দাদা বউদি। যেমন ওদের বাড়ি মাঝে মাঝে হাজিরা দিতে যাও, তেমনই যাবে। আমি তো বারণ করিনি।

অবিনাশ অসহায়ভাবে বলে, আমি একা যাব?

—হ্যাঁ, যাবে। তা কী হয়েছে।

অবিনাশের মনে হয়, তাকে একা পেলেই তো, ভালো-দি ওইরকম নিরীহ মুখে বলবে, তারপর আর সব খবর কী? আর সব খবর মানে কী সেটা অবিনাশ জানে। প্রথমে, মেয়ের স্কুল-পড়াশোনা, অতসীর খোঁজখবর, গান ইত্যাদি। তারপর, ওই এক কথা—হ্যাঁ, আর সব খবর কী।—মানে কাঞ্চন আসছে?—ভাইদা বলবে, এই ছেলেটি সম্পর্কে আমি ক্রমশ এমন খবর পাচ্ছি। যাকগে-ভোঁদাইয়ের শোনা সেসব না বলাই ভালো।

ভালো-দি বলবে, না, ভোঁদাই-এর জানা উচিত। এরপর যদি এগুলো বাবার কানে

~ www.amarboi.com ~

গিয়ে পৌঁছোয়! অবিনাশের ইচ্ছে করবে না, তবু ভালো-দি বলবে, এর মধ্যে একদিন তোমার দাদার এক কলিগ দেখেছেন, থিয়েটার রোড সার্কুলার রোডের মোড়ে অতসী দাঁড়িয়ে আছে আর ঘড়ি দেখছে। উনি তটিনীর বিয়েতে তোমাকে অতসীকে দেখেছেন।

ভাইদা বলবে, মুখার্জির গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ও ট্যাক্সি খুঁজছিল। পাচ্ছিল না।

ভালো-দি বলেছে, হ্যাঁ ট্যাক্সি পেয়ে যখন উঠলেন, দেখলেন, পাঞ্জাবি-পাজামা পরা একটি ছেলে। বেশ লম্বা, ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়িয়ে বলছে সরি, দেরি হয়ে গেল।

ভাইদা বলবে, ইনফ্যাক্ট মুখার্জি বলছিল ছেলেটিকেও আগে কয়েকবার দেখেছে, রবীন্দ্রসদন কলামন্দির এসব জায়গায়, অন্য অন্য মহিলাদের সঙ্গে।

ভালো-দি বলবে, কবে বলল? কবে এটা?

রবিবার, লাস্ট সানডে।

সত্যি এক দিন এরকম সংলাপ হয়েছিল অবিনাশকে সামনে বসিয়ে রেখে। যদিও অবিনাশের মনে পড়েছিল, সে রবিবারে কলামন্দিরে দক্ষিণীর গান শুনতে গিয়েছিল অতসী, মেয়েকে তার কাছে রেখে। বলেছিল, কাঞ্চন টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু, সে কথা ভালো-দি ভাইদার কাছে বলবার শক্তি পায়নি অবিনাশ।

আজকাল ওদের সামনে একা যেতে সে ভয় পায়। জানে, অতসী থাকলে ওরা এসব কথা তুলবে না। তাই অবিনাশ অতসীর কাছে মিনতি করে, শোনো, তুমি চলো। না হলে বারবার আমি একা গেলে, খারাপ দেখায়। বাবার কাছে তো ওরা বলবে। হাজার হোক ওরা বড় তো।

অতসী বলে, শোনো, বাবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি আছে কি না তার প্রমাণ দিতে বারবার ওদের বাড়ি যেতে হবে কেন? মেজকাকি, ভালো-দি, ছোটকাকি, আমার সামনে বাবাকে নিয়ে কী আলোচনা করে জানো।

কী বলে!

বলে, একা মানুষ ওই বত্রিশশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট নিয়ে কী করবেন। মেজকাকি বলে, সারভেন্ট কোয়ার্টার নিয়ে উনচল্লিশশো। ভালো-দি বলে সার্ভেন্টদের তো সব বেহালা, সুভাষগ্রামে বাড়ি করে দিয়েছিলেন। সার্ভেন্টরাও তো থাকে। ভালো-দি বলে, অত টাকা নিয়ে উনি কী করবেন। এর মধ্যে একা মানুষ।

—তাই? বলে বুঝি এইসব।

—হ্যাঁ। আর ভাইদা এসে কী বলল জানো। বলল, ক্ল্যাসিকাল মিউজিক আর শেয়ার মার্কেট দুটোই একসঙ্গে কী করে বোঝে বলো তো লোকটা। শেয়ারে যা টাকা কামিয়েছে। এই-ই ভাষা। নিজের বাবা সম্পর্কে। আর ওই রকম বাবা।

অবিনাশের মনে আছে, ভাইদা ভালো-দি তার সামনেও বাবা সম্পর্কে ওইরকম সুরে আলোচনা করে।

অতসী বলে, ভালো-দি আমাকে বলল, অতসী তুই কিছু বলছিস না কেন। একদম সাইলেন্ট যে। আমি বলেছিলাম, দ্যাখো, একজন লোক তাঁর নিজের টাকাপয়সা নিয়ে কী

~ www.amarboi.com ~

করবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। তবে, সিরাজুলদা বাবার কাছে, তিরিশ বছর আছে। নরেশদা কুড়ি বছর—এদের জন্য উনি যদি কিছু করেই থাকেন, তাতে দোষের কী আছে। কটা লোক এটা করবে বলো! উনি তো নিজের যোগ্যতায় সব করেছেন। আমার ওই মানুষটাকে নিয়ে এসব আলোচনা করতে ইচ্ছে করে না।

অবিনাশ চোখ বড় বড় করে বলে, তুমি বলো? এই কথা? ওদের বললে?

হ্যাঁ বললাম। বলে, ওখান থেকে উঠে চলে এলাম। ওদের সবসময় ধারণা, অন্য কেউ এসে ওদের চেয়ে বেশি পেয়ে যাবে। নইলে সিরাজুলদা নরেশদাকে নিয়ে কেউ কথা বলে। কীভাবে মানুষটাকে আগলে রেখেছে ওই দুজন।

অবিনাশ বলে, ভাইদা আমাকে বলেছিল, একেবারে চ্যারিটি খুলে বসেছেন। এ কি অন্যায় কথা, গিয়ে কাঁদলেই হল। কার লোনের টাকা বাকি আছে। আমার নেই। আমি পারছি না, বললেই হল।

অতসী বলল, বুঝতে পারছ খোঁচাটা আমাদের দিকে? আমাদের ফ্ল্যাটের টাকাটা বাবা দিয়ে দিয়েছেন তো তাই।

অবিনাশ বলে, বুঝেছি। তবুও ভাইদা ভালো-দি তো আমাদের বড়।

অতসী বলে, তোমার আপনারজনদের আমার জানা আছে। ওই তোমার ছোটোকাকা ইনকাম ট্যাক্স লইয়ার, বাবাকে পথে বসানোর চেষ্টা করেননি? ষড়যন্ত্র করেননি। যাতে বাবা সর্বস্বান্ত হয়।

অবিনাশ বলে, হ্যাঁ। সব চলে যেত। বাবাকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ছোক্কাকু।

অতসী বলে, তবে তোমার বাবা তো, তাঁকে শেষ করা এত সোজা নয়। এত লোকে ওঁকে ভালোবাসে। শেষ মুহূর্তে সব বানচাল হয়ে যায়।

আর তোমার মেজকাকাই বা কম কিসে।

অবিনাশের মনে পড়ল সব। একটা বড় কোম্পানিতে ডাক্তার হিসেবে সপ্তাহে তিন দিন দু'ঘণ্টা করে বসতেন মেজকাকা। কর্মীদের দেখাশোনার জন্য। শিবানী বলে একটা মেয়ের সঙ্গে কী গোলমাল হতে চাকরি ছেড়ে দেন। তারপর বাবাকে এসে অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন, যাতে ওদের ম্যানেজমেন্টকে বলে, তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। বাবাকে তো ওদের এম. ডি. খুব মানেন। কিন্তু বাবা সেটা করতে পারেননি। বলেছিলেন, অন্যায়টা তোর দিক থেকে হয়েছে। একটা নয়, পরপর তিনটে স্টেজে। আমি এটা ভুলে যেতে পারি না। তুই আমার ভাই বলে তো আরোই পারি না। তারপর, বছরের পর বছর ধরে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি মেজকাকা। বাবার সম্পর্কে অসম্ভব খারাপ কথা বলে বেড়িয়েছে। শেষে, বাবা তার দশ বছর পরে, মেজকাকার বড় ছেলেকে বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। সে যাতে বাইরে যেতে পারে—এসব দেখে দেন। তারপর মেজকাকার কাছে বাবা আবার ভালো। ছোক্কাকুর ক্ষেত্রেও তাই। খুব বড় এক ক্লায়েন্ট ধরিয়ে দেন। ছোক্কাকুর মেয়ের বরকে বড় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

~ www.amarboi.com ~

অতসী বলে, তুমি বোঝো তো, লোকটার কাছে কেন সবাই যায়। যায় শুধু, কিছু পাওয়ার জন্য। ওই এত সম্পত্তি, অত যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের মহলে এত উঁচু জায়গা—তারও পর সমাজের প্রতিষ্ঠা। সব সবাই হাত পেতে আছে।

অবিনাশ বলে, ঠিকই। কিন্তু আমরা তো হাত পেতে নেই, অতসী।

নেই-ই। উনি যা দিয়েছেন আমাদের, নিজে থেকে দিয়েছেন। তোমার মাইনে থেকে ফ্ল্যাটের লোন কাটছিল। উনি এককালীন টাকাটা দিয়েছিলেন। আমরা তো বলিনি। আর হ্যাঁ, বালুরঘাট থেকে উনি তোমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলেছিলেন, ছেলেকে অত দূরে রাখতে চাই না।

অবিনাশ বলে, দ্যাখো, সেই ভাইদের সঙ্গে উনি কীরকম ব্যবহার করেন।

অতসী বলে, আমি দেখেছি ছোক্কাকু দু গেলাস মদ খাওয়ার পর চিৎকার করে বাবাকে বলেছে। আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমাদের বংশে একজনও সৎ উপায়ে বড় হয়নি। একজনও সৎ উপায়ে...হয়নি।

অবিনাশ বলে, আর তোমার মনে আছে বাবা খুব নিচু গলায়, বারে বারে বললেন, তুমি জোর গলায় বললেই তো আর সেটা সত্যি হয়ে যাবে না। কেউ মানবেও না।

অতসী হাসল, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। ছোক্কাকু মেনে নিয়ে বললেন, হাঁ-অ্যা-অ্যা তা অবিশ্যি বলতে পারো। কেউ মানবেন না। তা ঠিক। অতসী সময় সময়, চমৎকার নকল করে দেখাতে পারে।

সত্যিই, বাবার মুখের সামনে কেউই কিছু বলতে পারে না। যা বলার আড়ালে বলে। ছোক্কাকু লম্বা সিড়িঙ্গে মতন, গায়ে মাংস নেই। সুযোগ পেলেই নিজের বড়দার সমালোচনা করবে। অতসী বলে, জানো তো, ওঁরা কিন্তু সবাই আমাদের থেকে বড়—কিছু তো বলতে পারি না। কিন্তু, ওরা একলা হলেই একটা জিনিস নিয়েই কথা বলে।

এই রাত্রে শুয়ে শুয়ে একা ঘরে ভাবছিল অবিনাশ, সে জানে, অতসীও জানে সেই জিনিসটা কী। সেটা হল, বাবার সম্পত্তি। টাকাপয়সা। বাবা কাকে কী দিয়ে যাবেন। তাই নিয়ে এদের চিন্তা।

অবিনাশ আজ এত বছর ধরে বুঝতে পেরেছে, যেহেতু সে এই পরিবারে অন্যদের তুলনায় অনেক সাধারণ, স্কুল থেকেই, মা মারা যাবার পর থেকেই, সে কখনও মাঝারি ধরনের ভালোও হতে পারেনি—তার পরিবারের সাপেক্ষে—তাই বাবার একটা আলাদা দৃষ্টি আছে তার ওপর। সেইজন্যই ফ্ল্যাটের টাকার বাকিটা বাবা দিয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্য এতদিন কেউ খুব একটা গা করেনি, কিন্তু অতসীর গানটাই সবকিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে আজ। দু-বছর ধরে। অবিনাশ, অতসীকে বলে কতবার, বাবা কী জানেন না। বাবা সব জানেন। কিন্তু কেমন সুন্দর ব্যবহার করেন সবার সঙ্গে। তুমিও তাই করবে।

অতসী বলে, শোনো, তোমার বাবার সঙ্গে তো আমার তুলনা হয় না। তোমাদের কারও সঙ্গেই হয় না। ভালো-দির সঙ্গে তো নয়ই। ওঁর গানও সবাই ভালোই বলে। কত জায়গায় যোগাযোগ। আমি তো নিজের জন্যই গান গাই।

~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। অবিনাশ জানে অতসী কোনোদিনই কাউকে তেমন বলত না গান গাইবার জন্য।

রোজ যাতায়াতের পথে কানে সুর ঢোকে। জয়শ্রীদি ডাকলেন, পাড়ার বউ, এক দিন এসো। সেই গেলাম। সেখানেই কাঞ্চন বলল, চলুন আমার সঙ্গে। তারপর কাঞ্চন জোর করে এদিক-ওদিক নিয়ে গেল। বলল, এমন গলা নিয়ে. বাড়ি বসে থাকবেন কেন।

কাঞ্চন। কাঞ্চন। কাঞ্চন।

অন্ধকার ঘরে কথাটা অবিনাশের ভেতরে ঢুকে পড়ল আবার। কাঞ্চন এদিক-ওদিক নিয়ে গেল। ওদের নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছে? নানা জায়গা মানে?

কিন্তু অতসী নানা জায়গায় যাবার অত সময়ই বা পাবে কী করে। বেশিরভাগ দিনই মেয়েকে স্কুল থেকে আনা-নেওয়া করে। করতে হয় তাকে। এক-আধ দিন অবিনাশ যায়। যেমন এই দুদিন সর্দিজ্বর হয়ে বাড়িতে বসেছিল অবিনাশ। অফিস যায়নি। বাজারটাও অতসীই করল। করে প্রায়ই। অবিনাশ ঠকে যায় বলে। আর ধৈবতেও তো নিয়মিত যেতে পারে না। আজ মেয়ের পরীক্ষা। কাল রান্নার লোক আসেনি। তারপরের দিন আর একটা কি। কলামন্দিরে দক্ষিণীর পঞ্চাশ বছরের জন্য গেছে বোধহয় দুদিন। এক দিন রবীন্দ্রসদনে আর এক দিন কোথায় গত দু-বছরে এই তিন-চার দিনের বেশি তো মনে করতে পারছে না অবিনাশ।

অতসী বলছিল, দেখ তুমি যদি বাবার সামনে বলে না দিতে তাহলে তো এইভাবে ভালো-দি, মেজকাকা, ভাইদা আমাকে কথা শোনাত না। অতসী সব গুণ লুকিয়ে রাখে। স্পেশাল লোকের কাছে বার করে। আমরা কে, বলে মেজকাকি। অতসীর গান মানে স্পেশাল ব্যাপার।

অবিনাশ বলে, উড়িয়ে দিয়ো। এসব কানে নিয়ো না। আমাকে তো কত ঠাট্টা করে।

অতসী বলে, দ্যাখো সেদিন যে বাবা বললেন, বিলায়েতের একটা পুরনো রেকর্ড খুব তোমাদের শোনাতে ইচ্ছে করছে। দরবারি কানাড়া।

—হ্যাঁ, তারপর চালিয়ে দিলেন তো?

—রান্নার একটু দেরি ছিল। ছোক্কাকু ভেতরে গিয়ে কাকে ফোন করতে লাগলেন। তুমি ঢুলতে লাগলে।

কী জানি, ও ওরকম বাজনা শুনলে আমার ঘুম পেয়ে যায়।

মেজকাকু ভাইদার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলে চলল। বাবা বোধহয় বুঝতে পারলেন। একটা পিঠ হয়ে যেতেই রেকর্ডটা তুলে দিয়ে বললেন আজ থাক।

—মনে আছে।

—আমাকে শুধু বললেন। সরি অতসী, তোমাকে পরে একদিন এর সবটা শোনাব। এখন হল না। তুমি বোধহয় সিরিয়াসলি শুনছিলে। তারপর বাবা একটু উঠে যেতেই ভালো-দি মেজকাকিকে বলল, আমরা না হয়, অতসীর মতো ভুরুটুরু কুঁচকে গান শুনি না। কিন্তু আমরাও তো গানবাজনা সিরিয়াসলি নিই।

অবিনাশ আবার বলে, বাদ দাও, বাদ দাও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতসী বলে, বাদ তো দিয়েই আছি। মন দিয়ে গান শুনতে গেলে, আমার ভুরু কুঁচকে যায়। আমি কী করব, পরে খেতে বসে শুনছি মেজকাকিকে ভালো-দি বলছে, কী করব, আমরা তো আর শ্বশুরের সামনে নাক মুখ খিঁচিয়ে অত অভিনয় করতে পারি না। তুমি বলছ, এটাও বাদ দেব!

অবিনাশ চুপ করেই ছিল। অতসী কী বলবে। অতসী বলেছিল, তুমি তো জানো, সংসারের সব কাজ সেরে তবে আমি একটু গান নিয়ে বসি। ওই জয়শ্রীদির কাছে। আর কখনও কখনও কাঞ্চন এলে। ওইটুকুই আমার আনন্দ। তাতে রোজ বসা হত না বলে কাঞ্চন জয়শ্রীদি দুজনেই বলল, ভোরে উঠতে। তাই আজকাল চারটেয় উঠে গলা সাধি। জয়শ্রীদিও তাই করেন। আমাদের ধৈবতের স্বাতীদিও। এমনকী কাঞ্চনও।

আবার কাঞ্চন!

মনে পড়ছে, ভালো-দির কথা, না, মানে ঠিকই তো আছে। অতসী তো ভালো মেয়ে। কিন্তু কাঞ্চন ছেলেটা তো ভালো নাও হতে পারে।

বাবা ভালো-দি সম্পর্কে বলেছিলেন, মেয়েটা বেশ।

সফ্‌ট স্পোকেন।

সফ্‌ট স্পোকেন। ঠিক। ওইভাবে আস্তে আস্তে বিষ ঢালে মাথায়। এক ফোঁটা, এক ফোঁটা। পরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সেই বিষ।

এখন ছড়িয়ে পড়ছে। অবিনাশ ঘুমোতে পারছে না। গত দু-বছরের অনেক কথোপকথন, অনেক টুকরো মুহূর্ত মাথায় ঢুকে মগজটাকে ঘেঁটে দেয় যেন। গত দু-বছর ধরে এই প্রসঙ্গটা ওর মাথায় গেঁথে দিচ্ছে ভাইদা ভালো-দি।

কান মাথা গরম। কাঞ্চন ভালো ছেলে নয়? তিরিশের ওদিকে বয়স। চমৎকার চেহারা। কোনো একটা কলেজে পার্ট-টাইম পড়াচ্ছে। গান গান করে মেতে থাকে বলে এর চেয়ে ভালো কাজ পায়নি। পেয়ে যাবে আশা করা যায়। অতসী বলেছে।

ছেলেটা খারাপ। কেন? হাসিটা মনে পড়ছে। ছেলেটা এসে বাড়িটা ঝলমল করে হাসি আনন্দ গানে। অতসীও খুব খুশি থাকে। অবিনাশের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার তখন।

কেন করে।

নাঃ, উঠে ঘাড়ে মাথায় জল দিতে হবে। অবিনাশ আলোটা জ্বালাল। জ্বালিয়েই চমকে উঠল। তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল।

ও মা গো! অ-অ-তসী!

অতসী ওঘর থেকে ধড়মড় করে ঘুম চোখে উঠে আসে, কি হল। কি হল গো!

ও-ওই যে।

থরথর করে কাঁপছে অবিনাশ।

অতসী দ্যাখে। তারপর বলে, ও তো জানলার বাইরে। ভেতরে নয়। বাইরে।

খবর কাগজ পাকিয়ে জানলার এদিক থেকে ঠোক্কা দেয় অতসী। বলে, ওই তো চলে গেছে। ওটা তো বাইরে ছিল। ভিতুরাম। ঘুমোও।

~ www.amarboi.com ~

বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে আসে অবিনাশ। ওর মাথায় বালিশটা ঠিক করে দেয় অতসী। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর নিজের ঘরে যেতে যেতে বলে, না, এবার ডাক্তার দেখাতেই হবে। একটা পঁয়তাল্লিশ বছরের লোক। টিকটিকি দেখে এত ভয় পাবে কেন?

তিন

—কবে থেকে শুরু হয়েছে এটা?

—ছোটো থেকেই ছিল। দেয়ালে দেখলে ভয় লাগত। কিন্তু কিছুদিন হল বেড়েছে।

—মানে কত দিন?

অতসী বলল, এই বছর দুয়েক। সে আপনি না দেখলে বিশ্বাস করবেন না শংকরদা। ঘরে একটা ছোটো টিকটিকি ঢুকেছে, দেওয়ালে, থরথর করে কাঁপতে থাকবে। মুখ চোখ পালটে যায়। নিচে থেকে কেয়ারটেকার ভোলানাথ এসে সেটাকে না মেরে ফেলা পর্যন্ত ও বাড়িতে ঢুকবে না। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

—আগে তো কখনও বলোনি, এরকম হয় ওর।

—না শংকরদা, বলা হয়নি। আরশোলা-মাকড়সা দেখে ভয় অনেকেই পায়। তাই জন্য ডাক্তারের কাছে বলতে হবে এটা কি ভাবা যায়?

শংকরদা, এদের পনেরো বছরের চেনা ডাক্তার। বলা যায়, পারিবারিক বন্ধু। পঞ্চাশ বছর বয়সেও চশমা পরতে হয় না। খাড়া টানটান চেহারা। অবিনাশের চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের বড়।

কিন্তু অনেকটা যেন অভিভাবকের মতো। জিজ্ঞেস করলেন, দেখলে কী হয়?

অবিনাশ বলে, কী হয় বলতে পারব না। কিন্তু আমি চেঁচিয়ে উঠি। লাফিয়ে পালিয়ে যাই। কোনো বুদ্ধি কাজ করে না।

অতসী বলে, জানলার উলটোদিকে রয়েছে। জালের বাইরে। ঢুকতে পারবে না। তাতেই চেঁচিয়ে ওঠে।

অবিনাশ বলে, ওই সাদা পেট। চারটি পা। সরীসৃপ।

শংকরদা বললেন, তাতে কী হয়েছে। সব বাড়িতেই তো থাকে। কোনো ক্ষতি করে না।

অতসী বলে, কে বলবে বলুন। কত বুঝিয়েছি। শংকরদার চেম্বারে ওরা বসে আছে। শংকরদা এখনও রুগি দেখতে শুরু করেননি। অতসী অবিনাশকে একটু আগে আসতে বলেছিলেন। তিনি শল্যচিকিৎসক। কোনো নার্সিংহোম থেকে অপারেশন সেরে আজ এদের জন্যই একটু আগে চেম্বারে এসেছেন। শংকরদার চেয়ারের পাশের জানলার পরদাটা সরানো। উনি বাইরে তাকিয়ে আছেন। বাইরে বিকেলের রোদ। বলছেন, তাই তো, তোমাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো?

বাইরে রোদ্দুরে ভরা আকাশে খুব নিচু দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেল। এখান থেকে দমদম বিমানবন্দর দূরে নয়।

~ www.amarboi.com ~

অবিনাশ বলল, নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া এরোপ্লেন দেখেও আবার ঠিক সরীসৃপের কথা মনে হয়। যেন ডানাওয়ালা বিরাট টিকটিকি। ওইরকম চকচকে পেট। স্বপ্নেও দেখি ওরকম।

কী দ্যাখো?

মেঝেতে টিকটিকি হাঁটছে। দেওয়াল থেকে ঝরে পড়ছে। ঘুম ভেঙে যায়।

শংকরদা বললেন, ঘুমটুম হয়?

আবছামতো ঘুম একটু আসে। আধঘণ্টা পরে ভেঙে যায়। তারপর আর আসতে চায় না। সারারাত এপাশ-ওপাশ। এক এক দিন পাখি ডাকতে শুরু করে। মনে হয়, পাখিগুলো যেন চিৎকার করছে।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে কাগজে কী লিখতে লাগলেন। বললেন, প্রেশারটা একটু লো। তোমার তো নিচের দিকেই থাকে। বিকাশ চ্যাটার্জি আমাদের বন্ধু, তার ফোন নম্বর লিখে দিলাম। আমিও বলে দেব। ওর সঙ্গে ফোনে একটা অ্যাপায়েন্টমেন্ট করে নাও। আর এই ওষুধ লিখে দিচ্ছি। রাত্রে খাবার পর খেয়ে নেবে। সাতদিনের জন্য। এর মধ্যে বিকাশের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।

রাস্তায় বেরিয়ে অবিনাশ দেখল অতসী একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল। অতসী সঞ্চয়ী। সাধারণত ট্যাক্সি এড়িয়ে চলে। কিন্তু আজ ধরল। উঠে, একদিকের কোনায় ঝুঁকে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে বলল, তুমি আজ একটু কুলটুকে স্কুল থেকে নিয়ে যেতে পারবে?

পারব।

তাহলে তোমাকে ওই ব্রিজের মুখটায় ছেড়ে দিয়ে আমি সোজা চলে যাব। বাড়ি গিয়ে একটু গড়িয়ে নেব। শরীরটা বইছে না।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অতসী বলল, আজ কাঞ্চন ফোন করেছিল। ও চাকরি পেয়ে গেল।

তাই নাকি? কী চাকরি?

লেকচারার। জলপাইগুড়িতে।

অতদূরে!

হ্যাঁ, আটাশে চলে যাচ্ছে। পরশু।

অতসী জানলা দিয়ে তেমনই বাইরে তাকিয়ে আছে। শেষ বিকেলের আলো পড়েছে ওর মুখে।

বলল, একটা নতুন গান তুলছিলাম। আর হল না।

চূর্ণ চূর্ণ চুল উড়ছে। কনুই জানলায় রাখা। করতলে চিবুকের ভর।

অতসী বলল, এখন আর আগের মতো যখন তখন আসতে পারবে না। ট্যাক্সিটাকে একটা মিনিবাস ঘেঁষে গেল। অবিনাশ বলল, হাতটা সরিয়ে নাও জানলা থেকে।

অতসী বলল, এই নাও মেয়ের স্কুলের কার্ড। একটা অটো ধরে নাও সামনে থেকে।

~ www.amarboi.com ~

অবিনাশ ঘড়ি দেখল। মেয়ের স্কুলের পর ক্রেশে থাকে। এখনও আধঘণ্টা সময় আছে। ব্রিজের পাশের রাস্তাটা ধরে হেঁটে গেলে বড়জোর মিনিট কুড়ি লাগবে। হেঁটে যাওয়াই ভালো। মাথাটা ছাড়বে।

আজ ব্যাঙ্কে ভালো-দি এসেছিল। ভোঁদাই ডাক শুনে ক্যাশ কাউন্টার থেকে তাকিয়ে দেখে ভালো-দি বলছে, প্রদীপের ঘরে আছি। একবার ঘুরে যেও।

প্রদীপ মানে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রদীপ গুপ্ত। ভালো-দি মাঝে মাঝে এখন আসছে এখানে। কিছু একটা বিজনেস শুরু করতে চায়। লোনটোনের ব্যাপার। এই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নাকি ভালো-দির কলেজের সহপাঠী।

আজ আগে আগে বেরোবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল অবিনাশ। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে দেখে ভালো-দি কফি খাচ্ছে। বলল, শুনলাম কদিন আসনি, কী হয়েছিল?

—একটু সর্দি-জ্বর হয়েছিল, গা-ব্যথা।

—তাই নাকি? এখন কেমন আছ?

—ভালো।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললেন, ভাইরাল ফিভার। এখন খুব হচ্ছে।

ভালো-দি বলল, কুলটু অতসী, ওরা?

—ভালো। সবাই ভালো।

—আর অতসীর গান? গানটানের খবর কী? বলে, ভালো-দি হাসল। অবিনাশ দেখল, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মুখ নিচু করে কীসব কাগজপত্র সই করছেন। তাঁর মুখেও বাঁকা একটু হাসি। সেই মুহূর্তে কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল অবিনাশের। তার মানে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গেও এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হয়।

গানটানের খবর মানে কাঞ্চন আর অতসীর খবর। এখন মেয়ের স্কুলের গেটে পৌঁছোতে পৌঁছোতেও সেই কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করা অবস্থাটা ফিরে এল অবিনাশের। এই কথাটা সে অতসীকে বলেনি। কিন্তু, তার অফিসের মধ্যে পর্যন্ত এটা ছড়িয়ে দিচ্ছে কেন ভালো-দি। ওটা তো অবিনাশের রুটিরুজির জায়গা। আর ভালো-দি তো ওখানে প্রদীপ গুপ্তর সঙ্গে গল্প করতে কফি খেতে আসে। এটা কেন করছে ভালো-দি? বাবা, অতসীর গান ভালোবাসেন বলে? নাকি সত্যিই কাঞ্চন, কাঞ্চন ভালো ছেলে নয়? যাক, কাঞ্চন তো চলে যাচ্ছে। কিন্তু. চলে যে যাচ্ছে, সে খবরটা বলার সময় অতসীকে অমন দেখাচ্ছিল কেন! কেন বলল, নতুন একটা গান তুলছিলাম, হল না, তার মানে? অতসীর দিক থেকেও কি কিছু। ভালো-দি ভাইদাই কি ঠিক? কারা কারা জানে কথাটা? ওই যে, বাচ্চা নিয়ে মায়েরা বেরিয়ে আসছে স্কুলের গেট দিয়ে, ওরা জানে! ওই যে রাস্তার পাশে নীল মারুতির থেকে একটি যুবক লাফিয়ে নামল, ও জানে! ওই যে সামনে দিয়ে চলে যাওয়া বাস মিনিবাস ভর্তি মানুষ, ওরা জানে! কে বলবে কোনটা ঠিক? স্কুল কম্পাউন্ডের পাশের ওই জারুল গাছটা বলতে পারে। নাকি আকাশ ভরে ছড়িয়ে থাকা শেষ রোদ্দুরের রং।

~ www.amarboi.com ~

অবিনাশ মাথা তুলে তাকাল আকাশের দিকে। ভাঙা ভাঙা মেঘ জেগে আছে, নানা রঙের মেঘ। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কেউ কেউ বিষ মিশিয়ে চলেছে। বিষ। এই বিষের শেষ হবে কী করে!

সেই সাড়ে ছ-কোটি বছর আগের উল্কাপাতের পর, আবহাওয়ামণ্ডল যখন নষ্ট হয়ে গেল, তেজস্ক্রিয়ায় ভরে গেল, তখন শত শত বছর ধরে বৃষ্টি হয়েছিল, সেই তেজস্ক্রিয়া মুছে দিতে। মানুষের ভেতরকার এই বিষ কোন্ বৃষ্টি এসে মোছাবে! হঠাৎ অবিনাশের মনে হল, ওই যে আকাশ ওই নীল ওর ভেতর থেকেই তো হঠাৎ দেখা দিয়েছিল। সেই অতিকায় উল্কা? সাড়ে ছ-কোটি বছর আগে?

আপনি তপস্বিনীকে নিতে এসেছেন তো? কার্ডটা দিন। চমক ভাঙে অবিনাশের। সামনে কুলটুদের ক্রেশের মহিলা।

অবিনাশ বলল, এই যে।

চার

সেই কোন্ বিকেলে, একটু গড়িয়ে নেবে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিল অতসী। কিন্তু, মেয়েকে নিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়ি ঢুকে দেখেছিল অবিনাশ, আগের দিন সে যেমন আলোটা জ্বালিয়ে বসেছিল বাইরের ঘরে, অতসীও তেমনি বসে আছে। জিজ্ঞেস করেছিল, শোওনি। অতসী বলেছিল, না। এখন রাত এগারোটা। এখনও সে খাবার টেবিলে বসে আছে। এর আগে মেয়েকে হোমটাস্ক করিয়েছে। মাঝে দু-একটা ফোন ধরেছে। মেয়ে ঘুমিয়ে গেছে। সাধারণত অতসীও মেয়ের সঙ্গেই শুয়ে পড়ে, ভোরে গলা সাধবে বলে। কিন্তু আজ জেগে বসে আছে।

অবিনাশ নিজের ঘরে ঢুকে যাবার আগে বলল, কী হল, শোবে না?

অতসী বলল, আজ ভালো-দির সঙ্গে তোমার ব্যাঙ্কে দেখা হয়েছিল বলোনি তো।

অবিনাশ একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, বলা হয়নি আর কি। তুমি কী করে জানলে?

ভালো-দি ফোন করেছিল। বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমাকে কী বলেছে?

অবিনাশ থতমত খেয়ে বলল, না। সেরকম কিছু তো বলেনি।

অবিনাশের বলার মধ্যে দ্বিধা ছিল। অতসী তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে বলল, লুকোচ্ছ কেন? কাল বাবার জন্মদিনে মেজকাকার বাড়িতে কাঞ্চনকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা কিছু বলেনি?

অবিনাশ অবাক, কই না তো!

অতসী জানে, অবিনাশ মিথ্যে বলে না। কারণ মিথ্যে ও কোনোদিন সামলাতে পারে না। অতসী বলে, বিকেলে, বাড়ি ঢুকতেই মেজকাকির ফোন। অতসী, তোমাকে যে ছেলেটি গান শেখায়। ওই কাঞ্চন, তাকে একটু আমাদের বাড়ি নিয়ে আসবে কাল সন্ধেবেলা?

অবিনাশ কিছু বুঝতে পারে না। বলে, কাঞ্চন? কাঞ্চন সেখানে যাবে কেন?

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শোনো। মেজকাকি বলল, কাঞ্চন বলে ছেলেটিকে নিয়ে এসো। বাবা তো তোমার গান ভালোবাসেন, তোমাকে যে শেখায় তার গান শুনলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

—কাঞ্চন কি তোমাকে শেখায়?

না, ঠিক শেখায় না। কিন্তু, অনেক গান তো আমাকে তুলে দিয়েছে। আমিও অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায় ওকে তুলে দিই। এখন, যার কাছে একটা গানের একটা স্বরও শিখেছি সেই তো শিক্ষক। আমি 'না' বলি কী করে!

তুমি কী বললে?

মেজকাকিকে বললাম, কাঞ্চন সদ্য একটা চাকরি পেয়েছে। রবিবার চলে যাচ্ছে। তা ছাড়া, আমি ছাড়া আপনাদের কারও সঙ্গে তো ওর পরিচয়ই নেই। বাবারও না। তাই এখানে কাঞ্চনকে কী করে বলব।

তারপর।

তারপর মেজকাকি রেখে দিল। একটু পরেই ভালো-দির ফোন। ঠিক আছে, তোর বলতে অসুবিধে থাকে, ওর ফোন নম্বরটা আমাদের দে। আমরা ডাকি। তারপর বলল, আমাদের না চিনতে পারে। কিন্তু বাবাকে চিনবে না তা তো হতে পারে না। ওইরকম লোকের জন্মদিনে ফ্যামিলি গেস্টদের সঙ্গে ইনভিটেশন পাওয়া...সেখানে গান গাওয়া...

আমি দিইনি।

অবিনাশ বলল, তুমি কি কাঞ্চনের কথা ওদের কাছে গল্প করেছিলে?

অতসী বলে, তুমি তো দ্যাখো, ওদের সঙ্গে দেখা হলে, কটা কথাই বা বলি আমি! কিন্তু মেজকাকি আর ভালো-দি সব খবর পায়। কে কার বাড়ি যাচ্ছে, কে কার সঙ্গে মিশছে, কার সঙ্গে কার কী নিয়ে ঝগড়া—এই-ই তো ওদের কথা বলার বিষয়। আমাকে অনেকদিন ধরেই কাঞ্চন বিষয়ে প্রশ্ন করে। এই গানটা কোথায় শিখলে, ও গানটা কার থেকে তুলেছ, করতে করতে কাঞ্চনের কথাটা জেনে নিয়েছিল কবে। তারপর দেখা হলেই কাঞ্চনের প্রসঙ্গ। ও কখন কখন আসে। তখন তুমি বাড়ি থাকো কি না। ওর সঙ্গে গান শুনতে গেলে ও বাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল না আমি একলাই এলাম, এইসব প্রশ্ন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দ্যাখো, ওরা কার সঙ্গে মিশছে না মিশছে আমি কিন্তু কোনো দিন জানতে চাইনি। প্রথম প্রথম উত্তর দিতাম। এখন অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি। একদিন বলেছি ভালো-দিকে, কাঞ্চনের খবরে তোমার দরকার কী। অতসী চুপ করে যায়। তার মুখের রেখা কঠিন। তার চোখের তলা, ত্বকের রং সম্পূর্ণ অন্ধকার। সে বলে, তারপর একটু আগে মেজকাকা ফোন করেছিলেন। বললেন অতসী, কে একটি ছেলে তোমাকে গান শেখায়, কাল যদি তাকে আমাদের বাড়ি একটু নিয়ে আস...তুমি যদি নম্বরটা দাও। তাহলে দাদার নাম করে আমি রিকোয়েস্ট করতে পারি...

অবিনাশ শিউরে ওঠে, বলে, তুমি কী বললে?

আমি নম্বর দিয়ে দিয়েছি। বলে, অতসী দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে।

আমার বই
...পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবিনাশ বলে, তুমি তার আগে নিজে একবার ফোন করে নিলে না কেন কাঞ্চনকে? ব্যাপারটা বলে রাখতে।

অতসী হাতে মুখ-ঢাকা অবস্থাতেই বলে, দু'বার করেছিলাম। বাড়ি ফেরেনি। পরশু চলে যাচ্ছে। অনেক কেনাকাটা।

অবিনাশ অতসীর কাঁধ ভয়ে ভয়ে ছুঁয়ে বলে, কিন্তু তুমি, তুমি অত ভেঙে পড়ছ কেন! নিয়ে গেলেই বা কী হবে? মুখ তুলে তাকায় অতসী। তার মুখে কান্না ভেঙেচুরে আটকে আছে। ফেটে বেরোয়নি এখনও। ভাঙা গলায় অতসী বলে, ওরা যে নোংরা নোংরা ইঙ্গিত করে। নোংরা ঠেস দিয়ে কথা বলে। ওকে নিয়ে তোমাকে কখনও বলিনি। মেজকাকির বন্ধুরাও জানে। ভালো-দির কলিগরাও। ভাইদাদের বাড়িতে খেতে গেলে তাদের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের তাকানো, হাসি, প্রশ্ন থেকে তখন বুঝি, সবাই জানে।

অবিনাশ বলে, আমাদের ম্যানেজারও দেখলাম জানে।

সে কী। কী করে!

ভালো-দির বন্ধু তো প্রদীপ গুপ্ত। ভালো-দি এটা আলোচনা করেছে। আমি আজ বুঝেছি। স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে অতসী। বলে, তোমার অফিস পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে গেছে ভালো-দি। সম্মোহিতের মতো বলে, বাবা আমার গান ভালোবাসেন, সেটা আমার দোষ হতে পারে—কিন্তু তুমি কী করেছ। তুমি তো কিছু করোনি।

—বুঝতেই পারছ কাল কী হবে—কী হবে?

—কাল বাবার সামনে ব্যাপারটা পৌঁছে দেওয়া হবে। সাক্ষ্য-সহ।

ফোন বাজে।

অতসী চমকে ওঠে। ভয় পাওয়া চোখে বলে, ধরো। আমাকে কেউ চাইলে বলবে আমি শুয়ে পড়েছি। অবিনাশ ফোন তুলে হ্যালো বলতেই শুনল, কে অবিনাশদা, আমি কাঞ্চন। অতসীদি কি শুয়ে পড়েছেন।

অবিনাশ বলে ফেলল, হ্যাঁ।

ঠিক আছে আপনাকে পেলেও হবে। আপনার মেজকাকা আমাকে ফোন করেছিলেন। বললেন, আপনার বাবার জন্মদিনে কাল সন্ধেবেলা যাবার জন্য। ওঁদের বাড়িতে। তারপর আপনার কাকিমা ফোনটা ধরে বললেন, আপনাদের কাছে আমার গানের কথা অনেক শুনেছেন। আপনারা যে কী করেন না।

কেন, তুমি তো খুব ভালো।

ভালো গাও পর্যন্ত আর বলতে পারে না অবিনাশ।

ভালো পর্যন্ত বলেই চুপ করে গেল। উলটোদিকে তাই শুনে কাঞ্চন তো হেসেই আকুল। আমি ভালো? আপনার বাবার মতো দেশবিখ্যাত ব্যক্তির জন্মদিনে যেতে পারলে ভালোই হত। তাছাড়া উনি তো সঙ্গীত-রসিক। কিন্তু আমি তো পরশু ভোরের ট্রেনে চলে যাচ্ছি। শুনেছেন তো চাকরি পেয়েছি।

হ্যাঁ। খুব ভালো।

~ www.amarboi.com ~

অবিনাশ ভালো-র বেশি এগোতে পারছে না।

তাই কাল যেতে পারছি না। অবশ্য অতসীদি বলেছিল, একদিন নিয়ে যাবে। তবে, জন্মদিনেটিনে নয়। এমনি। একা একা। সেদিক দিয়ে ভালোই হল। আমারও...আচ্ছা, আপনি একটু অতসীদিকে বুঝিয়ে বলবেন।

অবিনাশের হঠাৎ বুদ্ধি কাজ করে।

এই নাও, অতসী এসে গেছে। বলে রিসিভারটা অতসীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কাঞ্চন।

তারপর অবিনাশ শুনতে পায়, হ্যাঁ ঠিক আছে। বুঝতে পারছি। না না, কেউ কিছু মনে করবে না। বুঝিয়ে বলব সবাইকে। আমিই বলেছিলাম হ্যাঁ। গলাটা...

গলাটা ধরা লাগছে? ঘুমোচ্ছিলাম। তাই।

আচ্ছা। ঠিক আছে।

অবিনাশ দেখল, কথা বলার পুরো সময়টা চোখের জলে গাল ভেসে গেল অতসীর।

পাঁচ

সেই কান্নাধরা অতসীর চোখে পরের দিন সন্ধে পর্যন্ত রইল। মুখে কোনো শব্দ নেই। এমনকি ফোঁপানিও নয়, কেবল গাল বেয়ে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওর মধ্যে সংসারের যে যে কাজগুলো করবার করে গেছে সারাদিন। আজ মেয়ের স্কুল ছুটি। মেয়ের কাপড়জামা অতসী নিজে কাচে। আজও তা বাদ দেয়নি। ঘর ঝাড়ে এই দিনটায়। আজও ফুলঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করেছে।

কেবল মাঝে মাঝে গালে জলের ধারা। আর প্রয়োজনের জন্য যা দু-একটা বলেছে, তখন গলাটা ভারী লেগেছে। এর বেশি কিছু না, অবিনাশ দু-একবার শুনছ, শোনো করে চুপ করে গেছে। কুলটু একবার কী হয়েছে মা, কী হয়েছে বলেছিল। অতসী অস্বাভাবিক ধরা গলায় বলেছে, বড় হও। বলব। এখন পড়ে গিয়ে।

সন্ধেবেলা স্নান করে বেরবার পর অনেকটা স্বাভাবিক লাগল যেন। অবিনাশকে আলমারি থেকে ধুতি পাঞ্জাবি বার করে দিল। মেয়েকে ফ্রক। অতসী নিজে কোনোদিনই তেমন সাজে না। আজ জরিপাড় একটা টাঙাইল পরল। আকাশ নীল রঙের। টিপটাও আকাশ নীল। চুলটা ছেড়ে রাখল।

সাড়ে আটটা নাগাদ ওরা পৌঁছোল মেজকাকার ফ্ল্যাটে। বাবারও আসতে একটু দেরি হচ্ছিল। বাবা পৌঁছোতে সবাই গিয়ে এক এক করে প্রণাম করল। বাবা, জন্মদিন করতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু উপহার আনা পছন্দ করেন না। বাবা সবার খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

বাবা যে রাজ্যসভার সদস্য হতে চাননি, তাই নিয়ে আজও কাগজে খবর আছে। সেসব নিয়ে টুকরো কথা চলছে। বাবা এ সবের মধ্যে যোগ দিতে চান না। তিনি অতসীকে বললেন, কী, তোমাকে এমন কাহিল দেখাচ্ছে কেন? অতসী হাসল। বাবা বললেন, তোমার গানের মাস্টারমশাই আজ আসবেন ওরা বলছিল। কোথায় তিনি!

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

অতসী, সোজা চোখ তুলে বাবার চোখে চোখ রেখে বলল, কাঞ্চন। কাঞ্চন তো আমার গানের মাস্টারমশাই নয়। ও তো আমার বন্ধু।

বাবা বললেন, ও, তাই, তোমার বন্ধু?

অতসী বলল, হ্যাঁ। গানের বন্ধু। ও আমাকে রবীন্দ্রনাথের গান তুলে দেয়। আমি ওকে অতুলপ্রসাদি, ডি. এল. রায় তুলে দিই।

বলে অতসী একটু থামল।

বাবা, হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলেন, বাঃ। কি সুন্দর বললে। গানের বন্ধু। তুমি ওকে গান তুলে দাও, সে তোমাকে গান তুলে দেয়। কি সুন্দর!

বাবাকে যারা চেনে, তারাই জানে, ভালো গানের মতো, ভালো কথা শুনলেও বাবা শিশুর মতো খুশি হয়ে ওঠেন। আর খুশি হলে বাবা, কি সুন্দর কথাটা বারেবারে বলেন। বললেন, আমি যে তোমার গান শুনি, আমিও কিন্তু তোমার গানের বন্ধু। তাই না?

কুলটু বলে উঠল, আমিও মায়ের গান শুনি। আমিও মায়ের গানের বন্ধু। বাবা হেসে উঠলেন জোরে। সে হাসিতে আর কেউ তেমন যোগ দিল না।

অতসী বলল, ও একটা চাকরি পেয়েছে কলেজে। কাল ভোরে চলে যাচ্ছে। তাই আসতে পারেনি।

বাবা, কুলটুর জন্য জুরাসিক পার্কের ক্যাসেট এনেছেন। মেজকাকাকে ডেকে বললেন, টুলটুল, এটা চালিয়ে দে তো। মেজকাকা, তাঁর ভিসিআরে ক্যাসেটটা লাগালেন ভিতরে গিয়ে। পিছন পিছন অবিনাশও গেল। বাবা, কুলটুর জন্যই, ওদের একটা ভিসিআর দিতে চেয়েছিলেন। অতসী আপত্তি করে। বলে, মেয়ে আরেকটু বড় হোক বাবা। পড়াশুনা মাথায় উঠবে। মেজকাকা, ক্যাসেটটাকে রিওয়াইন্ড করে ফিরিয়ে আনছেন। ফলে, মাঝে মাঝেই, বিরাট সরীসৃপদের ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছে। অবিনাশ তাড়াতাড়ি বড় বসার ঘরটায় চলে এল। সেল ফোন বাজছে। বাবার হাতে। বাবা সরি বলে উঠে যাচ্ছেন। সামনের বারান্দায় গিয়ে কথা বলছেন ফোনে। আর অবিনাশ শুনছে তার দিকে পিঠ করে বসে থাকা মেজকাকি বলছে, আমাদের তো আর গানের বন্ধুটন্ধু হল না। সাহানা তুই তো গান করিস, তোর হয়েছে নাকি।

ভালো-দি বলছে, নাঃ, কোথায় আর হল! সবার কি সব হয়। অতসী ফরচুনেট।

ভালো-দি অবিনাশকে দেখতে পায়, বলে এই তো ভোঁদাই, তাই বলছিলাম। তোমার বউ কি লাকি। তুমিও লাকি।

বলতেই, মেজকাকি আর ভালো-দি দুজনে হেসে উঠল। ভালো-দি এমনিতে খুব, ওই যাকে বলে সফ্‌ট স্পোকেন। কিন্তু, এইরকম হাসির সময় যেন উৎকট একটা গর্জন বেরিয়ে আসে।

অতসীকে মাঝখানে বসিয়ে ওরা এই আলোচনা করছে। অতসী চুপ করে দূরে, সামনের দেওয়ালে তাকিয়ে রয়েছে।

ভালো-দি বলল, ভোঁদাই, তুমিও এবার একটু আধটু গান শিখতে থাকো।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবা ফোনে কথা সেরে বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে আসছেন। দেখেই ভালো-দি চুপ করে গেল।

অবিনাশের মনে হল, ভালো-দির ফরসা ছিপছিপে গড়ন, স্টেপকাট চুলের মাথা, টিকালো নাক, সব পালটে গেছে। ভালো-দি একটা ফরসা লম্বা টিকটিকি হয়ে দেয়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ছোক্কাকুর দুটো পেগ দরকার হয় মাতাল হবার জন্য। তখন দুটো হয়ে গেছে। ছোক্কাকু সেদিন নিজের বাবার মৃত্যু নিয়ে বড্ড চিন্তিত। অবিনাশ অনিমেষের ঠাকুরদার মৃত্যু হয়েছিল পথ-দুর্ঘটনায়, পরিণত বয়সে। মর্নিংওয়াক থেকে ফেরার সময় একটা ট্রাক ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ছোক্কাকু সেদিন বারবার সেই মৃত্যুটির প্রসঙ্গ আনছেন।

বলছেন, বাবার ব্যাপারটা কোথায় হয়েছিল বড়দা? সাদার্ন অ্যাভেনু ল্যান্সডাউনের ক্রসিংটার ওদিকে না এদিকে?

বাবা বললেন, তোর বাড়ির দিক দিয়ে দেখতে গেলে, ওদিকে।

ছোক্কাকু বলছেন, তাই বলো। ঠিক ধরেছি। সেদিন মর্নিংওয়াক থেকে ফেরার সময় দেখি, ওই, ওই ক্রসিংটার ওদিকেই—একটা গজাল পোঁতা রাস্তায়। বললে অবশ্য কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু গজাল এবং পোঁতা। এবং রাস্তায়। কে পুঁতল? আমার পায়ে ঠোক্কর লাগল। আমি বুঝলাম। এখানেই তা হলে।

ছোক্কাকুর কথা শুনতে শুনতে ভাইদা বলল, এখানে মানে ওখানে। কী ওখানে?

বাবার, মানে তোমাদের ঠাকুরদার অ্যাক্সিডেন্ট। বুঝেছ। বড়দা তুমি কি মর্নিংওয়াক করো, সাবধান। কত বয়স তোমার? বাহাত্তর, বাবা বললেন, গত ৮ তারিখ থেকে তিয়াত্তর চলছে। হ্যাঁ সাবধান। জন্মদিন আর মৃত্যুদিন। কে বলতে পারে।

অবিনাশ দেখল, এই লোকটা নিজের দাদার জন্মদিনের উৎসবে এসে তার মৃত্যুর কামনা করছে। ঈর্ষা। একে বলে ঈর্ষা। হারিয়ে দেবার সব খেলায় হেরে গিয়ে অনুগ্রহ দু-হাত পেতে নিয়ে এখন মৃত্যু চাইছে।

অবিনাশ দেখল, ছোক্কাকু কালো লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারার একটা টিকটিকি হয়ে দেওয়ালে উঠে যাচ্ছে।

মেজকাকি পকৌড়া আর মাছভাজার মস্ত প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকছে। পেটমোটা আর বেঁটে একটা টিকটিকি। সবগুলো এসে একটা আলোর কাছে ভিড় করেছে।

হঠাৎ ভাইদা বলল, তা গানের বন্ধু আসেনি বলে কি আজ গানটান হবে না। আমরা তো আছি।

বাবা উৎসাহে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই হবে। ধরো সাহানা ধরো। হারমোনিয়ামটা কই? ভালো-দি খুব আবদার করে বলল, না, না, কেন আমি রোজ প্রথমে গাইব। আজ অতসী গাইবে আগে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাবা বললেন, তাই না কি? তুমিই রোজ প্রথমে গাও বুঝি। খেয়াল করিনি তো? ঠিক

~ www.amarboi.com ~

আছে, আজ অতসীই আগে গাইবে। অতসী আবার বাবার দিকে সোজা চোখ তুলে বলল, বাবা আজ আমি গান গাইতে পারব না।

বাবা বললেন, গাইবে না? কেন? তোমাকে অবশ্য আজ একটা কেমন দেখাচ্ছে, গলাটাও ধরা লাগছে। শরীরটা ভালো নেই বুঝি?

বলতে বলতেই আবার বাবার হাতে সেলফোন বেজে উঠল। এক্সকিউজ মি বলে বাবা আবার বারান্দায় উঠে গেলেন।

ঘরের মধ্যে একটা ঝড় দুলছে। ভালো-দি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি গান গাইতে পারবে না? কেন? শরীর খারাপ?

অতসী তেমনি শান্তভাবে বলে, না শরীর ঠিক আছে। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে না।

ভালো-দির মুখ থেকে একটা পরত খসে গেল। কী!

ইচ্ছে করছে না বলে তুমি গাইবে না?

মেজকাকু একটা হাত তোলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও সাহানা। গাইবে না কেন। নিশ্চয়ই গাইবে। বেশি নয়, একটা গাইবে, কেমন? অতসী?

ভাইদা পুরো জিনিসটায় আমল দেবার মতো কিছু নেই, এইভাবে বলল, গাও গাও। শুরু করো। ওই যে তোমার স্পেশাল যেটা নীল আকাশে অসীম ছেয়ে।

ভাইদার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল অতসী, আপনাকে বললাম না, আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে না। তাও শুরু করতে বলছেন কেন?

অতসীর গলার স্বর একটুও ওঠেনি একটুও নামেনি। মুখে এতটুকু উত্তেজনা নেই। এই দুদিন মুখে যে কাঠিন্য ছিল, তা কোথায় চলে গেছে। ভালো-দি যেন ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। বলে, তুমি ওর মুখের ওপর কথা বললে। ও বলছে, মেজকাকু বলছেন, তাও তুমি গাইবে না।

অতসী মুখ নরম গলায় বলল, না গাইব না।

মেজকাকি বললেন, বড় আর্টিস্ট। আমাদের সামনে গাইবে কেন। ও সব ধৈবত টৈবত কোথায়? সেইখানে ফাংশানে গাইবে।

অবিনাশ দেখল ঘর ভরতি টিকটিকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা প্রজাপতিকে ধরে টানাটানি করছে। ডানা ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে দু-তিনটে সরীসৃপ। এই সরীসৃপদের মধ্যে থেকে তার পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। বাকি জীবন।

অবিনাশ ঘামতে ঘামতে বলল, গাও না অতসী। একটা গান।

অতসী, শান্তমুখে অবিনাশের দিকে চেয়ে বলল, এই প্রথম তুমি আমার গান শুনতে চাইলে। কিন্তু কী করব বলো। আমি গাইতে পারব না। এতক্ষণ পরে ঘরের কোণ থেকে ছোক্কাকু চেঁচালেন। তুমি আমার সঙ্গে গাও অতসী। আমি গাইছি। গাও। বলে সম্পূর্ণ সুরহীন গলায় ছোক্কাকু সুর শুরু করলেন, মু-কু-তি-রো, ম-ন-দি-রো, সোওপানো তলে...

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবা ফিরে এলেন, হ্যাঁ, কী যেন কথা হচ্ছিল। গান? না? অতসী না সাহানা, কে আগে করবে? তাই না, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করে বাবা একটা মজার হাসি হাসলেন।

অতসী, বাবার দিকে তাকিয়ে, সুন্দর হেসে বলল, আমি গান গাইতে পারব না বাবা।

বাবা বললেন, হ্যাঁ। তুমি তাই বললে তো। কেন বলো তো?

অতসী বলল, আমার গানের মন নেই আজ।

বাবা বলে উঠলেন, বাঃ। কি সুন্দর বলে মেয়েটা। গানের মন নেই। গান গাইতে গেলে যে একটা মন লাগে তা কি আমরা কেউ ভাবি। আমরা কেবল গান শুনতে চাই। বাঃ কি সুন্দর!

অবস্থা পালটে যাচ্ছে দেখে, মেজকাকি বললেন, কিন্তু দাদা, আমরা সবাই শুনতে চাইছি।

ভালো-দি বলল, আজ আপনার জন্মদিন, সেইজন্যই।

মেজকাকা বললেন, সবাই যখন বলছে ওর একটা গান করা উচিত।

বাবা বললেন, আমার জন্মদিন বলে নয়। ওটা এলেবেলে ব্যাপার। আসলে সবারই তোমার গান শুনতে ইচ্ছে করছে, সকলেই চাইছে—এখন তুমি একটা যদি না করো...

অবিনাশ ঘেমে ঝোল।

ভাইদা দাঁতে নখ কাটছে।

ছোক্কাকু বলছেন, যত প্রাণ হল বলিদান লেখা আছে অশ্রুজলে।

অতসী মুখ তুলে বলল, খানিকটা হাল্কা হাসি মিশিয়ে, সকলেরই ইচ্ছে করছে আমার গান শুনতে। কিন্তু, আমার কী ইচ্ছে করে সেটা আর তাহলে ভাবছে না কেউ। আচ্ছা, বাবা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনি কি আমাকে এমন কোনো কাজ করতে বলবেন, যাতে আমার মনে কষ্ট হয়? গ্লানি হয়?

বাবা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

অ্যাই, আজকে অতসীকে কেউ গান গাইতে জোর কোরো না।

তাহলে সাহানা, তুমি শুরু করো।

ভালো-দি মুখ গোঁজ করে বলল, আমার গাইতে ইচ্ছে করছে না।

বাবা তাঁর সেই মজার হাসিটা হাসতে শুরু করলেন, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ ওর ইচ্ছে করছে না বলে, তোমারও ইচ্ছে করছে না। তুমি কিন্তু প্রথমে বলোনি তোমার অনিচ্ছার কথা। তাই না? হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ...

মেজকাকি বললেন, তুই কেন করবি না। কর না।

ভালো-দি গাইবার চেষ্টা করল একটা দুটো শ্যামল মিত্রের গান। সুর কেটে গিয়েছিল সে দিন। আর জমল না।

বাড়ি ফিরে কুলটুকে শুইয়ে দিচ্ছিল অতসী। কুলটু ট্যাক্সিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছে। মেয়েটার এগারো চলছে। কিন্তু স্বভাবে একেবারে শিশু। এখনও একটু ঘুম পাড়াতে হয় অতসীকে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবিনাশ বলল, তুমি আজ গান গাইলে না কেন? এটা কি মানে, ঠিক হল?

অতসী মেয়ের মাথায় বালিশ গুঁজে দিতে দিতে বলল, কার পক্ষে?

না, মানে।

আমার পক্ষে ঠিক হয়েছে। ও ঘরে যাও, মেয়ে উঠে পড়বে।

অবিনাশ ও ঘরে, মানে, ডাইনিং স্পেসটায় দাঁড়িয়ে ভাবতে শুরু করল। আজ কী কী হল। বাবা ছাড়া সবাই গুম হয়ে গিয়েছিল। বাবা সিরাজুলদাকে বললেন, একটা ট্যাক্সি ধরে আনতে। চলে আসার সময় কেউ, প্রায় কেউই কোনো কথা বলল না। বাবা বললেন, অতসী, ভালো থেকো। কুলটুর চুল নেড়ে দিলেন।

অতসী ঢুকল। জলের বোতল টেবিল থেকে নিয়ে জল খেল। তারপর বলল, বললে না, আজ গাইলাম না কেন? আজ নয়। কোনোদিনই গাইব না আর।

অবিনাশ স্তম্ভিত, তার মানে? এরপর ওরা আবার যখন গাইতে বলবে তোমায়, তখনও তুমি 'না' বলবে?

—হ্যাঁ। 'না'-ই বলব। সবসময়।

—কিন্তু ওদের কথা না শুনলে, ওদের সামনে না গাইলে ওরা তো অসন্তুষ্ট হবে।

—এত দিন ওদের সামনেই তো গেয়েছি। তাতে ওরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছে! এত দূর যে তোমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পর্যন্ত পৌঁছোতে হয়েছে...এত দূর যে...

অতসী থেমে যায়। থেমে গিয়ে একটু দম নেয়। তারপর বলে, ওদের সামনে গাইব না তো নয়, কোথাওই গাইব না। তোমার কাছে কেবল ওদের সামনে গাইছি কি না সেটাই জরুরি তো। তবে?

না।

সে কি! ঐ ধৈবতে!

না। ধৈবতে যাব না। জয়শ্রীদির কাছেও না। আর বাড়িতেও গাইব না।

কেন?

অতসী হাসে। বলে, আমার ইচ্ছে। গান তো আমার নিজের জিনিস। সংসারের কোনো কাজে অবহেলা করে তো আমি গান নিয়ে বসিনি। আমার নিজের জিনিস সম্পর্কে আমার নিজের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে কারও কোনো ক্ষতি হবে না।

অবিনাশ বুঝতে পারে না, কী বলবে।

অতসী জলের বোতল থেকে জল খায়। একটা ছোটো তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছে নেয়। সে এখনও বাইরের পোশাক ছাড়েনি। অবিনাশ বলে, তুমি চেঞ্জ করবে না, শোবে না?

অতসী সে কথার জবাব দেয় না। বলে, শোনো আর একটা কথাও বলে রাখি। তোমার মেজকাকু, মেজকাকিমা, তোমার দাদা বউদি, এদের কারও বাড়ি আর কখনও যাব না।

অবিনাশ আকাশ থেকে পড়ল। যাবে না? কিন্তু ওরা তো মাঝে মাঝেই ডাকবে? তখন কী করবে?

~ www.amarboi.com ~

—আমি যাব না। তুমি যাবে, যদি ইচ্ছে করে। একমাত্র বাবা যদি নিজের ফ্ল্যাটে ডাকেন, তবে যাব।

অবিনাশ, ঘেমে যাওয়ার বেশি কিছু পারে না। সে আবার ঘামতে শুরু করে। পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেছিল আগেই। এবার স্যান্ডো গেঞ্জিটাও খুলে ফেলে। হাঁসফাঁস করতে করতে বলে, সে কী, ওরা তো বাবাকে গিয়ে বলবে।

অতসী বলে, বলবে।

অবিনাশ বলে, তাই বলে তুমি আমার আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। আমার নিজের দাদা বউদি। সম্পর্ক না রাখলে তো খুব, খুব খারাপ দেখাবে।

অতসী বলে, দেখাবে।

বিয়ের পরের এই সতেরো বছরের মধ্যে দু-বছর ছিলাম বালুরঘাটে। তারপর পনেরো বছর এখানে আছি। সম্পর্ক রেখেছি। এখন আর পারছি না। কোনো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব কি রাখব না সেটা ঠিক করার পক্ষে পনেরো বছর কি যথেষ্ট নয়, বলো?

অবিনাশ বলে, কিন্তু বাবা। বাবা যদি জিজ্ঞেস করেন, এ কথা বলবে?

অতসী বলে, বলব, কারণ আমি আর ভান করতে পারছি না। বলব, কারণ, আমি ওই মানুষটাকে সম্মান করি। সত্যি কথা না বলাটাই অসম্মানের। আর বলব কারণ? তোমাদের পরিবারের মধ্যে একজনই পুরুষ।

অবিনাশ দিশেহারা বোধ করে। বলে, আচ্ছা, ওরা তো বাবার কাছে গিয়ে নিজের মতো করে বলবে। আমাদেরও তো আমাদের দিকটা বলে রাখা উচিত।

তুমি আমাদের বলছ কেন। এটা 'আমার' ব্যাপার। আর অভিযোগ ওরা করবে। চিরজীবন। আমি কখনও অভিযোগ করব না। আমি শুধু নিজেকে সরিয়ে নেব।

অবিনাশ বলে, তুমি বুঝতে পারছ, ভালো-দি, ভাইদা, মেজকাকি এরা কি ছেড়ে দেবে। কেবলই ফোন করবে। আজ এর বাড়ি নেমন্তন্ন করবে, কাল ওর বাড়ি। তুমি কত দিন পারবে 'না' বলতে?

অতসী আঙুল দিয়ে টেবিলে আঁকিবুঁকি কাটে। বলে, যত দিন পারি। চেষ্টা করব। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে তার। বলে। এটা কীরকম জানো। তোমার ওই নেটলনের জাল দিয়ে জানলা ঘেরার মতো। সারাবাড়ি লক্ষ্মণরেখার দাগ টানার মতো। যতই করো না কেন, দুটো একটা টিকটিকি ঠিক ঢুকে পড়তে চাইবে। যতই সরে থাকতে চাই না কেন, ওরা এখানে, ওখানে ঠিক মুখোমুখি হবার ব্যবস্থা তৈরি করে তুলবে। যাতে যেতে বাধ্য হই আমি। যাতে আমাকে খোঁচানো যায়।

অতসী বড় একটা শ্বাস ফেলে। কী করব আর। যতটা পারি রেজিস্ট করব। কিন্তু আমি তো এইসব কিছু, এই শহর ছেড়ে কোথাও চলে যেতে পারব না। সেই আমার বাপের বাড়ির দেশে। দিশেরগড়ে। একা একা গান গাওয়ার সেই ছাদে। আর তো ফিরতে পারব না। কুলটু তো আছে। ওর জন্যই আমাকে থাকতে হবে। তোমার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে। যারা সবাই, ওই টিকটিকির মতো।

~ www.amarboi.com ~

অবিনাশ অবাক হয়ে ভাবে, আজ একটু আগে সেও তো ভালো-দি, মেজকাকা, ছোক্কাকু এদের টিকটিকি হয়ে যেতে দেখেছে। সেও তো ভেবেছে, এদের কাছ থেকে পালাবার পথ নেই। তাহলে কি পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করা যায়, দুজনে মিলে।

হঠাৎ অতসী বলে, তুমিও তাই। হ্যাঁ। তুমিও এক-এক দিন টিকটিকি ঢুকলে ভয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। ভোলানাথ এসে সেটাকে মেরে বাইরে ফেলে দেওয়ার পর তবে বাড়িতে আসো। তাই জানো না, প্রাণভয়ে টিকটিকিগুলো কীভাবে দৌড়োয়। কীভাবে ছবির পেছনে, আলমারির কোণে সিঁটিয়ে থাকে। তুমিও তাই। সারাজীবনটা সিঁটিয়ে রয়েছ এই ভয়ে যে কখন ভোলানাথের ঝাড়ু এসে তোমাকে চ্যাপ্টা করে দেবে। কিন্তু তোমাকেও ছেড়ে যাবার তো আমার কোনো উপায় নেই। তুমি তোমার আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রেখো। আমাকে বলবে না। দু-বছর আগে তুমি যদি ওই গানের কথাটা সবার সামনে বলে না দিতে তাহলে এতটা এগোত না ব্যাপারটা।

অবিনাশ বলে, তোমার গানের ব্যাপারে বাবা যদি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করেন।

—করবেন না।

—মানে।

—বাবা, আমার ব্যাপার আমাকেই বলবেন। তোমাকে নয়। তখন, বললাম তো, উত্তর দেব।

অবিনাশ বলে, না, বলছিলাম, গানের ব্যাপারে।

মানে, ওই কাঞ্চনের ব্যাপারে...যদি কিছু...

অবিনাশ কথা শেষ করতে পারে না। চুপ করে যায়।

ও। তাই বলো। অতসী হাসল। তুমি শুনে রাখো, বাবা কাঞ্চনের ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না কোনোদিন। কারণ তিনি মানুষকে সম্মান করতে জানেন। আর তিনি আমাকেও মানুষ বলে মনে করেন। কিন্তু...কিন্তু

অতসী লম্বা শ্বাস টানে—এটা তো বাবার প্রশ্ন নয়, এটা তো তোমার, তোমার প্রশ্ন, তাই না।

—মানে, ঠিক প্রশ্ন নয়, ভাবছিলাম...

—দেখেছ, এই দু-বছরে ওরা কী করেছে, তোমার মাথাটাকে। তুমি তো এই রকম ছিলে না আগে। শোনো, এই কাঞ্চনের ব্যাপারটা তুমি বুঝবে না। তোমরা কেউ বুঝবে না। ওই যে ছোটো ছোটো গানের দলগুলো, ধৈবত, অরিত্র, সোহিনী—যেসব জায়গায় কাঞ্চন আমায় নিয়ে যেত, ঘরের বউরা, সারাদিনের কাজের পর সেখানে কেন আসে জানো? তারা কেউ বড় আর্টিস্ট হব, টাকা করব বলে আসে না। তারা কিছুক্ষণ সুরের সঙ্গে থাকবার জন্য আসে। আনন্দের জন্যে আসে। গানের মনকে খুঁজতে আসে। কত মানুষ, নানা রকমের পুরুষ, মেয়ে, একজন আর একজনকে সুর ঠিক করে দিচ্ছে, তাল শুধরে দিচ্ছে, একটা গান থেকে হাত ধরে আরেকটা গানে পৌঁছে দিচ্ছে, এক রঙের

~ www.amarboi.com ~

পোশাক পরে, মঞ্চে বসে, একটা গানের মনের মধ্যে সকলে গিয়ে ভেসে পড়ছে, এর কী মানে জানো? এর মানে আনন্দ।

কাঞ্চন মানে আনন্দ। এই দু-বছর ও আমাকে গান তুলে দিয়েছে, আমি ওকে। এই দু-বছর আমি আর কাঞ্চন একই গানের মনের মধ্যে গিয়ে ভেসে গেছি কতবার। সে অভিজ্ঞতা তোমাদের নেই। সে অনুভূতি তোমরা বুঝবে না কেউ। তাই আমি কাউকে বোঝাতে যাবও না। 'তুমি বাঁধিয়ে কি দিয়ে রেখেছ হৃদি' এ গানটা তুলতে ওর এক মাস লেগেছিল। তারপর যেদিন সবটা নির্ভুল গাইল, এমন গাইল, অমন আমি পারব না। প্রত্যেকটা পরদা, খোঁচ, মোচড়, প্রত্যেকটা মীড় লাগাবার মুহূর্তগুলো এখনও আমার মনে আছে। সে কি কখনও মুছবে!

আর তোমার আত্মীয়স্বজনেরা। তারাও গান নিয়ে কথা বলে, কিন্তু কি সেই কথা! কে কোন্ প্রোগ্রাম করছে কোথায়, কে টিভিতে কটা অনুষ্ঠান করল, কার ক্যাসেট কীভাবে বেরোচ্ছে, কাকে কাকে ধরলে কোন্ কাগজে রিভিউ করানো যায়, এই—এই নিয়েই কথা হয় শুধু। এর মধ্যে সুর কোথায়!

কাঞ্চন হচ্ছে সুর।

অতসী থামে। জল খায়। সারা ঘরে থমথম করে স্তব্ধতা, বলে, শংকরদা যে ওষুধটা লিখে দিয়েছিলেন, আনোনি তো।

অবিনাশ বলে, না। মনে ছিল না।

আমি এনেছি। এই নাও। খেয়ে, শুয়ে পড়ো।

অবিনাশ বলে, তুমি শুতে যাবে না?

যাব। তার আগে একবার স্নান করতে হবে। তুমি শুতে যাও। আমি একটু জানলার ধারে দাঁড়াই। তারপর...

তারপর একটু থেমে বলে, জাল দেওয়া জানলার ধারেই দাঁড়াব। ভয় নেই।

ছয়

সকাল না সন্ধে ঠিক বোঝা যায় না। আকাশে অদ্ভুত রঙের আলো।

অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সমুদ্র। খাঁ খাঁ করে কিসের একটা কর্কশ ডাক। অবিনাশ মুখ তুলে দেখল, তার মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে কিছু অদ্ভুত আকার জীব। আধা পাখি। আধা গিরগিটি। তাদের ডানায় পালক নেই। চারটে পা। লম্বা লেজ। চিৎকার করছে তারাই, কারণ তাদের পেছনে, আকাশ দিয়ে, লম্বা একটা আগুনের রেখা নেমে আসছে সমুদ্রের দিকে। তার প্রচণ্ড ঝলকে সমস্ত চরাচর আলোয় সাদা হয়ে গেছে। সেই আলোয় অবিনাশ দেখছে, তার চারিদিকে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, মানুষজন, কিছুই নেই।

একদিকে বিরাট উঁচু উঁচু গাছ, অন্যদিকে মাইল মাইলব্যাপী উঁচু-নিচু পাথুরে ভূখণ্ড। সেই জীবগুলো ডাকতে ডাকতে ঝলসে কুঁকড়ে আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে সমুদ্রে। মাটিতে। অবিনাশের সামনে পড়ল। দৌড়োল অবিনাশ। কোথায় বিকট একটা

~ www.amarboi.com ~

বিস্ফোরণের আওয়াজ। মাইল মাইল ব্যাপী মাটিতে ফাটল। সমুদ্রের মধ্যে ওটা কি জলস্তম্ভ না ধোঁয়া? আগুনের আকাশচুম্বী ফোয়ারা? জল ঝাঁপিয়ে আসছে। জল না গরম কাদা? চারপাশে মরা সরীসৃপ। কোনো কোনোটা নড়ছে। অবিনাশ পড়ে গেছে একটা ফাটলে। উঠতে পারছে না। শত শত তক্ষকসদৃশ প্রাণীর সঙ্গে তলিয়ে যাচ্ছে। সে...হাজার হাজার ফুট গরম কাদা বালি পাথরের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে...কানে শুধু সেই কর্কশ চিৎকার লেগে রয়েছে...

উঠে বসল অবিনাশ। তার বালিশ বিছানা ঘামে ভিজে গেছে। গলা তেষ্টায় কাঠ। জানলার বাইরে মরা ফ্যাকাশে চাঁদ। ভোর হয়ে এসেছে। কোথায় একটা কাক সমানে ডেকে চলেছে।

অবিনাশ গেলাসের ঢাকা খুলে জল খেল। তারপর বাথরুমের দিকে এগোল। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া দরকার। ডাইনিং স্পেসটায় পা দিয়েই থমকে গেল।

অতসী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। গত রাত্রে শুতে যাবার আগে যেভাবে দেখেছিল অবিনাশ, সেইভাবেই, সেই পোশাকেই।

অবিনাশ, ওকে কোনো সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে চলে এল ঘুমন্ত মেয়ের ঘরে। শিয়রে বসল। একটা হাত ছড়িয়ে আছে। বালিশে ছোঁয়ানো গাল। মেয়ের কপালে হাত রেখে চুল সরিয়ে দিতে দিতে অবিনাশ মনে মনে বলল, তুই ঠিক বলেছিলি কুলটু সেই উল্কাটাকে আগে দেখতে পেয়েছিল পাখিরাই।

শারদীয় দেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাদবের ইউনিফর্ম

সেদিন খুব হাসি বাড়িতে। অমিতাভ বচ্চন কি যদুর চেয়েও লম্বা? এই কথায় হাসি।

শুধু এই কথায় নয়, অন্য অনেক কথাতেই হাসি সেদিন। কারণ সেটা মেয়ের জন্মদিনের সন্ধে। উনিশ হল এবার। মেয়ের বন্ধুরা এসেছে দু-তিনজন। তাদের মা-বাবারাও। তাই হাসি চলছেই। তবে 'যদু কি অমিতাভ বচ্চনের চেয়েও...' কথাটাতে হাসি ঘর থেকে পাড়ার দরজা-জানলায় আওয়াজ তুলল।

মেয়ের ছোটোবেলা, আরও আরও ছোটোবেলার গল্প উঠছে মেয়ের মায়ের মুখে। অন্য অন্য মা-বাবারাও বলছে একটা দুটো। এইসময় 'যদু কি অমিতাভ...' চলে এল।

মেয়ের খুব ছোটো বয়সে বলা কথা। মেয়ে তার বাবাকে বাবা বলে না। বলে যদু। তার বাবা যাদবেন্দ্র মৈত্রকে পৃথিবীতে কেউ কখনও যদু বলেনি। মেয়ে ছাড়া। কেন যে বাচ্চাকাল থেকে যদু শুরু করেছিল, ঈশ্বরই জানে।

যাদবেন্দ্র মোটেই লম্বা নয়। পাঁচ ফুট চার-পাঁচ হবে বড়জোর। বাচ্চাদের যেমন হয়, বাবার হাঁটু ধরে মাথার ওপর দিকে বাবার মুখ দেখত মেয়ে। হাঁচড়-পাঁচড় করে চেয়ারের ওপর বা খাটে উঠে দাঁড়িয়ে বাবার কাঁধ সমান হত। 'পড়ে যাবি পড়ে যাবি' করে মা ছুটে এসে কোলে নিয়ে নিত। কেন না বাবা তাকে কোলে নিতে পারত না। তখন কি হাসি। তারপর সে বয়স পেরিয়ে আরও একটু পরের বয়স এল। তখন মাথা বাবার কোমরের কাছে। অফিস থেকে এসে বাবা পাঞ্জাবি ছেড়ে চানে ঢুকেছে, অমনি সেই পাঞ্জাবির ভেতরে ঢুকে পড়ে মেয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে বেরতে পারছে না। কান্না।

এসব যে কত গেছে। আহ্লাদ করে মেয়ের মা বলছে। মেয়ের মা অমিতাভ বচ্চনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খুব ভক্ত। টেলিভিশনে একদিন অমিতাভর ফিলিম দেখছে মেয়ের মা আর মেয়ের মাসি। দুজনের মাঝখানে ঘট হয়ে বসে আছে খুদেটা। মেয়ের মা মেয়ের মাসিকে বলল, দ্যাখ কত্ত লম্বা, না?

মধ্যে থেকে খুদে বলে, কে লম্বা, মা? ওমা, কে লম্বা?

মা আর মাসির ডিস্টার্ব হয়। ওরা কান করে না। টিভি দেখতে দেখতে মেয়ের মাসি বলে, এরকম লম্বা আর কেউ নেই! কি ফিগার!

ঘটটা এবার নড়তে চড়তে থাকে। মায়ের হাঁটু ধরে ঝাঁকায়, বলো না মা, কে লম্বা!

বিরক্ত হয়ে ওর মাসি বলে, কে আবার, অমিতাভ বচ্চন। চুপ করে বসে বইটা দেখতে দে তো।

তখন কুচোটা বলেছিল, অমিতাভ বচ্চন কি যদুর চেয়েও লম্বা?

বাবাকেই সেই বয়সে সবচেয়ে দীর্ঘকায় দেখত শিশু।

মেয়ের মাসি এখন বলল, ভাগ্যিস সেই কথাটায় বিশ্বাস করেননি যাদবদা। তাহলে যে কী হত।

আবার হাসির হুল্লোড় উঠল ঘরে। মেয়ের মা বলল, হ্যাঁ ও তো সব ব্যাপারেই মেয়েকে বেশি বিশ্বাস করে।

যাদবের পাশাপাশি একবার অমিতাভ বচ্চনকে ভেবে নিল ঘরের সবাই।

যাদব পঞ্চাশে পৌঁছোতেই কুঁজো আর বুড়োটে হয়ে গেছে। সর্বসময় খাদির সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে যাদব। যাদবের অফিসের রাঘবদা বলেছিল, বাবাঃ, এ তো একেবারে ইউনিফর্ম করে ফেলেছ দেখছি।

যাদবের বেশি বয়সের সন্তান এই মেয়ে। একটি। হবার কথা ছিল না। হয়েছে। ঈশ্বরের কৃপায়।

মেয়ে শুনে খুব খুশি হয়, রঘু জেঠু ঠিক বলেছে। ঠিক ঠিক ঠিক। আমারও তো স্কুলে ইউনিফর্ম আছে। তোমারও ইউনিফর্ম হল।

এখন বড় হয়েও বলে, মা যদুর ইউনিফর্মগুলো বাথরুমে ডাঁই হয়ে রয়েছে। টুলিদি কাচেনি কেন।

যাদব ঝুঁকে হাঁটায় তাকে নিজস্ব দৈর্ঘ্যের তুলনায় ছোটো লাগে। তার মুখে ফুরফুরে সাদার ছোপ ধরা দাড়ি। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা। শীতের দু-মাস বাদ দিলে, বাকি দশ মাস ঝোলার ভিতর থেকে ছাতার বাঁট উঁকি মারে। যেন ক্যাঙারুর কোলে বাচ্চা।

যাদবের ওজন ছেচল্লিশ কেজি। যতটা রোগা একজন পঞ্চাশ বছরের লোক হতে পারে, যাদব তার চেয়ে সামান্য একটু বেশি রোগা। চোখে গুল্লি গুল্লি একরকম চশমাও থাকে তার।

মেয়ের মা বলল, অমিতাভ বচ্চন হাজার চেষ্টাতেও এ জন্মে আর যাদব মৈত্রর মতো দেখতে হতে পারবে না।

মেয়ের মাসি বলল, সব মেকআপ-ম্যান ফেল করে যাবে!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেয়ে এসে যাদবের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা যদুকে ওরকম করে বলছ কেন! যদু কবি!

হ্যাঁ। যাদব মৈত্র যে কবি যে কেউ একবার দেখলেই বলবে। তার জন্য কাব্যপাঠক হওয়ার দরকার নেই। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের মতো যাদব মৈত্রও একেবারে প্রোটোটাইপ কবি। এ জিনিস এখন আর চট করে রাস্তাঘাটে দেখা যায় না। যাদব যখন কবি হিসাবে চেনা দিতে শুরু করেছে যৌবনে—তখনও তাদের ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই বেঁচে ছিলেন। আর ছিলেন অঙ্কের অক্ষয় মজুমদার। এঁরা দুজনেই যাদবের পিতৃবন্ধু। দুজনের মধ্যে, একবার এরকম কথোপকথন হয়েছিল।

—মৈত্রবাবুর ছেলেরা এখন কী করে পণ্ডিতমশায়?

—ছোটো ছেলেটা তো ব্যবসা করে।

—আর বড়জন?

পণ্ডিতমশায় নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করে বলছিলেন, তার কথা আর বলবেন না।

—কেন?

—তিনি বাংলার ঢোলা কবি হয়েছেন।

কবির আগে ঢোলা কথাটা এইজন্য বলা যে, যাদব সেই বয়সেই তার ইউনিফর্ম অর্থাৎ পাজামা-পাঞ্জাবি ধরে ফেলেছে, ঝোলা-সহ।

তবে আজ যারা বাড়িতে এসেছে মেয়ের জন্মদিনে, তাদের কারও সঙ্গেই কাব্যসাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। নিজেদের মেয়ের বন্ধুর জন্মদিনেই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে এই তিন-চারটি পরিবার। সকলেরই একটি করে সন্তান। মেয়ে। যদিও যাদবকে তারা একজন মান্যিগন্যি লোক হিসাবেই জানেন। কে না জানে, টেলিভিশনে যাদব মৈত্র মাঝেমাঝেই দেখা দেন।

যেমন পয়লা-বৈশাখ আমাদের জীবনে কী তাৎপর্য নিয়ে আসে, সে বিষয়ে দু-চার মিনিট। কিংবা দোল উৎসব সকলের ভালো কাটুক অথবা এবার পুজোয় আমি বৃন্দাবন বেড়াতে যাচ্ছি। যদিও যাদব মৈত্র অত্যন্ত ঘরকুনো মানুষ। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়টায় না। কিন্তু 'কোথাও যাচ্ছি না' শোনার জন্য তো আর টিভি চ্যানেলের ছেলেমেয়েরা ক্যামেরা নিয়ে আসবে না। অল্পবয়সি ছেলেমেয়েগুলো নিরাশ হবে? ওদেরও সর্বদা ক্যামেরার সামনে দাঁড় করাবার লোক দরকার। ওদেরই একটু সাহায্য করতে, তাই যাদব কোনো একটা জায়গার নাম করে দেয়। তাছাড়া টেলিভিশনে খবরেও দেখা যায় যাদব মৈত্র কারও হাতে ফুলের স্তবক তুলে দিচ্ছেন কোনো অনুষ্ঠানে। হাসি হাসি মুখে অন্য অনেকের সঙ্গে যাদবের দাঁড়িয়ে থাকা বা বসে থাকা ছবি সংবাদপত্রেও দেখা যায় প্রায়ই। ভিতরের মেট্রো পাতায়।

এই যে পারিবারিক মিলনমেলা চলছে মেয়ের বন্ধুর মা-বাবারা প্রাথমিকভাবে সেইসব দেখাশোনার প্রসঙ্গ তুলছেন। [illegible]বাবু বললেন, সেদিন দেখলাম টিভিতে আপনি গীতা ঘটককে ফুল দিচ্ছেন। আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। হল না। কেমন গাইলেন উনি!

~ www.amarboi.com ~

রঞ্জিতবাবু বললেন, আমি গিয়েছিলাম। উঃ দারুণ! সেকেন্ড হাফটা তো দুর্দান্ত গেয়েছেন।

তিন-চারটি পরিবার জড়ো হওয়ায় এই ছোটো ফ্ল্যাটে স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। দরজাটা খোলা। দরজার সামনে বেশ কয়েকজোড়া জুতো। দু-জোড়া ফ্ল্যাটের বাইরেও। মেয়ের বন্ধুরা, কলি, তিষু, তিতির, সুমনা সকলে গিয়ে যাদবের পড়ার ঘরের দখল নিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের মায়েরা রান্নাঘরের সামনে থেকে শোবার ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় তাঁদের জটলা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার পিছিয়েও নিচ্ছেন। যাদব মৈত্র অন্য বাবাদের সঙ্গে ড্রইং-কাম-ডাইনিং-এর জায়গায় মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে বসে। মেয়েরা গান ধরল, শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে। মেয়েদের মায়েরাও গলা মিলিয়ে দিল। মায়েদের জটলাটাও মেয়েদের ঘরের দরজায় এসে গেছে এখন।

ছোটো ফ্ল্যাটবাড়িটা ভেসে যেতে লাগল গানে।

গানে বাধা পড়ল। ফোন বাজছে। আবার বাজছে। থেমে আবার।

—অ্যাই অ্যাই ফোন!

—মেয়েই গিয়ে তুলল, হ্যালো। হ্যাঁ, আছেন।

যাদব ফোন কানে নিয়েছে। কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

—তোরা একটু চুপ কর তো! হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা আচ্ছা বলো! ভালো আছি। তুমি কেমন!—অ্যাই, তোরা একটু আস্তে, বাচ্চারা।

মেয়েদের মায়েরা হেসে ফেলল, এরা কেউ আর বাচ্চা নেই এখন।

যাদবের গলা শোনা যাচ্ছে, ভায়োলেন্স! আর মিডিয়ার ব্যাপারটা...বুঝেছি। আসলে এখন...তুমি কোথায় আছ? ও, সন্তোষপুরে। মুশকিল হল, বাড়িতে মেয়ের বন্ধুরা এসেছে তো এখন, এখন ঠিক কথা বলবার পরিস্থিতি নেই। কাল হতে পারে। ও আচ্ছা। তাহলে কাল ছেড়ে দাও। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওটাই ঠিক রইল। আচ্ছা শমীন্দ্র।

যাদবদের ফ্ল্যাটে একটা বড় প্যাঁচা রাখা আছে। কাঠের। তার মাথায় ফোন। রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে মেয়েরা এখন বাংলা ব্যান্ডের গানে চলে গেছে। বাড়িতে যে কাজের মেয়েটা আছে, টুলি, সেও জানে ব্যান্ডের গান।

রঞ্জিতবাবু বললেন, কথাগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, না? চঞ্চলবাবু বললেন, দারুণ পপুলার কিন্তু এরা। চঞ্চলবাবুর স্ত্রী বাসবী স্বামীকে বাধা দিয়ে বললেন যাই বলো, সুমনের মতো কিন্তু কেউ না। ওই গানটা জানিস তোরা? তোমাকে ভাবাবোই ভাবাব, সে তুমি মুখে যাই বলো না। বলেই গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন লাইন দুটো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ধরল, তোমাকে আমি পথে নামাবই, যতই ঘরে বসে থাক না।

এবার ঘর ভরে অন্যরকম গান। একদল মেয়ের গলায় গানটা অচেনা একটা জোর পেয়ে যাচ্ছে। যাদব ভাবল।

এইসময় আবার বেজে উঠেছে ফোন।

ফ্ল্যাটের শেষ প্রান্তে যাদব, মাঝখানে মেয়েরা, মেয়ের মায়েরা বসে আছে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে। পেরিয়ে গিয়ে ফোন ধরা মুশকিল। গান থামিয়ে একজন মেয়েই তুলল, কাকু, তোমার ফোন। কী করে আসবে এদিকে।

যাদব বলল, কে বলছেন জিজ্ঞেস করো তো। আর কী দরকার?

—হ্যাঁ, কে বলছেন বলবেন কাইন্ডলি। ফোনের মুখটা চেপে কলি বলল, কে একজন বিলাস সরকার।

—কে আবার বিলাস সরকার!—মনে করতে পারছে না যাদব।

—কোথা থেকে বলছেন। বলছে, যাদবপুর থেকে বলছেন। আর এ. আই. এস. এ. না কিসব যেন বলছে। তুমি ধরো কাকু।

মেয়েরা আর মায়েরা হাঁটু সরিয়ে বেঁকে বসে রাস্তা দিল যাদবকে। যাদব ব্যালান্স করতে করতে অবশেষে যেন দুর্গম গিরি কান্তার পার হয়ে ফোন ধরে বলল, হ্যাঁ, বলুন। না, চিনতে পারছি না। আচ্ছা আলাপ হয়নি? অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন? হ্যাঁ, বলুন, আচ্ছা? আমরণ অনশন? কোথায়? যাদবপুর এইট-বি মোড়ে? বেলা একটা থেকে শুরু হবে? দেখি যেতে পারব বলে মনে হয় না। আমার তো কাজ আছে দুপুরে। ঠিক আছে ভাই। নমস্কার।

কল্যাণবাবু জানতে চাইলেন, ওরা কারা?

যাদব বলে, জানি না। কোনো দল হয়ত।

চঞ্চলবাবু বললেন, আমরণ অনশন? ইস্যুটা কী?

যাদব বলে, ইস্যু হল ওই...।

তার কথা শেষ হবার আগেই মেয়ের মা আর মেয়ের মাসি এসে পড়ল দু-হাতে দুটো করে খাবার ভর্তি প্লেট নিয়ে। কাগজের প্লেট।—খেয়ে নাও। সব খেয়ে নাও এবার। ধরো। হাতে হাতে কিন্তু।

—ঠিক আছে। হাতে হাতেই তো সুবিধে। এই নাও চন্দনা। তুমি আগে নাও।

—এই এই, অতটা দিও না। কমাও, কমাও কাকিমা।

—খা তো, কিছু ফিগার নষ্ট হবে না।

—সন্ধেবেলা ধোসা খেলাম যে।

—এই তো খাবার বয়স, নে তো। উঃ।

—পটলের দোরমাটা ফাটাফাটি হয়েছে। যাদববাবু, আপনার মিসেসের রান্নার হাতটা দারুণ।

যাদবের মিসেস রান্নাঘর থেকে খুশি খুশি গলায় প্রতিবাদ করে, আর আপনার মিসেস! ওর কাছে আমার রান্না লাগেই না!

অভিজিৎবাবু বললেন, অ্যাই বুকু, রিমোটটা কই রে! দেখি তো নিউজটা।

—এই তো, এই তো।

যাদব টেলিভিশন চালিয়ে দেয়। প্যাঁ-ও আওয়াজ হয়। অভিজিৎবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, সাউন্ডটা বেড়ে আছে।

~ www.amarboi.com ~

শব্দ কমানো হয়।

ছবি তো আর কমে না।

টিভির পরদায় দেখা যাচ্ছে একজন যুবক নিজের গায়ে পেট্রোল ঢালল। হাতে দেশলাই কাঠি নিয়ে ঠুকছে। ছোটো দেখাচ্ছে তাকে। দূর থেকে তোলা ছবি। একবার ঠুকল। দুবার। নিজের গায়ে দিল আগুন। লোকটার বাঁ কাঁধের পিছন দিকটা প্রথমে জ্বলতে লাগল।

পিঠ দিয়ে শিখা উঠছে মশালের মতো। ছুটতে শুরু করল লোকটা। পলকে ছুটল অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। চারপাশ থেকে লোক দৌড়ে এল। পোড়া সাদা গা দেখা যাচ্ছে তার। একজন রাস্তায় জমে থাকা জলই আঁজলা করে ছিটিয়ে দিচ্ছে গায়ে।

'মণিপুর। মণিপুর। মণিপুরের ঘটনা।'

ফিশফিশ উঠল ঘরে।

আকাশ বাংলায় দেখাচ্ছে।

খাওয়ার প্লেট হাতে সবাই চুপ।

যুবকটি বিশেষ সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সর্বসমক্ষে নিজেকে পুড়িয়ে মারল।

অভিজিৎবাবু কোনো মতে বললেন, সৌমিত্র দস্তিদারের ছবিটা...

রণজিৎবাবু বললেন, হ্যাঁ, ওই ডকুমেন্টারিটা। আবার দেখাচ্ছে!

—উঃ তুলল কী করে ক্যামেরায়।

এবার দেখাচ্ছে বয়স্ক মহিলাদের। পাশ থেকে। পিছন থেকে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে হাঁটছেন তাঁরা। এগিয়ে যাচ্ছেন আর্মি ব্যারাকের দিকে। সামনে একটা গেট। উর্দিপরা কয়েকজন সশস্ত্র লোক। পিছিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে।

—মণিপুরে কী অবস্থা!

—কীভাবে মেরেছে মনোরমাকে।

টিভিতে বলছে, গোপনাঙ্গে গুলি করেছে।

ধর্ষণের প্রমাণ লোপের জন্য। গুলি।

তারা কারা! সৈন্য। পুলিশ। সরকারি যোদ্ধা।

স্তনে। ঠোঁটে। গুলি।

—দেখছেন কোথাও কোনো প্রোটেস্ট নেই।

অস্ফুটে যাদব বলল, ওই বিলাস সরকার না কে? ফোন করেছিল, আমরণ... অনশন... এই জন্যই।

—কী পার্টি থেকে?

—কী যেন বলল, A.I.S.A. না কী?

—ভাবুন ভ্যাজাইনায় গুলি করেছে এগারোটা।

ধর্ষণের প্রমাণ লোপের জন্য।

—কারা গুলি করেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অসম রাইফেলের জোয়ান তারা। উর্দি পরা।

গুলি। স্তনে। ঠোঁটে।

হঠাৎ ওয়াক আওয়াজ। একটা মেয়ে প্লেট টেবিলে রেখে ছুটে গেল বাথরুমে। মুখে হাত চাপা। ওয়াক। ওয়াক।

বমি করে ফেলেছে রুষা।

আবার একটা বমির আওয়াজ।

এবার তিতির।

তারপর আর একটি মেয়ে। পরপর বমির আওয়াজ বাথরুমে। দুটো বাথরুমে তিনজন।

মধুমিতা সেলফোনে কথা বলছেন তাঁর ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে।—তুমি চলে এস। কৃষ্ণা গ্লাসের বাঁদিক দিয়ে। চেনো তো! কোথায় আছ। সুলেখা? আচ্ছা।

তিষুর বাবা ডাক্তার। তাঁরও সেদিন আসারই কথা। চেম্বার সেরে আসছিলেনও। এই সময় স্ত্রী মধুমিতার ফোন, মোবাইলে।

কেউ আর খেতে পারল না। প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সবারই। ভ্যাজাইনাতে এগারোটা গুলি। এটা শুনেই রুষার বমি পায়। করেও ফেলে। তার দেখাদেখি তিতিরের বমি আসে। তারপর বুলু। বুলুর মায়েরও।

অর্ধেক খাবার ভরা প্লেট। খাবারের গন্ধ। বমির গন্ধ। জলের আওয়াজ বাথরুমে। জলের ঝাপটা দেওয়া মুখ। চুল, কপাল ভেজা মেয়েগুলো।

জোরে চলা ফ্যানের দিকে মুখ তুলে বসেছে বা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর এক এক করে ফিরে গেল সবাই।

মণিপুর নিয়ে কোনো কথা উঠল না।

দুই

কথাটা উঠল রবিবার। চঞ্চল বাসবীর বাড়ি যাওয়ার সময়। ওদের ফ্ল্যাট সল্টলেকে। ওদের বাড়িতে অনেক রেকর্ড, পুরোনো। সবাই মিলে শোনা হবে দুপুরে। সেই সন্ধেয় যারা যারা এসেছিল যাদবদের বাড়ি, তিষুরা ছাড়া বাকিরা সব থাকবে। অনেকের পরীক্ষা এসে যাবে এর পর। তাই আপাতত এটাকেই ক্লোজিং সেরিমনি বলা যায়।

ট্যাক্সিতে চলেছে যাদবরা। যাদব সামনে ড্রাইভারের পাশে।

পিছনে যাদবের মেয়ে, মেয়ের মা, মেয়ের মাসি।

মাসির পাঁচ বছরের মেয়ে যাদবের কোল ঘেঁষে জানলার পাশে।

যাদব বলল, এই যাঃ। খুব ভুল হয়ে গেছে।

যাদবের মেয়ে বলল, কী হয়েছে?

মেয়ের মা বলল, আবার ওষুধ খেতে ভুলে গেছ বুঝি?

যাদব বলল, আমার কাছে একজন আসবে। সাড়ে বারোটায়। এখন সাড়ে দশটা। তোরা যা।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

মেয়ে বলল, তোরা যা মানে? কে এমন আসবে?

—শমীন্দ্র। শমীন্দ্র সেন। জার্নালিস্ট।

মেয়ের মা চিনতে পারল।—ও শমীন্দ্র সেন। কাগজে প্রায়ই তো পড়ি ওঁর লেখা।

মেয়ের মাসি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, রিসেন্টলি তো ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির ব্যাপারটা নিয়ে ডিটেল্‌সে লিখছিলেন।

যাদব বলে, হ্যাঁ খুব ব্রাইট ছেলে। আমাকে দাদা দাদা বলে। বাঁদিকে একটু রাখবেন ভাই। আমি নেমে যাব।

শেষাংশটুকু ড্রাইভারকে বলা। ট্যাক্সি তখন করুণাময়ীতে ঢুকছে।

পাঁচ বছরের বাচ্চাটা মেসোকে নামতে দেবে না।

—না, তুমি এখন যাবে না।

মেয়ে নামল বাবার সঙ্গে। বাড়ি চলে যাবে, তার মানে আর আসবে না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসতে পারব নিশ্চয়।

যাদবরা বাঘাযতীনের কাছাকাছি থাকে। মেয়ে বলল, একবার ফিরে আবার আসতে আসতে তো তিনটে-চারটে বেজে যাবে। তাছাড়া স্ট্রেনও হবে তোমার। কী এমন দরকার? ভদ্রলোককে ফোন করে দাও না। থাকছ না।

—বা রে। একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে।

—ইন্টারভিউ?

যাদব বলে, হ্যাঁ, মানে সাক্ষাৎকার। দিতে হবে।

মেয়ে ঠোঁট ওলটায়।—সে তো তুমি কতই দিয়েছ। আজ আর দিতে হবে না চলো।

যাদব বলে, তা হয় না, কথা দিয়েছি। আর বিষয়টা জরুরি।

মেয়ে হাত ছুড়ে বলে, ওঃ এই একটা কথা প্রত্যেকবার বল। এই যে, বিষয়টা জরুরি। কি নিয়ে ইন্টারভিউ শুনি?

—ধর, এই যেসব ভায়োলেন্স চলছে চারধারে...

—ভায়োলেন্স?

হ্যাঁ, আর মিডিয়ায় যেভাবে সেটা প্রচারিত হচ্ছে, সেটা উচিত না অনুচিত, মানে ভালো না খারাপ, সেইসব।

—উচিত না অনুচিত সেটা তুমিই আজকে বলে দেবে বুঝি?

যাদব একটু থতমত খায়, না মানে আমিই যে বলব, তা নয়। একটু আলোচনা করব আর কি।

—উঃ আবার সেই আলোচনা।—মেয়ে হতাশ ভঙ্গি করে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে দিল। মেয়ের মা জানলা থেকে বলে, বুকু, চলে আয়। কতক্ষণ দাঁড়াব। ও যদি যেতে চায় যাক। কিসব কাজ আছে, বলছে।

মেয়ে মাকে বলে, তোমরা চলে যাও মা, বাসবী মাসির বাড়ি। আমি যদুর সঙ্গে যাচ্ছি।

যাদব অবাক, সে কী রে, তুই কেন যাবি!

~ www.amarboi.com ~

মেয়ে বলে, যাব, আমার ইচ্ছে। ওই কী বললে, আলোচনা। ওইটা একটু দেখব। সরি, শুনব।

মেয়ের মাসি বলে, কীসে আসবি?

—সি-থ্রিতে। যদি না পাই সুলেখার মোড় থেকে সি-টু নেব।

মেয়ের মাসি বলে, সন্তোষপুর দিয়ে অটো করে বাইপাস চলে আসবি। ব্যস, ওখানে শ-য়ে শ-য়ে বাস।

মেয়ে এখন যাদবের কাঁধের সমান। বাবার কনুই ধরে, সাবধানে দুদিক দেখে বাবাকে রাস্তা পার করায়। যাদব লজ্জা পায়, এই ছাড় তো! নিজেই পারি আমি।

—তুমিই তো বলো, তোমার ভার্টিগো, স্পন্ডেলাইসিস, কত কিছু আছে। তার ওপর একটুতেই তো বলবে, প্যালপিটেশন হচ্ছে।

শাড়ি পরেছে। সেইজন্য বেশ বড়সড় দেখাচ্ছে। এমনিতে বয়সের তুলনায় চিরকাল ওকে বড়ই দেখায়।

মেয়ে বলে, যদু ওই দোকানটা থেকে কোল্ডড্রিঙ্কস কেনো একটা।

যাদব বলে, দেরি হয়ে যাবে রে!

—শোনো, এখন দশটা চল্লিশ। কিচ্ছু দেরি হবে না। তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো সাড়ে বারোটায়। এগারোটায় একটা ট্যাক্সিতে উঠব।

—ডবল ট্যাক্সি! তারপর বাড়ি ফেরা আছে না। অত পয়সা নেই আমার।

—কেন, অভিজিৎকাকুরা তো বলেছে, ফেরার সময় ওদের গাড়িতে ড্রপ করে দেবে আমাদের। ছাড়ো তো! এখন একটা কোল্ডড্রিঙ্কস নাও।

যাদব কেনে। মেয়ে কোল্ডড্রিঙ্কস গলায় ঢালে আর ছটফট করে যাদব!—তোর জন্যই দেরি হয়ে যাবে। একেই তো দেরি হয়েছে।

—আগেও তুমি সাক্ষাৎকারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করেছ বুঝি?

—না, তা নয়, তবে, ছেলেটা পরশু ফোন করল। কাছেই ছিল বাড়ির। কিন্তু বাড়িতে তো তখন তোর জন্মদিনের অত লোক। কথা বলতে পারলাম না। আজ সময় দিলাম।

—কালকের দিনটা ছিল তো মাঝখানে।

—কালকে শমীন্দ্রর অন্য অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। ও আসতে পারত না।

মেয়ে ডাকল, অটো!

অটো দাঁড়ায়। উঠে পড়ে দুজনে। কিছুটা এসে বাইপাসে পড়তেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে উঠে নিশ্চিন্ত বোধ করল যাদব।

—দেখ তো কটা বাজল।

—এগারোটা পনেরো।

—যাক পৌঁছে যাব।

হাঁফাতে হাঁফাতে চারতলায় উঠে বসেছে কি বসেনি যাদব, দরজায় বেল। যাদব লাফিয়ে উঠে খুলল। শমীন্দ্র সেন। লম্বা ছিপছিপে এক তরুণ। নীল একটা গেঞ্জি আর

~ www.amarboi.com ~

জিনস্। তার সঙ্গে ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে ফোটোগ্রাফার। মুখ চেনা এরও। নামটা মনে পড়ছে না। শমীন্দ্র হাসল। সে হাসলে আলো ছড়িয়ে পড়ে। কেন না, তার মুখটি বালকের মতো সারল্যময়।

—একটু আগেই এসে গেলাম। এ রবি! চেনেন তো?

রবির মুখ পোড়খাওয়া। আসন্ন কাজের জন্য সিরিয়াসভাব লেগে আছে মুখে। সে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার তো আমাকে চেনেন। রোজই তো কোনো না কোনো প্রোগ্রামে দেখা হচ্ছে। বলে সে তার ব্যাগ খুলে ক্যামেরা বার করতে শুরু করল।

মেয়েকে বলল যাদব, বুকু একটু চা বানাবি আমাদের জন্য?

শমীন্দ্র সেন বাধা দেয়, না, না, দাদা চায়ের দরকার নেই, আমাদের আবার আলিপুর যেতে হবে এক্ষুনি। ফিল্ম ডিরেক্টর শোভনলালের বাড়ি। বরং একটু জল খাব।

আজ টুলি বাড়ি গেছে। মেয়ে ট্রেতে জল এনে দেয়।

কাঁধের চমৎকার ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট টেপরেকর্ডার বার করে শমীন্দ্র সেন।—আমরা শুরু করে দিই, কেমন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সামনের ছোট্ট টেবিলে ডাঁই করা বই, খবর-কাগজ, ম্যাগাজিনের ওপর টেপরেকর্ডারটি শুয়ে অপেক্ষা করে। পরের দিনের কাগজে আরও কথা সরবরাহের জন্য।

ছোট্ট একটা নোটবই বার করে শমীন্দ্র, আর কলম। রবি তার ক্যামেরা তুলে পিছনে চোখ নিয়ে যাদবের দিকে লক্ষ্য স্থির করে।

যাদবের মুখের রেখা বদলায়। হাসি হাসি কৃতার্থ এসো-বসো ভাবটা মুছে দিয়ে প্রায় শোকসভার সদস্যদের মতো একাধারে কঠোর ও বিমর্ষ একটি ভাব ফুটে ওঠে।

প্রশ্ন শুরু হয়।—আচ্ছা যাদবদা, এই চারিদিকে যে ভায়োলেন্স চলছে, এ নিশ্চয়ই কবি হিসেবে আপনি সমর্থন করেন না?

—না। করি না।

—আর এই যে মিডিয়া এটা যেভাবে প্রচার করছে সেটা কি আপনার ঠিক বা উচিত কাজ বলে মনে হয়?

—দ্যাখো শমীন্দ্র...যাদব কথা শুরু করে...যাদবের কণ্ঠস্বর ভারী নয়। তাই চেষ্টা সত্ত্বেও যাদবের গলা গম্ভীর হতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু নিজে যাদব ভাবতে থাকে তার গলা বেশ ভরাট।

যাদব বলে যায়, দ্যাখো...যা সত্য তা প্রকাশ হওয়া উচিত। তবে তা কতটুকু বা কী মাত্রায় সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেলে তা সাধারণের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে না, তার একটি বিচার বা সামঞ্জস্য তৈরির দায় আমাদের আছে।

ছপাং, ছপাং, ছপাং।

ক্যামেরা কাজ করতে থাকে।

প্রশ্ন আসে, আমাদের মানে? আপনি কী মিডিয়ার কথা বলছেন? আমাদের মানে কাদের?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—আমাদের মানে এই সমাজের। সমাজের দায় এটা। শুধু মিডিয়াকে দোষ দিয়ে কী হবে?

আবার ছপাং, ছপাং।

যাদব আরও গম্ভীর হয়ে উঠতে চায়। তার মুখ থেকে স্বস্তির স্বাভাবিকতার শেষ রেশটুকু সে নিজেই মুছে নিয়ে বলে—আর কীভাবে এই দায় ঠিক ঠিক ভাবে আমরা বহন করতে পারব তাই নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

—আলোচনা?

—নিশ্চয়ই। সর্বস্তরে আলোচনা হওয়া উচিত।

হঠাৎই আলোচনা কথাটা দুবার উচ্চারণ করতে গিয়ে, যাদবের চোখ মেয়ের মুখে গিয়ে পড়ে। একটু দুরে দরজার কোনায় হেলান দিয়ে মেয়ে তাকিয়ে আছে।

—আচ্ছা মৃত্যুদণ্ড কি থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

যাদবের মুখ কঠোরতম হতে চায়।

কুঁচকে যায় ভুরু। যাদব বলে, আমি বলব—না কখনওই থাকা উচিত নয়। তবে-এ-এ...বলে যাদব অত্যন্ত চিন্তান্বিত মুখে ঘরের কোনার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থাকে।

আবার ছপাং ছপাং ক্যামেরা চলে। ওই নীরব মুহূর্তটুকু ধরে রাখা হল কবির।

—হ্যাঁ-অ্যা বলুন। বলে শমীন্দ্র সেন। বলেই হঠাৎ তার কী যেন খেয়াল হয়। সে বলে, একটু ইনটারাপ্ট করছি যাদবদা। এক সেকেন্ড। একটু দেখে নিই, এটা ঠিক ঠিক চলছে কি না।

বলে শমীন্দ্র সেন ছোটো টেপরেকর্ডারটি তুলে বন্ধ করে। কির কির করে ঘোরায়। আবার চালায় কড়াক করে। যাদবের গলা ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে বাইরের আওয়াজ। যাদবের স্বর তুলনায় গম্ভীর লাগে যন্ত্রে। শমীন্দ্র সেন আবার ঘোরায় রেকর্ডারটি ও পুরোনো জায়গায় রেখে বলে, বাইরের আওয়াজ একটু এসেছে। গাড়ির আওয়াজ। নিচের গলি দিয়ে একটা বাইক গিয়েছিল বটে। হ্যাঁ। দাদা বলুন। আপনি বলছিলেন, মৃত্যুদণ্ড থাকা উচিত কি না।

—না। নিশ্চয়ই থাকা উচিত নয়।

যাদব কথার মধ্যে বাধা পেয়ে তার বলার মুড হারিয়েছে। সেটাকে যথাসাধ্য ফেরত আনতে চেষ্টা করে, এবং এবার আর সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয় না। তবে আমিই-ই মনে করি, অপরাধের মাত্রা যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়...যাদব স্তব্ধ।

—যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়?

—সেক্ষেত্রে, অপরাধের মাত্রা এবং চরম দণ্ডবিধানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রচনার কথাও আমাদের বিবেচনাধীন থাকা উচিত। আমাদের মানে সমাজের। যা বিচারব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাকে বিপন্ন করবে না।

—আচ্ছা দাদা, আমার শেষ প্রশ্ন, একজন কবি হিসেবে আপনি কি আশাবাদী?

~ www.amarboi.com ~

—নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। অবশ্যই আশাবাদী।

নিশ্চয়ই। অবশ্যই...এই কথাগুলো বলার সময় যাদবের কেশবিরল মাথা ও শ্মশ্রুসহ চিবুক এমন ভঙ্গিতে উত্তোলিত হয়, যে মনে হয়, যাদব কথা বলছে না। উই শ্যাল ওভার কাম গাইছে।

তার গুল্লি গুল্লি চশমা, কাঁচাপাকা দাড়ি, পাঞ্জাবির পুট ঝোলা রোগা কাঁধ সমস্তটাই যেন এক সমবেত সঙ্গীত। কেউ কান পাতলে নিশ্চয়ই অলক্ষে ড্রামের আওয়াজও শুনতে পেত।

শমীন্দ্র সেনের মুখ খুশি খুশি হয়ে ওঠে।—মানে, সমাজের চারদিকে যা আনরেস্ট। এই উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যেও আপনি আশা রাখেন?

আবার উই শ্যাল ওভার কাম শোনা যায় যাদবের ভাবভঙ্গির মধ্যে।—নিশ্চয়ই। তাছাড়া...বলে এবার দেওয়ালের অন্য কোনায় তাকিয়ে চুপ করে থাকে যাদব। চিন্তান্বিত নীরবতার জায়গায় এবার অবশ্য উজ্জ্বল মুখে চুপ করে থাকা। তারপর মুখ খোলে—তা ছাড়া, সমাজ তো কোনোদিন শান্ত ছিল না। চাঞ্চল্য বা ক্ষোভ তো সমাজদেহে চিরকালই আছে। সমাজ চিরকালই ক্ষুব্ধ। পৃথিবীর ভেতরটা যেমন উত্তপ্ত চিরকালই, তেমনই।

শমীন্দ্র সেন একেবারে মুগ্ধ।—বাঃ! যাদবদা আপনি এত সুন্দর বলেন!

যাদব থামে না, বলে চলে, তবে উদ্বেগ থাকাও স্বাভাবিক। সেই প্রবাদটা জানো তো? স্নেহের স্বভাবই অমঙ্গল আশঙ্কা করা। ভালোবাসি বলেই নিকটজনের অমঙ্গল আশঙ্কা করি আমরা। সুতরাং উদ্বেগ থাকবে, কিন্তু নিরাশ হব কেন। এই যে আমার মেয়ে যখন বাইরে বেরোয় আমরা কি চিন্তা করি না কখন ফিরবে? বলে দরজার দিকে তাকিয়ে যাদব দেখে মেয়ে আর দাঁড়িয়ে নেই। কখন ভেতরে চলে গেছে। যাদব বলেই চলে, এর মধ্যে থেকেই কোনো সমীচীন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে আমাদের। মানে উদ্বেগটাই যেন সমাজের শেষ কথা না হয়।

—থ্যাঙ্ক ইউ দাদা। থ্যাঙ্ক ইউ। হাসিমুখে টেপরেকর্ডার তুলে নেয় শমীন্দ্র সেন। বলে, বাইরে খুব মেঘ করে এল দেখছি। রবি তোমার হয়ে গেছে তো?

—আর একটা। ক্যামেরা তাক করে রবি বলে, স্যার এই সোজা জানলার দিকে একটু তাকান। আচ্ছা এই তো।

ছপাং ছপাং।

—ও. কে. স্যার। অনেক কষ্ট দিলাম।

—না, না, কষ্ট আর কী! তোমরা কত দূর থেকে এলে, চা-ও খেলে না।

যাদবের মুখে আবার সেই এসো-বসো ভাব ফিরে আসে।

শমীন্দ্র সেন বলে, আপনার সঙ্গে একদিন সারাদিন আড্ডা দেব। কেমন!

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

যাদবের এই 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই' কিন্তু আগেরবারের মতো সেই উই শ্যাল ওভার কামের নিশ্চয়তা নয় এখন। কারণ যাদবও জানে, শমীন্দ্রও জানে, ওই সারাদিনের আড্ডা কোনোদিন হবে না। ওটা কথার কথা মাত্র।

~ www.amarboi.com ~

তিন

শমীন্দ্র আর ফোটোগ্রাফার রবি নেমে গেছে সিঁড়ি দিয়ে। ওরা বলেছিল, কোন্ দিকে যাবেন, আমরা এগিয়ে দেব? গাড়ি তো আছে। কিন্তু 'না' বলেছিল যাদব, কারণ শমীন্দ্ররা যাবে যাদবদের একেবারে উলটোদিকে। কী দরকার!

মেয়ে তালা লাগাচ্ছে দরজায়। যাদব তার ঝোলা আর ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ঝমঝম করে বৃষ্টি এসে পড়ল। মেয়ে তালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে সিঁড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।—ওঃ, কিছু দেখা যাচ্ছে না।

যাদব বলে, এ বৃষ্টি তো ছাতায় মানবে না, একটু দাঁড়িয়ে যাই।

মেয়ে দ্রুত তালা খুলে ঢুকে ফ্ল্যাটের জানলা বন্ধ করতে শুরু করে। সব ভিজে যাবে ইস। যাদবও হাত লাগায়। কেবল বাইরের ডাইনিং স্পেসে পৌঁছে বলে, এ-দুটো জানলা খোলা থাক বৃষ্টিটা একটু দেখা যাবে।

মেয়ে কিছু না বলে, সোফার হাতলে বসে বাইরে তাকায়।

দু-জনে চারতলার দুটো জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকে।

নারকেল গাছগুলো মাথা দোলায়। পাশের ছাদের জলের ট্যাঙ্কের নিচে আশ্রয় নিয়ে একটা কাক ভেজা ডানা ঝাড়ছে। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে জানলার নিচের গলিতে ঢুকছে একটা ম্যাটাডোর। তার ত্রিপলমোড়া পিঠে বসা ভেজা খালাসিদের হাঁকডাক।

মেয়ে বলল, যদু, একটা কথা বলব?

আনমনা ভাবে যাদব বলে, অ্যাঁ, বল।

—তোমার এই সাক্ষাৎকার দিয়ে কী হল?

যাদব অবাক, কী হল মানে? কী আবার হবে!

—কেন, কী কারণে তুমি দিলে এই ইন্টারভিউটা?

যাদব বোঝানোর চেষ্টা করে। একটা সামাজিক কারণে দিলাম বুকু। এটা একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন।

মেয়ে সোফার হাতল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা তাকাল যাদবের চোখে।

—আমি কি তোমার ইন্টারভিউ নিচ্ছি? নিচ্ছি না তো! তাহলে আমাকে সত্যি কারণটা বলো!

যাদব হতভম্ব।—সত্যি কারণ মানে?

—তুমি কি ভাবছ ওই স্মার্ট হ্যান্ডসাম ছেলেটাকে যা যা বুঝিয়ে দিয়েছ আমাকেও সেই সবই বলবে?

—মানে!—যাদব কিছু বুঝতেই পারছে না।

—মানে আবার কী! আমাকেও কি গলাটা ওইরকম গম্ভীর গম্ভীর করে, ওইসব সামাজিক দায়টায় বলে দেবে?

—বুকু!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—শোনো, কী কী হবে আমি বলছি। তোমার কাছে দুটো-তিনটে ফোন আসবে। কেউ বলবে দারুণ বলেছেন। কেউ বলবে খুব ব্যালান্সড। কেউ বলবে আপনার কমেন্টটা পড়লাম। আর কিছু বলবে না। অভিজিৎকাকু বলবে হয়ত, আমি আপনার সঙ্গে একটা পয়েন্টে এগ্রি করি না। চঞ্চলকাকু বলবে ওটা কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন। কি, বলবে তো?

—বলতে পারে।

—আমার বন্ধুরা, রুষা, তিষু, তিতির বলবে ম্যাডাম চ্যাটার্জিও বলতে পারেন, তোমার বাবার ফোটো দেখলাম কাগজে। কি, বলবে তো!

—তাও বলতে পারে।

যাদব কিছুই বুঝতে পারে না।

—তারপর! তারপর কী হবে?

মেয়ে সোজা তাকিয়ে আছে যাদবের দিকে। বৃষ্টির ছাট জানলা দিয়ে এসে তার শ্যামলা মুখের পাশে লম্বা ঝুলে পড়া চুলের ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশা হয়ে লাগছে। কিন্তু মেয়ের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাতে কুয়াশা নেই।

—কী হবে মানে?

মেয়ে হাত দিয়ে তার মুখের ওপর নেমে আসা চুলের গুচ্ছ সরায়। তার হাতে লেগে চুলের ওপর জমে ওঠা বৃষ্টি-কুয়াশা মুছে চুলের রঙে মিশে যায়।

—এই যে বাড়ি ঢুকে আমি যখন রুষাকে ফোন করলাম, বাসবীমাসি ধরল, ওরা সবাই কী ব্যস্ত হল। না, না। ওঁর কাজ আগে। ধীরেসুস্থে ওঁর কাজ শেষ করে তারপর যেন আসেন। আমরা ওয়েট করছি।

বলে মেয়ে চুপ করল। জোর ছাট আসছে বলে জানলার একটা পাল্লা বন্ধ করতে করতে বলল, কী কাজ এটা, যদু? এতে কী হল? কী হয়!

যাদব চঞ্চল বোধ করছে।—কী বলছিস কি, বুকু? সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য নেই? আমাদের এই কথাগুলো ছাপা হলে লোকে পড়বে। বুঝতে পারবে পরিস্থিতি।

—বুঝতে পারবে? তোমার কথাগুলো! যেগুলো বললে। মেয়ে হাসে।—কী পালটাবে ওই কথাগুলো, কী পালটাতে পারবে? ওর মধ্যে একটাও কোনো সত্যি আছে?

—সত্যি মানে?

—এই বাইরে যে বৃষ্টিটা পড়ছে। ওইরকম একটা সত্যি।

আঙুল দিয়ে বাইরেটা নির্দেশ করে মেয়ে।

—সত্যি, মানে কী?

—সত্যি মানে এটাও যে, কেউ সত্যি সত্যিই শুনবে না তোমার কথা। কোনো কিছু করবে না। আরও কিছু লোক আরও একবার তোমার কমেন্ট পড়বে কাগজে। আরও একবার তোমার ছবি দেখবে সবাই।

যাদব আজকে তার মেয়েকে ঠিক চিনতে পারছে না।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো মতে বলে, কী করে জানলি শুনবে না?

—বি অনেস্ট যদু। আজ তুমি যদি রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও তোমার পাশে কেউ জড়ো হবে! কেউ তোমার কথায় হল্লা করবে? দোকান আর দোকানের সাইনবোর্ড ভাঙতে যাবে কেউ? তোমার কথায়?

—না, তা অবিশ্যি যাবে না।

—কোথাও ওয়ান ফরটিফোর জারি হলে তা কি একদল লোক তোমার কথায় অমান্য করবে? আর তারপর দশ মিনিটের জন্য গ্রেফতার বরণ করবে? তারপর ছাড়া পেয়ে আবার যে যার অফিসে ফিরে যাবে? এসব হবে না তো? তাহলে?

—তাহলে? তুই কী বলতে চাইছিস?

—ম্যাক্সিমাম তুমি নিজেই ওই দলে ঢুকে গ্রেফতার বরণ করে নিজের মুখ রক্ষা করবে। আর কী।

বৃষ্টিটা একটু ধরেছে মনে হচ্ছে। বলতে বলতে, বন্ধ করা পাল্লাটা আবার খুলে ছিটকিনি আটকায় মেয়ে। আর বলে, বরং ওই বিলাস সরকার না কে তোমাকে ফোন করেছিল? এই ছেলেগুলো অনেক বেশি অনেস্ট।

—বিলাস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই অনশন না কী যেন? যাদব মনে করতে পারে।

—হ্যাঁ, যেখানে তুমি গেলে না। কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে গেলে না। আর যাবেই বা কেন...সেদিন দুপুরে অটোর সামনে বসে যেতে যেতে দেখলাম ওদের।

—কাদের?

—ওই বিলাস সরকারদের। যাদের কেউ চেনে না তোমাদের মতো। কী একটা A.I.S.A. লেখা প্ল্যাকার্ড। ছোট্ট একটা গ্রুপ। যাদবপুরের এইট-বি'র ওখানে, রাস্তার পাশে, একটা ডায়াস মতো করে তিন-চারটে ছেলে বসে আছে। ওপরে লেখা মণিপুরের বিশেষ সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হোক। মনোরমার জঘন্য হত্যাকাণ্ডের আমরা নিন্দা করি। স্লোগানও দিচ্ছে না কেউ।

যাদব কষ্ট করে মনে করে, ও হ্যাঁ, হাজরার মোড়েও যেন দু-দিন দেখেছি। কয়েকটা ছেলে। সঙ্গে দুই-একজন মণিপুরিও ছিল। কী একটা পি. এস. ইউ. লেখা। আর. এস. পি.-র ছাত্র সংগঠনও হতে পারে।

—উফ্ যদু। আমি পার্টির কথা বলছি না। বলছি মনোরমা। মণিপুর।

—মণিপুর? মনোরমা? যাদব মেয়েকে দেখতে থাকে। যেন আগে দেখেনি। এই বুকু অন্তত তার চেনা নয়।

—হ্যাঁ, মনোরমা। চারটে ছেলে চুপ করে বসে আছে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু তাদের। উশকোখুশকো চুল। সাধারণ পোশাক। বসে আছে। দোকানের সাইনবোর্ড ভাঙার জন্য দলে দলে লোক পাওয়া যায়। আর একটা মেয়ের ভ্যাজাইনায় অতগুলো গুলি করে মেরে ফেলল। সে মেয়েটার জন্য চারটি মাত্র ছেলে। চেঁচামেচি করছে না। বসে আছে। না খেয়ে।

~ www.amarboi.com ~

যাদব মিনমিন করে বলে, এ পি ডি আর-এর ছেলেরাও তো এ নিয়ে বলতে গিয়ে কোথায় যেন মার খেয়েছে শুনলাম। আর ওই অনশনের ব্যাপারটাও নাকি শেষ পর্যন্ত সাক্‌সেসফুল হয়নি।

—স্টপ যদু! স্টপ! মেয়ে উঠে দাঁড়ায়।—যদি না হয়ে থাকে, যদি ভেস্তে গিয়েও থাকে, তবে তোমাদের মতো লোকের জন্যই গেছে। ওদের মুখ আমি দেখেছি। ওরা মনোরমার কেউ নয়। তবু ছেলেগুলো যদি এক ঘণ্টাও না খেয়ে বসে থাকে, তবু, ওরাই মনোরমার আত্মীয়। ভাই, দাদা, বন্ধু। আর আমি জানি না! হয়তো, প্রেমিকও।

মেয়ের চোখ জলে ভরে ওঠে। গাল বেয়ে গড়িয়ে নামে জল। যাদবের এগিয়ে যেতে কেমন যেন সাহস হয় না। বলে, বুকু, অত ইমোশনাল হোয়ো না। সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লে চলবে না। যুক্তি দিয়ে বোঝ সব জিনিসটা। ব্যাপারটা খারাপ। খুব খারাপ। কিন্তু আমরা, কতটুকু করতে পারি। আমাদের ভেবে দেখতে হবে। চেষ্টা করতে হবে।

জলভরা চোখ জ্বলতে থাকে মেয়ের।

আবার ইন্টারভিউ দিচ্ছ? আমি তোমার জার্নালিস্ট নই। তোমার মনে আছে ওই মনোরমার মা, মাসি, কাকিমা, ঠাকুমারা সবাই কোনো পোশাক না পরে, একদম নগ্ন হয়ে প্রতিবাদে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। দেখেছিলে সেটা?

—হ্যাঁ। দেখেছিলাম। মাথা নিচু করে বলে যাদব।

—আমার জন্মদিনের উৎসবের মধ্যে দেখলাম, মনোরমার মা, মাসিমা, কাকিমারা নগ্ন হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আর উর্দিপরা অসম রাইফেলসের লোকগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে। কেমন পিছিয়ে যাচ্ছে। হাতে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও। তাই না!

যাদব বলে, হ্যাঁ। বন্দুক থাকা সত্ত্বেও...

মেয়ে ঘর থেকে ঘরে গিয়ে জানলাগুলো খুলে দিতে থাকে। বৃষ্টি ধরে এসেছে। আর আমাদের ঘর ভরতি তখন আমারও মা, মাসি, কাকিমারা! কেমন লাগত যদি ওরা বেরিয়ে পড়ত ঐভাবে রাস্তায়? তখনও কি তুমি সামঞ্জস্য, সমীচীন, সমাজের দায় এসব বলতে পারতে? তা ছাড়া বন্দুকের আর কি দাম বলো! দাম তো ওই উর্দিটার। ওই উর্দিটা পরে বলে ওরা বন্দুক নিয়ে যা খুশি করতে পারে। যেখানে খুশি গুলি করতে পারে। ওয়াক! ছুটে বাথরুমে ঢুকে যায় মেয়ে।

দরজার সামনে উদ্বিগ্ন, ভীত যাদব দাঁড়িয়ে বলে, বুকু, কি হল? শরীর অস্থির করছে? মুখে চোখে জল দাও। শরীর খারাপ করবে। এসব ভেব না। বুঝলে...

মেয়ে বেরিয়ে এসে বাথরুমের দরজায় দাঁড়ায়। সামনেটায় জলের ঝাপটা দিয়েছে। শান্তভাবে বলে, সরি! বলে এগিয়ে গিয়ে ফ্যানটা ফুল স্পিডে করে দেয়। তারপর আবার সোফার হাতলে গিয়ে বসে। তাকিয়ে থাকে বৃষ্টি শেষ হওয়া দুপুরের দিকে।

যাদব ধীরে ধীরে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাতটা কাঁধের ওপর রেখে বলে, বুকু, মানুষের সাধ আর সাধ্য তো মেলে না। বড় হও। বুঝতে পারবে। আমি বুঝিয়ে বলব। এখনও তো ছোটো আছিস।

~ www.amarboi.com ~

মেয়ে ঘুরে তাকায় যাদবের মুখের দিকে। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে বলে, আমি আর কত বড় হব নাদের আলি, কত বড়? আছে না, সুনীল গাঙ্গুলির কবিতায়?

যাদব বলে, হ্যাঁ, আছে।

মেয়ে বলে, যখন খুব ছোটো ছিলাম তোমার হাঁটু ধরে মুখ তুলে তোমাকেই সবচেয়ে বড় দেখতাম যদু। সবচেয়ে লম্বা।

যাদব হাসবার চেষ্টা করে, সেই অমিতাভ বচ্চনের চেয়েও লম্বা? না?

মেয়ে হাসে না। জানলার বাইরে তাকিয়ে বলে, সেদিন আমি যেমন তোমাকে অমিতাভ বচ্চনের চেয়েও লম্বা মনে করতাম, আজ এই টিভি চ্যানেলের লোকেরা, কাগজের জার্নালিস্টরা বিভিন্ন ব্যাপারে তোমাদের কমেন্ট যখন নেয়, ইন্টারভিউ যখন নেয়, তখন তোমরা ভাবে তোমাদের কথার খুব জোর। মতের খুব মূল্য। এটা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। অন্ধবিশ্বাসও বলতে পারো!

যাদব বলে, অন্ধবিশ্বাস? কীরকম?

জানো কি, তোমারও একটি উর্দি আছে। তোমাদের কবি-সাহিত্যিকদের উর্দি। তুমি লেখক, সেটাই, সেই পরিচয়টাই তোমার উর্দি। সেইটা গায়ে দিয়ে তোমরা যা বলো, মনে করো, সেটাই ধ্রুব সত্যি। গম্ভীর গম্ভীর করে বলো তো! কখনও বা একটু রাগ-রাগ করে বলো। গম্ভীর-গম্ভীর করে বললেই তো সেটা সত্যি হয়ে যায় না যদু, মিথ্যেই থাকে। যেমন ওই বন্দুক হাতে অসম রাইফেলসের লোকগুলি ইউনিফর্ম পরে রেপ করলেও সেটা রেপই হয়।

এই ব্যাগটা ধরো, জলের বোতলটা নিয়ে নাও তোমার ঝোলায়। ঝোলার মাঝখানে সোজা করে বসাও। ঠিক আছে?

বলতে বলতে মেয়ে বেরোনোর জন্য ছোটোখাটো গোছগাছ করে নেয়।—ছাতা দুটো ধরো। আমি তালাটা আটকে দিই। বলে মেয়ে দরজার সামনের কোলাপসিবল্ গেটটা টানে।

যাদব বলে, জানলাটা বন্ধ করলি না?

—না। করলাম না আর। তবে তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব।

—বল।

—এইসব ইন্টারভিউ দেওয়াগুলো এবার বন্ধ করো।

যাদবের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে যাদব বলে, কী করব বল, কমবয়সি ছেলেমেয়েগুলো এসে অনুরোধ করলে না বলতে পারি না।

—এবার না বলতে শেখো। নইলে কী হবে জানো?

—কী হবে রে?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাছে এসে মেয়ে থমকে ঘুরে তাকায়—ওর চোখে এবার হাসি!

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

—সেদিন আমার কথায়, নিজেকে যদি সত্যিই অমিতাভ বচ্চনের চেয়ে লম্বা বলে বিশ্বাস করে নিতে তুমি তাহলে কী হত? লোকে হাসতে শুরু করত তোমার হাবভাব দেখে। কী তাই তো?

—হ্যাঁ। হাসতই তো।

মোড় ঘুরে আর এবার নিচের মাটিতে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বলে, ভবিষ্যতের মানুষও একদিন তোমাদের এইসব ইন্টারভিউ, কমেন্ট, আর বিতর্ক নিয়ে ওইভাবে হাসবে। কারণ কথায় আর কাজে কোথাও মেলেনি তোমাদের। লোকে একদিন বুঝবে যে এগুলো শুধু নিজেদের প্রচার ছাড়া আর একবার নিজের ছবি আর নাম ছাপানো ছাড়া কিছুই ছিল না তোমাদের কাছে। ইউনিফর্মটা কিন্তু তখন বাঁচাতে পারবে না। তখন তো আর দল থাকবে না।

—দল? দল মানে?

—দল মানে ওই আর কি। ইন্টারভিউ নেবার দল। ভাঙচুর করার দল। সব কথায় 'হ্যাঁ' বলবার দল। গুজরাট আর ইরাক নিয়ে চেঁচিয়ে মণিপুরের ব্যাপারে চুপ করে থাকবার দল।

বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি এখনও হচ্ছে। ছাতা খুলে মেয়ে ধরল যাদবের মাথায়।

—চলো, অটো পেয়ে যাব সামনে।

ওরা দুজনে এগোয়। গাছের পাতা থেকে জল ঝরে পড়ে বড় বড় ফোঁটায়। মেয়ে বলে, দেখো ভিজো না। ইউনিফর্ম ভিজে গেলে জ্বর এসে যাবে।

যাদব তাকায় মেয়ের দিকে।

মেয়ে সুন্দর করে হাসে।

—সরি যদু। তুমি আমার বাবা, ঠিক। কিছু মনে কোরো না, সেইসঙ্গে এটাও ঠিক, তুমিও তো ওই দলেরই!

শারদীয় দেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোনালি তরল

সেইসব মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। বাবার মৃত্যু। মায়ের মৃত্যু। গোবিন্দকাকার মৃত্যু। অজানা অচেনাদের মৃত্যুও মনে পড়ে। বাবার মৃত্যুর কথা সে শুনেছিল মায়ের মুখ থেকে। বাবার মৃত্যু সে দেখেনি। কিন্তু মা এমনভাবে বলেছিল, দেখা গেছিল সব।

তোমার বাবা ঘুমোচ্ছিলেন। সারারাত পাশে ডাক্তাররা। তোমার বাবা সাড়া দিচ্ছিলেন না, জাগছিলেন না, দুটোর পর একবার হঠাৎ চোখ খুলে তাকালেন, কথা বললেন হেসে। জল খাওয়ানো হল। ডাক্তাররা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে গেলেন। তারপর তাঁদের দৌড়ে আসতে হল আবার—আধঘণ্টা পরেই। তোমার বাবা আবার ভেলকি দেখাচ্ছিলেন।

ভেলকি মানে কী, মা? ভাই জিজ্ঞেস করল।

ভেলকি মানে ম্যাজিক। আর এটা এমন ম্যাজিক যাতে মানুষ উবে যায়। আর ফিরে আসে না।

সে জিজ্ঞেস করল, বাবা যখন হেসে কথা বললেন, তোমাকে কী বলেছিলেন? কী কথা বলেছিলেন হেসে?

এই 'হেসে' কথাটা যখন সে বলছিল, নিজের সেই সময়ের চেহারাটা মনে পড়ছিল তার। মাথা নেড়া, মুখটা শুকনো ধরনের কাঁচুমাচু, ভয়ানক রোগা, ভাই মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে। সে মায়ের বাহুতে গাল রেখে বসেছে। আজও সে মনে করতে পারছে না সেদিন সেই বালক বয়সে বাবা কী বলেছিলেন এই প্রশ্ন করার সময়ে তার মনে বাবার স্বাভাবিক হাসিটা ফুটে উঠছিল। তখন তার বয়স ছিল আট। তারা তিনজনে, মাকে মাঝখানে নিয়ে সে আর তার ভাই, তাদের পুরনো খাটে শুয়ে-বসে আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাত কত হবে, এই দশটা-টসটা, সামনের টেবিলে মায়ের খাতার বান্ডিল। পাশে ডিকশনারি। তারা দুজন ঘুমিয়ে পড়বে এখন। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম একটু ভাঙলে দেখবে, তখনও খাতা দেখে যাচ্ছে মা।

তোমার বাবা হেসে বললেন, কি, আজ বাড়ি যাবে কখন? আমাকে দেখে উনি তো ভাবছেন তখনও ভিজিটিং আওয়ার্স চলছে। কে ওঁকে বলবে তখন রাত দুটো পার হয়ে গেছে।

সে বলে, তুমি কী বললে?

বললাম, কী করে যাব, তুমি যা ডোবাচ্ছ। আবার হাসলেন তোমার বাবা। তারপর ওই হাসিমুখেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। জানলার বাইরে ভটচায্যি বাড়ির অনেক নারকেল গাছ পেঁপে গাছ। একটা জানলা দিয়ে নারকেল গাছের বড় বড় ভিজে পাতায় নড়াচড়া দেখা যায়। অন্য জানলা দিয়ে চোখে পড়ে তাদের বাড়ির শিউলি গাছ, লেবু গাছ, গন্ধরাজ গাছের ভেজা পাতায় স্ট্রিট লাইটের আলো। আলো তাদের ঘরেও আছে। বড় আলো নেভানো। কিন্তু টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মায়ের খাতা দেখার টেবিলে। দূরে ট্রেন সিটি দিল।

ভোরের দিকে বিপদ কেটে গেল আবার। নার্স বলল, চা খেয়ে আসছি। আলো ফুটছে তখন। হাসপাতালের চত্বরের মধ্যে বড় একটা দেবদারু গাছ। তাতে পাখি আসা-যাওয়া করছে, ডাকছে। তোমার বাবা ভালোমতেই ঘুমোচ্ছেন দেখলাম। নিচু দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেল, খুব আওয়াজ। দমদম তো সামনে।

সে উত্তেজিত হয়, ওই, ওই প্লেনের আওয়াজ আমিও শুনেছিলাম। মামাবাড়ির বিছানায় আমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ভোরবেলায়।

আমি ভাবলাম, চোখেমুখে একটু জল দিয়ে আসি এবার। সারারাত একভাবে আছি তো। ভাবলাম, দেখি যদি কোথাও একটু চা পাওয়া যায়। হঠাৎ তোমার বাবার মাথাটা বালিশ থেকে হেলে গেল।

মা চুপ করে যায়। কী হল তারপর, বলো না মা, বলো না। ভাই অস্থির হয়।

নার্সের কাছে ছুটলাম। নার্স বলল, চা-টা খেয়েই যাচ্ছি। না এক্ষুনি চলুন। নার্স এল। এসেই দৌড়োল ডাক্তারদের ঘরে। ডাক্তাররা এল।

মা মশারি তুলে বেরিয়ে পড়ছে। বেরিয়ে, মশারি গুঁজে দিচ্ছে আবার। বাইরে বৃষ্টি জোর হল। মা টেবিলে গিয়ে বসে পড়ছে। টেবিল ল্যাম্পটা সুবিধে অনুযায়ী বেঁকিয়ে বসাচ্ছে। নাও, ঘুমিয়ে পড় এবার।

ডাক্তাররা কী বলল মা? কী বলল?

কী আবার বলবে? বলল, সরি। মা খাতা দেখতে শুরু করে দিয়েছে।

সে এখনও মনে করতে পারে বাবার হাসিটাকে। বাবাকে হাসপাতালের চত্বরে দাঁড়ানো সৎকার সমিতির গাড়িতে তোলার আগে, সে ঠিক বুঝতে পারেনি কি হয়েছে। কারণ, মা কাঁদছিল না। এপাশে ওপাশে দাঁড়ানো দু-একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। বাবাকে এখান

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

থেকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে, এমন আলোচনাও এই কদিনে বড়োদের মুখে শুনেছিল সে। তাই মামামণিকে জিজ্ঞেস করল, বাবা কোথায় যাচ্ছেন? অন্য হাসপাতালে? মামামণি বলেছিল, বাবা স্বর্গে চলে যাচ্ছেন। বলে, তার মাথাটা পেটের কাছে টেনে নিয়ে হু হু করে কাঁদছিল মামামণি। তার তাদের দু-ভাইকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করছিল। তার আগে-পরে আর কখনও অত আদর করেনি মামামণি।

সে অবাক হয়ে দেখছিল, বাবার নাকে তুলো গোঁজা। ঘুমোচ্ছে। আর ঠোঁটে একটা হাসির ভাব লেগে আছে। সারাদিন, সমস্ত রোগযন্ত্রণার মধ্যে যে হাসিটা থাকত বাবার মুখে সেটাই। কোনো মৃতদেহের মুখে আজ পর্যন্ত আর কখনও অমন শান্ত প্রসন্নতা দেখেনি সে। বলা দরকার, সেদিনই তার জীবনে প্রথম মৃতদেহ দেখার অভিজ্ঞতা হল।

দুই

মায়ের ব্যাপারটা এরকম নয়। আলাদা।

মা পান সাজছিল। ভাই পোষা গোরু-বাছুরদের জাবনা দিচ্ছিল। সে কুয়ো থেকে ছোটো একটা বালতি করে জল তুলে মাথায় ঢালছিল সাড়ে বারোটা নাগাদ। বাবার মৃত্যুর পর ২১ বছর কেটে গেছে তখন।

মা হঠাৎ বলল, বাবু ফ্যানটা চালিয়ে দাও তো।

সে বলল, কী করে যাব এখন। চান করছি দেখছ না।

ভাই বলল, গোরুগুলোকে খেতে দিয়ে দিন, যাচ্ছি।

মা ওয়াক তুলল। দড়ি থেকে একটা গামছা টেনে গা মুছতে মুছতে দৌড়োল সে। কী হল, শরীর খারাপ করছে নাকি মা?

মায়ের সারা মুখে ঘাম। বলল বেশি বেশি দোক্তা খেয়ে ফেলেছি তো, তাই বমি পাচ্ছে...বলতে বলতেই আবার ওয়াক উঠল। সে ফ্যান চালাতে গিয়ে দেখল বিদ্যুৎ নেই। স্নানের মতো ঘাম ঝরছে মায়ের। মাথার চুল লেপটে গেছে। ভাই ডাক্তার ডাকতে ছুটল। ডাক্তার যখন এল, মা আর চোখ খুলতে পারছে না। হিক্কার মতো বমির বেগ উঠছে। দু-একজন প্রতিবেশী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। মাকে ধরাধরি করে বিছানায় তোলা হচ্ছে। এতক্ষণ মেঝেতেই ছিল তো। মা হঠাৎ ডাক্তারের মোটা মোটা আঙুল চেপে ধরল চোখ বুজেই। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল আঙুলগুলো অচেনা। ডাক্তার বললেন, আপনাদের কাউকে খুঁজছেন বোধহয়। প্রতিবেশী এক মহিলা আশ্বাস দেন, আছে, আছে, ছেলেরা সব আছে। চঞ্চল হবেন না দিদি।

যেন শিশুকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। সারাজীবন মা দাপটে চলেছে। লোকে চিরকাল সম্ভ্রম করেছে তার মাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই মা কেমন হয়ে পড়ল!

সে ঝুঁকে তার হাত বাড়িয়ে মায়ের হাতটা ধরে, কিছু বলছ, মা?

মা বলে, দই-ভাত...দই-ভাত...

কথা জড়িয়ে গেছে একেবারে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে বলে, হ্যাঁ, দই-ভাত, কী?

চোখ বুজে কথা বলছে মা, দই পেতে রেখেছি...দই-ভাত...খেয়ে নাও...

এরপর মা আর কথা বলেনি। অ্যাম্বুলেন্সে শুইয়ে হাসপাতালে। হিক্কার মতো বমির ভাবটা এখন গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজে বদলে গেছে। সম্পূর্ণ অচৈতন্য। কিন্তু শ্বাস টানার প্রবল চেষ্টায় শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। চেপে ধরে রাখতে হচ্ছে বিছানায়। ঠেলে উঠতে চায় বিছানা থেকে। দ্রুতই সে কষ্টও বন্ধ হয়ে গেল।

সে আর তার ভাই বসে আছে বেডের দু-পাশে। অক্সিজেন। ড্রিপ। নার্স। ডাক্তার। আর চন্দন। চন্দন একবার এদিক ছুটছে, একবার ওদিকে। ডাক্তারেরা খুব চেনাজানা চন্দনের। চন্দন। ভাইয়ের বন্ধু।

কিছুক্ষণ পর একজন কর্মী এসে ড্রিপ ইত্যাদি খুলে নিতে লাগল। কী ব্যাপার! ডাক্তার এসে বললেন, শি ইজ নো মোর। উই আর সরি!

মানে-এ-এ? হতেই পারে না। ভাই চিৎকার করে উঠল। যে কর্মীটি অক্সিজেনের নল খুলছিল, ধাক্কা দিল তাকেও। লোকটি রাগ করল না।

কখন? কখন হল?

আপনাদের সামনেই তো হল। আপনারা সকলেই তো ছিলেন এ ঘরে।

লোকটি সব খুলে নিয়ে চলে গেল। চন্দন সামলাতে লাগল ভাইকে। আর লরির ব্যবস্থা করার জন্য লোক পাঠাল।

সে দেখল তার মায়ের ঠোঁট এক দিকে বেঁকে আছে। বেঁকে, শক্ত হয়ে আছে। মায়ের গালে হাত দিয়ে আদর করতে গিয়ে সে দেখল, অদ্ভুত এক ধরনের ঠান্ডা।

মায়ের ওই মুখটাই চিরকালের জন্য মনে থেকে গেল তার। অথচ মায়ের কত রকম মুখই তো সে দেখেছিল তিরিশ বছর বয়স অবধি। কত রকমের অভিব্যক্তি। মনে রইল শেষ মুখটাই। মায়ের মৃত্যু চোখের সামনে সে দেখেছে। মৃত্যু বলে খেয়াল করেনি।

তিন

চোখের সামনে আর একটি মৃত্যুও সে দেখেছিল এর আগে। সেটাই প্রথম। গোবিন্দকাকাকে দেখেছিল। প্রতিবেশী ছিলেন তাদের। কবিতা লিখতেন। বন্ধও করে দিয়েছিলেন লেখা। সে জিজ্ঞেস করত, এখন লেখেন না?

সময় পাই না লেখার। তবে ভাবি।

ভাবেন?

হ্যাঁ, শুনবে? বলতে শুরু করলেন একটা কবিতা। ছোটোদের জন্য লেখা। একটা মশা যাচ্ছে মরক্কো বেড়াতে। ছন্দে অন্ত্যমিলে গাঁথা তারই মজাদার বর্ণনা। বেশ লম্বাই কবিতাটি, বলে যাচ্ছেন মুখস্থ।

সে দেখছে পাশ দিয়ে লোক যাচ্ছে, রিকশা সাইকেল যাচ্ছে। তাকাচ্ছে কেউ কেউ। সে অস্বস্তি বোধ করছে না, তা নয়। কিন্তু গোবিন্দকাকার ভ্রুক্ষেপ নেই।

~ www.amarboi.com ~

কেমন লাগল।

দারুণ! যদি পড়ে দেখতে পারতাম বেশ হত।

পড়বে কী করে। লিখিনি তো। নানা কাজ থাকে তো, লিখতে বসার সময় কোথায়!

তারা দাঁড়িয়েছিল পাড়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের একদম সামনেই। সে বলেছিল, আমার বাড়িতে আসবেন একটু? আপনি বলবেন, আমি লিখে নেব। তারপর দিয়ে দেব আপনাকে।

ছেলেমানুষের মতো খুশি হলেন গোবিন্দকাকা। মাথার অল্পকটা চুল উশকো হয়ে আছে। রোদে পুড়ে ফরসা মুখ কালচে। আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছোটোখাটো মানুষটি হাঁটতে লাগলেন দৌড়ের মতোই দ্রুতবেগে। সে তাল রাখতে পারছে না। বাড়ি নিয়ে গিয়ে বসিয়ে মুখে মুখে শুনে কবিতাটি লিখে নিল সে। কাগজটা হাতে নিয়ে দু-একটা বদল বললেন। তাও করে দিল। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে বুকপকেটে রেখে বললেন, চলি।

বসুন একটু। ফ্রেশ করে কপি করে দিই।

না না, বাড়িতে একজন আসবে। বরং এটা তোমার কাছেই থাক। চলে গেলেন কাগজটা না নিয়েই।

কবিতাটি ধরে ধরে কপি করে বিকেলে গোবিন্দকাকার বাড়ি গিয়ে দিয়ে এল সে। গোবিন্দকাকার পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তারা সবাই স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে চলে যায়। গ্রীষ্মের বিকেলে উঠোনে বসে কাকিমা তোলা উনুন ধরিয়ে দিয়ে হাওয়া দেন। উঠোনের মধ্যে মস্ত পাতকুয়ো। উঠোনের পাশে একরাশ অবিন্যস্ত গাছপালা। আগাছা-জঙ্গলের এদিক ওদিক বুনো ফুল ফুটে আছে। গোবিন্দকাকাদের বাড়ির পাঁচিল ভাঙা। পিছনে ভূতোর বাগান নামে এক জঙ্গুলে ভাঙা বাড়ি। সেখান থেকে আগাছা আর সাপ লতিয়ে এসে এ বাড়িতেও ঢোকে।

কাকিমা বললেন, তোমার কাকা তো নেই, চলে গেছে কখন কে জানে! কিছু না বলে অমনি হুটহাট বেরিয়ে যায়।

সে ভাঁজ করা কাগজটা কাকিমার কাছে রেখে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ ওই ঝোপজঙ্গল ফুঁড়ে গোবিন্দকাকা বেরিয়ে এলেন। টাক মাথার অল্প উশকো চুলে শুকনো পাতা, পাঞ্জাবির কাঁধে একটা কলকে ফুল আটকে ছিল, হাঁটার তোড়ে নিচে পড়ে গেল। গোবিন্দকাকার হাতে একটা বেতের মোড়া।

আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। মাথায় এক্ষুনি একটা কবিতা এল।

তাই বুঝি!

কাকিমা বললেন, ও মা! তুমি কোথায় ঢুকে বসেছিলে? এদিক-ওদিক খুঁজছি, দেখছি না তো!

ও-ই জঙ্গলে বসেছিলাম। এই নাও, মোড়াটা রইল, আমি একটু বেরোচ্ছি। চলো তো চলো।

কাকিমা ক্ষুব্ধ। দ্যাখো মানুষের চালচলন! সারাদিন এইরকম টো-টো করে ঘোরা! কবে মাথা ঘুরে পড়ে থাকবে কোথায়।

~ www.amarboi.com ~

গোবিন্দকাকা বেরিয়ে এসেছেন। বললেন, কলম? সঙ্গে কলম এনেছো তো!

না। মানে। কলম তো আনিনি। কলম বাড়িতে।

চলো তবে তোমার বাড়িতে, চলো।

বলেই অবাক করে দিলেন গোবিন্দকাকা। ধুতি মালকোঁচা দিয়েই পরতেন। সোজাসুজি পথ, সামনের বড় রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে রবি পালচৌধুরিদের বিরাট বাড়ির পিছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।

দে চৌধুরিদের বাড়ির পিছনে ভূতোর বাগান। তার পিছনে গোবিন্দকাকাদের বাড়ি। আর রবি পালচৌধুরিদের বাড়ির পিছনে অনেক জংলা ঝোপঝাড় গাছপালা একটা মজা পুকুর। সেই পুকুরের ওপারের বাড়িটাতেই সে, তার মা আর ভাই থাকে।

দুটো বাড়িরই পিছনে জঙ্গল। দুটো বাড়িরই পাঁচিল ভাঙা।

গোবিন্দকাকা ঝোপঝাড় ভেঙে পুকুরের দিকে নেমে চললেন অকুতোভয়ে।

করেন কী! ও গোবিন্দকাকা! কত কাঁটাগাছ বিঁচুটি শেয়ালকাঁটা শুঁয়োপোকা সাপ... এদিক দিয়ে কি দরকার যাওয়ার?

ধীরেন কুণ্ডুর বাড়ির পাশের সরু গলি দিয়ে প্রায় ছুটছেন তখন। ওই তো পুকুরটা। ওটা পেরলেই তো তোমাদের বাড়ি। দেরি করলে লেখাটা মাথা থেকে উবে যাবে। চলো। চলো।

পুকুরের ঢাল দিয়ে তারা নামছে, কিনার দিয়ে বেড় মেরে পুকুরটাকে পার হলেই ওপারে, ঢালের উঁচু দিকটায় একটা তুলসী মঞ্চ হেলে পড়েছে বাইরের দিকে।

ওটাই তাদের বাড়ি।

ওদিকে এগোতেই দুটি বালককে দেখা গেল ঝোপঝাড় ছত্রখান করে দৌড়ে ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। একজন অচেনা। অন্যটি গোবিন্দকাকার ছোটো ছেলে। দুজনেরই হাতে দুটি পাটকাঠি দিয়ে তৈরি ছিপ।

গোবিন্দকাকা বললেন, ছোটোটা। ওফ্! মাছ ধরছিল। বাবাকে দেখে পালাচ্ছে। ইস্কুল কামাই করে...

সে বলে, এখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে গোবিন্দকাকা। এখন ইস্কুল কোথায়?

তবে যে বলল, পড়তে যাবে মাস্টারের কাছে?

উঁচু পাড়ের ওপর রাস্তা। বালক দুটি ছিপ উঁচু করে মিলিয়ে গেল সেখানে।

সে পরের দিন বালকটিকে দেখতে পায়। বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। ডেকে জিজ্ঞেস করে, কালকে নিশ্চয় গোবিন্দকাকা বকলেন তোকে? কী বললেন?

বালকটির হাতে একটি ইয়ো-ইয়ো। সে একমনে ইয়ো-ইয়োর চাকাটি একবার সামনে ছুড়ে দিয়ে, আবার, সুতোর টানে সরসরে করে নিজের হাতে ফেরত নিয়ে আসছে। অর্ধমনস্কভাবে উত্তর দেয় বালকটি, বাবা বলল, মাছ পেয়েছিলি? আমি বললাম না পাইনি। বাবা বলল কী দিয়ে ধরছিলি? আমি বললাম, আটার গুলি দিয়ে। বাবা বলল, আটার গুলি দিলে কী মাছে খায়? কেঁচো দিবি, কেঁচো। নারানের দোকানে পাওয়া যায়। না, বকেনি তো।

~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন পর হঠাৎ সে শুনল গোবিন্দকাকা হাসপাতালে। জ্বর চলছিল তিন-চারদিন। আজ ভোরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়নি। একটা ম্যাটাডোরে শুইয়ে হাসপাতালে আনা হয়েছে।

সে পৌঁছে দেখল গোবিন্দকাকার জ্ঞান নেই। নাকে নল। হাতে নল। মুখটা খোলা। মাঝে মাঝে তলার চোয়ালটা হেঁচকির টানে উপরে উঠে এসে আবার খুলে গিয়ে ঝুলে পড়ছে। সাধনদা, একটু একটু ডাক্তারি জানে, বলল, গ্যাসপিং হচ্ছে, বুঝলি, গ্যাসপিং।

আরও চারদিন চলল এরকম অবস্থা। কাকিমা বিকেলে এসে ফিরে যান। ছেলেমেয়েরা সবাই সারাদিনই বসে থাকে হাসপাতালে। এই মুহূর্তে অবশ্য সকলেই এক এক করে বাইরে চলে গেছে। একা সে শুধু বসেছিলে বেডের পাশের টুলে।

এই চারদিনে দুটি হিক্কার মধ্যবর্তী সময় অনেকটা বেড়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর পর একটি হিক্কা আসছে। গোবিন্দকাকার চোখ দুটি অচৈতন্য অবস্থায় খোলা পড়েছিল দৃষ্টিহারা। মস্তিষ্ক তখন পলক ফেলবার সংকেতও চোখে পৌঁছে দিতে অপারগ। ফলে ডাক্তাররা চোখের পাতা দুটি বন্ধ করে তার ওপর তুলে রাখা স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে আটকে দিয়েছেন। নইলে চোখের ভিতরটা ক্রমাগত হাওয়া লেগে নষ্ট হয়ে যাবে।

সে হঠাৎ খেয়াল করল বেশ অনেকক্ষণ সে বসে রয়েছে, একবারও তো হিক্কা ওঠেনি! সে সাধনদাকে ডাকল। সাধনদা নার্সকে ডাকল। নার্স ডাক্তারকে ডাকল। ডাক্তার বলল বাড়ির লোক কে আছেন? ডাক্তার বলল, সরি।

এটাও তার চোখের সামনে হল। কিন্তু সে লক্ষ করেনি, কখন কীভাবে শরীর ছেড়ে চলে গেছে শেষনিশ্বাস। বাইরে কালো একটা লম্বা বেঞ্চের ওপর বসেছিল গোবিন্দকাকার তিন মেয়ে। এ ওর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছিল। তাদের ফোঁপানির শব্দ পিছনে রেখে সে বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে।

কদিন পরে হঠাৎ সে আবিষ্কার করল গোবিন্দকাকার একটা চশমার খাপ রয়ে গেছে তাদের বাড়িতে। প্রায়ই তো এসে বসতেন। চশমার খাপ ফেলে চলে গেছিলেন। কেন না, নতুন একটা চশমা কিছুদিন আগেই করিয়েছিলেন। তাই পুরোনো চশমার খাপটা হয়ত অপ্রয়োজনীয় ভেবে আর খোঁজ করেননি।

স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখন নিশ্চয়ই মূল্যবান। এই ভেবে, সে একদিন সেটা পৌঁছে দিতে গেল কাকিমার কাছে।

কাকিমা তার ডাক শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সেটা গ্রীষ্মকাল। বাড়ির মধ্যে ঝোপ-জঙ্গলে লাল লাল ফুল ফুটে আছে। কুয়োর ঠিক পিছনেই শিয়ালকাঁটা উঠেছে, ফুল ফুটেছে তাতেও। কাকিমা খাপটা নিলেন। চোখের জল মুছলেন আঁচলে। বললেন, ওই রান্নাঘরটা ভেঙে পড়ছে। বারান্দার ধারে বসে রান্না করি। ছেলেমেয়েরা কলেজে বেরিয়ে যাওয়ার পরে, এক একদিন বারান্দা দিয়ে ঘরে যেতে যেতে মনে হয়, বলে ঝোপঝাড়ের দিকে আঙুল দেখালেন কাকিমা।

~ www.amarboi.com ~

মনে হয়, দেখছি তোমার কাকা বসে আছে মোড়া পেতে। ওই জঙ্গলের মধ্যে টাকটি ফুটে আছে। আগে যেমন থাকত।

তার মনে পড়ল, ওখানে মোড়ায় বসে থাকতেন গোবিন্দকাকা, গাছপালার মধ্য দিয়ে কেশবিরল মাথাটি দেখা যেত বটে।

গোবিন্দকাকার সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল এক বিকেলবেলায়। সেদিন একটু আশ্চর্য লেগেছিল গোবিন্দকাকার ব্যবহার। কবি বা লেখকসুলভ কোনো চালচলন ছিল না ভদ্রলোকের। না কথায় প্রসাধন, না পোশাকে। সাদাসিধে সহজ মানুষ। সেদিন পুকুরের ঢালের ওপরে বাঁক ঘুরতেই গোবিন্দকাকার মুখোমুখি। তাঁর হাতে একঝাঁক বাঁদরলাঠি ফুলভরতি ডাল। পরে আছেন ক্ষারে কাচা হলদে ধরনের খদ্দরের পাঞ্জাবি। হাতের ফুলগুলো ঝকঝকে হলুদ। আর শেষ বিকেলের আলোয় তখন বাড়ির দেওয়াল, গাছের পাতা, আকাশের মেঘ সবই হলদে রঙে রাঙানো।

সেকি গোবিন্দকাকা? এত ফুল!

বুঝলে, ভেঙে আনলাম। তিন মেয়েকে বাড়ি ফিরে এই তিনটে ডাল দেব। ওদের তো তেমন কিছু দিয়ে উঠতে পারি না। কিন্তু আমি তো কবি। ভাবলাম, আমার তো এক্তিয়ার আছেই। তিনটে ফুল ভরতি ডাল দিলে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হবে। ঘরে রাখবে। সাবধানে নিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে না ঝরে পড়ে।

সে বলল, অনেকদিন আপনার খবর নেওয়া হয়নি গোবিন্দকাকা, আসবেন একদিন। কিংবা আমিই যাব। এখন আর লিখছেন না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। লিখছি লিখছি। তবে মনে মনে। কাগজে কলমে নয়। শুনবে? এস, কাছে এস। চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর। পুকুরের ধারে কুল গাছতলায় দাঁড়িয়ে এতগুলো ফুলভরতি ডালের ওপর রৌদ্রহরিদ্রা নিয়ে, গোবিন্দকাকা শোনাতে লাগলেন না-লেখা হওয়া কবিতা।

এখানে বিশেষ লোক চলাচল করে না। অনেক ঝোপঝাড় দু-পাশে। কাজেই শহরে বড় ড্রেনের গভীর নালা। পিছনে পলেস্তারাখসা গাড়ির ওপর বোর্ড; নারীকল্যাণ সমিতি। শটকার্ট করার জন্য একটা ভ্যান রিকশা চলে গেল।

আসুন গোবিন্দকাকা, বাড়িতে গিয়ে বসি।

নাঃ। আজ আর যাব না।

কেন, কেন! এইটুকু তো পথ। চলুন।

সত্যিই কুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পুকুরের ওপারে তাঁদের পাঁচিলভাঙা বাড়িটি দেখা যাচ্ছিল। হেলে পড়া তুলসী মঞ্চ। এমনকি বারান্দার তক্তপোশটা পর্যন্ত বিকেলের মায়াবী রোদ্দুরে স্পষ্ট। তাদের বাড়িতে ও বাড়ির চারপাশে অনেক গাছ থাকায় তাদের বারান্দা ও উঠোনটিকে এই দূরত্ব থেকে ছায়ারৌদ্রে মেশানো একটি শান্তিপল্লি মনে হয়।

সে বলে, চলুন না, গোবিন্দকাকা। কবিতাটি খুব ভালো লাগল। আপনি বলবেন, আমি কপি করে দেব।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুখটা কেমন একটা হয়ে গেল গোবিন্দকাকার। বললেন, দরকার নেই। মনে মনে ভাবলেই চলবে। এই তোমাকে শোনালাম। এই তো বেশ হল। লিখে রাখার দরকার কী আর!

মানে?

লিখে রাখলেই তো ছাপতে দিতে ইচ্ছে করবে। ছাপতে দিলে কেউ যদি ছাপতে না চায়? যদি না বলে? তার চেয়ে এই বেশ ভালো। মনে মনে লেখা। তাই না!

ফুলগুলো যাতে ঝরে না যায় সেই জন্যেই নিজের স্বাভাবিক গতির চেয়ে অনেক ধীরে ধীরে কুল গাছের বাঁক ঘুরে মিলিয়ে গেলেন গোবিন্দকাকা। সে দাঁড়িয়ে রইল।

চার

সে এরপর গোবিন্দকাকাকে দেখেছিল একেবারে তাঁর মৃত্যুশয্যায়। যখন তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

এইরকম সব মৃত্যুর মুখ মনে পড়ে আজ। কতদিনের চেনাজানা মুখ সব, কেমন অজানা-অচেনা হয়ে যায় মৃত্যুর সময়। সে মুখ একবার দেখলে, বাকি জীবন শুধু ঐ মুখচ্ছবি মনে থেকে যায়। জীবিত মুখের স্মৃতির ওপর বারবার উড়ে এসে বসে মৃত মুখটি। শুধু চেনা জানাদের মুখ নয়। অচেনা মুখ।

শিয়ালদহ স্টেশনে এসে টিকিট কেটে ট্রেন ধরতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে সে। রাত নটার ট্রেন ধরতে হবে তাকে। দেখল, প্ল্যাটফর্মের ঠিক বাইরে একজন লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে। লোকটিকে একটু দূর থেকে লক্ষ করছে কয়েকটি স্টেশনবাসী বাচ্চা। বাচ্চাগুলোর পোশাক নোংরা, চুল রুক্ষ, পায়ে জুতো নেই কারও। একজন মহিলা এসে চড় মারতে মারতে দুটো বাচ্চাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। বলল, লাশের কাছে যাচ্ছিস কেন? পুলিশ আসবে না এক্ষুনি?

লাশ? শুয়ে থাকা লোকটাকে দেখল সে। উলটো দিকে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল একজন। চালচুলোহীন চেহারা দেখে তাকেও প্ল্যাটফর্মবাসী বলে মনে হয়। যুবক বয়স, চোখের দৃষ্টি কেমন কেমন। পাগল কি? নাকি খুব গাঁজা খেয়েছে? পাগল একটু অপ্রস্তুত ধরনের হাসল তার দিকে। বলল... এই লোকটা... এসে শুয়ে পড়ল... এখানে। ছটফট করল... মরে গেল।

মরে গেল?

তিনটে গাড়ি... ছেড়ে চলে গেছে... নড়ছে না।

তিনটে ট্রেন চলে গেছে, তাও নড়েনি? কোথাও যাবে বলেই স্টেশনে এসেছিল নিশ্চয়। সে দেখল লোকটার পরনে পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে একটা বাজারের থলির মতো ব্যাগ। পায়ের এক পাটি চটি খুলে কাছেই পড়ে আছে। চুল কাঁচাপাকা। চোখে চশমা। চশমার নিচে সোজা চেয়ে থাকা স্থির হয়ে যাওয়া চোখ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। মাছি উড়ছে সামনে। কোথায় যাচ্ছিল লোকটা? ফিরে যাবার মতো ঘর একটা আছে নিশ্চয়ই। যেতে যেতে শুয়ে পড়েছে। মরে গেছে।

~ www.amarboi.com ~

সেই মুখটাও মনে পড়ে। যে মুখটিকে মৃত্যুর পরেই মাত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিল সে। সে মুখ আর তার পিছু ছাড়ল না।

সে এখন ছাপান্ন। একান্নতে বাবা গিয়েছিলেন। তার ফ্ল্যাটের পিছনে লম্বা একটা মাঠ। মাঠ, দুপুরবেলা বৃষ্টি দেখায়। রাত্রে, জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে বক এসে বসে। ভোরে উঠলে দেখা যায় মাঠে ধীরে ধীরে বিছিয়ে যাচ্ছে রোদ্দুর। ঘাসের ওপর এসে পড়া রোদ্দুরের কণায় কণায় ঋষভ কোমল হয়ে ছড়িয়ে আছে।

এই একটা দিন শুরু হল। এই দিনটার পর আসবে আর একটা দিন, তারপর আর একটা। এই রকমই একটা দিন আসবে যা হবে মৃত্যুর দিন। যে অজস্র দিন ও রাত সে কাটিয়েছে তেমনই একটা দিন বা রাত এসে পড়বে তার মৃত্যুর সময়কে সঙ্গে নিয়ে। তাতে কোনো ভুল নেই।

তেমন কোনো কাজও আর নেই তার। মেয়ের আর একটু বড়ো হওয়া। তার বিয়ে দেওয়া। দেওয়া কেন? এসব ব্যাপার নিজেদের ঠিক করাই ভালো। বাবা-মা ঢুকবে কেন এর মধ্যে? তারা শুধু ব্যবস্থা করবে। সেটা একটা কাজের মধ্যে পড়ে।

সে কাজটা বাকি আছে বটে। হয়ে যাবে। সে না থাকলেও ও কাজটা হয়ে যাবে। তার কিছু কিছু লোন আছে। সাংসারিক কারণে নিতে হয়েছে। সেসবও শোধ হয়ে যাবে। নিজের বলতে কোনো কাজ আর নেই তার। মৃত্যুর দিকে, প্রতিদিন, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া দিনগুলোয় তেমন কোনো লক্ষ্য নেই।

খুব কি কষ্ট হবে? খুব? শেষ মুহূর্তের ওই কষ্টটাকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না, না? যে কষ্টের পরে আর কোনো নিরাময়ের স্বস্তি উপভোগ করতে পারবে না জীবন? যে কষ্টের পরে আর কোনো জেগে ওঠা নেই?

সে, রাত্রিবেলা, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে আসে। রান্নার জায়গাটায় গিয়ে জলের বোতল তুলে জল খায়। প্লাস্টিকের কৌটো খুলে একটা বিস্কুট খেল কোনোদিন। দূর দিয়ে চলে গেল নাইটগার্ডের বাঁশির শব্দ। মেয়ে আর মেয়ের মা ঘুমন্ত। সকালে সব জেগে উঠবে। শুধু মৃত্যুর পর কেউ জেগে ওঠে না। মিউট করে টিভি চালিয়ে অন্ধকারে বসে রইল সে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল। একটা পেঁচা উড়ছে রাত্রিবেলার আকাশে।

নিজের ঘরে এসে দ্যাখো, জানলা ঘেঁষে রাখা তাঁর লেখার টেবিলে বসে টেবিলল্যাম্পটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছে মা। করে নিল। তারপর গোল করা পরীক্ষার খাতার বান্ডিলের গারডারটা খুলে খাতাগুলো সমান করতে লাগল। মুখ তুলে মা বলে, একটু সহ্য করবে। কী হয়েছে তাতে! বেশিক্ষণ থাকবে না কষ্টটা। জন্মেছ যখন ওইটুকু তো সইতেই হবে। যাও, যখন হবে তখন দেখা যাবে। এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

তাড়াতাড়ি ফিরছে সেদিন অফিস থেকে। শেষ বিকেলের আলো ছড়িয়ে আছে। ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে আসছিল বাসটা। চারপাশের গাছপালায় বৃষ্টি পরবর্তী কোমলতা। শরৎ শেষ

~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেল। বৃষ্টি এখন আসে আর যায়। স্টপে নেমে গলিরাস্তা ধরেছে সে। এই জায়গায় কেমন একটা গাছ-গাছ সবুজ-সবুজ মফস্‌সল ভাব রয়ে গেছে। আশপাশের বাড়িতে শিউলি আর হাসনুহানা। একটু দূরে একটা ছাতিম। সব গাছেরই গা থেকে বৃষ্টিভেজা গন্ধ আসছে। গলিটা দুদিকে ছড়িয়ে গেছে ইংরেজি ওয়াই-এর মতো। সে বাঁ-দিক নেবে। সেখানে বড় একটা নালা। নালার পাশেই ছোট্ট পার্ক। মধ্যের একটু ঘাসজমিতে বড় বড় ঘাসের প্রান্ত ভিজে রয়েছে। শেষ রোদ পড়েছে তার ওপর।

ডানদিকের রাস্তাটা থেকে গোবিন্দকাকা বেরিয়ে এলেন। চোখে, অন্ধদের কালো চশমা, চশমার নিচে থেকে দুটো ভ্রুর ওপর সাদা তুলো বেরিয়ে। মাথার ওপর দুটো শুকনো পাতা আটকে আছে। হাতে বাঁদরলাঠি ফুলের ডাল। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বললেন, তিন মেয়ের তিন জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে তো। বাড়িটাও প্রোমোটরকে দিয়ে দিয়েছে ছেলেরা। বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট উঠছে। এই ডালগুলো নিচে পড়েছিল, তুলে আনলাম। বাড়ি ফিরছ?

হ্যাঁ গোবিন্দকাকা।

আমি কিছু বুঝতে পারিনি, জানো।

বুঝতে পারেননি?

গোবিন্দকাকা হাসলেন। না। কিচ্ছু টের পাইনি। জ্বর হয়েছিল। একটা ঘোরের মতো। মাথাটা খুব ভার। ব্যস।

হাসলেন আবার। যা দেখার তোমরা দেখেছ।

মেনিনজাইটিস, গোবিন্দকাকা। তাই বলেছিলেন ডাক্তাররা।

হবে হয়ত। তাতে আমার আর কী বলো!

আপনার চোখে কী হয়েছে গোবিন্দকাকা? দেখতে অসুবিধা হয়?

কই, কিছু হয়নি তো! বলেই চোখ থেকে কালো চশমা খুলে ফেললেন। তুলোর দুটো গোল্লা দুটো চড়ুই পাখি হয়ে ফুড়ুত করে উড়ে গেল। চোখের দৃষ্টি আগের মতো স্বচ্ছ, ঝকঝকে।

দেখছ তো, আসলে কিচ্ছু হয়নি আমার!

ছয়

ভোরের দিকে একটা প্লেন গেল নিচু দিয়ে। পাখি ডাকছে। মাঠটা কেমন নীলচে সবুজ। আজ রবিবার। এখনই একটু ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিলে ঘুমোতে পারবে সে। আজ মা-মেয়ে কেউ বাড়ি থাকবে না। সারা রাত জেগে থাকার পর ভাগ্যিস আজ রবিবার। টেলিফোনের তারটা খুলে দিয়ে ওষুধের ব্যাগ বার করল সে। পিলটা মুখে ফেলে জল খেল। জানলার পাল্লা দুটো ভালো করে খুলে দেবে বলে ঝুঁকতেই দেখল পিছনের মাঠে উবু হয়ে বসে বাবা। সেখানে অনেক ফুলগাছ, ঠিক তাদের ছোটবেলার উঠোন-বাগানে যেমন গাছ করতেন বাবা তেমনই। বাবার হাতে খুরপি। ফুলগাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছেন। মুখ তুলে

~ www.amarboi.com ~

বাবা বললেন, ঘুম খুব ভালো জিনিস। এই তো আমার কথাই দ্যাখো। আমি তো ঘুমিয়েই ছিলাম।

মাথাটা যে হেলে গেল তোমার, বালিশ থেকে হেলে গেল।

সে তো তোমার মা দেখেছে। আমি তো আর দেখিনি। ঘুমোও, ঘুমিয়ে নাও। ঘুমোলে সব দুশ্চিন্তা চলে যাবে। মৃত্যুর দুশ্চিন্তাও।

বাবার মুখে সেই শান্ত হাসি লেগে আছে। ভোর হচ্ছে মাঠের পিছনে।

সাত

অফিসে নিজের সিটে বসে আছে সে। পাশেই কাচের জানলা। জানলা দিয়ে দূরে একটা উঁচু বাড়ির ছাদ দেখা যায়। সামনেও একটা তিনতলা বাড়ির ঘোরানো অর্ধেক বারান্দা। সেই বারান্দায় চন্দন দাঁড়িয়ে।

চন্দন, তুমি আমার মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য লরির ব্যবস্থা করেছিলে। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় লরির ব্যবস্থা কে করল?

এই জানলা থেকে বারান্দার দূরত্ব বেশ অনেকটা। নিচে তাকালে বোঝা যায় একটা রাস্তা আছে মাঝখানে। যান চলাচল করছে। কিন্তু চন্দনের কথা এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। তাকে চেঁচাতে হয় না।

রতন বোধহয়। শালাবাবুও হতে পারে। ভোলা, চানা, পরেশ। হতে পারে যে কেউ। মনে করতে পারছি না এখন।

তোমার কি ভয় করছিল, চন্দন?

ভয়? নাঃ। করেনি তো। শীত করছিল। খুব শীত।

ছ-ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। সিংহের কেশরের মতো ঝাঁকড়া চুল। চন্দন দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার রেলিং ধরে। শান্ত আর অন্যমনস্ক একজন অ্যাথলিটের মতো দেখাচ্ছে তাকে। যার এই মুহূর্তে মনে নেই কি প্রবল শক্তি তার পেশির মধ্যে পুঞ্জিত হয়ে আছে।

চন্দনের ঘাম হচ্ছিল খুব। সবাই জল ঢেলেছিল। অনেক জল। ভাবছিল গরম লাগছে, বুঝি, তাই ঘাম। গরম পড়েওছিল বটে। মে মাসের শেষ দিক সেটা।

ঘরে তোলা যাচ্ছে না বড়সড় শরীর বলে। বারান্দায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। সরবিট্রেট এগিয়ে দিল পাশের বাড়ির শিবু। নিল না চন্দন। বলল, না রে সরবিট্রেটের কেস এটা নয়।

কথা বলছিল তখনও।

চন্দন ডাক্তারি জানত অনেক। তাই বলল, দুটো নসিফার দে। গ্যাস হয়েছে। তাই এমন হচ্ছে। পরে আরও একটা নফিসার খেল। শীতে কাঁপতে লাগল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল।

কেন সরবিট্রেট মুখে দিলে না, চন্দন?

চন্দন হাসল, ভুল হয়ে গেল, বুঝলেন। ভুল হল। এই সময় ভুল হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেন ভুল হল? যন্ত্রণা? যন্ত্রণা কি তোমাকে বোঝায়নি এ যন্ত্রণা যে কোনো যন্ত্রণা নয়? এর নাম মৃত্যুযন্ত্রণা।

মৃত্যুযন্ত্রণা কি বারবার হয় কারও, যে চিনতে পারব। একবারই হয়। এবার শব্দ করে হাসল চন্দন। তখন তাকে মৃত্যুযন্ত্রণা বলে মনেই হয় না।

চন্দন এখন দাঁড়িয়ে আছে দূরের বাড়ির সবচেয়ে উঁচু ওই ছাতটায়। কিন্তু তার কথা কি স্পষ্ট।

ধুস্। কী এমন যন্ত্রণা! বুকের একদিকে একটা ভার। একটা চাপ। তারপর ছুঁচ ফোটার মতো ব্যথা। আর সঙ্গে ঘাম। মনে হয় যেন চান করছি। তখন বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যায় না, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। এই তো, এইটুকুর মধ্যে মৃত্তু... যন...ন্ত্রণআ... হা হা আবার কোথায়। হা হা।

হাসছ?

ঘাবড়াচ্ছেন তো? ঘাবড়াবেন না। এমন কিছু না। একটু শীত করে শুধু। চাট্টি লোক ভিড় করে আসে। একটু হুটোপাটি হয়। তেমন কিছু টের পাওয়া যায় না। এই আপনার দোষ! সব ব্যাপারে বড় আগে থেকে ঘাবড়ে বসে থাকেন। এ কি আপনাদের দীর্ঘ কবিতা লেখা নাকি? তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে...মরে যেতে...একটা মানুষের মরে যেতে...কবিতা লেখার চেয়ে অনেক কম সময়... এ হে... হা... হা...

আবার হাসতে লাগল চন্দন। যেন কলকাতার সবচেয়ে উঁচু ছাতে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাওয়ায় ওর চুল কখনও উড়ত না। আজ উড়ছে। উড়তে উড়তে চুলগুলো লকলকে আগুনের শিখা হয়ে গেল। ওর ঝাঁকড়া কেশরের মতোই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আগুন এখন ওর মাথায়। শায়িত একটা অগ্নিময় শরীর সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ভেলার মতো ভেসে চলে গেল দূর অস্তমেঘের ভেতরে।

আপনার ফোন। শুনছেন? আপনার ফোন? পিছনের সিট থেকে সহকর্মীর ডাকে উঠে গিয়ে ফোন ধরে সে। কথা বলবার সময়ও তার চোখে ভাসছে চন্দন। অতখানি আগুনের মধ্যে চন্দনের মুখ হাসিতে জ্বলছে।

ভাগ্যিস চন্দনের মৃত্যুমুখ সে দেখেনি। ভাগ্যিস সে তখন অনেক দূরে ছিল। এসে পৌঁছোতে পারেনি শ্মশানে। ভাগ্যিস।

আট

যে দিনগুলো আসছে যে তারিখগুলো আসবে পরপর, এসেই চলবে, তাদেরই একটির মধ্যে আছে মৃত্যুর তারিখ। ভবিষ্যতে ওই তারিখটায় পরিজনরা মালা চড়াবে ছবিতে। প্রথমদিকে বেশি বেশি মনে পড়বে, তার পরে কম কম। কথা উঠলে বলবে সেটা তো অমুক মাস ছিল, অমুক বার আর অমুক তারিখ।

তারপর ভুলে যাবে সবাই।

যাক। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু শেষ মুহূর্তের শ্বাস নিতে না পারার চাপ? সেটা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এড়ানো যাবে কী করে? একবার বেঁচে থাকবার সুযোগ যে পেয়েছে, মরবার যন্ত্রণা তো তাকে পেতেই হবে। তাছাড়া যদি অজানা অচেনা এসে পড়ে মৃত্যু? তখন কি তাকে বলা যাবে তুমি তো বলোনি আসবে? দাঁড়াও, আগে বাড়ি ফিরতে দাও।

না, এসব বলার সুযোগ কেউ পায় না। বার্গম্যানের ছবির জোহান আন্তোনিয়াস ব্লক পেয়েছিল এই সুযোগ। মৃত্যুকে বলেছিল দাবাখেলা জানো তো? তবে এস, এক হাত খেলি। সমুদ্রের জলে এক ঝলক ভেসে দুলে উঠেছিল দাবার বোর্ড। সেই যুদ্ধফেরত নাইট অবশ্য দেখতে পেয়েছিল মৃত্যুকে। তাই দাবাখেলার প্রস্তাব দিতে পেরেছিল। আর আপনি?

আপনি কি দেখেছিলেন? মাপ করবেন, আপনার নামটা জানা হয়নি আমার। কারণ আপনাকে প্রথমবার, আর শেষবারও, আমি দেখেছিলাম আপনার মৃত্যুর ঠিক পরেই। ফলে নাম জানার সুযোগ হয়নি। আপনি কি দেখতে পেয়েছিলেন, সামনাসামনি, মৃত্যুকে, সেদিন? ওই রাত ন-টার শিয়ালদার স্টেশনে?

সামনাসামনি?

হ্যাঁ, সামনাসামনি? মানে মুখোমুখি?

আমি তো দেখলাম দু-তিনটে বাচ্চা, মানে রাস্তার বাচ্চারা যেমন হয় আর কি, সেইরকম বাচ্চা এসে আমাকে দেখছে। এর বেশি আর কিছু না। নাহ্। রামো রামো। নিরীহ গরিবদের বাচ্চা সব। ছদ্মবেশী মৃত্যু-টিত্যু ওরা কোনকালেই নয়। কীসব যে ভাবেন মশাই! ওটা এমন কিছু নয়।

বলেন কি, এমন কিছু না!

আসলে বাসে বসার জায়গা পাইনি। বয়সও আটান্ন পেরিয়েছে। বুকে একটা চাপ লাগছে। প্রাচীতে নেমে অতটা হেঁটে হেঁটে আসতে আসতে মনে হল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। গলার কাছটা বুজে আসছে। একটু বসি। প্ল্যাটফর্মের ভেতরে বেঞ্চি আছে। অতটা যাওয়া গেল না। চোখ অন্ধকার লাগল। বসলাম। বসতেই মনে হল শুয়ে পড়ি। তারপর কয়েকটা বাচ্চা ঝুঁকল...দূরে যেন একটা পাগলমতো লোক...ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার অ্যানাউনস্‌মেন্ট...মুখের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কয়েকটা পা...আর তো কিছু না। উঁহু মৃত্যু বলে কিছু কোথাও ছিল না।

আর বাড়ির সবাই? তাঁরা কতক্ষণ অপেক্ষা করে বসেছিলেন রাত্রে?

চিন্তা করবেন না। বাড়িতে খবর ঠিক পৌঁছে যাবে। বুকপকেটে শুধু নিজের নাম-ঠিকানা লেখা একটা কাগজ রাখবেন।

রাত সাড়ে ন-টার মেট্রো ধরে ফিরছিল সে। ট্রেন ফাঁকাই প্রায়। দেখল উলটোদিকের সিটে এক ভদ্রলোক মাথাটা পিছনে হেলিয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন। তার কাছে বাজারের থলির মতো একটা ব্যাগ। ঘুমন্ত অবস্থায় ব্যাগের হাতলটা ধরে আছেন ভদ্রলোক। পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি একটু ময়লা হয়ে গেছে সারাদিনের ধকলে, পা-টা সামনে কিছুটা ঠেলে বসেছেন, আলগা হয়ে পা থেকে বেরিয়ে এসেছে একপাটি চটি। ট্রেনের গতির তালে তালে অল্প দুলছে তাঁর মাথাটি।

~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ সে দেখল ভদ্রলোকের হাঁ-করা মুখের সামনে কয়েকটা মাছি ঘুরছে। মাছি? চলন্ত মেট্রো রেলের কামরার মধ্যে মাছি? নাঃ অসম্ভব। মাছি ওই একবারই যেন দেখল। পরক্ষণে মাছিরা নেই। ভদ্রলোকের মাথাটা শুধু দুলছে। এরপর সে আর পারল না। প্রশ্ন করে ফেলল, আর আপনি? আপনি কি দেখতে পেয়েছিলেন, মৃত্যুকে?

কালীঘাট স্টেশনে যখন সে নামছে তখনও ভদ্রলোকের মুখ হাঁ হয়ে আছে। চোখ বন্ধ। ঘুমে।

ঘুমেই তো?

নয়

ঘুম। ঘুমের ভেতরে তলিয়ে থাকলে মৃত্যু এসে পাশে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। দুটো ঘুম এক হয়ে যাবে। যন্ত্রণা থাকবে না। তার মনে আছে, অপারেশনের জন্য টেবিলে তোলা হয়েছে তাকে। ভারী আর গম্ভীর একটা গন্ধ। টক টক টক টক ঘড়ির আওয়াজ। তার নিজের চিকিৎসককে চিনতে পারছে না সে। কারণ সবার নাকমুখে কাপড় বাঁধা।

শুয়ে শুয়ে সে বলল, ডাঃ ভট্টাচার্য কোথায়? তিনি আসবেন না?

এই তো। এই তো আমি। আছি।

অন্য সকলেরই মতো দেখতে, মাথায় ক্যাপ, মুখ ঢাকা চোখ খোলা একটা মূর্তির কাছে এই উত্তর পাওয়া গেল। মূর্তির হাতে একটা সিরিঞ্জ। তাতে সোনালি তরল। ড্রিপ দেওয়ার জন্য যে নল তার হাতে লাগানো হয়েছে এইমাত্র, সে নলের মধ্যে সিরিঞ্জের ছুঁচ ঢোকালেন ওই মূর্তি বা ডাক্তার ভট্টাচার্য।

আর কোনো চিন্তা নেই। আপনি এবার ঘুমিয়ে পড়বেন, কেমন? ডাক্তারের কণ্ঠস্বরটি কোমল স্পর্শের মতো। যেন স্বর নয়, কপালে রাখা একটি হাত।

সে স্থিরভাবে চেয়ে রয়েছে সিরিঞ্জের দিকে। সিরিঞ্জের সোনালি তরল একটু কমল। সে তাকিয়েই আছে কখন শেষ হয়।

সিরিঞ্জটি শেষ হতে সে দেখেনি। তার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে জেগে ওঠে অপারেশনের পরবর্তী ব্যথাবোধ আর মুখের ওপরে ঝুঁকে থাকা ডাক্তারের মুখ একসঙ্গে নিয়ে।

পরে সে জেনেছিল, সোনালি তরলের পরিমাণটা একটু বেশি হলেই আর কখনও সে জেগে উঠত না।

কী নাম ওই তরলের? ডাঃ ভট্টাচার্য হেসে বলেছিলেন, জেনে কী করবেন? বলেওছিলেন কী যেন একটা নাম, সে ঠিক মনে করতে পারে না। বার্বিচুরে? বার্বিচুরেট? নাকি নামটা অন্যরকম? সোডিয়াম পেন্টাথল? এরকম কিছু কি?

কী নাম? কী নাম তোমার? মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার আগে, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি এসে পড়ো তুমি, হে সোনালি তরল! বলো, বলো, এসে পড়বে না, বলো!

মনে মনে এই কথা বলতে বলতে ওই সে হাঁটছে। তার কোনো কাজ নেই কোনো

~ www.amarboi.com ~

দরকার নেই এই পৃথিবীতে আর, আর চরিতার্থ করবার জন্য পড়ে নেই কোনো উচ্চাশা বা প্রতিহিংসা, প্রতিদিন কাজে যাওয়া, কাজ থেকে ফিরে আসা যে-কোনো গৃহস্থের মতো সে একদিন উবে যাবে এবার, জনস্রোত থেকে যে কোনো একজন খসে পড়বে কোথায় কোন শূন্যের মধ্যে, ওই তার বুকপকেটের মধ্যে কলমের পাশে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে নাম-ঠিকানা-ফোন নাম্বার লেখা কাগজটুকু, ভাঁজ করে রাখা হয়েছে দু-একটি কর্তব্য, ওই সে বাস থেকে নামছে, ওই সে মেট্রোয় উঠল, ওই সে লেখা জমা দিচ্ছে, প্রুফ পড়ছে, ঘরে ফিরে জানলা খুলে দিল, মাঠে নামছে বক, জ্যোৎস্না নামছে, বৃষ্টি বা ভোর হচ্ছে, বাবা ফুলগাছ লাগাচ্ছে, মা খাতা দেখছে, পুকুরধারের ঢালের ওপর গোবিন্দকাকার সারা গায়ে ঝরে পড়ছে হলদে হলদে বাঁদরলাঠি ফুল, হলদে না সোনালি, সোনালি-ই তো, সোনালি নামে কোনো মেয়েকে কি চিনত সে, কখনও কোনোদিন চিনত, ওই তো সিরিঞ্জ, ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে দেখছে সোনালি তরল, কমছে না কমছে না একটুও, কেন না এবার তার পরিমাণ বেশিই, শেষ হয়নি, সিরিঞ্জ স্থির। শেষ হয়নি, হে সোনালি তরল, স্থির হয়ে আছ কেন, সিরিঞ্জ খালি করে দাও, রাত্রির থেমে থাকা মেট্রোরেলে এখনও লোকটা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, মেট্রোরেলের কামরা অনুগ্রহ করে খালি করে দিন, হে তরল, শরীরে সংযুক্ত ওই সিরিঞ্জ খালি করে দিতে তোমার আর কত দেরি?

দেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘাসফুলের কবি

সেই মেয়েটি দেখা দিয়েছিল এক ময়লা, ম্লান চায়ের দোকানে। যে দোকানকে দোকান বলতে দুবার ভাবতে হয়। বড়ো রাস্তা থেকে বেঁকে যাওয়া গলির পরের গলির ফুটপাত। ওপাশে মোটর গ্যারেজ। ফুটপাত দখল করে মুখোমুখি দুটো বেঞ্চি পাতা। বিহারি যুবক, ওপরে চিঁড়ে, মুড়ি, খই, বাতাসা, ঝুরিভাজা রাখে দোকানের। তলার খোঁদলে চা বানায়। বৃষ্টি পড়লে, বেঞ্চির মাথা ঢাকতে বাঁশে খাটিয়ে দেয় প্লাস্টিকের চাদর। সেদিন বৃষ্টি পড়েছিল। প্লাস্টিক ছাউনির নিচে, বেঞ্চিতে চায়ের গ্লাস হাতে বসে থাকবার সময়, সামনে দাঁড়ানো বিশ্রামরত টেম্পো ম্যাটাডোর ছোটো ট্রাকের অন্তরাল থেকে দেখা দিয়েছিল মেয়েটি। যেভাবে আকাশে উল্কা দেখা যায়।

দেখা দিয়েছিল এক সন্ধেবেলা। ময়লা ম্লান সন্ধেবেলা। শনিবারের ফাঁকা হয়ে যাওয়া সাড়ে সাতটায় সন্ধেবেলা। এমন দোকানে কোনো আলোর ব্যবস্থা থাকার কথাও নয়, ছিলও না। স্ট্রিট ল্যাম্পের লালচে আলো আবছাভাবে তার মুখে পড়েছিল।

সোমেশদা, আপনার কাছেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ-অ্যা, আপনার কাছেই। ওই দেখুন। বলল, কৌশিক, সোমেশ্বরের নবীন সহকর্মী। সে তখন চায়ের গ্লাস হাতেই বসে, সোমেশ্বরের পাশে।

রাস্তাঘাটে একেবারে অচেনা তরুণ-তরুণীরা এগিয়ে এসে আলাপ করছে, কথা বলছে, এ অভিজ্ঞতা সোমেশ্বরের আছে। অভিজ্ঞতা এখন অভ্যাসে পরিণত। সোমেশ্বর জানেন, এরা সাহিত্য প্রসঙ্গে উৎসাহী। তিনি যেহেতু একটি সাহিত্যপত্রিকায় কাজ করেন, তাই এদের উৎসাহ দেওয়া বা নিরুৎসাহ করা সোমেশ্বরের কাজের মধ্যেই পড়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিরুৎসাহও করতে বয় বইকি। জগতের সকলকে, পত্রিকাকর্মী হিসেবে, সাহিত্যে উৎসাহিত করলে, রাশি রাশি পাণ্ডুলিপির নিচে চাপা পড়ে মরতে হবে তো সোমেশ্বরকে। বাছাই করাটা তাঁর কাজ। বাছাই কথাটির মধ্যে ছাই-ও তো আছে। ছাইয়ের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে মাঝে মাঝে গরম হৃৎপিণ্ড ঠেকে যায় হাতে। তখন আনন্দ হয়।

সেই আনন্দের জন্যই অপেক্ষা। তাই, বাসে, ফুটপাতে, মেট্রোয়, বাজারে, থিয়েটার হলে, প্রায়ই অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপিত হতে হয় সোমেশ্বরকে, যারা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। যেমন সোমেশ্বরও এক সময় চাইতেন। সে কথা ভেবেই তিনি ধৈর্য রাখেন। দেখতে পান, তাঁর কাজটা, তাঁর অফিসের টেবিল পেরিয়ে, রাস্তাঘাটে, বাড়িতে, দোকানে, সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। সোমেশ্বর জানেন, যতক্ষণ তিনি এই বিখ্যাত সাহিত্যপত্রের কর্মী, ততদিন তাঁর কদর এদের কাছে। এদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, দূরত্ব রেখে। রেলের টিকিট কাউন্টারের কোনো কর্মী যেমন মন দিয়ে ভাড়া নিয়ে খুচরো ফেরত দিয়ে, টিকিট দিয়ে দেন। সেইভাবে তিনি দপ্তরে বসে পাণ্ডুলিপি পড়েন, প্রেসে দেন বা ফেরত পাঠান। কাউন্টারের কর্মীর যেমন যাত্রীটির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বোধ না করলেও চলে, এ যেন সেইরকম। সোমেশ্বর একটি অদৃশ্য কাউন্টারের জানলার ওপারে বসে তাঁর কর্মীজীবন কাটাচ্ছেন। অপরে না বুঝলেও তিনি নিজে কাউন্টারের ওই দূরত্ব সর্বদা বজায় রাখেন।

এক্ষেত্রে, দূরত্ব রইল না।

উল্কা, দেখা দিল আকাশে, তারপর, দ্রুত সব দূরত্ব ভেঙে ঢুকে এল।

ওই দেখুন, বলল তো কৌশিক। আর তৎক্ষণাৎ সোমেশ্বর দেখলেন, এক তরুণী দৌড়ে, ছোটো রাস্তাটুকু পার হচ্ছে। পিছনে এক যুবক, এমনই তো হয়। একটি যুবক একটি মেয়েকে নিয়ে এসে বলে, ও লেখে।

একটি মেয়ে, একটি যুবককে নিয়ে এসে বলে, ওর লেখা একটু দেখবেন?

এরাও তেমন নিশ্চয়। অবাক হলেন না সোমেশ্বর।

ওরা এল। মেয়েটি ছিপছিপে লম্বা। কমলা সালোয়ার কামিজ। ছেলেটি দোহারা, কাঁধে চামড়ার ব্যাগ, ট্রাউজার আর স্ট্রাইপ শার্ট।

দাঁড়াল। নমস্কার করল। সোমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল, সোমেশ্বরই সোমেশ্বর কি না। তারা ঠিক ভাবছে তো?

হ্যাঁ, ঠিকই। সোমেশ্বরই সোমেশ্বর। এই রকম প্রায়ই হয় এবং এই রকম সময়ে সোমেশ্বর ঈষৎ বিব্রত ঈষৎ লাজুক একটি হাসি সাজিয়ে রাখেন মুখে। এখন সেই হাসিটা ভালোভাবে এল না। সোমেশ্বর আজ ক্লান্ত। অতিরিক্ত সাহিত্যের ফলে ক্লান্ত। সকাল থেকে খুবই সাহিত্যের চাপ গেছে আজ। তাঁদের আপিসে এখন পূজাসংখ্যার কাজ চলছে।

ওরা দাঁড়িয়ে রইল। নিজেরা কেউ লেখে কি না কিছু বলল না। সোমেশ্বরের হাতে চায়ের গ্লাস। সোমেশ্বর ভদ্রতা করে বললেন, চা খাবেন আপনারা?

ওরা বলল, এইমাত্র খেয়েছি আর খাব না। যেমন সবাই বলে ও নমস্কার করে চলে যায় বা ছাপানোর প্রসঙ্গে এসে পড়ে। এরা চলে গেল না। ছাপানোর কথাও তুলল না।

~ www.amarboi.com ~

বরং মেয়েটি সামনের বেঞ্চে বসে পড়ল। বসে, চেয়ে রইল সোমেশ্বরের দিকে। চেয়েই রইল।

কী করবেন, বুঝতে পারছেন না সোমেশ্বর। এইভাবে মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে কেন? লেখা পাঠানোর কথা বলবি তো বল না বাবা! তুই লিখিস না এ লেখে? না কি দুজনেই?

মেয়েটি এইভাবে চেয়ে থেকেই বলল, আমি আপনার সব বই পড়েছি। সব।

যাক সোমেশ্বর বুঝলেন, কথা কোন দিকে এগোচ্ছে শুরুটা অনেকেই এভাবেই করে। আপনি কত ভালো রাইটার, এ মুহূর্তে সেরা কিংবা পপুলার। ওই যেসব কথা আছে। শুনলেই সোমেশ্বরের অপেক্ষা শুরু হয়। কখন ব্যাগ থেকে একটি ডায়েরি বা খাতা বেরবে তার অপেক্ষা। কেন না, সেইসব ডায়েরি বা খাতাতে অপেক্ষা করে আছে পাতার পর পাতা কবিতা। তারা ছাপা চায়।

মেয়েটি অবশ্য ছাপা-টাপার কথা কিছু বলছে না। ব্যাগ থেকে ডায়েরিও বার করার কোনো লক্ষণ নেই। শুধু চেয়ে আছে সোমেশ্বরের দিকে। একবার হয়ত বাঁ দিকে তাকাল। একবার ডানদিকে। হাতটা নামিয়ে, পায়ের গোছে একটি অদৃশ্য মশাকে চাপড় মারল। কিন্তু চোখ, সোমেশ্বরের মুখ থেকে নড়ছে না প্রায়। অল্প আলো, একটু আগের বৃষ্টি থেকে জমে যাওয়া জল মাথার প্লাস্টিক ছাউনি থেকে দু-এক ফোঁটা নিচে পড়ছে। পিছন থেকে একটা ম্যাটাডোর স্টার্ট নিল। তারপর, হেলেদুলে গলি থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটির স্পষ্ট, সরল, নিঃসঙ্কোচ চেয়ে থাকায় অস্বস্তি হচ্ছে সোমেশ্বরের। আবার দোকানটি ফুটপাতের মধ্যে হওয়ায় দু-একজন পথচারী চলে যাচ্ছে মেয়েটি আর সোমেশ্বরের মাঝখান দিয়ে। তাতে বিরক্তও লাগছে। দোকানের বাঁ পাশে। বিহারি যুবকটির দিকে তাকিয়ে, ওঠার ভঙ্গি করলেন সোমেশ্বর, কত হয়েছে আমাদের?

কৌশিক লাফিয়ে উঠল। আমি দিচ্ছি সোমেশদা। কৌশিক সঙ্গে থাকলে এই একটা বিপদ। কখনও অন্য কাউকে দাম দিতে দেয় না।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। বলল, খুব বড় একটা বাড়ির মধ্যে আমি সারাদিন থাকি। একা একা।

সোমেশ্বর জানেন না কী বলবেন। মেয়েটির মুখের ওপর আলো স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। চোখের তারা ঝকঝক করছে। মেয়েটি সেইভাবেই বলে, বই পড়ি সারাদিন।

পাশের স্মার্ট ছেলেটি কী বলবে বুঝতে পারছে না। ছেলেটির দাঁড়ানোর, তাকানোর ভঙ্গিতে না বোঝা। উদ্দেশ্যহীনতা। সোমেশ্বরেরও তাই।

মেয়েটি বলে, আপনার সব বই পড়েছি। স-অ-ব। টেনে বলে চুপ করে যায়।

সোমেশ্বর নিজের বইয়ের প্রসঙ্গ ঘোরাতে বলেন, আপনারা কোথায় থাকেন!

যুবকটি কথা খুঁজে পায়। বলে, ও থাকে দক্ষিণেশ্বর। আমি হাতিবাগান।

কৌশিক দাম দিয়ে দিচ্ছে, বেঞ্চি থেকে গ্লাস তুলে নিচ্ছে দোকানের বালকটি।

আপনি মাঝে মাঝে এখানে এই দোকানে বসেন, না? একইভাবে তাকিয়ে মেয়েটি বলে।

~ www.amarboi.com ~

সোমেশ্বর বলেন, এটায় না, পাশে, ওই রায়দার দোকানে। বলে, পাশের বন্ধ হয়ে যাওয়া আধা-কাফে আধা-রেস্তোরাঁটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন।

যুবকটি, এতক্ষণে একটু জায়গা পায়। গর্বের হাসি নিয়ে বলে, তোকে বলেছিলাম না।

মেয়েটি বলে, ও বলেছিল, আপনাকে এখানে চা খেতে দেখেছে।

সোমেশ্বর হাসির ভঙ্গি করেন। তারপর বলেন, আচ্ছা, আমরা তবে এগোই আজকে। দেখা হয়ে ভালো লাগল।

মেয়েটি সচকিত হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেকক্ষণ সময় নিলাম আপনার। আচ্ছা একটা কথা বলব?

বলুন।

আপনার নম্বর পেয়েছি গণশক্তির ডায়ালে। আমি যদি ফোন করি বিরক্ত হবেন?

উদাসীনভাবে সোমেশ্বর বলেন, বিরক্ত হব কেন! করবেন ফোন।

কখন করব?

রোববার, সকাল ১০টা-১১টা। ১২টার পর আপনি আমাকে পাবেন না। বেরিয়ে যাই।

বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করলেন সোমেশ্বর।

দুই

পরদিন খুব ভোরে যখন ঘুম ভাঙল সোমেশ্বরের, তখনও চোখ খোলেননি, পাখির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, অস্পষ্টভাবে দেখলেন মেয়েটি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

আরে, এ কী ব্যাপার। চোখ খুলে ফেললেন।

নিজের ঘরেই তো শুয়ে আছেন সোমেশ্বর। নিজের জানলার পাশে। বাইরে, ভোরের হালকা নীলচে আকাশ। আবার চোখ বুজলেন। আবারও মেয়েটি চেয়ে আছে। এবার স্পষ্ট আরও। চোখের তারা যতদূর সম্ভব দেখার চেষ্টা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এবার পরপর যা ঘটে চলল তা এইরকম।

একদিন সোমেশ্বর স্নান করতে ঢুকে শাওয়ার খুললেন, চোখ বন্ধ অবস্থায় মাথায় জলঝরনা ঝাঁপিয়ে পড়ামাত্রই দেখলেন মেয়েটি তাকিয়ে আছে।

অফিসে সম্পাদকের বড় গোল কাচঢাকা টেবিলের সামনে বসে পুজোসংখ্যার জন্য মিটিং করতে করতে মুখ নামিয়ে টেবিলে তাকানোমাত্র দেখলেন কাচের ভিতর থেকে মেয়েটি তাকিয়ে আছে। অফিসে কাজ করতে করতে ইউরিনালে এসে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করামাত্র দেখলেন, তাকিয়ে আছে মেয়েটি।

ভয় পেয়ে গেলেন সোমেশ্বর। এ কী শুরু হয়েছে! এ কে তাঁর জীবনে দেখা দিতে শুরু করেছে, যার নামটা পর্যন্ত তিনি জানেন না। কাউকে বলা দরকার। কোনো বন্ধু। কোনো শুভার্থী। যে বুঝবে।

কে বুঝবে? কাকে বলবেন সোমেশ্বর?

সেরকম সম্পর্ক তো নেই কারও সঙ্গে, যাকে বলা যায়। এই পত্রিকার, তথা এই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পত্রিকার লেখা নির্বাচনের সঙ্গে সোমেশ্বর সংযুক্ত বলে, সোমেশ্বরের সবকটি সম্পর্কই সাহিত্যনির্ভর। বলা ভালো সাহিত্য প্রকাশনির্ভর। যারা লেখক হিসেবে সামনে আসতে চায়, বা সামনে আসছে, অথবা সামান্যও এসেছে সামনে, তারাই সোমেশ্বরের যাবতীয় কেমন আছেন ভালো আছেন বিজয়ার প্রণাম জানবেন। এ বাদে, সম্পর্ক, মনের কথা বলার সম্পর্ক, সোমেশ্বরের একটিও নেই।

কিন্তু বহুকাল পরে সোমেশ্বর নিজের মধ্যে একটি পরিবর্তন অনুভব করছেন। বলার মতো পরিবর্তন। একটা সম্পর্ক অনুভব করছেন। বলার মতো সম্পর্ক। কিন্তু সম্পর্কের কথা বলার মতো সম্পর্ক সোমেশ্বরের একটাও নেই।

ফলে, সোমেশ্বর খুঁজতে বেরোলেন।

প্রথমত, অফিস থেকে বেরিয়ে একবার করে ওই চায়ের দোকানে গিয়ে বসতে লাগলেন। যেখানে তিনি মাঝে মাঝেই বসেন, না সেই রায়দার দোকানে নয়— সোমেশ্বরের মনে পড়ছে, মেয়েটির সঙ্গী যুবকটি গর্বিতভাবে বলেছিল, কী তোকে বলেছিলাম না।

বরং, তার পাশের বিহারি দোকানির ত্রিপল খাটানো বেঞ্চিতেই গিয়ে বসতে লাগলেন। সামনে মোটর গ্যারেজের সেই থেমে থাকা ট্রাক-ম্যাটাডোর-বাইক-মারুতির জট। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে সোমেশ্বর ভাবতে লাগলেন, ওই দাঁড়িয়ে থাকা স্থবির মেরামতের জন্য অপেক্ষমান বাহনসারির পিছন থেকে যদি উল্কা দেখা দেয়।

দেয় না। চায়ের গ্লাস বেঞ্চিতে নামিয়ে রেখে চলে আসেন সোমেশ্বর।

মেয়েটি বলেছিল, আপনার সব বই পড়েছি। স-অ-ব। কেমন একটা টেনে বলেছিল। কি সাধারণভাবে বলা, অথচ একটা জোর, একটা এমফ্যাসিস ছিল। অন্যের মুখে এই কথা তো আগেও শুনেছেন সোমেশ্বর। তবু, কেন মনে হচ্ছে, এমনভাবে আর শোনেননি।

অতিরিক্ত সাহিত্যের সঙ্গে থাকতে থাকতে সাহিত্য বিষয়ে একটি মন্দাভাব দেখা দিয়েছে তাঁর ভিতরে। এখন অনায়াসে যে কোনো লেখা লিখে দিতে পারেন, যে কোনো অনুরোধে লেখা দেন। নির্বাপিত হয়েছে পরিশ্রমের ইচ্ছে। ভালো লেখার জন্য অপেক্ষা।

নির্বাপিত হয়েছে প্রেমও।

তবে একজন স্থির, নিবিড় পাঠকলাভের বাসনা হয়ত তাঁর এখনও আছে। একটি প্রেম লাভের বাসনার মতো।

আছে? আছে কি? সোমেশ্বর নির্ভুল জানেন না।

না জেনেই, সোমেশ্বর খুঁজতে বেরোলেন। দুটো রবিবার পরপর চলেও এলেন দক্ষিণেশ্বর। তারপর একটা রিকশা ভাড়া করে ঘুরলেন গলিতে গলিতে। সে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার। এই মধ্য বয়সে পৌঁছে, সমাজসেবা বা সভাসমিতিতে আত্মনিয়োগ করতে হয়। করেওছেন সোমেশ্বর। কিন্তু আজ সোমেশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুটি চোখের 'চেয়ে থাকা'কে। নতুন সব পাড়ার নাম। বাচস্পতি পাড়া, নায়েক কলোনি, রানওয়ে মাঠ।

~ www.amarboi.com ~

রাস্তার যে-কোনো বাঁকের মুখ উদ্‌গ্রীব রইলেন প্রত্যাশায়। বাঁক ঘুরেই যদি দেখতে পান। হঠাৎ হঠাৎ মুখ তুললেন শেষ দুপুরের আলো পড়া কোনো কোনো বারান্দায়। বড় আকারের কোনো বাড়ির তলা দিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন এটাই সেই বাড়ি নয় তো। মুখ তুললেন আবারও রাস্তায় ধারের কোনো খোলা জানলায়। যদি তাকে দেখা যায়।

দেখা গেল না।

হতাশও হলেন না সোমেশ্বর। এ তো জানাই ছিল। ফেরার সময় এস-১৭ বাসের টার্মিনাসে পৌঁছে জানলা নিয়ে বসে পড়লেন দুদিনই। এই যে দুদিন তিনি দুজন রিকশাচালককে অবাক করে ঘুরে বেড়ালেন, এবং অভীষ্টকে পেলেন না, এর মধ্যে কোথাও কিন্তু সভাপতি হয়ে পড়া নেই। এর মধ্যে কোথাও, 'এবার প্রধান অতিথিকে পুষ্পস্তবক দেওয়া হচ্ছে' নেই। কোথাও নেই, সমাগত সুধীবৃন্দ, বা বন্ধুরা আপনাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করে আমি অত্যন্ত ব্লা ফ্রম ল ক্রুস ব্লা কুট পিস উফ্...।

অজস্র সভায় উপস্থিত হতে হতে সোমেশ্বর শেষের দিকে যেসব বক্তৃতা শোনেন তা শেষ পর্যন্ত কয়েকটি অর্থহীন আওয়াজে পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর নিজের দেওয়া ভাষণও তাই। শুধু অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ। সামনে বার্তাহীন সারি সারি চোখ। শোভন ও স্মিত সারি সারি মুখ। ঘাড় হেলানো। হাতের পাতার ওপর চিবুক রাখা। পাশের শ্রোতার পাশে ফিশফিশ আলোচনা করা মুখ। একটি-দুটি চোখ-বন্ধ, ঢুলে-পড়া মাথা। সেই একটি-দুটিই শুধু সত্য। আচরণে সত্য। অভিব্যক্তিতে সত্য। বাকি সব বানানো।

যে চেয়ে-থাকাটিকে খুঁজছেন সোমেশ্বর, তার মধ্যে ওই বার্তাহীনতা নেই। সেই চেয়ে থাকা, অভ্যাসে অভ্যাসে মৃত নয়, সৌজন্যে সৌজন্যে মিথ্যা নয়। যদি না খুঁজে পান, না-পেলেন। সোমেশ্বর জানেন, এই খোঁজাটাও গুরুতর কারণ, বেঁচে থাকার।

এই খোঁজাখুঁজি ও তার ব্যর্থতা দুটোই গোপন রইল। ইতিমধ্যে সাতটি শনিবার কেটে গেল। আটটি শনিবার কেটে গেল। শনিবার কেন? কারণ একটা শনিবারেই তো সে দেখা দিয়েছিল, ওই ট্রাক, মারুতি, ম্যাটাডোরের পিছন থেকে। তাই শনিবার দিয়েই সোমেশ্বর সপ্তাহের হিসেব রেখে চললেন। এবং বুঝতে পারলেন, ওই চোখের ওই ঝকঝকে তারা দুটি আবছা হয়ে আসছে। আর তত ঝকঝক করছে না।

কেন না, প্রতিদিনের ঘটনা এসে পড়ছিল তার ওপর। গৃহস্থের গৃহস্থালির ঘটনা, কর্মক্ষেত্রের ঘটনা, প্রতিদিন রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবার ফলে পাওয়া অজস্র ঘটনা, ছবি, ঘটনা, ছবি, ঘটনা। পড়ছিল তো, জমা হচ্ছিল তো। ওই এক সন্ধের কয়েক মিনিটের জন্য দেখতে পাওয়া সেই চেয়ে থাকার ওপর। ফলে, সেই চেয়ে থাকা আবছা হয়ে আসছিল। যখন তখন দেখা দেওয়া আগেই বন্ধ হয়েছিল। এখন, সোমেশ্বর নিজের ঘরে শুয়ে পড়ার পর চোখ বন্ধ করে মনে আনতে চেষ্টা করেন চেয়ে থাকাকে। প্রথমে অনেকখানি অন্ধকার। তারপর, সেই অন্ধকারের পিছনে যেন ধীরে ধীরে ফুটে উঠল চোখ দুটি। কিন্তু এর মধ্যে, যদি বাইরে থেকে কোনো আওয়াজ এসে পৌঁছোয় সোমেশ্বরের কানে তবে, সে দ্রুত মিলিয়ে যাবে। সম্পূর্ণ শব্দহীন অবস্থা হওয়া চাই। এমনকী, রাস্তার কুকুরের ডাক

~ www.amarboi.com ~

কানে এলেও সেই অন্ধকার অন্ধকারই থাকবে। চেয়ে থাকা-কে দেখাবে না। তাই, সোমেশ্বর রাত্রি অনেক নিঝুম হয়ে যাওয়ার পর, চোখ বন্ধ, ঘর আঁধার করে, চোখ দুটি দেখতে চাইতেন। যদি ফুটে উঠত, তবে ধীরে ধীরে, সেই সন্ধ্যার চায়ের দোকান, অল্প বৃষ্টির হাওয়া, স্ট্রিট লাইটের লালচে মতো আলো, সবটা ফুটে উঠত একে একে। সেই আকস্মিক ঘটে যাওয়া সন্ধের ভিতরে ফিরে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়তেন সোমেশ্বর।

এই রকম চলছে। এবং সোমেশ্বর বুঝতে পারছেন, ওই চেয়ে থাকা-কে আর বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। দিনের পর দিন, আর ছবির পর ছবি এসে পড়ে, ঘটনা এসে পড়ে, তাকে নিভিয়ে দেবে। হারিয়ে যাবে সে।

তিন

রবিবার সকালে, এগারোটা নাগাদ, স্নান করে বেরিয়েছেন সোমেশ্বর। ফোন বাজছে। একটু বিরক্তভাবে ধরলেন ফোন। একটু পরে বেরোতে হবে। তাছাড়া রবিবার ফোন একটু বেশি আসে।

ওপারে নারীকণ্ঠ, সোমেশ্বর বসু আছেন?

কথা বলছি।

ওপারে একটু নীরবতা। তারপর, আমি, আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

আচ্ছা?

আমাকে একদিন একটু সময় দেবেন? একটু কথা ছিল।

এটা চেনা গৎ। সোমেশ্বরের সঙ্গে কেউ কেন দেখা করতে চাইবে? পুরুষ অথবা মেয়ে? হয় কোনো সভায় যেতে হবে, নয় তাদের লেখা ছাপাতে হবে। সভায় সোমেশ্বর যাবেন বা যাবেন না। কিন্তু লেখা সোমেশ্বর ছাপাবেন। ছাপাবেনই। কারও লেখার একটু কিছু উজ্জ্বলতা থাকলেই সোমেশ্বর প্রেসে পাঠিয়ে দেন। তবে ছাপানোর জন্য সোমশ্বরের সঙ্গে দেখা করার কোনো দরকার নেই। দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেই হবে। এ কথা হাজারবার হাজার জনকে বুঝিয়েও ফল হয় না। ওই চেনা গৎ বাজতে থাকে। আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। আমাকে একটু সময় দেবেন। এইসব...।

পরে কড়া করে বলতে হতে পারে। তবে প্রথমে নরম করে বলাই ভালো। বললেনও সোমেশ্বর, কেন দেখা করতে চান বলুন।

মানে, লেখার ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই।

ঠিক ঠিক মিলে গেছে। এবার সোমেশ্বরেরও তা হলে একটি বাঁধা গৎ আছে। সেই বন্দিশটি সোমেশ্বর এবার আউড়ে চললেন, কাগজের এক পিঠে কপি করবেন। অন্তত চার-পাঁচটি কবিতা। ওপরে কবিতার নাম আর আপনার নাম লিখবেন। নিচে ঠিকানা, পুরো ঠিকানা, পিন কোড সহ লিখবেন। খামের ওপর কবিতা বিভাগ আর পত্রিকার ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিন। নির্বাচিত হলে তিন মাসের মধ্যে চিঠি পাবেন। লেখা ভালো হলে নিশ্চয়ই ছাপা হবে। এর জন্য দেখা করার কোনো দরকার হবে না।

~ www.amarboi.com ~

ওপারের কণ্ঠ সোমেশ্বরের কথার তোড়ের মধ্যে একটু নিশ্বাসের অবসর পেয়ে বলে, আমি...আসলে...বলছি...যে একটু শুনুন...

সোমেশ্বর থামিয়ে দিলেন। মানে দেখুন কোনো কবিতা শুনে তো ঠিক বোঝা যায় না। চোখের সামনে পুরোটা দেখতে হয়। বুঝেছেন তো।

এটা অবশ্য সোমেশ্বর সত্যি বললেন না। কারণ, তিনি শুনেও কবিতা ভালোই ধরতে পারেন। শুনেওছেন আগে, ফোনে। কারও কারও কবিতা। কিন্তু মুশকিল হল, দু-একদিন কারও কাছে ফোনে কবিতা শুনলে, তারা প্রতিটা নতুন কবিতা লিখেই টেলিফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। কত শুনবেন সোমেশ্বর। অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে সব, উৎসাহ প্রচুর। তাই এখন থেকে প্রথমেই দেয়াল তুলে রাখেন তিনি।

ওপারে অনেকক্ষণ সব চুপ। শুধু একটা বাচ্চার গলা পাওয়া যাচ্ছে।

সোমেশ্বর একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, হ্যালো, বলুন?

কণ্ঠ ফিরে এল আবার, হ্যাঁ বলছি।

লেখা তাহলে পাঠিয়ে দেবেন, কেমন?

আমি তো লিখি না। কী করে পাঠাব?

সোমেশ্বর অবাক। লেখেন না?

না তো। যে কিছু লেখে না, তেমন কারও সঙ্গে কি আপনি দেখা করেন না? সময় দেন না?

না, না তা কেন?

তা ছাড়া, আপনার সঙ্গে একদিন আমার দেখা হয়েছিল। প্রায় মাস দুয়েক আগে। মোটর গ্যারেজের পিছনে একটা চায়ের দোকানে।

সোমেশ্বরের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। গলাটা শুকিয়ে আসছে। ওপারের কণ্ঠ আবার বলল, আপনার অবশ্য মনে থাকার কথা নয়।

সোমেশ্বর কোনো মতে বললেন, মনে আছে। বলতে বলতে চোখ বন্ধ করে সোমেশ্বর, দেখলেন, চেয়ে থাকা চোখের দুটি ঝকঝকে তারা। আগের মতোই উজ্জ্বল। সোমেশ্বর বললেন, খানিকটা সাব্যস্ত গলায়, মনে পড়ছে, আপনি বলেছিলেন, ফোন করবেন।

এবার মেয়েটি অবাক! হ্যাঁ, বলেছিলাম। করা হয়নি।

সোমেশ্বর বললেন, আপনারা দুজন ছিলেন। যুবকটি ছিলেন বেশ লম্বা। আর আপনি বলেছিলেন, আপনি মস্ত বড় একটা বাড়িতে সারাদিন একা থাকেন। আর বই পড়েন।

ওপারে কণ্ঠ বলে, আপনার এত মনে আছে? আমি ভাবতেও পারিনি।

সোমেশ্বর কী করেই বা বলবেন, কত মনে আছে। সোমেশ্বর ফোনের রিসিভার ধরে জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। রোদ্দুর কোমল হয়ে পড়েছে গাছে, আর পাশের বাড়ির সাদা দেওয়াল ছাদ আর ছাদের ট্যাঙ্কের গায়ে। এই জায়গাটা, কলকাতা শহর হলেও, একটু জংলা মতো আছে এখনও। দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে সপ্তাহ খানেক আগে।

~ www.amarboi.com ~

বিসর্জনের ঠাকুর জলে পড়লেই বাতাস ঠান্ডা হয়ে আসে। গাছে-পাতায় হেমন্তের আভাস।

ওপারের কণ্ঠ বাচ্চাটিকে একটু বকল। বাচ্চার গলার আওয়াজ তাতে বাড়ল বই কমল না। তারপর বলল, দেখা করবেন তো একদিন?

আচ্ছা বেশ।

কবে-এ? ওপারের গলায়, এতক্ষণে একটা প্রতীক্ষা যেন ফুঁসে বেরোল।

আপনি বলুন।

আমি? দ্বিধায় পড়ল সে।

হ্যাঁ। জায়গা আর দিন ঠিক করুন। আমি চলে যাব।

জায়গা? জায়গা? সে থেমে যায়। আবার বলে, আমাদের বাড়িতে যদি ঠিক করি? আসবেন একদিন?

তাই যাব।

ওপারে সে আত্মহারা। সত্যি আসবেন!

বললাম তো।

বেশ, আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।

সোমেশ্বর বললেন, না। আমি চিনে চিনে যাব! সেটাই আমার পছন্দের। আপনার নাম আর বাড়ির ঠিকানা বলুন আমি লিখে নিই। হ্যাঁ, ফোন নম্বরটাও।

বলে, সোমেশ্বর তার লেখার টেবিলে ঝুঁকে পড়লেন। হাতে কলম।

নাম বলুন, ঠিকানা...

ওপারের কণ্ঠ বলে, আমার নাম ঘাসফুল। ঘাসফুল চৌধুরী। ঠিকানা, হল...

থমকে যান সোমেশ্বর। ঘাসফুল? আপনার নাম?

হ্যাঁ, এতক্ষণে একটু হাসির আভাস ওপারের। সকলেই শুনে অবাক হয়। আমার বাবা রেখেছিল।

বাবা?

হ্যাঁ। আমার বাবা। আমার বাবা একজন ব্যর্থ কবি। ছোটবেলায় নাম রাখল, ঘাসফুল। আর বড়ো মেয়ে, আমার দিদি, যার বাচ্চার গলা শুনছেন, মাঝে মাঝে, সেই দিদির নাম রেখেছে দিঘি।

কলম সোমেশ্বরের হাতেই ধরা। আর অন্য হাতে ধরা রিসিভার। আমার বাবা একজন ব্যর্থ কবি। এমন কথা কারও মুখে কখনও শুনবেন, কল্পনাও করেননি সোমেশ্বর। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ব্যর্থ কবি?

হ্যাঁ। আমার বাবা জানেন তো কবিতা লিখত। রাত জেগে লিখত। মা কত বকত। তবু লিখত। অনেক বেরোত বাবার কবিতা।

সোমেশ্বর বলেন, বেরোত? কোন কাগজে?

ছোটো ছোটো কাগজে। আপনাদের মতো বড় কাগজে কখনও ছাপেনি। তবে, অনেক

~ www.amarboi.com ~

ছোটো ছোটো পত্রিকায় বেরোত। পোস্টেই পত্রিকা আসত বাড়িতে। তাতে বাবার নাম থাকত। তারপর একসময় আর বেরোত না বাবার লেখা। বাবার তো কোনো চাকরি ছিল না। তাই আর লিখত না বাবা।

লিখতেন না?

না। মা খাতা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর বাবা আর লিখত না। তখন আমাদের খুব টানাটানি ছিল তো। তাই লিখত না।

টানাটানি ছিল?

হ্যাঁ। মানে অভাব।

এই সময় বাচ্চাটি বোধহয় ফোনের কাছে এসে উপস্থিত হল। তার ধরে টানল। একটু গোলমাল, একটু বকাবকি চলল। আসলে দিদির মেয়েটা আমার কাছে আছে আজকে। দিদি একটু কাজে বেরিয়েছে। কী বলছিলাম যেন।

সোমেশ্বর বলেন, আপনাদের সংসারের কথা।

হ্যাঁ-হ্যাঁ। মনে পড়েছে। অভাব, অভাব। খুব ছিল। অনেক সময় আমরা একবেলাও খেয়েছি। কিন্তু জানেন তো আমাদের একটা বড় ছাদ ছিল। কি সুন্দর সে ছাদটা। বাবাদের চার পুরুষের বাড়ি তো। তাই ভাঙা, কিন্তু বড়-ও-ও ছাদ। এ বাড়িটাও বড়। কিন্তু এ বাড়িতে ছাদটা তেমন নয়। এটা তো আমার শ্বশুড়বাড়ি। সেই ছাদে বসে, এক একদিন বাবা আমাদের দুই বোনকে কবিতা পড়ে শোনাত। সূর্যাস্ত হত গাছের পিছনে। আমাদের ছোটবেলায় তো চারদিকে অনেক গাছ ছিল। বাবা কবিতা পড়ত আর বলত শোন, আমার দিকে তাকাবি না। ওই গাছেদের দিকে তাকিয়ে কবিতা শোন। সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে। ওই যে মেঘগুলো নানা আকার নিচ্ছে ওই দিকে তাকা, তাকিয়ে শোন। বলে কবিতা পড়ত বাবা।

কী নাম আপনার বাবার?

স্বপ্ন রায় নামে লিখত। তবে বাবা নিজের কবিতা কখনও শোনাত না। বলত ভালো ভালো কবিতা শোন। যদি আমি বা দিদি বলতাম তোমার কবিতা শোনাও না বাবা। বাবা বলত, ধুস! আমি তো ব্যর্থ কবি। আমার লেখা শুনতে হবে না। ভালো কবিতা শোন। বলে বাবা পড়ত কত...কত কবিতা।

ওপারে গলাটা ধরা শোনায়। যেন কত দূর থেকে বলছে। বাচ্চাটা চুপ করে গেছে। টিভির আওয়াজ আসছে। সম্ভবত কার্টুন চ্যানেল।

আপনার কবিতা বাবাই প্রথম শুনিয়েছিল।

আমার কবিতা?

হ্যাঁ, তখন আপনি নতুন। এত নাম করেননি। বাবা বলেছিল এই ছেলেটা বড় হবে। এর লেখা পড়িস।

তারপর থেকে আপনার লেখা পড়েছি। সব সব।

তখন কত বড় আপনি। যখন আপনার বাবা আপনাকে কবিতা শোনাতেন?

~ www.amarboi.com ~

আমার তেরো-চোদ্দ হবে। দিদি আর একটু বেশি। আমার থেকে তিন বছরের বড়। তখন থেকে আপনার লেখা পড়েছি। আর মনে মনে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। আর ভেবেছি দেখা হলে কিছু বলব। কত দিন চলে গেছে, বলার কথাটাও বদলে বদলে গেছে। দেখাও হয়েছে। কিন্তু কথা হয়নি। সেদিন কথা হল। প্রথম। প্রথম দিনেই তো আর বলা যায় না। তাই বলিনি।

সোমেশ্বরের গলা বুজে আসছিল। সোমেশ্বর সারাদিন সাহিত্যিক সঙ্গ করেন। সেই তাঁর নিয়তি। কিন্তু এমন কথাও শোনেননি কখনও। এই ধরনের কথাকেই কি সত্য বলে?

হঠাৎ দরজার বেল বাজল। ঘোর কেটে গেল সোমেশ্বরের। এক মিনিট ধরবেন? দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।

দরজা খুলে সোমেশ্বর দেখলেন, তাঁর স্ত্রী। কী ব্যাপার তোমার? এখনও তৈরি হওনি। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে এলাম।

সোমেশ্বর সবই ভুলে গেছেন এতক্ষণে। তাঁর স্ত্রী আগে বেরিয়ে নিজের কাজ সেরে সোমেশ্বরের জন্য অপেক্ষা করবেন কাছেই, সোমেশ্বর সেখানে পৌঁছোলে দুজনে একসঙ্গে যাবেন তাঁর শ্যালক বাসুদেবের বাড়ি, দুপুরে খাওয়া সেখানে, এই রকম কথা ছিল। সোমেশ্বরের স্ত্রী অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ফোন করেছেন STD বুথ থেকে। বাড়িতে ফোন এনগেজ্‌ড পেতে পেতে বিরক্ত হয়ে ট্যাক্সি ধরে চলে এসেছেন। বলছেন, শিগগির রেডি হও। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বাসুরা কতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে।

সোমেশ্বর দৌড়ে রেখে যাওয়া রিসিভারের কাছে ফিরলেন, কারণ ঠিকানা আর ফোন নম্বর নিতে হবে। ফোন তুলে দেখলেন ভেতরটা নিস্তব্ধ। হ্যালো, হ্যালো। কোনো সাড়া নেই। রিসিভার ঝাঁকালেন সোমেশ্বর, অকারণে। হ্যালো। সাড়া নেই। সোমেশ্বর স্ত্রীকে বাড়িয়ে দিলেন রিসিভারটা। দেখ তো, ডেড হয়ে গেল কি না।

হ্যাঁ, ডেড হয়ে গেছে সন্দেহ নেই।

সোমেশ্বরের স্ত্রী জানতে চাইলেন, এতক্ষণ কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলে তুমি, আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে?

অম্লানে মিথ্যা বললেন সোমেশ্বর, এতক্ষণ? এতক্ষণ তো নয়। এই ফোনটা তো এইমাত্র এসেছিল। আমি লিখছিলাম বলে দেরিটা খেয়াল করিনি।

তবে আমি যে বারবার এনগেজড্ পাচ্ছিলাম।

তা হলে হয়ত ঠিকমতো রাখা ছিল না রিসিভারটা। এইমাত্র আমি বাসুকে ডায়াল করেছিলাম, আমার একটু দেরি হতে পারে বলে।

দ্রুত হাতে পোশাক পরে তৈরি হতে থাকেন সোমেশ্বর।

আমার বই

চার

সেদিন এক ঘণ্টারও বেশি সময় কথা বলেছিলেন সোমেশ্বর। এবং, পুরো সময়টার কোনো হিসেব ছিল না তাঁর কাছে। একটা আচ্ছন্নতার মতো। অথচ প্রথমে ফোনটা বাজতে একটু

~ www.amarboi.com ~

বিরক্তই হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মাথায় ছিল, তাঁর স্ত্রী রাস্তায় অপেক্ষা করবেন। কিন্তু, কে ফোন করছে যখন জানতে পারলেন, পরমুহূর্ত থেকে তাঁর কাছে সমস্ত বর্তমান উধাও হয়ে গেল।

এ কথা ঠিক তিনি তাঁর স্ত্রীকে অতক্ষণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। এ কথাও ঠিক তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরপর মিথ্যা বলেছেন। কেন না, সোমেশ্বর মিথ্যা বলতে অপটু নন। মিথ্যা শুনতেও তিনি অভ্যস্ত। চোখের দিকে তাকিয়ে, একটা পলকও না ফেলে মিথ্যা বলে থাকে, এমন দু-একজন লোকের সঙ্গে সোমেশ্বরের প্রায় প্রতিদিনই দেখা, চা, শিঙাড়া খাওয়া বা গল্পগুজব হয়। এই দু-একজন লোক, সর্বদাই, নিজেদের পূর্ণ সত্যবাদী এবং দুঃখী মানুষ হিসাবে উপস্থিত করে সোমেশ্বরের সামনে। যেমন সোমেশ্বর নিজেকে পূর্ণ সত্যবাদী হিসেবে উপস্থিত করেন তাঁর স্ত্রীর সামনে। অবশ্য সোমেশ্বর নিজেকে আর দুঃখী মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে চান না, এইটুকুই যা তফাত।

সুতরাং মিথ্যার ব্যবহারে, দেওয়া বা নেওয়ার ক্ষেত্রে, সোমেশ্বর অভ্যস্ত। অসুবিধে হয় না।

অসুবিধা হয় শুধু লেখার সময়।

কেন অসুবিধে?

কল্পনা আর মিথ্যার মাঝখান দিয়ে চিরকাল একটি নদী বয়ে চলেছে। একদিকে কল্পনার দেশ অন্য দিকে মিথ্যার রাজ্যপাট। লেখার সময়, মানচিত্র আঁকার তুলি যেহেতু লেখকের হাতে, তাই সে, লেখক, ওই নদীরেখাটিকে মিথ্যা যে রাজ্য তার মাঝখান দিয়েও নিয়ে যেতে পারে। বলবে ওইটাই আসল ভূখণ্ড। কেউ তো আর লেখকের মনের ভেতরে ঢুকে তার অন্তর্জীবন জেনে আপত্তি তুলতে পারে না। কারণ, তুলিটাই তো সব। সত্য আর মিথ্যা বলে তো কিছু হয় না। এটা জোর গলায় বলে দিলেই হল। সত্য শুধু মানচিত্র। আর মানচিত্র এক-এক লেখায় এক এক রকম হলেই বা দোষ কী! কে ধরতে যাচ্ছে।

কেউ ধরে না। যে ধরে, সে নিজে। আর সেই জন্যই অসুবিধে। অন্য লোকের সামনে মিথ্যে দেখানো যায়। কিন্তু নিজের কাছে? তাই লেখার সময় অসুবিধে হয়। কেন না, জগতে সমস্ত জায়গায় মিথ্যা বলে আসার পর, অন্তত লেখার কাছেও যদি সত্যি না হই তবে লিখি কেন? নিজেকে জিজ্ঞেস করেন সোমেশ্বর।

আবার, জগতে সর্বত্র মিথ্যে হয়ে থাকার পর লেখার কাছে এসেই কি সত্যি হওয়া যায়? সত্যি হওয়ার জন্য কি একটু পরিশ্রম, অনুশীলন, একটু রেওয়াজ লাগে না? রেওয়াজ ছাড়া যেমন গলায় সুর লাগবে না ঠিক ঠিক, তেমন অনুশীলন ছাড়া কি কলমে সত্য এসে লেগে যাবে? অত সোজা? নিজেকে ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে তৈরি করতে হবে না!

এই দুই বিভাগের মাঝখানে তাঁর কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সোমেশ্বর। বুঝতে পারেন তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই এখানে। এ একরকম নো ম্যানস্ ল্যান্ড। আর তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে যায়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেদিন ওই ঘাসফুল নামের মেয়েটির কথা শুনতে শুনতে সময়জ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল

~ www.amarboi.com ~

সোমেশ্বরের, তার কারণ হয়ত এই যে, সে কেবল সত্য বলছিল। সরল সোজা ভাবে। অথচ সত্য শোনার অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যজগতের কাছে পাননি সোমেশ্বর। তার ওই চেয়ে থাকা যে অনুসরণ করে আসছে সোমেশ্বরকে। সোমেশ্বর যে ভুলতে পারছেন না ঝকঝকে তারা দুটি, তার একটা কারণ কি এই যে, সেই কবে তার বাবার মুখ থেকে নবীন সোমেশ্বরের কবিতা শোনার কিশোরী দিনগুলি থেকে আজকের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞ সোমেশ্বরের ভিতরে সবটুকুই সে দেখে নিতে চাইছিল, যেভাবে অতল মাপার জন্য পাথর বাধা লম্বা দড়ি ফেলা হয় সমুদ্রের জলে? সেইভাবে?

যখন প্রথম কবিতায় জনস্বীকৃতি পাচ্ছিলেন সোমেশ্বর, তখন তাঁর বয়স কত ছিল? একত্রিশ-বত্রিশ হবে।

মেয়েটি, এই মেয়েটিও এখন তবে সেই বয়সে। অবশ্য সেদিন এক ঝলক দেখে তো কমই মনে হয়েছিল। অবশ্য কতটুকুই বা দেখেছেন সোমেশ্বর।

এতই অল্প সময় যে, নামও জানা যায়নি। নাম যখন জানলেন, তখন ঠিকানা নেওয়া হল না।

আমার বাবা একজন ব্যর্থ কবি।

কি আশ্চর্য কথা। এ কথাটা ভাবলেই, চোখে জল এসে পড়ে কেন সোমেশ্বরের? সেই ছাদটা সোমেশ্বর মনে মনে দেখতে পান, বাবা যেখানে দুই কিশোরী কন্যাকে কবিতার জগতের দীক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু একবারও নিজের কবিতা পড়ছেন না। এমন সংযম যার, আত্মসম্মান যার, আবার অন্য দিকে সৌন্দর্যের প্রতি এমনই উন্মুখতা, যিনি বলেন, আমার দিকে তাকাবি না, গাছের দিকে তাকিয়ে কবিতা শোন, সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে—তিনি ব্যর্থ কবি? তাহলে সফল কবি কে? সোমেশ্বর?

এই কার্যভার থেকে, স্বাভাবিকভাবেই সোমেশ্বরও একদিন অবসর গ্রহণ করবেন। লেখা ছাপিয়ে যাওয়ার ভার তাঁর হাতে আর থাকবে না। কী লেখা ছাপা হবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে না কেউ। সোমেশ্বরের কাছে এত ফোন আর আসবে না তখন। সভা-সমিতির আহ্বান কমে যাবে। ব্যস্ততা কমবে। গুরুত্ব, যেসব অকারণ গুরুত্বে আজ তিনি বিরক্ত বোধ করেন, সেদিন, এই চাকরি থেকে সরে যাওয়ার পর, সেসব অকারণ গুরুত্ব নেই বলে ফাঁকা ফাঁকা লাগবে না তো সোমেশ্বরের? তাঁর তুলনায় অল্পবয়সি লেখকরা, যাঁরা গুরুত্ব পাবেন, তাঁদের সম্পর্কে মনে হবে না তো এ এমন কিছু নয়? দলবাজি অথবা মিডিয়ার জন্য ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে? ঈর্ষা, প্রান্তবয়সে এসে, তাঁর পায়েও দাঁত বসাবে না তো? নিজেকে, তখন, ব্যর্থ কবি ভাবতে শুরু করবেন না তো সোমেশ্বর? ভুল অর্থে ব্যর্থ!

অবশ্য অন্য উপায়ও আছে। তা হল সমান্তরাল সাম্রাজ্য তৈরির দিকে মন দেওয়া। টেস্ট ক্রিকেটার ওপেনারদের সম্পর্কে একটা কথা চালু আছে। সারাদিন যদি কষ্টেসৃষ্টেও উইকেটে থেকে যেতে পারো, বিকেলে ফেরার সময় দেখবে, তোমার নামের পাশে, স্কোর বোর্ডে একটা সেঞ্চুরি রয়েছে। সোমেশ্বর যদি বেগড়বাঁই না করেন, ঠিক

~ www.amarboi.com ~

ঠিক সভা-সমিতিগুলো করেন, পনেরো মিনিটের শৌখিন আইন অমান্য মিছিলে যোগ দেন, সরকারি-বেসরকারি পদযাত্রায় অংশ নেন, তবে, কোনোক্রমে, সর্বভারতীয় লেখকসমাজের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সম্পাদক হলেও হতে পারেন। সে আশা তাঁর এখনও আছে। হতে পারেন, সারা বাংলা কবি পরিষদের মুখ্য অভিনেতা, নিদেন উপমুখ্য। যার ফলে, সেই নদীরেখাটি তাঁর রচিত মানচিত্র থেকে মুছে গেলেও, কেউ তা দেখিয়ে দেওয়ার সাহস রাখবে না। সোমেশ্বরের গুরুত্ব থাকবে তখনও, হয়তো বেশিই থাকবে। প্রার্থীদের যত সুযোগসুবিধে দেবার ক্ষমতা করায়ত্ত থাকবে একজন নেতার হাতে, তাঁর তত গুরুত্বও থাকবে সমাজে। সাহিত্য সমাজও এর বাইরে নয়।

তবে এর ফলে, সোমেশ্বরকে এখন যেমন, চোখের পলক স্থির রেখে মিথ্যা বলতে সক্ষম এমন দু-এক জনের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়, তখন ধুরন্ধর আরও ওইরকম কুড়ি-পঁচিশ জনকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, সুযোগসুবিধা দিতে হবে, বা দেব-দেব ভাব করতে হবে।

বছর তিনেক আগে বিদেশে একটি আন্তর্জাতিক লেখক-শিবিরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সোমেশ্বর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ষোলোজন কবি-লেখকের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন তিন মাস। লক্ষ করেছিলেন ষোলোজনের মধ্যে তেরোজনই সাহিত্যের উচ্চপদের অধিকারী। সাহিত্যের উচ্চপদ! সে আবার হয় নাকি? হয়ই তো। এর মানে হল, নিজের নিজের দেশে এঁরা বড় বড় অকাদেমি, দামি প্রকাশন সংস্থা অথবা রাজনৈতিক দল পরিচালিত লেখক সংগঠনের কোনো না কোনো বড় চেয়ারে আছেন। সহ-প্রধান, উপ-প্রধান বা উপ-উপ প্রধান। কেউ লিটারেচার সেক্রেটারি, কেউ কালচারাল কনভেনার। এ ছাড়া ভালো ভালো পত্রিকার বিভাগীয় এডিটররা তো আছেনই। সোমেশ্বরের নিজের পরিচয়ের কার্ডেও তো ছাপা অক্ষরে লেখা ছিল—Poetry Editor.

তাহলে? সাহিত্যিক হতে গেলে, সাহিত্যিক হিসেবে ভবিষ্যৎ তৈরি করতে গেলে এখন শুধু লিখলেই হয় না। সাহিত্যের উচ্চ চেয়ারেও থাকতে হয়। যে চেয়ারে থাকলে সাহিত্যের জগৎকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, রাজনীতির মতোই।

কারণ লেখকের লেখার শক্তি একদিন অবসিত হতেই পারে। কিন্তু চেয়ারের শক্তি তো অবসিত হয় না। বসলেই শক্তিমান হওয়া যায়।

অথচ কবির সমস্ত শক্তি তো নির্ভর করবে তাঁর লিখিত শব্দের ওপর।

কবির সামর্থ্যের পরীক্ষা তো তাঁর শব্দের সঙ্গেই?

কে জানে, এখন হয়ত লিখিত শব্দের ক্ষমতার চেয়ে চেয়ারের ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করছে সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ।

লেগে থাকলে সোমেশ্বরেরও ভবিষ্যৎ আছে।

লেগেই তো আছেন সোমেশ্বর।

অফিস যান, কাজ করেন, সভা করেন, বাড়ি আসেন, বই পড়েন, আর মাঝে মাঝে এইসব ভাবেন। মাঝে মাঝে চমক উঠে ফোন ধরেন। আর হতাশ হন। ডেড ফোন বেঁচে

~ www.amarboi.com ~

উঠেছে দুদিন পরেই। এক মাস হতে চলল সেই দুদিনের পর। কিন্তু সে আর ফোন করেনি। যতবার ফোন বাজে, বাড়িতে থাকলে ভেতরটা ধক করে ওঠে। বাইরে কোনো সাড়াশব্দ করেন না। অনুতাপ হয়, কেন নম্বরটা লিখে নেননি প্রথমেই। কিন্তু তবু, এই অনুতাপ হতাশা এখন তাঁকে জাগিয়ে রাখে। কেউ একজন আছে, যে সোমেশ্বরকে পড়ে চলেছে। যে হয়ত, সোমেশ্বরকে বোঝে। যে, একদিন সোমেশ্বরকে কিছু বলবে।

বলবেই, আজ না হোক তো কাল বলবে। জগতের কাছ থেকে এই প্রত্যাশা লুকিয়ে রাখছেন সোমেশ্বর। তাঁর স্ত্রীকে তিনি মিথ্যা বলেন কিন্তু ভালোবাসেন। তাঁর সন্তানকে ভালোবাসেন। কিন্তু এ হল অন্য এক আলো। ভেতরে যা এখন জ্বলে উঠেছে। যে আলো আর জ্বলতে পারে বলে ভাবেননি সোমেশ্বর। এই আলোতে যেন তাঁর কলম পথ দেখতে পায়।

পাঁচ

ফোন যেদিন এল, সেদিন আর চমকে ওঠার অবকাশ নেই সোমেশ্বরের। ফোন সেদিন মুহুর্মুহু বাজছে। একটি সাহিত্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে, সোমেশ্বর তার প্রাপক। টেস্ট ওপেনারের সূত্রটা খেটে যাচ্ছে এখানে। গা লাগিয়ে থাকতে পারলে, বোর্ডে রান উঠবেই। উঠছেও। বাড়িভরতি লোক। মেয়ে খবর পেয়ে হোস্টেল থেকে চলে এসেছে। দু-একজন কাগজের লোক। টিভির এক প্রস্থ লোক এইমাত্র গেছে, অন্য দল আসবে বলে ফোন করেছে, এসে পড়ল বলে। এইসময় ফোন ধরে মেয়ে হেসে বলল, আবারও তোমার।

অভ্যস্ত হাতে ফোন নিয়ে সোমেশ্বর বললেন, হ্যাঁ-অ্যা?

আমি ঘাসফুল।

পলকে সারা ঘর নির্জন হয়ে গেল সোমেশ্বরের কাছে। সোমেশ্বর জানলার বাইরে তাকালেন। নারকেল গাছের মাথায় চাঁদ। প্রায় শীত পড়তে চলল। এপাশের বাড়ির ছাদটা অন্ধকার। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন সোমেশ্বর। ঝকঝক করছে দুটি তারা। সেই চেয়ে থাকা ফিরে এল।

আবার সেই গলা, আমি ঘাসফুল, চিনতে পারছেন কি!

চমক ভাঙল সোমেশ্বরের, কেন চিনতে পারব না। কেমন আছেন। এতদিন খবর দেননি কেন। সুস্থ ছিলেন তো।

না, ছিলাম না। ঠিকই ভেবেছেন।

সোমেশ্বর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কী, কী হয়েছিল?

তেমন কিছু না। আমার মাঝে মাঝে এরকম হয়।

সোমেশ্বর বলেন, একটু ধরবেন? বলে কর্ডলেস সেটটা নিয়ে চলে আসেন বারান্দায়। ওরকম হয় মানে? কী রকম হয়?

মাঝে মাঝে সব কেমন অন্ধকার হয়ে যায়।

অন্ধকার?

~ www.amarboi.com ~

অন্ধকার হয়ে আসে। একদিন দু-দিন, তিন-দিন। এক মাস, দু মাস। টানা চলে। এবার বেশিদিন চলেনি।

কী? কী হয় আপনার তখন?

কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। খেতে ইচ্ছে করে না। আমি দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকি। সাদা দেওয়ালটা দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ করি। চোখ বন্ধ করলেও সাদা দেওয়ালটাই দেখি। দিনগুলো সাদা। রাত্রি, তাও সাদা। সাদা রঙের একটা অন্ধকার। সব সময়।

সোমেশ্বর চুপ করে থাকেন, তারপর বলেন, ডাক্তার কী বলছেন?

প্রত্যেকবার যা বলেন। ডিপ্রেসন।

বসবার ঘরে কোলাহল চলছিল। সেই কোলাহল বাড়ে একটু। মেয়ে এসে বলল, টিভির লোকেরা এসে গেছে। আর দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুবাবু চিঠি আর মিষ্টি পাঠিয়েছেন।

সোমেশ্বর ফোনে বললেন, আজ আমার বাড়িতে কয়েকজন অতিথি এসেছেন। পরে কথা বলব, কেমন?

হ্যাঁ জানি। আপনি এখন ব্যস্ত। ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের বাড়ি আসবেন বলেছিলেন কিন্তু, মনে আছে তো।

সোমেশ্বর বললেন, আপনি যেদিন ডাকবেন, যাব। যেদিন ইচ্ছে, বলবেন।

ফোন রেখে ওপরে এসে টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন সোমেশ্বর। তারা আগে আলো ঠিক করেছে। মাইক্রোফোন লাগিয়েছে। খাট চেয়ার টেনে সরিয়েছে, ফ্রিজের প্লাগ পয়েন্ট থেকে পাওয়ার নিয়েছে—সারা ঘর লন্ডভন্ড। এবার জিজ্ঞেস করল, পুরস্কার পেয়ে কেমন লাগছে?

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলেন সোমেশ্বর। তাঁর মনে পড়ল, এবারও ফোন নম্বর নেওয়া হয়নি।

ছয়

ফোন অবশ্য নিজেই এল। আর সেই সূত্রেই আজ সকালে বেরিয়ে প্রথমে ট্রেনে এসেছেন, আধঘণ্টার মতো। তারপর অটোয় কিছুটা। এখন রিকশায় চলেছেন সোমেশ্বর। চলেছেন ঘাসফুলের বাড়ি। তবে এই জায়গাটা সোমেশ্বরের এলোপাথাড়ি খুঁজে বেড়ানো দক্ষিণেশ্বর নয়। এটা ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে একটু ভেতরে। সে বলেছিল, যেতে যেতে বড় রাস্তার ধারেই মস্ত একটা পুকুর পড়বে। পুকুরটার সামনে এখন পৌঁছেছেন সোমেশ্বর। জল খুব পরিষ্কার। রোদ জলে চমক দিচ্ছে। পুকুরের ঐ পাশে যে রাস্তাটা ঘুরে গেছে, ওইটায় যেতে হবে। লম্বা লম্বা গাছ রয়েছে রাস্তার ধারে। পুকুরটা এত বড় যে পিছনের বাড়িগুলো ছোটো দেখায়।

রিকশা বাঁক নিয়ে অনেকটা এসে পুকুরটাকে পিছনে ফেলল। এবার কী করবেন সোমেশ্বর? নম্বর দিয়েছিল বাড়ির। কিন্তু এখানে বাড়িগুলোর নম্বরপ্লেট কিছুই দেখা যাচ্ছে

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

না। দু তিনটে বাড়ি সামনে। ভাঙা ভাঙা একটা বাড়ির বেশ বড় উঠোন দেখা যায়, নিচু পাঁচিল ঘেরা। উঠোনে কয়েকটা গাছ। গাছ তো এদিকে সব বাড়িতেই। সাইকেলে আসছে এক যুবক, 'আচ্ছা ভাই' বলে মুখ ঘোরালেন সোমেশ্বর, ছেলেটি খেয়াল না করে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন, এই যে, এই যে, এই দিকে।

ঘাসফুল। নিচু পাঁচিল আর বড় উঠোনের ভাঙা ভাঙা বাড়িটার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গেট বলতে অবশ্য কিছু নেই আর। শুধু মরচে ধরা আংটা লাগানো।

সবজে ধরনের একটা সালোয়ার কামিজ, ফ্যাকাশে একটা ওড়না। মুখে শুধু কালচে একটা ছাপ। এতদিন পর তাকে দেখে ভেতরটা ধক করে উঠল এবং অসম্ভব স্বাভাবিক রইলেন সোমেশ্বর। স্বাভাবিকভাবেই হাসলেন। রিকশা থেকে নেমে 'কোন বাড়িটা বুঝতে পারছিলাম না' বলতে বলতে এগিয়ে এলেন আর তাঁর নাকে একটি সুগন্ধ এসে লাগল।

দেরি হল কেন? আমি তো কখন থেকে জানলা আর ছাদ করছি। দেখেই দৌড়ে এলাম।

ট্রেনটা দেরি করল। বলতে বলতে তার পাশে পাশে এগোচ্ছেন সোমেশ্বর আর ততই গন্ধটি জোর হচ্ছে। পুজো পুজো গন্ধ। ধূপের? কী ধুপ? ধূপ এই উঠোনে কোথায় লাগানো?

উঠোনের শেষ প্রান্তে দু-তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে যে বারান্দায় পৌঁছেছে, সোমেশ্বর দেখলেন, সেই বারান্দায় আর একটি মেয়ে, এরই মতো দেখতে অনেকটা, একটু ভারির দিকে গড়ন। তার হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে একটি শিশু।

আমার দিদি।

সোমেশ্বর হাসলেন। হ্যাঁ, দিঘি তো! তাই না?

আসুন, আসতে কষ্ট হয়নি। অন্যজন বলল, তার বাচ্চাটিকে দেখাশোনা করছে এক মহিলা।

না, কষ্ট কী! এ জায়গাটা বেশ খোলামেলা। বললেন, সোমেশ্বর। ভাবলেন, বেশ দিঘির পাশে ঘাসফুল।

পুরো বাড়িটা ব্যবহার হয় না। কিছুটা ভেঙে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। যে অংশে এদের বসবাস, সেও বেশ ভাঙাচোরা। যে ঘরটায় বসেছেন সোমেশ্বর, তার জানলা দিয়ে অন্য একটা বাড়ির উঠোন, সেখানে সুপুরিগাছ, তাঁর গুড়ির ফাঁক দিয়ে পুষ্করিণীর জল দেখা যায়। বড় বড় কচুপাতা আর আগাছার জঙ্গলে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে।

ওই যে, আমার বাবা।

দেয়ালে টাঙানো ছবিতে চশমাপরা একটি লোক। বয়স, হ্যাঁ, অনেকটা সোমেশ্বরেরই মতো। নাক তীক্ষ্ণ, চোয়াল ভাঙা। কিন্তু চোখ দুটি ঝকঝকে। মেয়ে তার আঁখিতারা কোথা থেকে পেয়েছে, বোঝা যায়।

আর এই যে, মা।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একজন মহিলা, আটপৌরে ধরনের শাড়ি পরা। মুখে চাপা হাসির আভা। ছবি তোলার সময় গৃহিণীরা যেমন লজ্জা পান, তেমন লজ্জার রেখা তাঁকে লাবণ্য দিয়েছে। সিঁথির বাঁদিকে লম্বা লম্বা সাদার আঁচড়। দুটো ছবি আলাদা। জোড়ে তোলা নয়। কিন্তু রাখা পাশাপাশি।

কাচ লাগানো দু-খানা আলমারিতে অনেক বই। সোমেশ্বর একটু দূর থেকে কোনো বইয়ের নাম পড়তে পারেন না।

চা নিয়ে ঘাসফুলের দিদি ঢুকল। জানতে চাইলেন সোমেশ্বর, এত সুন্দর গন্ধ কোথা থেকে আসছে?

ঘাসফুলের দিদি বলল, আমরা উঠোনে, সিঁড়িতে, ঘরের বাইরে বাইরে, ধুনো আর ধূপ দিয়ে রেখেছি। আপনি আসবেন বলে।

সোমেশ্বর অবাক! সে কী, কেন?

ঘাসফুলের দিদি আবার বলে, এই প্রথম আমাদের বাড়িতে কোনো কবি এলেন তো, তাই! তাছাড়া, বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করত।

সোমেশ্বর চুপ করে যান। ঘাসফুল বলে, এই বাড়িতেই আমরা বড় হয়েছি কিন্তু এ বাড়ি শিগগিরই ভেঙে ফেলা হবে। প্রোমোটারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেঙে ফেলার আগে, আপনাকে একবার দেখাতে চাই বলে এখানে আনলাম। দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে নয়।

আমাকে দেখাতে চান? কেন?

ঘাসফুল কাঁধ পর্যন্ত চুল ঝাঁকুনি দিয়ে পিছনে ফেরায়। বলে, কারণ এখানেই তো আমরা আপনাকে প্রথম পেয়েছিলাম।

ঘাসফুলের দিদি বলে, বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

সোমেশ্বর আবার চুপ করে যান।

এই দুটি মেয়ে তাঁকে পেয়েছিল? পেয়েছিল মানে?

সোমেশ্বর বলেন, এ বাড়িতে আপনারা বড় হয়েছেন তো, বুঝতে পারছি বাড়ির প্রতি আপনাদের টান কত। তাও কেন...

ছোটো মেয়ে বলে, মেনটেন করা যায় না। আমার জাঠতুতো দাদারা তাদের অংশ বিক্রি করে দিচ্ছে। আমরা কী করেই বা রাখব বলুন?

বড় মেয়ে বলে, আমাকে তো প্রায়ই এখানে এসে থাকতে হয়। বাচ্চা নিয়ে, খুব অসুবিধে। আমার হাজব্যান্ডের ঘুরে ঘুরে কাজ। সেলসে আছে। ওর বরও সেলসেই। তবে আমার বরের মতো অত ট্যুর করে না। কতদিন পারা যায়।

সোমেশ্বর বলেন, আপনারা সাহিত্য এত ভালোবাসেন, দুজনের কেউ কখনও লিখেছেন কিছু?

দিদি বলে, ও লিখত।

বোন খুবই বিরক্ত হয়। কী সব বলিস। ওকে কি লেখা বলে?

সোমেশ্বর উৎসাহিত, কী লিখতেন, কবিতা?

~ www.amarboi.com ~

ছোটো মেয়ে খুবই বিব্রত এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায়। বলে, না, না, কবিতা লেখার চেষ্টা করিনি কখনও। গল্পটল্প লিখেছিলাম। তারপর যা সব হল...

কেন? কী হল!

বড় মেয়ে বলে, আমার এক মামাতো ভাই আছে, আমারই বয়সি, টিভি সিরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত। স্ক্রিপ্ট লেখে। সে-ই গল্প দুটো নিয়েছিল।

টিভি সিরিয়ালের জন্য?

হ্যাঁ, ছোট মেয়ে বলে। সেদিন আমার সঙ্গে যাকে দেখেছিলেন, বুবলুদা, ও-ই।

মনে পড়ে সোমেশ্বরের। লম্বামতো ছেলেটি।

ছোটো মেয়ে বলে, ও নিয়েছিল। তারপর সেই গল্প ভেঙেচুরে বাড়িয়ে কেটে কিম্ভুতকিমাকার করে দিল। দুটোই। তারপর আর লিখিনি।

বড় মেয়ে বলে, তা তো করবেই। ওদের যেমন দরকার তেমনই তো করে নেবে ওরা।

বোন বলে, তবে আমাকে দিয়ে লেখানোর কোন দরকারটা ছিল শুনি? নিজেরাই লিখলে পারতিস।

দিদি বলে, আসলে বুবলুই ওকে বলে লিখিয়েছিল।

বোন বলে, আমার লিখতে কোনোদিনই ইচ্ছে করেনি। বাড়িতে যা চলত লেখা নিয়ে।

দিদি বলে, আসলে মা তো বাবার লেখালেখি করা দেখতেই পারত না।

বলে চুপ করে যায়। তারপর আবার বলে, বেচারি মা।

সোমেশ্বর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, আপনার বাবার কবিতার খাতা আছে? একবার দেখাবেন?

ছোটো মেয়ে বলল, না। দেখানো যাবে না।

স্বরের আশ্চর্য কাঠিন্যে ধাক্কা খেলেন সোমেশ্বর।

দিদি তাকাল তার বোনের দিকে।

সোমেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, দেখাবেন না? কেন? কাছে এখন নেই বুঝি!

থাকবে না কেন? আছে। কিন্তু দেখাব না।

ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেল। নীরবতা ভেঙে সে আবার বলল, আমার বাবা আর কোনোদিন কবি হবে না। আমার বাবা ছিল একজন ব্যর্থ কবি। তার লেখা নিয়ে এখন টানাটানি করে কী হবে।

দিদি চুপ করে আছে। সোমেশ্বর অপ্রস্তুত। আলমারির উপরে হাত রেখে সে বলছে, আপনি অত বড় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বাবার লেখা তো কখনও আপনাদের কাগজে ছাপা হয়নি। কী করবেন এখন? দয়া করে দুটো লেখা নিয়ে গিয়ে ছাপিয়ে দেবেন? কী দরকার বলুন তো। কী দরকার। এতদিন যখন দেখেননি, নজর করেননি বাবার কবিতা, এখন কেন করবেন! আমাদের সঙ্গে চেনা হল বলে? না, বাবার লেখা আপনাকে দেখাব না।

বলে, ঝড়ের মতো বেরিয়ে চলে যায়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সোমেশ্বর। হাওয়ায় পরদা উড়ছে। জানলার বাইরে জংলা

~ www.amarboi.com ~

গাছগুলোয় উড়ছে প্রজাপতি। অপ্রস্তুতভাবে দিদি বলে, কিছু মনে করবেন না। ও একটু ওই রকম। মানে, বাবার ব্যাপারটায়...।

না না, ঠিক আছে। না বুঝে কোথাও আঘাত করেছি হয়তো।

তা নয়। আসলে, ওর...কিছু ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে তো। আপনি জানেন না। বলতে বলতে দিদি দরজার দিকে তাকায়।

ঘাসফুল ফিরে আসে। চোখে গভীর বিষাদ। মুখে কালো ছায়া, আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছি।

সোমেশ্বর অপমান বোধ করেননি। মেয়েটির মধ্যে তীব্র সংবেদনশীলতা আছে। সাড়া পাওয়া যায় তার ব্যবহারে। বাবার জীবনের সম্পর্কে ব্যথা। গভীর অভিমান আছে। সোমেশ্বর বলেন, আমি কিছু মনে করিনি।

সে গিয়ে জানলায় দাঁড়ায়। পরদা পাশে সরিয়ে দেয় ঠেলে। ঘরের দুটো জানলা। একটার সামনে সোমেশ্বর বসেছেন। একটায় সে দাঁড়িয়ে। দিদি বেরিয়ে গেছে।

সে বলে, আপনি যে আমাদের বাড়ি আসতে রাজি হবেন, এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। এ আমার অনেক ভাগ্য। কিন্তু, আসতে যে বলেছিলাম, তা আপনাকে বাবার লেখা দেখানোর জন্য নয়। অন্য, অন্য কারণে।

বলতে বলতে তার মুখে অস্থিরতার ছায়া পড়ে আবার।

সোমেশ্বর সহজ হতে চান, কী কারণে, বলুন না।

মেয়েটি সহজ হয় না। সে যেন কিছুটা দূরে চলে যাচ্ছে। জানলার বাইরে তাকিয়েই আছে। তার জানলাতে লতানো গাছ উঠেছে জাফরি জড়িয়ে, আঙুল দিয়ে সেই লতা নাড়ায় সে। বলে, আপনাকে ফোন করেছিলাম। আপনার সঙ্গে একদিন দেখা করতে চেয়েছিলাম, একটা কথা বলব বলে। খুব জরুরি একটি কথা। আপনাকে বলা খুব দরকার। এক্ষুনি।

তার গলা নেমে আসছে। অন্যমনস্ক স্বর যেন পাতা খসার মতো মৃদু, অল্প। থেমে থেমে আসা।

সোমেশ্বর প্রাণভরে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকা চোখের ঝকঝকে তারাদুটি দেখতে থাকেন। এই তারাদুটি তিনি মনে মনে রিওয়াইন্ড করে বারবার দেখতে চান ভবিষ্যতে।

সে বলে চলে, কি জানেন, সারাদিন তো বই-ই পড়ি। ভালোও তো লাগে কত। কিন্তু, হঠাৎ একজনের লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়, আমি তো এমনই। এ কী করে জানল? মনে হয় এসব তো আমার কথা, আমার। কিন্তু এমন অপরূপ করে তো বলতে জানতাম না। ভাবতেও জানতাম না। তখন মনে হয় এ কে?

ধীরে ধীরে গলার স্বরে চাপ ফিরে আসছে। আকুলতা আসছে। ঘুরে সে তাকিয়েছে সোমেশ্বরের দিকে।

বলছে, তখন মনে হয়, যেই হোক, এই লোক আমার।

সোমেশ্বর ঝকঝকে চোখ দেখতে পাচ্ছেন। চেয়ে আছে। তাঁর হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেছে।

~ www.amarboi.com ~

সে বলে চলে অস্থিরভাবে, আপনি যখন লেখেন, কবিতায় আপনি তো আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু ঢেলে দেন। কি, তাই না।

সোমেশ্বর এই ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নন, তাঁর জবাবটা পোশাকি হয়ে গেল। তিনি বললেন, পারি কি না জানি না, তবে চেষ্টা হয়ত করি, কিন্তু লেখা এতটাই নিজের হাতের বাইরে...

মেয়েটি ধৈর্য হারায়। আঃ শুনতে চাই না। পারেন নাকি পারেন না নয়, চান কি না বলুন। কতটা, কতটুকু পাই আমরা জীবনে? কিন্তু চাই তো প্রচণ্ডভাবে, তীব্রভাবে চাই। আপনি চান না, সত্যি বলুন?

সোমেশ্বর মাথা নামিয়ে বললেন, হ্যাঁ।

মাথা নামানো, কারণ তিনি অনেকদিন কোনো কিছু তীব্রভাবে প্রবলভাবে চাইতে ভুলে গেছেন। তিনি বলতে পারতেন, চাইতাম। কিন্তু বলতে পারলেন না।

সে তার মুখের ওপর এসে পড়া চুল মুঠো করে ধরে। বলে, একজন কবি বলেছিলেন, আমার অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ অংশ আমি পৃথিবীকে উপহার দিতে চাই। তাই আমি কবিতা লিখি। কে বলেছিলেন, আপনি জানেন?

সোমেশ্বরের মনে পড়ে না। তিনি নীরব থাকেন।

বাবা জানত। বোধহয় জার্মানির কোনো কবি। ধরুন আপনার অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ অংশ, যখন আপনার লেখায় ভেসে ওঠে, আর আমার সঙ্গে এসে মিলে যায়, তখন সে তো আমার!

কেমন পাগলের মতো ছটফট করছে। কোনার টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসে। কনুই দুটো টেবিলে রেখে ঝুঁকে পড়ে। বলে, নিজের অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ অংশ যে একবার আমাকে দিয়ে দিয়েছে, তখন সে অন্যের হবে কী করে।

সে স্বগতোক্তির মতো বলে যায়;

গান যদি জাগে তাই অর্ফিউস।

সে আসে এবং চলে যায়।

সেই কি পর্যাপ্ত নয়, মাঝে মাঝে, গোলাপেরও পরে

সে যদি কয়েকদিন আমাদের সংসর্গে কাটায়?

তারপর একটু থেমে বলে, আপনি এসেছেন আজ। চলেও যাবেন। তাতে কী? 'গোলাপের পরে' কথাটার কি কোনো সীমা আছে বলুন?

চিত্রার্পিত হয়ে বসে আছেন সোমেশ্বর। চিনতে পারছেন, রিল্‌কে। বুদ্ধদেবের অনুবাদ।

আপনার সংসার থাকুক। ছেলেমেয়ে থাকুক। চাকরি খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকুক। আপনি যেখানে খুশি থাকুন। কিন্তু ওই একটা জায়গায়, গোলাপেরও পরে, আপনি আমার। যেখানে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব। গোপন শ্রেষ্ঠত্ব। অন্য লেখকের লেখার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব নয়। আপনারই ভিতরকার যেসব ময়লা, নোংরা, অপ্রয়োজনীয় ও দূষিত অংশ সেগুলির তুলনায় আপনার ভিতরকার শ্রেষ্ঠত্ব। সে-ই, সেইটুকু আমার। আপনার ভিতরকার শ্রেষ্ঠ কবিতা—আপনার নয়, আমার। সেই জন্যই, আপনি আমার।

~ www.amarboi.com ~

সোমেশ্বর ভাবছিলেন চারদিন আগেই একটি সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি। তখন মিডিয়া প্রশ্ন করেছিল, এই পুরস্কার থেকে তিনি প্রেরণা পাচ্ছেন কি না। কি মনে হচ্ছে পুরস্কার পেয়ে? জীবন কত আশ্চর্য! এই নিভৃত পুরস্কার, গোপন পুরস্কার, যার মধ্য দিয়ে তিনি এই মুহূর্তে চলেছেন, তার কাছে প্রকাশ্য সম্মান তৃণবৎ তুচ্ছ। সোমেশ্বরের মনে ধারণা জন্মাচ্ছে, তিনি যে একজন চূড়ান্ত পাঠকের কথা কল্পনা করেছেন সারাজীবন, এই হয়ত সেই পাঠক। লেখকের প্রথম ও শেষ আশ্রয়।

ও ঘর থেকে দিদি আসে। বলে, আপনি তো চা আর বিস্কুট ছাড়া কিছুই খেলেন না। একটু পায়েস করেছিলাম। দেব?

সোমেশ্বর বলেন, আমি যে বলেছিলাম আগেই...এই খাওয়ার ব্যাপারটা।

বোন বলে, দিদি, জোর করিস না। বেশি থাকলে টিফিন বাক্সে করে দিয়ে দে। আমি সন্ধেবেলায় ফিরব তখন নিয়ে যাব।

সে কী রে। তুই যে বললি, আজ রাত্তিরে থেকে সকালে ফিরবি।

জেদি গলায় উত্তর আসে। না। আজই ফিরব। আমার সব বই ও বাড়িতে। আমার ফেরার দরকার।

দিদি বলে, কখন যে ঠিক করবে কেউ জানে না। খুব মুডি। দেখলেন তো, একটু আগে কেমন খেপে গেল।

সোমেশ্বর লজ্জিতভাবে বলেন, আমি কিছু মনে করিনি।

সে হঠাৎ ঘুরে বলে, দেখবেন, বাবার একটা কবিতা? আমাদের কবিতা ওটা। হ্যাঁ দিদি দেখাই?

দিদি বলে, আমি কি একবারও বারণ করেছি?

সে আলমারির কাছে চলে যায়। পাল্লা খুলে ভেতর থেকে কাঠের একটা ফোটো ফ্রেম বার করে আনে। সোমেশ্বরের সামনে ধরে। যেভাবে মানপত্র বাঁধানো হয়, সেইভাবে কাচ দিয়ে বাঁধানো। মধ্যে, স্পষ্ট সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা কবিতাটি। কোনো নাম নেই। সোমেশ্বর পড়েন :

এইসব বীজ ধান, এইসব শস্যের গঠন
পথের আত্মীয়বাড়ি, পথে পাওয়া সংসার-স্বজন
এসব আমার হয়নি, আমার হবে না আর এরা
যা ধরেছি, দেখি সব আমারই ভুলের দোষে ঘেরা
ঘুরে দেখি শুধু এই কঠিন বসবাসে
ঘাসফুল ফুটে আছে নিরিবিলি দিঘিটির পাশে।

ফ্রেমটি দেখে ফিরিয়ে দিয়েছেন সোমেশ্বর। ঘরের দুটি জানলা দিয়ে অপরাহ্ণের আলো। সোমেশ্বরের মতামতের জন্য একটু ফিরেও তাকায়নি দুই বোন। ফ্রেমটিকে মাঝখানে রেখে দুজনে দুদিক থেকে কবিতাটি পড়ছে মনে মনে। নাকি দেখছে হাতের লেখাটুকু। অনেকবার দেখার পরও আজ, আবার আর একবার দেখছে। পিছন

~ www.amarboi.com ~

থেকে রোদ এসে পড়েছে তাদের চুলে, পোশাকে। ঘরের টেবিল, চেয়ার, আলমারির কোনায়।

সোমেশ্বরের কথা যেন খেয়াল ছিল না মেয়ে দুটির। পাশের ঘরে শিশুটি ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠতে শিশুর মা 'উঠে পড়েছে' বলে বেরিয়ে যায়। আর অন্য জন আলমারি খুলে যত্ন করে গুছিয়ে রাখল ফ্রেমে বাঁধানো লেখাটা। সোমেশ্বর বললেন, আপনারা দুজনে যখন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে লেখাটা দেখছিলেন, আমার কী মনে হচ্ছিল জানেন!

মেয়েটি আলমারি বন্ধ করে সোমেশ্বরের দিকে তাকায়। কী মনে হচ্ছিল?

মনে হচ্ছিল, চোখের সামনে একটি গান। আমি দেখতে পাচ্ছি।

গান!

সে অবাক। আর কি অবাক তার সেই চেয়ে থাকা।

সোমেশ্বর বলেন, গানই তো। এই যে আপনারা দুই বোন, আপনাদের বাবার একটি কবিতা নীরব হয়ে দেখছেন। কতবার তো দেখা, তবু দেখছেন জগতের সমস্ত কিছু থেকে ডুবে গিয়ে, মনে হল এই দৃশ্যটি একটি গান। বলবেন, গান কী করে হবে? এতে কোনো সাউন্ড নেই। মিউজিক কী? তাতে তো সাউন্ড থাকবে। এখানে নেই। তবে? এই দৃশ্যটি কিভাবে সংগীত হল? হল, কারণ সঙ্গীত আমাদের মনকে যেখানে নিয়ে যায়, যে শুদ্ধ অপরূপ বেদনাময় আনন্দের স্তরে—এই দৃশ্যটিও আমার মনকে সেই স্তরে নিয়ে যাচ্ছিল।

সে একদৃষ্টেই তাকিয়ে থাকে। চোখের পাতা যেন পড়ে না। জানলা দিয়ে আসা হাওয়ায় তার রুক্ষ চুলের একটি গুছি উড়ছে। বিকেলের হেলে আসা রোদ।

সে বলে, এই হচ্ছেন আপনি। ভেতরের কথাটা জানতে পেরে যান। আমার একবার কী হয়েছিল জানেন! হোলি উৎসবের সময় একবার গান শুনতে গিয়েছি, লাহাবাড়িতে। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে কাছেই। দুজন শিল্পী ছিলেন, একজন গাইলেন বসন্ত, আর হোরি কাফি। অন্য জন বাহার-এ পরপর তিনটি বন্দিশ। তারপর একটি হোলির গান। ব্যস, ছোটো অনুষ্ঠান। ফিরছি, বাড়ির কাছে দুটো গাছ আছে। ছাতিম, দেবদারু। রোজই দেখি। সেদিন চাঁদের নিচে দেবদারুকে দেখে মনে হল ঐ গাছটিই যেন স্বয়ং বাহার রাগ। যদিও কোথাও কোনো সাউন্ড ছিল না। প্রত্যেক পাতা থেকে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে।

সোমেশ্বর দেখলেন, বলতে বলতে কী একটা ঘোরের মধ্যে মেয়েটি চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। তারপর আপন মনে বলল, জানেন তো, আমি এখনও চোখ বন্ধ করে গাছটার কথা ভাবতেই তানপুরার আওয়াজ শুনতে পেলাম। যেন এখুনি শুরু হবে গান।

সাত

ছাদে বসে আছেন সোমেশ্বর। দুই বোন ছাদে নিয়ে এসেছে তাঁকে। পুরোনো কতকালের ছাদ। একটা ছাদের ওপরে আর একটা ছোটো ছাদ। কালো হয়ে গেছে মেঝে। কালো হয়ে গেছে সিঁড়ি। প্লাস্টার নেই। তবে লতানে গাছ আছে আলসে জড়িয়ে। একটা ছাদ থেকে ছোটো অপর ছাদে যাওয়ার যে সিঁড়িতে বসে আছেন সোমেশ্বর তারও মাথা ঘিরে

~ www.amarboi.com ~

মালতির ঝোপ এগিয়ে গেছে ওপরের ছাদে। সাদা সাদা ফুল। সামনে তাকালে পুকুর, পুকুরের ওপারে ছোটো ছোটো মানুষজন। ছুটে যাওয়া বাস, স্কুটার। শব্দ আসে না এত দূর।

সোমেশ্বর লক্ষ করেছেন, এরা দুজন তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো হলেও একবারও তাঁকে বলেনি আমাদের তুমি করে বলবেন। বড়জন নমস্কার করেছিল বটে। ছোটজন তাও করেনি। এরা অন্য রকম।

ছোটোজন ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানেন তো এই ছাদে বসেই, ওই আপনি যেখানে বসে আছেন, ওই সিঁড়িতে বসেই বাবা প্রথম আপনার কবিতা শুনিয়েছিল।

নিচে থেকে উঠে আসে বড়জন, তার হাতে গেলাস ভরতি জল, ছোট প্লেটে নীল আর সাদা দুটো ট্যাবলেট। দুপুরে ওষুধটা খাসনি। নে খেয়ে নে।

বোন বিনা প্রতিবাদে খেয়ে নেয়। বলে, মনে ছিল না।

দিদি সোমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলে, ওর তো জানেন, এটাই দোষ। ওষুধ খাবে না। ফেলে দেবে জানলা দিয়ে।

বোন মৃদু আপত্তি করে। সে তো একদিন দিয়েছিলাম।

দিদি বলে, একদিন? মোটেও না। ওর জানেন, প্রবলেম আছে তো? ডাক্তার বলেছেন ওষুধটা ঠিকমতো পড়া দরকার। গ্যাপ হলে বেড়ে যায় অসুখ।

সোমেশ্বর বলেন, না না ওষুধটা খাবেন। আপনি তো এত সুন্দর করে চিন্তা করতে পারেন। ওষুধ না খেয়ে অসুখ বাড়ানোটা কি ঠিক কাজ?

দিদি বলে, সুন্দর চিন্তা! ও তো উলটোপালটা চিন্তা করে জানেন। আপনি একটু বলুন তো বুঝিয়ে।

সোমেশ্বর একটু অবাক হন। উলটোপালটা চিন্তা?

দিদি চোখ বড় করে বলে, আপনি জানেন না, ও উলটোপালটা কাজও করতে যায়। খারাপ কাজ, জানেন তো।

ছোটো বোন বলে, কেন ওসব তুলছিস?

দিদি বলে, হাতের শিরা কেটে ফেলেছিল ও।

আঃ চুপ করবি?

সোমেশ্বর কথা বলার শক্তি পাচ্ছেন না।

তাও সেটা এ বাড়িতে। আমি ছিলাম বাড়িতে তাই রক্ষে। আর ও বাড়িতে যখন, তখন তো রঞ্জিত ছিল না। কী হত।

উঃ বাবা। হয়নি তো কিছু শেষ অবধি। করিনি তো।

দিদি বলে, করিসনি, কিন্তু ভাববিই বা কেন। কেউ ভাবে ওইরকম বিশ্রী কথা।

সোমেশ্বর দ্যাখেন তার মুখে অস্থিরতার রেখা কাঁপছে আবার। সে বলছে, বিচ্ছেদ। আমি বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারি না জানেন। একটা কলমের ঢাকনা যদি হারিয়ে যায় আমার ঘুম হয় না রাত্তিরে। মনে হয় কলমটা এখানে পড়ে রয়েছে তার খাপটা কোথায়? কোন

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খাটের তলায়? সিঁড়ির তলায় অন্ধকারে? একা একা থাকতে কষ্ট হবে হারিয়ে যাওয়া খাপটার।

দিদি বলে, ও জানেন দুটো গ্লাস পাশাপাশি থাকলেও সরাবে না। বলে নিতে হলে দুটো একসঙ্গে নিবি। ওদের কাউকে একা করে দিবি না।

ছোটো মেয়ে এসব শোনে না। সে বলে চলে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ। বাবা বলত কবিতা সমস্ত বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে কাজ করে। বাবা বলত, কবিতায় মিল থাকে তো, মিল মানে মিলন। যখন কেউ জোর করে মিল দেয় কবিতায়, বাবা বলত, যেন রেপ করছে কবিতাটিকে। কবিতার যদি ইচ্ছে হয়, সে ঠিক মিল আপনিই নিয়ে নেবে। জোর করতে হবে না, বাবা বলত, মিল ছাড়াও কি সুন্দর কবিতা হয় না? হয়। বাবা বলত...

চুপ করে যায় ছোটো মেয়ে। তারপর আপন মনে বলে, কিন্তু জীবন? জীবনে কি তাই হয়? মিল ছাড়া কি জীবন হয়, বলুন? হয় না তো।

তীব্রভাবে তাকিয়ে থাকে সোমেশ্বরের দিকে। সোমেশ্বর তাকিয়ে থাকতে পারেন না। চোখ সরিয়ে নিয়ে বলেন, আপনার জীবন সুন্দর হবে। পূর্ণ হবে। দুশ্চিন্তা করবেন না। খারাপ কথা ভাববেন না।

সুন্দর হবে? পূর্ণ হবে? আপনাকে তো এখানে সভাপতি হতে হয়নি। আপনি তো কারও সংবর্ধনা সভায় ভাষণ দিচ্ছেন না। তবে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছেন কেন!

ঠিক তো। সোমেশ্বর ভাবলেন। বানিয়ে বানিয়েই যেন বলেছেন তিনি। ঠিক। বলতে বলতে এমন হয়েছে, এসব কথায় আর প্রাণ দিতে পারেন না এখন।

ছাদের আলসেয় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন দূরে, ওই পুকুরের ওপারে তাকিয়ে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো সোমেশ্বরের দিকে ঘুরে বলে, বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে আমার। বিচ্ছেদ। রঞ্জিত আর আমার সঙ্গে থাকতে পারছে না। আমি নাকি অস্বাভাবিক। বিচ্ছেদ। আমি বাড়ির গাছেদের সঙ্গে কথা বলি। ও বাড়ির বারান্দায় টবে জল দিতে দিতে কবিতা শোনাই। কবিতার বই বিছানায় নিয়ে শুই। কবিদের সঙ্গে ঘুমোই। বেড়াতে গেলে কবিদেরও সঙ্গে নিয়ে যাই। রঞ্জিত রেগে যায়। রঞ্জিত ঈর্ষা করে, ও তো পড়েনি কখনও। তাই ওর পক্ষে একেবারে অচেনা কতকগুলো নামকে ও ঈর্ষা করে। বলে আমার সঙ্গে কোনো সুস্থ মানুষ থাকতে পারে না। আমার নাকি একা থাকা উচিত। একা।

দু-হাতে আলসের ওপর ভর রেখে সে হাঁপায়। মুখের ওপর চুলগুলো ঝুঁকে পড়ে। যে আমি একটা গ্লাসের পাশ থেকে আর একটা গ্লাস সরাতে পারি না, বাড়ি থেকে পুরোনো শিশি-বোতল যখন বিক্রি হয়ে যায় তখন আমি কাঁদি, কারণ ঐ পুরোনো শিশি-বোতল ওরা তো এতদিন আমাদের সংসারেই ছিল, বিচ্ছেদ কেন হবে, ওরা বলতে পারে না তাই। বিজ্ঞান যদি একদিন বলে, ওইসব বস্তুরও প্রাণ আছে? ওরাও অনুভব করতে পারে? আমার কত হাতের স্পর্শ, এই বাড়ির ধূপ-ধুনোর কত গন্ধ, বাবা-মায়ের শোক, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওই শিশি-বোতলগুলোও তো পেয়েছে, এই চেয়ারটা যেমন পেয়েছে। ওই আলমারিটা।...শুধু ওরা বলতে পারেনি, এই যা।

~ www.amarboi.com ~

সোমেশ্বর কাঁধের ঝোলার থেকে রাস্তায় কেনা জলের বোতলটা ছিপি খুলে এগিয়ে দিয়ে বলেন, আপনার গলা শুকিয়ে গেছে। জল খান একটু।

সে হাতে বোতলটা নেয়। বলে এ থেকে আপনি জল খেয়েছেন? একবারও?

খেয়েছি তো।

ওটাতে তো আপনার স্পর্শ আছে, হাতের। এই দেখুন, আমারও রইল।

উঁচু করে জল খায় সে। হাত বাড়িয়ে বলে, ছিপিটা দিন।

ছিপিটা লাগিয়ে নেয়। এটা আমার কাছে রাখব?

রাখুন না। সহজ হতে চান সোমেশ্বর।

জানেন, সেই রাত্রে, অত বড় বাড়িতে আমি একা। খাটের ওপর টুল রেখে উঠে দাঁড়িয়েছি, ফ্যানের সঙ্গে দোপাট্টার একটা দিক বেঁধেছি। অন্যদিকটা গলায় লাগিয়ে ফাঁস দিতে যাব, দেখলাম টুলের নিচে বিছানায় কবিতার বইগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ কী মনে হল জানেন?

কী মনে হল জিজ্ঞাসা করার শক্তি সোমেশ্বরের নেই।

সেও উত্তর দিতে চায় না। বলে চলে, মনে হল, এরপরও কত আশ্চর্য কবিতা লেখা হবে, কত নতুন নতুন কবিরা আসবেন লিখতে। আমি থাকব না? আমি কিছু জানতে পারব না?

জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। ঘাম ফুটে উঠেছে মুখে। দূরে তাকিয়ে সে বলছে মনের মতো মানুষ যদি না-ই পাওয়া যায়, তার জন্য মরতে হবে কে বলেছে? মনের মতো কয়েকটা কবিতার জন্যও তো বেঁচে থাকতে পারি? পারি না? নতুন কবিতা পড়ার জন্য বেঁচে থাকতে পারি তো।...টুল থেকে নেমে পড়লাম।

সোমেশ্বর বললেন, আপনি শান্ত হোন। আপনার মতো করে চিন্তা করতে তো সবাই পারে না। যারা পারে না তাদের ওপর অভিমান করে নিজেকে কষ্ট দিতে নেই।

হঠাৎ সে ঘুরল সোমেশ্বরের দিকে। এখন আমাকে শান্ত হতে বলছেন, কিন্তু আপনিই বা কী করলেন আমার সঙ্গে?

আমি? সোমেশ্বর কিছু ভেবে পান না। আমি কী করেছি?

এত আগে কেন জন্মালেন? আমার চেয়ে কুড়ি বছর আগে কে জন্মাতে বলেছিল আপনাকে? আমার কথা একবারও ভাবলেন না? ভাবলেন না? যার জন্য লিখছি, যার দিকে যাচ্ছে লেখাগুলো, সে যখন পাবে, তার কী অবস্থা হবে? সে কী করবে নিজেকে নিয়ে? কী করবে সে লেখককে নিয়ে?... মানে, বলুন... আসলে এসব লেখা তো আমার? আমারই। দিয়ে দেওয়ার আগে কেন ভাবেননি একবার?

দিদি উঠে এসেছে আবার। এবার তার সঙ্গে শিশুটিও আছে।

ওপরে এবার কিন্তু মশা হবে। চলুন নিচে গিয়ে বসি।

সোমেশ্বর ঘড়ি দেখলেন। আর বসব না জানেন। অনেকটা ফিরতে হবে তো।

সিঁড়ির দিকে এগোলেন সোমেশ্বর।

~ www.amarboi.com ~

এ জায়গাটা অন্ধকার হয়ে যায় বিকেলেই, এই সিঁড়িটা।

দাঁড়ান আমি নিচে গিয়ে সিঁড়ির আলোটা জ্বালাই। দিদিকে আবার নিচে যেতে হয়।

চলি তবে? মুখে হাসি আনার চেষ্টা করেন সোমেশ্বর।

সে এগিয়ে আসে। বলে চলে যাচ্ছেন, না? হ্যাঁ চলে তো আপনি যাবেনই। ঠিকই।

সোমেশ্বর বলেন, আজ যাচ্ছি। আবার আসব।

সোমেশ্বর মনে মনে বলেন, ঠিক, তোমার জন্যই লিখেছি। তোমার জন্যই লিখব। তবে দেখা পাব ভাবিনি।

মুখে বলেন, ডাকলেই আসব। ডাকবেন।

সে হঠাৎ বলে, না। ডাকব না আর। আমার আর দরকার নেই আপনাকে। এক জীবনে একবারই যথেষ্ট। হেল্ডার্লিনের সেই কবিতা মনে আছে তো : 'একবার বেঁচেছি দেবতা হয়ে, আর তাই যথেষ্ট আমার?'

সোমেশ্বর আবার মাথা নামিয়ে নেন। বলেন, মনে আছে। তাই হবে। চলি তবে, বলে সিঁড়ির দিকে ঘোরেন।

কেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, শুনবেন না? না শুনেই চলে যাবেন?

সোমেশ্বর আর কোনো প্রতিরোধ করেন না। কেন, ডেকেছিলেন?

সিঁড়ির দরজার ডান দিকটায় সোমেশ্বর দাঁড়িয়ে। বাঁদিকে, দরজার পাল্লায় পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে সে। মাঝখানে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া সিঁড়ির সুড়ঙ্গ।

ডেকেছিলাম একটা কথা বলব বলে।

সোমেশ্বর তাকিয়ে আছেন। ওই চেয়ে থাকার দিকে। আর কখনও দেখতে পাবেন না হয়তো।

খুব জরুরি একটা কথা।

বলুন।

সে হাত বাড়িয়ে সোমেশ্বরের হাত তুলে নেয় হাতে। সোমেশ্বর কেঁপে ওঠেন। সেও বুঝতে পারে সেই কেঁপে ওঠা। হাত টেনে নেওয়ার টানে এক পা এগিয়ে আসেন সোমেশ্বর। এক পা-ই মাত্র।

টান দেওয়ার টানে সেও এগিয়ে আসে এক পা।

সোমেশ্বরের হাতের পাতাটি নিজের গালে রাখে। রাখে চোখের ওপর। তারপর পূর্ণ চোখে তাকায় সোমেশ্বরের দিকে। সোমেশ্বরের ভিতরটা থরথর করে। সোমেশ্বর নিজেকে বলেন, জীবনে একবারও যদি এই চোখের দিকে তাকানোর সুযোগ নাও আসে, তবু এই মুহূর্তটির কথা লেখার জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

সে বলে, বলব? আমাকে বিশ্বাস করেন তো?

সোমেশ্বর নিশ্বাসের স্বরে বলেন, করি।

সে বলে, আর আপনি লিখবেন না।

সোমেশ্বর প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেন না। কী বলছে?

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোমেশ্বর চেয়ে থাকেন।

আপনার কাছে একটাই অনুনয় আমার। আর লিখবেন না। আপনি শেষ হয়ে গেছেন। আপনার কবিতা আর আপনার ভেতরের সমস্ত শক্তি শেষ। আর সেইরকম লেখা আপনি লিখতে পারবেন না! মেনে নিন।

ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নেন সোমেশ্বর। তাঁর পৃথিবী চোখের সামনে ঝাপসা হয়। আবার ফুটে ওঠে। নিশ্বাসের দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে বলে, বাবা বলেছিল, দেখিস, এ একদিন বড় হবে। আপনি বড় হলেন না। সভাপতি হলেন। সম্পাদক হলেন। অনুগ্রহ বিতরণকারী সম্পাদক। হয়ত আরও কয়েকশ সভায় সভাপতি হবেন। আরও পুরস্কৃত হবেন। সাহিত্যসমাজের লোলচর্ম অধিপতি হয়ে জয়ন্তীতে জয়ন্তীতে মালা নেবেন, মঞ্চে বসবেন। কবিতার উৎস শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে জেনেও সাহিত্যের সর্দার হয়ে কুর্নিশ নেবেন, যা নিতে শুরু করেছেন এখন। এও কি একজন ব্যর্থ কবির জীবন নয়? আমার বাবা একাই ব্যর্থ কবি ছিল?

সোমেশ্বরের অসাড় জিহ্বা বলে, আমি...আমি যাই এখন।

যাবেন। কিন্তু আর লিখবেন না। কি জানি আপনার ফেরার রাস্তা আর আছে কি না। সূর্য যেমন স্বাভাবিক ভাবে অস্তে নেমে যায় তাতে তার কোনো অসম্মান হয়? আপনার অবসানকে মেনে নিন। শান্তভাবে দৃঢ় পায়ে অন্তরালে চলে যান। আপনার পুরোনো লেখা ফিরে ফিরে পড়ব, কিন্তু আপনার নতুন লেখা পড়বার পরেকার অসম্ভব সেই হতাশা আমাকে দিয়ে আর সহ্য করাবেন না। আমাকে এইটুকু সম্মান তো দেবেন? সেই সঙ্গে নিজেকেও।

এই, এই জরুরি কথাটুকু বলার জন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে অতলের দিকে নামতে নামতে একবার পিছনের দিকে মুখ ঘোরালেন সোমেশ্বর। সে যেন অনেক দূরে, সিঁড়ির মুখটায়। দাঁড়িয়ে আছে আবছা। তার চোখ দেখা যায় না আর। ছাদে সন্ধে নেমেছে।

সোমেশ্বর বুঝলেন তাঁর আর সরে যাওয়ার উপায় নেই, কিন্তু সেই চেয়ে থাকা মিলিয়ে গেছে—অকস্মাৎ দেখা দিয়ে আবার অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে যাওয়ার সে স্বাধীনতা থাকে শুধু উল্কাদেরই।

দেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

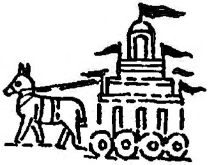

তুমি জানো, শ্রীজাতকিশোর?

সেই একদিন আমি প্রজাপতি ছিলাম। শ্রীজাতকিশোর, আমি একদিন মথের জীবনও কাটিয়েছি। তখন আমার ডানায় ছিল কত রঙের ফুটকি। যে কোনো পাতায় গিয়ে বসতাম আমি। আমি যখন খুব ছোটো, তখন আমার সঙ্গী একটা জানলায় বসেছিল। সে বাড়ির একটা বাচ্চা ছেলে জানলাটা বন্ধ করে দেয়, এক মুহূর্তে পিষে গিয়েছিল বেচারি। সে কি আমার বোন ছিল? সে কি আমার ভাই ছিল? আমি তার নাম জানতাম না, শ্রীজাতকিশোর, আমি, তারপরও সাহস করে কত বাড়ির জানলা দিয়ে ঢুকে গেছি, বসেছি তাদের দেয়ালে। কত চুনবালি খসা দেওয়াল, বাচ্চাদের পেনসিলের আঁকিবুকি কাটা দেয়াল কত, দেয়ালের নিচে তাক, তাকে কাঁসা এনামেলের বাসন, বাসন তুলে রাখা, বাসন নামিয়ে রাখা হাত, আমি দেয়াল থেকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছি সেইসব হাতে কত দাগ, হাতের শাঁখাপলা, রোগা রোগা শিরা। যখন উনুন ধরানো হয়, ধোঁয়া লেগে দেয়াল ছেড়ে উড়ে বেরিয়ে গেছি আমি। ছোট্ট জানলা দিয়ে, রান্নাঘরের জানলা—বেঁটে, ময়লা, শিকগুলোতে যে কতদিনের মরচে, জানলার পাল্লাগুলো ফাটা, রং হয়নি কতকাল—এসব জানলার নিচে বসে একটা মা রাঁধে, একটা মা রাগ করে—, একটা মা ছেলেমেয়েদের ধাঁই ধাঁই দেয় দু'ঘা। দু-তিনটে ছেলেমেয়ে কাঁদে, দু-তিনটে ছেলেমেয়েই স্কুলে যায় দু-তিনটে ছেলেমেয়ে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করে। দু-তিনটে ছেলেমেয়ের বাবা ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, রাত করে ফেরে, তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো কখনও জ্বলে কখনও জ্বলে না, পাওয়ার অফিসের লোক এসে লাইন কেটে দিয়ে যায় বিল জমা হয়নি বলে। লণ্ঠন নিভিয়ে দেওয়া অন্ধকারে, মশারির চালের ওপর এসে বসি আমি। দু-তিনটে ছেলেমেয়ের বাবা, দু-তিনটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছেলেমেয়ের মাকে টানে। মা আধো ঘুম থেকে উঠে থাপ্পড় মারে, অশান্তির আগুনে মশারি পুড়ে যায়, সেইসব আগুনের ওপর দিয়ে আমি উড়ে বেরিয়েছি, শ্রীজাতকিশোর, আমার ডানা থেকে দু-একটা রেণু সেইসব আগুনে ঝরেও পড়েছে। তবু কখনও অশান্তির পরের সকালে যখন রোদ ওঠে, শুকনো শুকনো ডালপালা পড়ে থাকা উঠোনটায় শালিক ডাকে কটরকট, ফুড়ুক করে একটা তুলোফুরকি পাখি শুকিয়ে যাওয়া শিউলিগাছের ডাল থেকে উড়ে পাতকুয়োর ওপর বসে। বাড়ির সামনে ছোট্ট পায়ে চলা পথটা দিয়ে বাজারে সবজি নিয়ে যায় মাথায় ঝুড়ি চাষি বউরা, তখন দরজার সামনে জল দিয়ে, ঘরে আসার সময় বারান্দার বাইরের দিককার থামে বসে থাকা আমাকে দেখে ঐ ছেলেমেয়ের মা'ই বলে ওঠে—বাঃ, কী সুন্দর মথ! শ্রীজাতকিশোর, আমি কারও অশান্তি কমাতে পারতাম না, কারও আগুন আমি ঢেকে দিতে পারি না আমার ডানা দিয়ে। তবু আমি উড়ে বসেছিলাম ওই বউটির ময়লা আঁচলে, ওকে 'থাকো থাকো, শান্ত থাকো বলে' পালিয়েছিলাম : পরক্ষণেই কারণ আমাকে আঁচল থেকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে যদি ও আমায় ব্যথা দিয়ে বসে, ইচ্ছে করে নয়—কিন্তু দেয় যদি। কিংবা যদি ওর বাচ্চারা 'মা! তোমার আঁচলে একটা মথ বলে চেঁচামেচি লাগায়, তাড়া করে আমাকে, যদি আমার ডানা ছিঁড়ে দেয়...তাই আমি পালাই, তাই আমি পালাতাম, ওদের মায়ের চোখের সামনে দিয়ে, আর অবাক হয়ে বলত ওদের মা—'বাবা, মথটা এখানেও এসেছে!' ওর মা তো তখন স্নান করতে যাচ্ছে সামনের পুকুরে, ভাঙা ভাঙা ধাপ দিয়ে নামছে ঘাটে, কাঁখ থেকে কলসি রেখে বলে উঠল—'ইস এত সুন্দর মথটা, রাজু বিজু দেখতে পেল না!' রাজু বিজুকে দেখা দিতে আমার ভারী দায়! ওরা আমায় দেখলেই তো ধরতে ছুটবে, তাই আমি সবাইকে দেখা দিতাম না। আমি সবাইকে দেখা দিই না শ্রীজাতকিশোর। সকলের অশান্তি আমি নেভাতে পারি না, শুধু তাদের কষ্টের ওপর দিয়ে একটু উড়ে যেতে পারি, যদি তাদের মন ভালো হয়, যদি তারা একবার 'বাঃ কী সুন্দর' বলে ওঠে! শ্রীজাতকিশোর। আমি রাস্তার পড়ে থাকা রক্তের ওপর দিয়েও উড়েছি। উলটে যাওয়া ট্রাক যখন চারচাকা আকাশমুখো তুলে, চারদিকে গোল করে লোক জমিয়ে তার নিজেরই ড্রাইভারের ওপর চিত হয়ে আছে, তখন সেই ড্রাইভারের বেরিয়ে থাকা মাথার ওপর আমি ঘুরে ঘুরে উড়েছি, চিরকালের মতো তাকিয়ে থাকা চোখ দুটোর পাশের কপালে বসেওছিলাম একবার। চোখ দুটোকে বলেছিলাম—ঘুমোও ঘুমোও, নিশ্চিন্তে ঘুমোও এবার। আর তোমাকে সারারাত জোর করে তাকিয়ে থাকতে হবে না, আর তোমাকে ধাবায় নেমে গলা অবধি বিষপান করতে হবে না, আর আশি মাইল গতির থরথর কাঁপা স্টিয়ারিংয়ের ওপর তোমার শক্ত কবজিকে, আঙুলকে সতর্ক রাখতে হবে না, উলটোদিক থেকে আসা তোমারই মতো আরেকজনকে পাশ দিতে হবে না, বার বার কেউ তোমার সামনের ভরদুপুরের পিচ রাস্তায় মরীচিকা ফেলবে না, মরীচিকা তুলবে না, ছুটতে ছুটতে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে অর্ধেক জলের মধ্যে চার চাকা তুলে উলটো হয়ে থাকা আরেকটা ট্রাককে দেখে আর শিউরে উঠতে হবে না তোমাকে।

~ www.amarboi.com ~

ঘুমোও ঘুমোও বলে আমি উড়ে যাব জমা হওয়া লোক-দঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ হয়ত বলবে : 'কারবার দ্যাখো এর মধ্যে আবার একটা মথ এল কোত্থেকে!' শ্রীজাতকিশোর, ওরা কেউ জানবে না আমি উঠে আসবার আগে ড্রাইভারের হিমকপালে একবার আমার মুখ ছুঁইয়ে এসেছি। শ্রীজাতকিশোর, ওরা এও জানবে না আমি ড্রাইভারকে বারণ করে এসেছি ওর বাড়ির কথা ভাবতে, যদিও ওদের এখন খুব কষ্টে কাটবে কিছুদিন, যতদিন না ওর ছেলে ঠিকঠাক বড় হয়ে ওঠে, যতদিন না ওর মেয়ে একটা বর খুঁজে পায়, যতদিন না...যতদিন না...ততদিন আমি দড়ির খাটিয়ার ওপর দিয়ে উড়ে যাব গোয়ালের দিকে, গিয়ে বসব বড়ো গাইটার শিঙের ওপর, আর ওর বউ হঠাৎ দেখে ফেলবে আমাকে, তখন শিং থেকে আমি বসেছি চাঁদ—কপালে, আর গাইটার মাথা নাড়ানোতে উড়েও যাচ্ছি সামনের শিমুল গাছটার দিকে, আর বউটা তখন তার শোকতাপ অভাব অভিযোগ ভুলে কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার উড়ে যাওয়ার দিকে যেন আমি শিমুল গাছের কোন পাতায় বসব তা না দেখলে ওর চলবেই না। ওই কয়েক মুহূর্তের জন্যেও তো ওর মন অন্যদিকে যাবে! ও খুশি হয়ে উঠবে, ছেলেবেলাকার খুশি! কয়েক পলকের জন্যে হলেও আমি ওই খুশি দেব তাকে, আমি না হলেও আমার মতো অন্য কেউ দেবে, অন্য কোনো মথ! শ্রীজাতকিশোর, ওরা যে দেশে থাকে ততদূরে তো আমি যেতে পারব না, অতদূর যেতে আমার ডানা ঝরে যাবে, কিন্তু ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে নিশ্চয়ই উড়ে যাবে ওদেরই দেশের কোনো মথ, যে, আমারই মতো নিশ্চয়, দুঃখী দুঃখী সব বাড়ির মন কয়েক পলকের জন্য খুশি করে বেড়ায়। হ্যাঁ, শ্রীজাতকিশোর, বাড়িরও মন আছে। ধোঁয়ার দাগ ধরা, পলেস্তারা খসা, বহুদিন চুনকাম না করা যেসব দেয়ালে গিয়ে আমি বসি, সেইসব দেয়ালের ভেতরেই থাকে বাড়ির মন। হ্যাঁ, থাকে। থাকে না, ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল থেকে দেয়ালের ভেতরে ভেতরে ঘুরে বেড়ায় সেই মন, ধরো, আমি যখন কোনো ময়লা দেয়ালের ওপর গিয়ে বসি, তখন সেই আধভাঙা বাড়ির সকাল ঘুমে নিঃঝুম, আধভাঙা জানলা ক্যাঁচকোঁচ করছে হাওয়ায়, ময়লা মশারির ভেতর হাঁপের নিশ্বাস, এইসব বাড়িতে লোকে ঘুমের মধ্যেও শান্তি পায় না, সেই অশান্তির ঘুমের ভেতর থেকে উহ্ আহ্ আওয়াজ উঠে আসে। রান্নাঘরে ইঁদুরে কিছু একটা ফেলল, কিচকিচ ছুঁচো ডাকল সামনের বাগানমতো অন্ধকার জংলাটায়, আর আমি যেই গিয়ে বসলাম একটা চুনখসা বালিখসা দেয়ালের কোনায়, অমনি সেই দেয়ালের পেছন দিকে এসে বসে পড়ল বাড়ির মনও। ঠিক আমারই মতো দুদিকে ডানা ছড়িয়ে, আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ধক ধক শুনতে পাচ্ছি—বুকে কান পাতলে যেমন শুনতে পাওয়া যায়। বাড়ির মন আমাকে বলল, তুমি কোথা থেকে আসছ? বললাম, মন্দিরের ধারের ওই বটগাছটা চেনো তো? তারই একটা পাতা থেকে। পাতাটা হাওয়ায় ঝরে পড়ল, আর আমিও উড়তে থাকলাম। পাতাটা উড়তে উড়তে পড়ল তোমাদের বাড়ির সামনে মাটিতে। আর আমিও জানলা দিয়ে ঢুকে পড়লাম। দেয়ালের উল্টোদিক থেকে বাড়ির মন বলল, কিন্তু কেন এলে, এ বাড়িতে বড় অশান্তি। আমি বললাম—হ্যাঁ সে তো হয়ই, কিন্তু তুমি নিজেকে ঠিক রাখো। দেখবে

~ www.amarboi.com ~

একদিন সব অশান্তি কেটে যাবে। অভাবকে অভাব বলে মনে হবে না একদিন, ততদিন তো নিজেকে ঠিক রাখতে হবে। কী করে রাখব! বাড়ির মন বলল, 'কত দিন আর নিজেকে ঠিক রাখব, কেউ তো আর আমাকে ভালোবাসে না, এ বাড়ির কেউ'—কী করে জানলে, ভালোবাসে না? আমি বলি। বাড়ির মন বলে, 'কখন আর ভালবাসবে, সারাক্ষণ নিজেদের শাপমন্যি করছে, কেউ ঘটিবাটি ছুঁড়ে মারছে, কেউ গায়ে আগুন ধরাতে যাচ্ছে, কেউ গলায় দেবার জন্য দড়ি খুঁজছে সারাজীবন...আমাকে ভালোবাসবার সময় কোথায় ওদের? ওরা নিজেদেরই ভালোবাসে না। আমি বলি, আচ্ছা বেশ, বাড়ি, তুমি রাগ কোরো না, তুমি খারাপ থাকলে তো সবার কষ্ট।—না, কারও কষ্ট নয়, কেউ তো আমায় ভালোবাসে না, বললাম না। আমি তোমায় ভালোবাসব বাড়ি। আমি তোমায় খুব ভালোবাসব। বাড়ির মন অবাক!—তুমি! তুমি ভালোবাসবে আমাকে?—হ্যাঁ, আমি। কেন, আমাকে পছন্দ নয় তোমার? বাড়ির মন আকুল হল।—তুমি, সবুজ মথ! তোমাকে পছন্দ না হয়ে পারে! এ তো আমি ভাবতেও পারিনি।

—কী ভাবতে পারোনি তুমি?

—এই যে তুমি ভালোবাসবে আমাকে। তার মানে তুমি আজ থেকে থাকবে তো আমার কাছে?—না বাড়ি, আমি থাকব না। আমি থাকব তো বলিনি। বাড়ির মন যেন ভেঙে পড়ে—সে কী, থাকবে না! তবে ভালোবাসবে বললে যে!—হ্যাঁ, বাসব তো, আজ রাত্তিরের মতো ভালোবাসব, আজীবন যত ভালোবাসা তোমার বাকি আছে, এই এক রাত্রে তা পূর্ণ করে দেব আমি। বাড়ির মন বলে,—আর তারপর? কাল সকালে বুঝি উড়ে যাবে?—হ্যাঁ, যাব। ওই জানলাটা দিয়ে। ক্যাঁচকোঁচ করা ওই ভাঙা জানলাটা?—হ্যাঁ, ওটা দিয়েই তো এসেছিলাম, ওটা দিয়েই যাব। বাড়ির মন বলে,—তারপর থেকে আমি ওই জানলাটার দিকে আর তাকাব কী করে? যতদিন না মিস্তিরারা এসে আমাকে আবার ভেঙে ফেলছে ততদিন তো ওই জানলাটা নিয়ে আমাকে থাকতে হবে। আমার নিজেরই একটা জানলার দিকে আমি তাকাতে পারব না।

—পারবে না কেন, যখন ভাববে ওই জানলা দিয়েই আমি ঢুকেছিলাম, এসে বসেছিলাম তোমার দেয়ালে, তখন আর জানলাটাকে অত অসহ্য মনে হবে না তোমার। তাছাড়া আর কখনও আসব না, তাও তো বলিনি। আবার হয়ত ওই জানলাটা দিয়েই, কিংবা ফাটল ধরা ঐ দরজাটা, কিংবা রান্নাঘরের ঘুলঘুলি— যে কোনো দিক দিয়েই তো আমি আসতে পারি। আবার আসব না তো বলিনি।—আবার আসবে তুমি! আশ্চর্য, আমি তো এখনও চলে যাইনি, আবার আসার কথা তো পরে। তার আগে তো এই রাতটা রয়েছে। আমাদের হাতের সামনের এ রাত! ভালোবাসার জন্যে।—ও বলল, কিন্তু আমরা তো কেউ কাউকে দেখতে পাই না, আমরা তো দেওয়ালের এপিঠে ওপিঠে। কী করে আমি তোমাকে ছোঁব! আমি বললাম, বালি, সিমেন্ট, ইঁট, চুন গলে যাক, ব্যবধান গলে যাক। তুমি মনে মনে বলো, তোমাকে ছোঁব। দেয়ালের উলটোপিঠে ধক ধক বেড়ে উঠল। আমিও বলতে লাগলাম— এসো, তোমাকে ছুঁই, এসো। আর আমাদের মধ্যের দেয়াল

~ www.amarboi.com ~

মিলিয়ে গেল রাত্রির ভেতরে। আমি তাকে পেলাম, সে আমাকে দিল—যত ভালোবাসা সে অন্যদের দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে আজীবন, সব সে দিল আমাকে।

সকাল হওয়ার আগে যখন আমি তাকে ছেড়ে এলাম, বাড়ির অন্য সবার সঙ্গে সেও তখন আচ্ছন্ন ভোরবেলার ঘুমে, কী আশ্চর্য! এতদিন বাড়ির সবাই যখন ঘুমোত, জেগে থাকত শুধু বাড়ির মন। আজ সেও ঘুমে। তারপর সকাল হল, আর অতদিনের ভাঙা বাড়িটাকে রোদ পড়ে কী সুন্দর দেখতে লাগল। ক্যাঁচকোঁচ করা ফাটা জানলাটায় সকালের রোদ্দুর লাগল। ভাঙা দরজার মধ্যে দিয়ে ঢুকল দুটো তিনটে সাহসী চড়াই। বাড়ির লোকেরা সকালের চা-বিস্কুট থেকে ভেঙে বাসি রুটির প্রাতরাশ থেকে ছিঁড়ে বারান্দায় টপকে দিল। চড়াইরা ভয়ে পিছু হটল প্রথমে, আবার ভাঙা থামের ওপর দিয়ে উড়ে এসে ঠোঁটে তুলে নিয়ে পালাল তাদের জলখাবার। সেদিন থেকে ঐ বাড়িতে ভালো খবর আসতে শুরু করল। সে বাড়ির লোকেরা পরস্পরকে শাপমন্যি করার বদলে 'জানিস তো জানিস তো' করে গল্প শুরু করল অকারণে। সে বাড়ির পুরুষলোক তার চরম অসুখী বউকে বলল, 'রমা টকিজে একটা ভালো বই এসেছে।' ছেলেমেয়েরা তাদের বাবার হাতে মার খেল না, মায়ের কাছে বকা খেল না। তাদের একজন খুব ভালো রেজাল্ট করল, অন্যজন টায়েটায়ে পাশ করে গেলেও তাদের দাদুর হাঁপের টান কোবরেজের ওষুধে হঠাৎ আশ্চর্যভাবে ভালো হয়ে গেল, সেরে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল 'ভগবান আছেন'। অসুখী বউটি তার আজন্ম অপদার্থ স্বামীর বুকে মাথা রেখে দু-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলল। বলল, অনেক গঞ্জনা দিই তোমাকে। মাথার ঠিক থাকে না। তুমি দোষ নিও না গো। স্বামী তো অপদার্থই, সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সে এসব শুনতেই পেল না। আর বাইরে বৃষ্টি নামল। আমি ডানা বাঁচাবার জন্য বটগাছের একটা পাতা থেকে আরেকটা নিরাপদ পাতায় সরে যেতে যেতে দেখলাম বৃষ্টির শব্দে বাড়ির মনের ঘুম ভাঙল। সে উড়ে গেল, উড়ে গিয়ে বসল জানলায়। তার গায়ে ছাট লাগছে, তার ডানা ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু তার হুঁশ নেই। আমি জানি, আমার মতোই তার ডানা ভিজলে কোনো ক্ষতি হবে না তার। কেন না সে এখন ভরে আছে। মন ভালো থাকলে ভেজা ডানার কোনো ক্ষতি হয় না। সে তাকিয়ে আছে গত রাত্রে যে হাওয়া ধরে আমি উড়ে গিয়েছিলাম, উঠোনের ওপরকার যে শূন্যতা ধরে, সেই অদৃশ্যরেখার দিকে তাকিয়ে আছে সে। সে জানতেও পারছে না এই বটগাছের পাতার আড়াল থেকে আমিও চেয়ে আছি তার দিকেই। আমি চোখ দিয়ে তাকে ভালোবাসছি, বলছি ভালো থাকো, ভালো থাকো বাড়ির মন, তুমি ভালো থাকলেই তো বাড়ির সবাই ভালো থাকবে। তোমার বাড়ির উঠোনে যে অযত্নের গন্ধরাজ, সে ভালো থাকবে। তার সাদা পাপড়ির ওপর গত রাত্রের ওই একটা-দুটো বৃষ্টিবিন্দু ভালো থাকবে। সকালের রোদে হাসতে হাসতে উবে যাবে তারা, একটুও দুঃখ করবে না। যে কামিনীঝোপ পাতা ঝামরে মুখ গুঁজে পড়ে থাকত একদিন হঠাৎ সে একদিন তার লুকনো কুঁড়ি দেখতে পেল, আর তোমাদের বাড়ির সেই সদ্য বড় হয়ে ওঠা মেয়েটা পড়ালেখা করতে করতে

~ www.amarboi.com ~

খাতার ওপর গাল রেখে শুয়ে পড়বে। তখন কি মনে পড়বে তার? তুমি ওর মনও ভালো করে দিও বাড়ির মন। আমার এত কথা বাড়ির মন শুনতে পাবে না। কিন্তু কথাগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে গিয়ে আদর করবে তাকে। বাড়ির মন সেদিন আর দেয়ালের পিছনে ফিরে যাবে না। ভাঙা ছাদের ওপরটায় গিয়ে সারারাত বৃষ্টি পড়া দেখবে, বৃষ্টির পর রোদ ওঠা দেখবে। বাড়ির মন সে দিন উড়ে বেড়াবে সারা বাড়ি। কিন্তু বাড়ির লোকেরা তাকে দেখতে পাবে না। তেমনই বাড়ির মনও দেখতে পাবে না যে, আমি সামনের বটগাছের পাতা থেকে উড়তে উড়তে চললাম অন্য কোনো দেশে। দেশ মানে গাঁ, গাঁ মানে ঘরবসত, লোকজন, ঝগড়াঝাঁটি, হাসিমশকরা, দোকানপাটের পর দোকানপাট, জল আনতে যাওয়া মেয়ে, ভট্‌ভট্‌, শ্যালো পাম্প, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত লেখা সাইনবোর্ড, চাটাই ঘেরা, শতরঞ্চি পাতা সরমা সিনেমা, আর বৃষ্টিতে চড়চড় আওয়াজ করা টিনের চালার প্রাথমিক বিদ্যালয়, আর এ পাশে সবসময়ের একটা নদী, সেই নদী আমি কতবার এপার ওপার করেছি, শ্রীজাতকিশোর আমি উড়ে উড়ে দেখেছি ধক ধক জলকাটা স্টিমার, ছপছপ জলকাটা খেয়ানৌকো আর মস্ত মাঠের ওপর মেঘ করে আসা। মেঘ সরে যাওয়াও আমি দেখেছি। আর শ্রীজাতকিশোর, ঠিক এই সময় আমি দেখলাম—সে। তাকে দেখেই আমার মানুষ হতে ইচ্ছে করল। ভগবানকে বললাম—ভগবান, তুমি আমাকে মানুষের শরীর দাও, আমি ওর পাশেপাশে খানিকক্ষণ হাঁটি। গাছের দিকে তাকিয়ে আমি ভগবানকে বললাম, একপুকুর জলের দিকে তাকিয়ে বললাম, সারামাঠে যে ধান গোলায় ওঠার জন্য দুলছে তাকে বললাম আর তাকে দোলাচ্ছে যে হাওয়া সেই হাওয়াকেও বলতে ছাড়লাম না। সবাইকে বললাম, আমাকে মানুষ করে দাও, ওর পাশেপাশে হাঁটি। এই মথের জীবন আর একমুহূর্ত সহ্য হচ্ছে না আমার। ধানের ভগবান আমাকে বলল, গাছ-পুকুর বাতাসের ভগবান সবাই মিলে আমাকে বলল—কিন্তু ওর পাশে তো তোমাকে মানাবে না। তুমি তো অনেক দিন ধরে মথ হয়ে আছ। তুমি তো কয়েক জন্মের মথ। এখন তোমাকে মানুষ করে দিলে তুমি তো ওর পাশে বুড়ো। তুমি ওর পাশেপাশে হাঁটলে ও কি তোমার দিকে ফিরেও দেখবে? আমি বললাম, না দেখুক, তবু দাও। শ্রীজাতকিশোর, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ—কী এমন দেখতে তাকে! এমন কী রাত জাগানো রূপ? নিশ্চয়ই ভাবছ তুমি। আসলে তা না জানো, তা না। তাকে কেমন দেখতে বলব? মহেঞ্জোদরোর তলা থেকে তোলা একটা ভাঙা নারীমূর্তির মতো দেখতে সে। তেমনই লম্বা লম্বা হাতে মোটা মাটির গয়না, একটা কান ভাঙা, কপালে ফাটল, গায়ে ধুলোবালি। তুলে আনবার সময় খনকের শাবল লেগে পিঠের একটু পাথর উঠে গেছে। কিন্তু সে মূর্তি নয়, তার প্রাণ আছে। সে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়, সে জলের ধারে বসে থাকে। জল মানে, সমুদ্র। আবার এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রের ধারে সে হাঁটে। আমি আবার বললাম, আমি ওর সঙ্গে হাঁটব। তুমি আমাকে মানুষ করে দাও, ঠাকুর! তারপর ঠাকুর তো একদিন আমায় মানুষ করে দিল। আমি হাঁটছি ওর পাশেপাশে, পেছন পেছন, ওর চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি তো, তাই গতি অনেক কম। ও কী করে জানো?

~ www.amarboi.com ~

পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছেনি বাটালি দিয়ে পাথর কেটে নাক মুখ চোখ বানায়। ছোট্ট ছোট্ট মানুষ, হরিণ, পাখি। মানুষ চলতে চলতে স্থির হয়ে যায় পাথরের মধ্যে, চিল চিরকালের জন্য বাঁক নেয়, অস্ত্র চিরকালের জন্য উদ্যত হয়ে থাকে প্রাণ নেবে বলে। আহত ও অ-নিরাপদ পশু আর মানুষ নিঃশব্দ চিৎকার করে গুহারাত্রে। সেই গুহায় সে ঘুমোয়, বাইরে পাহারায় থাকি আমি। পরদিন সে উঠে আবার চলে। নতুন পাহাড়, নতুন গুহা, নতুন সমুদ্রতীরের খোঁজে। পেছন পেছন চলি আমি। সে মাঝে মাঝে আমাকে তার ছেনি বাটালি ধরতে দেয়, স্নান করতে নামলে তার যৎসামান্য পোশাক ধরতে দেয়, স্নান করে উঠে বলে—খাবার কোথায়? আমি কাঠকুটো জড়ো করে রান্না করি। দেশে দেশে কুটির তৈরি করি, রাতে তার অস্থিরতা এলে সে আমাকে ডেকে নেয় দাওয়া থেকে। একবার, দুবার, তিনবার আমি শান্ত করে আসি তাকে। তার নতুন খেয়াল এসেছে মাথায়। সে বালির ওপর হাতের তেলো দিয়ে চেপেচেপে তৈরি করছে মুখ, পাখি, প্রাসাদ। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি, সে জিজ্ঞেস করে—কেমন হয়েছে বলো তো? ঠিক আছে? আমি বলি—হ্যাঁ। তার শিল্পের খুঁত ধরে দিই আমি, গুণ খুঁজে আনি আমি। কোনো সমুদ্রও তার বেশিদিন ভালো লাগে না, কোনো গাছ, কোনো পাহাড় তার বেশিদিন ভালো লাগে না। আর মানুষ! মানুষকে তো সে পরিহার করেই এসেছে বরাবর। এত হাজার বছর ধরে সে তো কোনো মানুষের সঙ্গে থাকতে পারল না। সে মাঝেমাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, পোশাক ছুড়ে ফেলে দেয় সমুদ্রে, মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফ্যালে মাটিরই গয়না। মাথা ঠোকে গাছের গায়ে, বলে—আমাকে মাটির তলার স্নানাগারে ফিরিয়ে দাও আবার, আমার ওপর ধস নামাও। মাটির স্তূপের নিচে চাপা দিয়ে রাখো আমাকে, যাতে আমার সংজ্ঞা চলে যায়, যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ কষ্ট পাব আমি। আমার ভালো লাগছে না, আমার কিছু ভালো লাগছে না, আমি জলে ঝাঁপিয়ে সমুদ্র থেকে তার ভেসে যাওয়া পোশাক এনে দিই। সেগুলো আর পরা যায় না। আমি গাছের ছাল থেকে আবার পোশাক তৈরি করতে শিখি। মাটি থেকে আবার তৈরি করি মৃৎপাত্র, মাটির অলঙ্কার। আমি আবার কুটির বানাতে শিখি, কাঠকুটো কুড়িয়ে কীভাবে রান্না করতে হয়, কাঁচা মাংসকে সুস্বাদু করতে হয় কীভাবে আবার সেসব শিখি। আর এতে আবার আমার বয়স বেড়ে যায় হাজার বছর। আরও বুড়ো হয়ে যাই আমি। সে শান্ত হয় ক্ষিপ্ত হয়, শান্ত হয়। তার ভাঙাভাঙা হাত-পা আমি নতুন করে তৈরি করে দিই আবার। গুহায় গুহায় গিয়ে আবার খুঁজে বার করি তার শিল্পকাজ, সভ্যতাকে বলি—এই দ্যাখো। দেখামাত্র পুরো সভ্যতা খুঁজতে শুরু করে তাকে। জাহাজ চেপে লোক আসে, উড়োজাহাজ চেপে লোক আসে। টুপি, চশমা, আতসকাচ, আর ছবি তোলার যন্ত্রপাতি হইহই করে এসে পড়ে, সে আবার খেপে যায়। বলে—আমার কিছু ভালো লাগে না। সে আবার তার হাতের ছেনি বাটালি ছুড়ে দেয় গভীর জলে, তুলি ছুড়ে মারে গ্যালারি ভর্তি লোকজনের মধ্যে। ক্রিটিকের চশমা সে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভাঙে, ক্রিটিকের ছেলের বুকের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে এবং রাত শেষ হতেই তাকে ভোম্বল অবস্থায় ফেলে আসে। আমি জলের তলা থেকে তার ছেনি বাটালি খুঁজে নিয়ে, কাঁধের

~ www.amarboi.com ~

ঝোলায় তার ব্রাশ আর রঙের টিউব ভরে নিয়ে, পিঠের ওপর ক্যানভাস চাপিয়ে আবার তার কাছে যাই, বলি—শান্ত হও। মন স্থির কর। মনকে হাতের ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যেতে দিও না। সে বলে, পাজি বুড়ো। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা। সেই কবে থেকে, কত হাজার বছর আগে থেকে তুমি আমার পিছু নিয়েছ। আমি আর তোমাকে দেখতে চাই না। তুমি দূর হও। বলে, সে তার মন ছুঁড়ে মারে আমার মুখের ওপর। কত পাথর, কত উল্কা, কত ধস তো আমার ওপর পড়েছে, আর ঐ মনটাও এসে পড়ে। আর আমি যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটে। মন হারিয়ে ফেলে সে অন্ধকার হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে একা রাখা ঠিক না। আমি লোকচক্ষু থেকে তাকে সরিয়ে ফেলি।

আবার তাকে গুহা আর সমুদ্রতীরের কাছে নিয়ে যাই। শুইয়ে রাখি জলের ধারে। তার মন কিন্তু আমার কাছে গচ্ছিত থাকে। তার শরীর পড়ে থাকে জলের ধারে, নিস্পন্দ। তার মনকে আমি যত্ন করে লুকিয়ে রাখি আমার শরীরের ভেতর। যখন ও সেরে উঠবে, ওর মন ফিরিয়ে দেব ওকে। ওর মনকে আমি জিজ্ঞেস করি—কী চাও মন! কী চাও? এত অশান্ত কেন? নিজেকে নষ্ট করে ফেলতে চাও কেন? কেন তুমি শান্তি পাও না? সে বলে, আকাশের ওই সূর্যটাকে আমার পছন্দ নয়। আমি বলি, কী করতে চাও, তাতে?—আমি ওইটার বদলে আরেকটা সূর্য তৈরি করতে চাই। আমার মনের মতো সূর্য। এই পৃথিবীর পাহাড়গুলো আমার পছন্দ নয়। আমি নতুন নতুন পর্বত গাঁথতে চাই। আমার ছেনি বাটালিগুলো কোনো কম্মের নয়। ওরা কিচ্ছু পারে না। এই সমুদ্রের রংটা আমার পছন্দ নয়। নীল কেন হবে! আমি অন্য রং দিতে চাই, আমার রং। আমি বলি—কী রং? মন! কী রং? মন ভেঙে পড়ে, বলে—আমি জানি না, সত্যি জানি না। আমি এখনও খুঁজে পাইনি কী রং। সে জন্যেই তো এত অসহায় লাগে। তুমি কিচ্ছু পারো না, তুমি বলতেই পারো না কী রং সেটা! কী রং...বলতে বলতে মন খানখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমি একটা একটা করে তার টুকরোগুলো জড় করতে থাকি। কোনোটা পাওয়া যায় মিশরে, কোনোটা উত্তর মেরুর বরফের নিচে, কোনোটা থর মরুভূমির দুপুরের উড়ন্ত বালি থেকে মুঠো করে ধরে আনতে হয়। কোনো অংশটা চাপা পড়ে থাকে ইহুদিদের গণকবরের নিচে। সাদা হাড়গোড়ের ভেতর থেকে বহু কষ্টে তাকে চিনে বার করতে হয়। সারা পৃথিবী থেকে তার ছড়িয়ে পড়া মন একটু একটু করে জড় করে আমি অঞ্জলি ভরে ঢেলে দিলাম তার ঘুমন্ত শরীরে। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। এমনভাবে তাকাল সে আমার দিকে যেন তার কোনো স্মৃতি নেই। যেন সে প্রথম দেখছে আমাকে। তাকিয়েই রইল, তারপর বলল সেই কথা, যা সে এতদিন কখনও বলেনি। বলল,—কী সুন্দর! কী সুন্দর তুমি! তুমি কী করে এমন সুন্দর হলে! সে আর চোখ ফেরাল না আমার দিক থেকে।—আমি। সুন্দর!...আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। এতদিনে তো আরও পাঁচ হাজার বছর বয়স বেড়েছে আমার! আমার সামনে আরও দু-বার ধ্বংস হয়ে গেছে পৃথিবী। আমার পিঠের পেশি এতদিনে পাথর হয়ে গেছে, আমার হাত পা শিলায় তৈরি। দু-বার ধ্বংসের পরেও বেঁচে গিয়েছিল যে গাছ, আমার

~ www.amarboi.com ~

চুলগুলো এখন তার শেকড়। আমার মুখের ওপর কত লম্বা লম্বা দাগ, শুকিয়ে যাওয়া ঝরনার দাগ, বুকের ওপর ঘাসের চাবড়া...পাথর ফাটিয়ে ওরা জন্মেছে। সে আমার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না কতদিন, কতদিন? তা হাজার বছর হবে! তারপর সে এগিয়ে এসে ধরল আমার হাত। অত ভারী হাত আমার! কিন্তু সে হাল্কা খেলনার মতো তুলে নিয়ে চেপে ধরল তার ঠোঁটে। আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা আঙুল সে ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে জিভে ছোঁয়াল, বলল—উম্‌ম্‌, আমি এদের চিনি...এটা লোহা, এটা ম্যাঙ্গানিজ, এটা তামা, এটা সোনা, অভ্র...অভ্র এটা হুম্‌ম্ আমি এদের স্বাদ চিনি! এরা একই রকম আছে!—কী আশ্চর্য! একই রকম মানে। তাহলে ওর কি স্মৃতি আছে! কিন্তু ওর দৃষ্টি তো স্মৃতিহীন! আমি তার কাঁধে হাত রেখে বলি—শান্ত হও। সে আমার কথা শুনতে পায় না। কিন্তু আমার স্পর্শমাত্র সে বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয় এবং পরক্ষণে আগের চেহারায় ফিরে আসে। আমার হাত ঝনঝন করে। দাড়িগোঁফের জঙ্গল থেকে আঙুল দিয়ে সে খুঁজে বার করে আমার ঠোঁট। ধীরে ধীরে আঙুল বোলায়। বলে,—এরাও কি পাথর? বলো, বলো! পাথর কি এরা! আর আমার ঠোঁটের পাথরে ধীরে ধীরে মাটি সঞ্চার হয়। সে আঙুল রাখে আমার বুকে। তার হাত ভেসে বেড়ায়। সে বলে,—কত সব পুরোনো নদীখাত! এরা কী করে শুকিয়ে গেল? সে ঠোঁট রাখে এই শুকিয়ে যাওয়া নদীখাতগুলোয়। বলে,—জল আসুক। আমার তেষ্টা পেয়েছে। বুকের ওপরকার ঘাসের চাপড়ায় সে মুখ ঘষে আর খেলে বেড়ায়। এমন সেই খেলা, যাতে পাথরও শিউরে ওঠে। আর সে খুঁজে বেড়ায়, বলে, কোথায়! কোথায় তোমার প্রাণ! আমি দেখব। কত হাজার হাজার ফুট নিচে তাকে রেখেছ? মাটি, শিলা, জল, কয়লা সব সরিয়ে আমি পৌঁছোব সেখানে। তোমার শেষ বাধা সেই চলমান প্লেটগুলোকেও আমি সরিয়ে ফেলব আমার ঠোঁট দিয়ে। বলো কোথায় তোমার প্রাণ! কোথায়, কোথায়! বলতে বলতে সে কোন পাতালে পৌঁছে ওষ্ঠের মধ্যে চেপে ধরে আমার প্রাণ। আমি চুপ করে থাকতে পারি না। বলি,—ঈশ্বর! আমি আর পারছি না। আমায় রক্ষা কর। আর আমার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়।

জ্ঞান যখন ফিরল, তখন সে সমুদ্রের ধারে বসে, বালি নিয়ে তার খেলায় মেতেছে। মুখ, প্রাসাদ, আর বালির গাছপালাই সে বানায়নি, তার পাশে সে বালি দিয়ে তৈরি করছে একটা মথ। আমি তাকে কাতর হয়ে বললাম—একে তৈরি কোরো না, না, একে নয়। শোনো, তুমি আমার কথা শোনো। সে আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। দু'হাত দিয়ে সে বালির মথের বালির ডানা তৈরি করে চলল। আমি আমার ক্লান্ত অশক্ত শরীর নিয়ে তাকে অনুনয় করলাম আবার—শোনো, এমন কোরো না, সে আমার দিকে তাকাল না। আমি জানি এবার সে কী করবে। হ্যাঁ আমি জানি—তা হতে দেওয়া যায় না। ওই তো! ওই তো সে তাই করছে। হ্যাঁ, সে নিজে হাতে তৈরি করা বালির মথটার ওপর ফুঁ দিচ্ছে। আর বালি উড়ে যাচ্ছে মথের গা থেকে। আমি বললাম—আমি তো তোমাকে সমস্ত দিয়েছি, সমস্ত!

~ www.amarboi.com ~

আমি তো বললাম তুমি ওকে তৈরি কোরো না। কারণ তৈরি করলেই তোমার ওকে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করবে। সে বলল—আমার ইচ্ছে আমি তৈরি করব। আমার ইচ্ছে, আমি ভেঙে ফেলব। আমি বললাম—শোনো, আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। তুমি আমার কথা শোনো। সে বলল—আমার ক্ষতি হয়েছে। আমি বললাম—সে আমার দুর্ভাগ্য; আমি তোমাকে কেবল দুর্যোগ থেকে আগলে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি কেবল তোমার হাতে ছেনি, বাটালি আর রং-তুলি এগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। সে বলে—ওরা তো আমার হাতেই ছিল, তুমি এগিয়ে দেবে কি। হ্যাঁ। ছিল, কিন্তু তারা যাতে খসে না যায়, তারা যেন হারিয়ে না যায় তোমার থেকে, আমি কেবল এইটুকুই চেয়েছিলাম। তারা যখন খসে গিয়েছিল, আমি তাদের খুঁজে এনেছিলাম।—কেন! কেন চেয়েছিলাম! সে বলে, আমি তো তোমাকে তা চাইতে বলিনি? কেন তুমি হাত দেবে আমার স্বাধীনতায়? আমার ইচ্ছে হলে ছেনি বাটালি ধরব, আমার ইচ্ছে হলে আমি ছুড়ে ফেলব তাদের। আমার বেঁচে থাকাটা আমার, তোমার নয়। আমি কী জানি না ভেবেছ! তোমার সব কথা জানি আমি। আমি কাতর হয়ে বলি,—কী! কী জানো তুমি? সে বলে—আমি জানি সেই কথা তুমি কখনও আমাকে বলোনি।—কী, কী কথা আমি বলিনি তোমাকে! সে এতক্ষণে পরে আমার দিকে তাকায়। আমি দেখি তার মুখ কাছ থেকে দেখা চাঁদের মতো। তাতে বড়ো বড়ো উল্কাক্ষত, তাতে লম্বা লম্বা শুকিয়ে যাওয়া সমুদ্র, তার চোখ থেকে বালি উড়ছে, সেখানে কোনো জল নেই। সে বলে,—আমি জানি, তুমি কেবল আমাকে দেখেই একদিন পতঙ্গ থেকে মানুষ হতে চেয়েছিলে, কেবল আমাকে দেখে। আমি যদি না থাকতাম, তাহলে চিরকাল পতঙ্গ হয়ে থাকতে হত তোমাকে, মানুষ হওয়ার ইচ্ছেটুকুও আসত না তোমার মধ্যে। আমি জানি এ মানবশরীর পাওয়ার পর কেন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছ। কান্নায় আমার গলা ভেঙে যায়, মাথা ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপর। আমি শুধু বলি—কেন, বলো, কেন? সে বলে—যে কেবল আমি একদিন তোমার বুকের ওপর উঠে খেলা করব বলে। তোমার প্রাণকে মুঠোয় ধরব বলে। আমি বলি—না, তা নয়। আমি শুধু চেয়েছিলাম তুমি হও, তুমি হও, তুমি হয়ে ওঠো, সমস্ত সভ্যতা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।—আমার দিকে?—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার দিকে। কারণ, শিল্প ছাড়া যে এ সভ্যতা বাঁচবে না। তুমি এই মথকে উড়িয়ে দিও না। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হাঁটু গেড়ে বসে গাল রাখল বালির ওপর। ফুৎকার দেওয়ার জন্য মুখ গোল করল চুম্বনের মতো। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম তার দিকে—কোরো না, থামো, থামো তুমি। তার হাত আঁকড়ে তাকে টানলাম। কিন্তু আমার সমস্ত আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি, আর কোনো শক্তি আমার নেই। আমার শরীর গড়াতে লাগল বালির ওপর। সে একবার ফুৎকার দিল। বালি উড়ে গেল। আমি শেষ শক্তি নিয়ে বালির ওপর গড়িয়ে তার মাথার ওপর হাত রাখলাম। মাথা সরিয়ে দিতে চাইলাম যাতে তার ফুৎকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল—তুমি আমাকে ছোঁবে না। এত হাজার বছর পরে সে প্রথম বলল এবং তুমি ছোঁবে না আমাকে। আমি দু'হাতের মধ্যে তার মুখ ধরলাম। আর সে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। আর

~ www.amarboi.com ~

গড়িয়ে পড়ল বালি আর সমুদ্রের বিভাজনরেখায়। সে শুধু চিৎকার করে বলতে থাকল—না! না! না!

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্বনাশ ঘটল। তার আর্ত 'না'! চিৎকার সোজা উঠে গেল সমুদ্রতীর থেকে আকাশে, আর ফাটিয়ে ফেলল মেঘ। আর বজ্রপাত হল সরাসরি তার মাথায়। কয়েক মুহূর্তে সে শরীর থেকে অঙ্গার, অঙ্গার থেকে ভস্মে পরিণত হল। আর সে ভস্ম ধুয়ে নেমে গেল সমুদ্র। তুফান উঠে এল সমুদ্র থেকে। সহস্র ফুৎকারের বেশি তেজ তার। বালির মথ বালির ঘূর্ণিঝড় হয়ে উড়ে চলল দিক্‌দিগন্তে। সেই ঝড় মানুষ থেকে উড়ন্ত বালি করে দিল আমাকেও। তার একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার আর কোনো সম্পর্কই রইল না।

শ্রীজাতকিশোর, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ এসব গল্প কেন আমি তোমায় বলছি! আর কী করেই বা এর মধ্যে তুমি এলে। কী করেই বা এল তোমাদের ওই পাড়া! আসলে কী হয়েছে জানো! ওই যে দিগন্তে ছুটে গিয়েছিল বালিঝড়। তার একটি দিগন্তের নিচে ছিল তোমাদের এই পাড়া। আর ওই বালিঝড় থেকে একটি বালির কণা এসে পড়েছিল তোমাদের এই কলেজের মাঠের পেছনে। তারপর যা হয়। একটা কাক ডিমের খোলা মুখে করে এনে ফেলল তার ওপর, একটা সাইকেলের চাকা তাকে আরেকটুখানি বসিয়ে ফেলল মাটিতে। আরেকটা পাখি এসে তারপর একটু নতুন মাটি ফেলল, সামনের বটগাছটাকে একদিন কেটে ফেলল কারা। সেখানে নাকি বাড়ি উঠবে। বটগাছটার কাটা ডাল থেকে কতকগুলো বটফল গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল আমার ওপর। তারপর আমি আর বালির কণা রইলাম না, চারাগাছ হয়ে গেলাম। তখন আমি তোমারই মতন ছিলাম, শ্রীজাতকিশোর। এখন অবশ্য আর নই। এসব যখন ঘটেছে তখন তুমি কোথায়! তাই তো তোমায় সব বলছি। ওই যেখানে বটগাছটা কাটা হয়েছিল, বাড়ি উঠবে বলে, সেখানে বাড়ি আর উঠল না। ভিত গাঁথা হল, পুজোআচ্চা হল, বাউন্ডারির পাঁচিল দেওয়াও আরম্ভ হয়েছিল, তারপরেই কোন শরিকে যেন মামলা করে দেয়। এত বছরেও তার নিষ্পত্তি হল না। ফলে জায়গাটায় এখন ভিতের ওপর শেয়ালকাঁটার ঝোপ। হলুদ হলুদ শেয়ালকাঁটার ফুল ঈষৎ বেগুনি সবুজ পাতার ওপর ফুটে থাকে। বড়ো বড়ো কালকাসুন্দে গাছে ছোট্ট ছোট্ট নীলচে ফল হয়। ইশকুলের ছেলেরা ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় যদি ছিটকে এদিকে এসে পড়ে তা হলে ছিঁড়ে নিয়ে এ ওর গায়ে ছুঁড়ে মারে। ওই চৌহদ্দির মধ্যে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছও জন্মেছে। তার পেছনে মস্ত মাঠ। মাঠের মধ্যে দিয়ে তুমি সাইকেল চালিয়ে আস, শ্রীজাতকিশোর। এসে বসে পড়ো আমার গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে। সাইকেল শুইয়ে রাখো ঘাসে। তোমার হাতে কখনও থাকে একটা খাতা, কখনও একটা বই। তুমি খাতা খুলে কীসব আঁকিবুঁকি কাটো, লেখো কিছু। আমি টুপ করে একটা পাতা ফেলে দিই তোমার খাতার ওপর, তোমার মাথার ওপরেও ফেলি। তুমি কি বুঝতে পারো, শ্রীজাতকিশোর?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রথম তুমি আসতে, এসে, গাছের নিচে বসে ঘুমিয়ে পড়তে। যেন তুমি কোনো রাখাল, তোমার মুখে সদ্যোজাত শ্মশ্রু, মাথায় কোঁকড়া চুলের ঝাঁক, সকালবেলার রোদ্দুরের মতো গায়ের রং। যা কিছুই তুমি দ্যাখো না কেন, চোখ দেখে মনে হয় প্রথম দেখলে—এত বিস্ময় তাতে। মাঝে মাঝে বিষাদও, কেন শ্রীজাতকিশোর! জগতের অনেক কিছুই তোমার মনের মতো নয় এই জন্যে? কটা জিনিসই বা আমাদের মনের মতো হয়, বলো! নিজের ইচ্ছেমতো কোনো কাজ কতদূর করা যায়! যায় না যে, তা তুমি সবে জানতে শিখছ। পরে আরও শিখবে, আরও কষ্ট পাবে। কিন্তু কীই বা করার আছে তাতে! ওই যে তোমার খাতা, আর তার আঁকিবুঁকি, ওরা তো চিরকালের জন্য কারও দুঃখ মোছাতে পারবে না। তুমি যখন বড়ো হবে, তখন যদি ধরে রাখো ওদের, যদি ওদের কথা জানতে পারে মানুষ, তাহলে দেখবে, সেসব মানুষের দুঃখের সামনে দিয়ে ওরা দু-একবার উড়ে যাবে, তোমার ওই খাতার সব লেখা, তারা খাতা থেকে বেরিয়ে কারও কাঁধে বসবে। সে হয়ত খেয়াল করবে না প্রথমটা। যখন দেখবে, বলবে—বাঃ কী সুন্দর! কিন্তু ততক্ষণে তুমি আবার উড়ে যাবে শ্রীজাতকিশোর। যদি ততদিন ঐ পৃষ্ঠাভরা আঁকিবুকি তোমার সঙ্গে থাকে, তবে তারা অশান্তির আগুনের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে, শোকের কপালে গিয়ে বসবে, দুঃখের চোখ মুছিয়ে দেবে, হাত রাখবে বন্ধুত্বের কাঁধে। প্রেমকে গিয়ে বলবে, দাও তোমার ঠোঁট। আমি একদিন যেমন উড়ে বেড়িয়েছি আমার মথের জীবনে, আমার প্রজাপতির জীবনে, গাছের গায়ে যেমন বসেছি, উন্নত, সুঠাম, ঋজু গাছের গায়ে, তেমনই ভাঙা বাড়ির ময়লা দেয়ালে বিছিয়েছি আমার ডানা। একদিন...সেই এক জীবন ছিল আমার। আর আজ, এই জীবনে, যখন আমি গাছ, আর তুমি যখন এসে পিঠ ছুঁইয়ে বস আমার গুঁড়িতে, আমার ইচ্ছে করে দু-হাতে তোমার মাথাটা টেনে নিই আমার বুকে। কপালে আমার স্নেহ ছোঁয়াই। কিন্তু গাছের তো হাত হয় না! গাছের তো ঠোঁট নেই, স্নেহের চুম্বন সে রাখবে কী করে! শ্রীজাতকিশোর, তুমি কালকে দুপুরে যখন এসেছিলে, তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে আমার গুঁড়িতে মাথা রেখে। আর উঁচু উঁচু ঘাসের মধ্যে খোলা পড়ে ছিল তোমার খাতা। কয়েক মিনিটের ঘুম ভেঙে তুমি দেখলে সেই খাতার মধ্যে তোমার সদ্য লেখা কবিতার ওপর ডানা ছড়িয়ে বসে আছে একটা মথ। পাছে ওর কোনো অসুবিধে হয়, পাছে ও ভয় পায়, তাই তুমি চুপ করে বসে রইলে, অপেক্ষা করলে কখন ও নিজের মনে উড়ে যাবে! কিন্তু ও গেল না, বসে রইল, বসে রইল। ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে আসতে লাগল, ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করল সামনের ঝোপজঙ্গল থেকে, ব্যাং লাফাল, গিরগিটি ছুটল সামনের পোড়ো পাঁচিলের ওপর দিয়ে, তখন তুমি আর অপেক্ষা করলে না। খাতাটাকে সাবধানে তুলে ধীরে ধীরে, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলে আমারই একটা নিচু ডালের দিকে। তারপর খাতাটাকে ডালের সামনে তুলে ধীরে, খুব আলতো করে ফুঁ দিলে একবার, দুবার। মথের ডানা কেঁপে উঠল। সে টুপ করে উড়ে গিয়ে বসল একটা নিরাপদ পাতায়। তুমি খাতা বন্ধ করে সাইকেল তুললে ঘাস থেকে। রওনা হয়ে গেলে। সন্ধের মাঠের মধ্যে তোমার সাইকেল নিয়ে মিলিয়ে গেলে তুমি। আজ সকালে

~ www.amarboi.com ~

দেখি, ওই মথটা আমার পাতার ভেতর থেকে বেরিয়ে, ওই পোড়ো ভিত জঙ্গলের ওপারে চলে যাচ্ছে। ওই যে, যেখানে একটা টালির বাড়ি, যেখানে একটা রোগা বউ ধোঁয়াওঠা তোলা উনুন নামিয়ে রাখে উঠোনে, লুঙ্গি আর বেগ্‌নে শাড়ি আর বাচ্চার কাঁথা শুকোতে দেয়, ওদের বাড়ির দিকে দেখি যাচ্ছে সে। আমি জানি শ্রীজাতকিশোর, ও একদিন তোমাদের বাড়িতেও যাবে, ও একদিন ডানা ছড়িয়ে বসবে তোমাদেরও দেয়ালে। তোমাদের দেয়াল ময়লা না ঝকঝকে, শ্রীজাতকিশোর? তোমাদের জানলা ভাঙা, না নতুন? তোমাদের দরজায় কি ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হয়? তোমাদের কি বাড়ির সামনে উঠোন আছে? উঠোনে আছে সন্ধ্যামণি গাছ?

থাকুক, আর নাই থাকুক, শ্রীজাতকিশোর, ওই মথকে দেখলেই তুমি জানবে ও তোমারই মতো এক কবি। কারও দুঃখ ঘোচাতে পারে না, নেভাতে পারে না কারও অশান্তি। শুধু কয়েক পলকের জন্য উড়ে যেতে পারে শান্তি অশান্তির ওপর দিয়ে। ওকে দেখে যাতে দুঃখী মানুষ সন্তপ্ত মানুষ, অশান্তিতে অঙ্গার হয়ে যাওয়া মানুষ দু-এক মুহূর্তের জন্য বলে উঠতে পারে—বাঃ! কী সুন্দর!

সানন্দা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বুবুলটি উড়ে যাও

সেই দিনটার জন্য আমি এখন বসে আছি। তুমি কবে ছেড়ে যাবে আমাকে। যে কোনো দিনই হতে পারে সেটা। যে কোনো বিকেলবেলা বলবে আর কখনও আসব না। যে কোনো সকালবেলা হতে পারে, আজ আর দেখা করতে এসো না। তবে কি কাল? কালও নয়। পরশু তবে। অথবা হঠাৎ কোনো ফোনে। আর ফোন কোরো না কখনও।

সেই দিনটার জন্য আমি রোজ অপেক্ষা করি। সকালে উঠে ভাবি আজই হয়ত সেই দিন হবে। রাতে শুতে যাওয়ার সময় ভাবি, হয়ত আগামিকালই সেই দিন।

এমনকী যখন তোমার সঙ্গে থাকি, যে সময়টা, তখনও এমনই হতে থাকে। তুমি ঘরে ঢুকলে। ছুটির দিন, দুপুরবেলা। আজ খুব মজা হয়েছে জানো! তাই না কি, কীসের মজা? মুখে এ কথা বলে আমি 'বুবুলটি উড়ে যাও' বলে দুহাতে তোমাকে ঘরে উড়িয়ে দিই আর তুমি কি যেন একটা বনের ভিতর দিয়ে দুপুর ভেদ করে উড়ে যেতে থাকো, সেদিন তোমার দু ডানা হলুদ রঙে ছোপানো, একটার পর একটা গাছ পেরিয়ে উড়ে চলেছ তুমি, আর ভরদুপুরের গাছগাছালির ছায়ার ভিতর রোদের জাফরি তোমার ডানায় লাগছে, ওদিকে আমার সামনে বসে তুমি বলে চলেছ, কি যে দারুণ একটা মজা হয়েছে না। আর আমিও সেই মজায় খুব মজাই যেন পাচ্ছি। আমি দেখছি তোমার খুশি হয়ে ওঠা আর যেন খুব খুশি হয়ে উঠছি আমিও।

নীরব প্রেম ও মুখ ফুটে বলতে না-পারার দিন শেষ হয়ে গেছে বহুকাল, আমি জানি। স্বপ্নের ভিতর ঢুকে পড়া স্থাবর-অস্থাবর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে জাগ্রত অবস্থাতেও যারা নাড়াচাড়া করে তারা যে কি শোচনীয় দশায় পৌঁছাতে পারে তার আন্দাজ আমার আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি জানি হেরে যাওয়া লোক শুধু হেরে যাওয়া লোক। আর তাকে কোনো কিছুতেই একটুও আলো দেওয়া যাবে না। মুখ বাঁকিয়ে হাসার মতো মানুষের কি অভাব? আর জানি বলেই তুমি যখন তোমার খুব একটা মজা দারুণ একটা দুর্দান্ত ভীষণ জবরদস্ত একটা মজা বিষয়ে বলতে থাকো। কুলুকুলু করে আমিও তখন প্রায় পেট চেপে ধরেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে চাই। পুরোটা না পারলেও তোমার কখনও সন্দেহ হয় না যে আমি আসলে হাসছি না। আমি আসলে ভাবছি তুমি কখন ছেড়ে যাবে আমাকে।

কেন এমন ভাবি জানো? যাতে ঠিক ঠিক নিতে পারি তোমার ছেড়ে যাওয়াটা। শুধু সেই সতর্কতাটুকু নিজের মধ্যে জারি রাখি সমস্তক্ষণ। এখন একদিনও আমি নিজেকে এই সতর্কবার্তা থেকে রেহাই দিই না। তোমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ কবে ঠিক শুরু তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। অথবা খুব শক্তও নয়। প্রথম তোমার সঙ্গে কীভাবে আলাপ?

সেটা ছিল একটা বৃষ্টির দুপুর। শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি চলে গেলাম। আলাপ করব। শহর সেদিন জলে ভাসছে। যাদবপুর একটু ছাড়িয়ে সুলেখার কাছে উনি থাকেন শুনেছিলাম। ঠিকানাটা বলে দিল শুভব্রত। বাড়ির নম্বর বলতে পারেনি। এলাকাটা বলে দিল। বড় রাস্তা থেকে একটা সরু পিচরাস্তা ঢুকে গেছে কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরির সামনে দিয়ে। দু'পাশে দুটো পান-সিগারেটের দোকান। এটাই ওই বিশেষ মোড়টার মার্কিং। তাছাড়া কয়েকটা রিকশাও দাঁড়ায়। শুভ কাছেই থাকে। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা শ্যামল চৌধুরীকে সে ঢুকতে দেখেছে ঐ গলিতে। ভুরু কুঁচকে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েও থাকতে দেখেছে কয়েকবার। শুভ বলেছিল, নাম বললে পাড়া-পড়শি নিশ্চয়ই চিনবে।

কোথায় পাড়া পড়শি? বৃষ্টির চোটে সেদিন রাস্তায় লোকই নেই। মোড়ের দুটো দোকানই প্রায় বন্ধ। প্রায় বললাম এই জন্য যে, তার একটা দোকানের ঝাঁপ একটু খোলা। সেখানে কালো মতো জড়সড় চেহারার একটি ছেলে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে বসে। সিগারেট পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করলাম। তারপর বললাম, শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি চেনে কি না। সে চেনে বলেও দিল। পেলামও। যেমন হয়, কয়েকটা ফ্ল্যাটের একটা সমষ্টি, নাম অঞ্জলি। চারতলায় উঠে দেখি শ্যামল চৌধুরী লেখা দরজাটি খোলা। দাঁড়িয়ে বেল দিলাম। একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। তুমি!

তখন কি কোনও স্বপ্নেও ভেবেছি এই তুমি আমার সর্বসময়ের সতর্কতা হয়ে উঠবে? ঘুম ভাঙতে তোমার মুখ মনে পড়বে! স্নানের জল মাথায় ঢালার সময় চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাব তোমার চোখ! দিনরাত্রি তোমার সঙ্গে মনে মনে কথা বলব এক সময়। তারপর সেই অবস্থাটা পার করে পৌঁছোব আজকের অবস্থায় যখন সকাল থেকে উঠে নিজেকে তৈরি করব কবে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে তার জন্য।

সে-মুহূর্তে এসব কিছুই ধারণা করা সম্ভব ছিল না। কোনো নিয়তির হাত-এর সঞ্চালন-এ। আমি পৌঁছে গিয়েছি দরজায় আর বলেছি—

শ্যামল চৌধুরী আছেন?

সেই মেয়েটি বলেছে, হ্যাঁ আছেন। টুবুল, দ্যাখ তো।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর একটি মেয়ে উঠে এল ভিতর থেকে। হ্যাঁ, বলুন? আমি শুরু করলাম, শ্যা-মল। দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, আসুন, বসুন। আমি ডাকছি। বলে, ভিতরের ঘরে চলে গেল।

দ্বিতীয় মেয়েটি কিশোরী। স্কুলের শেষদিকে পৌঁছেছে মনে হয়। মুখ-চোখে এখনও বাচ্চা বাচ্চা ভাব থেকে গেছে। প্রথম মেয়েটি, মানে তুমি, ছিপছিপে, লম্বাটে মুখ। শাড়ি পরেছ বলে আরও লম্বা লাগছে। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নিচে কী দেখছ। আমিও যেখানে বসেছি তার পিছনে জানলা রয়েছে, একই দিকে। মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি নিচে একটা পুকুর। টিপটিপ বৃষ্টিতে পুকুরটা কাঁপছে। এত অবাক লাগল, বলে ফেললাম, আরে এখানে একটা পুকুর আছে? জানলার মেয়েটিও অবাক, কেন আগে দেখেননি?

না, আমি যে রাস্তায় এলাম সেখানে তো পুকুর ছিল না।

ওদিক দিয়ে আর একটা রাস্তা আছে।

তাই বুঝি।

দ্বিতীয় মেয়েটি ঢুকল, বাবা আসছে। তারপর তোমাকে বলল, চলো, ছাদে যাবে?

তোমার মুখ ঝকমক করে উঠল। চল্, এক্ষুনি চল্।

শ্যামল চৌধুরী ঢুকলেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সেই প্রথম দেখেছিলাম তোমাকে। বাচ্চা মতো মেয়েটির সঙ্গে যে দরজা দিয়ে আমি ঢুকেছিলাম সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে সামনেই যে সিঁড়ি উঠে গেছে তা দিয়ে মিলিয়ে গেলে। শ্যামল চৌধুরী আগন্তুক-এর পরিচয় জানাটা স্থগিত রেখেই গলাটা একটু তুলে বললেন, কি রে, বৃষ্টিতে ভিজতে যাচ্ছিস না কি? সিঁড়িতে তখন আর তোমাদের দেখা যাচ্ছে না, শুধু সমস্বরে একটা হ্যাঁ-অ্যা ভেসে এল ওপর থেকে।

সেই বর্ষাতেই দ্বিতীয়বার দেখা হল, সেইরকম বৃষ্টির দুপুরেই। ঝুপঝুপ করে বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি আসতেই দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম রাস্তার ধারের একটা দোকানের সামনে। কিছু লোক ছিলই, আরও কিছু লোক এসে গেল। বৃষ্টিছাট গায়ে লাগছে, আমি ডানদিকে সরছি। হঠাৎ ডানদিকে যেন একটা মেয়ে! তাকালাম। তুমি। প্রথমবার চোখ সরিয়ে নিলাম, সরিয়ে নিয়ে চেনা চেনা লাগতে আবার তাকালাম। তুমি হাসলে। চিনতে পারছেন না? শ্যামল জেঠুর বাড়িতে গেলেন না সেদিন? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। তুমি চেয়ে আছো। কী একটা বৃষ্টি শুরু হল বলুন তো। যেন কতদিন চেনা। রোজই কথা হচ্ছে আমাদের। তাই তো। বলো দেখি, আমি অনায়াসে তোমাকে তুমি বলে ফেলি, যেন এটাই স্বাভাবিক। তুমি কিছুমাত্রও বিস্মিত হও না। তুমি বলো, ছাতা আনেননি তো?

না-আ। আমার বিপন্ন উত্তর।

আমার অবশ্য ছাতা আছে, কোনদিকে যাবেন আপনি?

ওই দিকে। বলে দক্ষিণ দেখাই।

সেই দক্ষিণ কিন্তু শ্যামল চৌধুরীর বাড়ির দিকটাই। সেই দক্ষিণে কিন্তু তোমারও বাড়ি। শ্যামল চৌধুরীর ফ্ল্যাটের তলার ফ্ল্যাটেই বাবা-মা-র সঙ্গে তুমি থাকো আমি জানতে পেরে

~ www.amarboi.com ~

যাব কিছুক্ষণ বা কয়েকঘন্টা বা আঙুলে গোনা কয়েকটি দিনের মধ্যেই। জানতে পেরে যাব যেন নিয়তির অঘোর বিধানে আর নিয়তির নিয়ম যেখানে ক্রিয়াশীল। সেখানে কখন কেন কীভাবে কোন পরিপ্রেক্ষিতে কী উপায়ে এ-সব প্রশ্নের তো আর কোনো গুরুত্ব থাকে না। কেবল তুমি জানলে যে আমি জানলাম।

তবে সেদিন তুমি বলেছিলে, ও, আজকেও শ্যামল জেঠুর বাড়ি যাবেন বুঝি? না তো, আমি থাকিই তো গড়িয়ায়। ওই কৃষ্ণা গ্লাসের ওপর দিয়েই তো যেতে হয় রোজ। এইসময় বৃষ্টিভরতি আর একটা হাওয়ার ঝাপটা এসেছিল। তোমার সালোয়ার কামিজ সপসপে, রাস্তার ধারে সেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার হেলে যাওয়া ভঙ্গি চিরকালের জন্য আমার চোখে স্তব্ধ হয়ে গেল।

এরপর তৃতীয় দেখা কীভাবে সে কথায় অনর্থক কাজ কী! বলা ভালো, রাস্তায়। আর এও অবাক কাণ্ড, বা আর এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই যে সেদিনও বৃষ্টি এবং আকাশ কালো করা মেঘ। গাঙ্গুলি বাগানের মোড়ে সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মধ্যে সামনে সেদিন লোক ধরছে না। ক্রেতা নয়। আশ্রয়প্রার্থী। আমিও দৌড়ে তাদের একজন হলাম। পেছন থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'এই যে। আবার!' ঘুরে তাকাতেই হাসিতে ভেঙে পড়লে তুমি। অত যে লোক চারপাশে, ভ্রুক্ষেপ নেই। হাসছই। আর আমি ভাবছি, এমনও হয়?

হয়ই তো! নিয়তির অমোঘ নিয়ম সক্রিয় হয়ে উঠলে কত কিছু হতে পারে! এ তো শুধু দু-দিন, প্রায় পরপর দু-দিন, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একই দোকানে এসে দুজনের দাঁড়ানো। কী অবিশ্বাস্য যে মনে হয়, প্রথমটা না হোক, অন্তত সেই দ্বিতীয় দিনটাকে!

—আজকেও ছাতা নেননি তো?

—নিতে পারি না। হারিয়ে ফেলি।

সেই হাসি আবার ফিরে এল উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। তুমি বাইরের দিকটা দেখিয়ে বলল, বৃষ্টি ধরে এসেছে। চলুন, একটু এগিয়ে দেখি, কিছু পাওয়া যায় কি না। কতদূর যাবেন আপনি?

যাদবপুর, বলি আমি।

দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। তুমি ছাতা খুলে নিয়েছিলে। বললে, ছাতার নিচে আসুন। আমি বলি, ঠিক আছে। এমন কিছু জল পড়ছে না।

মাথাটা অন্তত রাখুন।

এত নরম করে বললে! আমি মাথাটা দিলাম। তখনও জানি না, এ-ই আমার যূপকাষ্ঠে মাথা রাখা।

বাসে ওঠার প্রশ্নই নেই। ঝুলছে লোক। তাদের পিঠ ভিজছে, কাঁধ ভিজছে বৃষ্টিতে। অটো চলে যাচ্ছে ভরতি হয়ে। দাঁড়ানোর কথাই উঠছে না।

দাঁড়িয়ে দুজনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, তুমি বললে, চলুন রিকশায় চলে যাই।

রিকশায়?

~ www.amarboi.com ~

আমি তো কৃষ্ণা গ্লাস অবধি যাব। আপনি যদি কৃষ্ণার মোড়ে নেমে যান, কিছু পেয়ে যাবেন যাদবপুরের।

বলে তুমি উলটো দিকে হেঁটে ছোট্টো চৌমাথাটার কাছে চলে গিয়ে রিকশা ধরে ফেললে একটা। এখন, বৃষ্টির জন্য এক একটা রিকশা ছাদ লাগিয়ে নেয়। হ্যান্ডেলের সঙ্গে একটা খুঁটি আটকে সিটের মাথার থেকে মোটা ওয়াটার প্রুফ টেনে ছাদ তৈরি হয়ে যায়। তেমন একটা রিকশা নিয়ে আমার সামনে এসে বললে, উঠে আসুন।

এ-কথা সে-কথায় বাঘাযতীন এসে পড়ল, সেখানে অটো একটু ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে। নেমে পড়েছি। তুমি চলে যাচ্ছ। রিকশার পিছনের পরদাটা তুলে একবার হাসলে। চশমার ফ্রেমে জলকণা। ব্যস। সমস্তটা ফাঁকা হয়ে গেল। নিজের ওপর রাগ হল, এতক্ষণ পাশাপাশি বসে রইলাম, একবারও তোমার মুখটা ভালো করে দেখলাম না কেন। তাই কখনও হয়। ওভাবে দেখাটা কি দৃষ্টিকটু নয়? কিন্তু এক্ষুনি একবার তো দেখতেই হবে ঐ মুখটা আর একবার।

একটা অটো প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। তার সামনে উঠে গেলাম। তোমার রিকশার পাশ দিয়ে আমার অটো চলে গেল। আমি বাইরের দিকে বসে আছি। রিকশা থেকে তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাবে না। কত অটো যাচ্ছে অমন। কিন্তু তোমার রিকশাকে আমি অটোর সামনের কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম। তোমাকে দেখা যাচ্ছে না। অথবা এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য যেন তোমার সালোয়ারের সবুজ রঙের প্রান্ত দেখতে পেলাম, মনের ভুলও হতে পারে। তোমাকে দেখতে পেলাম না, সেটা ঠিক। কিন্তু যে রিকশায় তুমি আছ, সেই রিকশাটাকে দেখাই তো তোমাকে আর একবার দেখা। ওই ছাদঢাকা রিকশা যে তোমাকে নিয়েই চলেছিল তখন তাতে তো কোনো ভুল নেই। আমার অটো তোমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিনের পর আর দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু সারাক্ষণ মনে পড়ছে। ছাতাটা খুললে, একপাশে হেলিয়ে নিয়ে চলে গেলে রিকশা ডাকতে। গাঙ্গুলিবাগানের মোড়টা তো যাতায়াতের পথে দু-বার। কখনও চারবারও পার হতে হচ্ছেই আমাকে। রোজ। প্রত্যেকদিন। আর মোড়টা এলেই মনে পড়ছে তোমার কথা। অটোতে বসে আছি। অটো একটু থেমেছে। সামনেই সাইনবোর্ড, সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। ভাবছি, এই দোকানে সেদিন যখন দৌড়ে দিয়ে দাঁড়ালাম, জানিও না, ভিতরে তুমি রয়েছ। এখন খটখটে দুপুর। শ্রাবণ শেষের মেঘ ভাঙা রোদ নেমেছে ভাদ্রের তেজ নিয়ে। দোকানের ভেতরে মোটা এক ভদ্রমহিলা খাবার কিনছেন। ফাঁকা দোকান। ওখানেই ছিলে তুমি।

আরে! এইভাবে তো পাগল হয়ে যাব। এক্ষুনি একবার দেখা করতে হবেই। চলে গেলাম কৃষ্ণা গ্লাসের ওই মোড়টায়। অকারণে সিগারেট কিনলাম মোড়ের মাথার সেই কালো ছেলেটির দোকান থেকে। তারপর ধীরে সুস্থে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়ালাম। অপেক্ষা করছি। যেন বাসের অপেক্ষা। আসলে আমার চোখ ওই ভিতরে বেঁকে চলে যাওয়া

~ www.amarboi.com ~

গলিটার মুখে। যদি বেরোয়। যদি ফেরে। সকাল সাড়ে দশটা এখন। কোনো কাজ নিয়ে কি বেরোবে না? খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা বাসে উঠে চলে এলাম।

একটা চান্স নেওয়া যায়। শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি যাওয়া। বলেছিলে তো, শ্যামল জেঠুর বাড়িতে তো আমি সারাক্ষণই থাকি। টুবুল আর জেঠিমার সঙ্গে। বলেছিলে। চলেই যাই।

দুই

শ্যামল চৌধুরীকে অবশ্য আমার একটু কেমন কেমন লাগে। তাঁর সম্পর্কে নানা কথা শুনতে পেরেছি। সে তো যে কোনো আড্ডায় বসলে এসব শোনা যায়। বইমেলায় দেখেছি কয়েকবার, কাছ থেকে, দূর থেকে। মানে পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, ওঁর চারপাশেই একটা ভিড় মতো হয়ে থাকত। কয়েকজন সবসময় ওঁর সঙ্গে সঙ্গে। সামনে গিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করল, উপায় কী, যেভাবে হাত নেড়ে কথা বলেন ভদ্রলোক, ইচ্ছে করেনি। অথচ ওঁর লেখা পড়ে কতবার মনে মনে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। টিভিতে মাঝে মাঝে বলেন শ্যামল চৌধুরী। এক একটা কথা শুনে মনে হয়েছে, আরে, এমন তো আমিও ভেবেছি। এত মিলে যায় ওঁর সঙ্গে। কিন্তু কথা বলব বলে, যতবার এগিয়েছি, কিছু না কিছুতে ঠেকে গেছি।

মণীশ বলেছিল, দ্যাখ, তুই তো অনেক লোকজনের মধ্যে শ্যামল চৌধুরীকে দেখেছিস। অনেক লোকজনের মধ্যে একটা মানুষ যেমন, একলা কিন্তু তেমনটা নয়। অন্তত তেমনটা না হতেও পারে। দ্যাখ না একদিন বাড়ি গিয়ে।

যদি ভাবেন লেখা ছাপানোর জন্য উমেদারি করতে এসেছে।

মনীশ বলেছিল, সেটা ভাবার সম্ভাবনা আছে। বড় হাউসে আছেন তো। পোয়েট্রি এডিটর। কত লোকজন আসছে ওই একটু লেখা ছাপানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তোকে দেখলে তা ভাববেন না। তুই তো ওঁর লেখা ভালোবাসিস।

হ্যাঁ।

লেখকরা ঠিক ভালোবাসা বুঝতে পারে। নইলে আর লেখে কী করে বল। চলে যা।

তাই গিয়েছিলাম। ভাবতাম, মানুষটি বেঁচে রয়েছেন। আমাদের মধ্যে রয়েছেন। কত একাকী মুহূর্তে এই মানুষটির লেখা আমার সঙ্গী হয়েছে। একটু যাব না? কথা বলব না? শুধু বড় পাবলিশিং হাউসে চাকরি করেন বলে?

গিয়ে কিন্তু মন ভরল না। কলম বন্ধ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন শ্যামল চৌধুরী। ওঁর মেয়ের সঙ্গে তুমি উঠে গিয়েছ সিঁড়ি দিয়ে, তোমাদের সাড়া নিয়েছেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বলেছেন, হ্যাঁ বলুন।

আমার মুখে কথা সরছে না—তোমাকে সদ্য দেখেছি বলে কিন্তু নয়। তুমি তখনও আমার মধ্যে প্রবেশ করোনি। শ্যামল চৌধুরীকে কাছ থেকে দেখার একটা কাঁপন তখন আমার মধ্যে। একটা অভিভূত ভাব। মানে, আপনার সঙ্গে...

~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গে তো বটেই। বসুন না, বসুন। নার্ভাস হবেন না ভাই। বলুন কী দরকার?

আমি দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম ওঁকে দেখে। আসলে আমি একটু এলাম।

শ্যামল চৌধুরী হেসে ফেললেন। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা। কপালের দিকটি চওড়া হয়ে এসেছে কেশবিরলতার কারণে। দাড়িগোঁফের মধ্যে কালোর ভিতর যথেষ্ট সাদার আঁকিবুকি। কত বয়স হল শ্যামল চৌধুরীর?

বলুন ভাই।

কী আর বলব? আপনাকে একটু দেখতে এলাম।

মানুষ যতদূর বোকা হতে পারে ততদূর বোকা আমি তখন।

শ্যামল চৌধুরীর মুখে অধৈর্য হওয়ার রেখা দেখা দিচ্ছে।

দেখতে এলেন? কী দেখবেন? লেখককে কি লোকে দেখতে আসে? তাতে কোনো লাভ হয়? লেখকের লেখাকে দেখতে হয়। লেখাই একজন লেখকের পরিচয়। তাই লেখার সঙ্গে দেখা করাই তার সঙ্গে দেখা।

অধৈর্যভাবে কপালে, মাথায় হাতটা ঘষে নিলেন শ্যামল চৌধুরী।

শ্যামল চৌধুরী সম্পর্কে যা যা শুনেছিলাম, তার মধ্যে একটি হল, অল্পবয়সি ছেলে...পেলেই উনি কিছু জ্ঞানের কথা বলেন। অত বড় কাগজের কবিতা সম্পাদক বলে কেউ কিছু বলে না, চুপচাপ শুনে চলে আসে। কিন্তু আমি কী করব, লোকটার লেখা যে আমার ভালো লাগে। বড় বেশিদিন ধরে ভালো লাগে। আমি ওঁর সব পড়ি। না হয় বললেনই দুটো জ্ঞানের কথা।

হঠাৎ শ্যামল চৌধুরী বললেন, আপনার নাম কী?

বললাম।

চোখটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আপনি তো ভালো লেখেন।

আপনি পড়েছেন?

পড়ি তো! সুতীর্থ। চতুর্বেদ। লিপিকার। বীজাণু। কালো শিল্প। এই সব কাগজেই তো আপনি লেখেন। ভালো লেখা। শক্তি আছে আপনার।

আমি এতটা আশা করিনি। পত্রিকার নাম পর্যন্ত বলে দিচ্ছেন।

শ্যামল চৌধুরীর চোখের দৃষ্টি এবার সোজা আমার মুখের দিকে।

এখন কি আমাদের হাউসে লিখতে চান? মত বদলেছেন? তা লিখুন না! আমাদের কবিতার পাতায় সকলেরই সমান অধিকার। সকলেরই প্রবেশ অবাধ। দিন, কী এনেছেন দেখে নিই তাড়াতাড়ি। আমার আবার হাতে কাজ রয়েছে আজ।

বলে, হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

আমি কিছু বুঝতে পারি না। বলি, কী? কী চাইছেন বলুন?

লেখা, লেখা। কি এনেছেন দেখি।

উনি হঠাৎ আমার কাছে লেখা দেখতে চাইবেন ভাবিনি। বলি, লেখা? লেখা তো আনিনি।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

ওহ্। আনেননি। খানিকটা যেন স্বস্তি পেলেন শ্যামল চৌধুরী। আজ শুধু আলাপ করে গেলেন, তাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরের দিন লেখা নিয়ে আসবেন।

আমি যে লেখা ছাপানোর জন্য আসিনি, শুধু ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে এসেছি, এ কথা বলার সময়ই পেলাম না।

উনি উঠে পড়লেন, করবী, করবী। তুমি তো বেরোবে? তাহলে আমার জন্য একটা খাতা নিয়ে এসো।

করবী বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। মধ্যবয়সিনী। ভারি চেহারা। বাইরে বেরোবার জন্য তৈরি, একটু সাজগোজ করেছেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলাম। করবী বললেন, বসুন। আমি বললাম অনেকক্ষণ এসেছি। এবার যাব যে।

সে কি। চা খেয়ে যান। ও টুনি, একটু চা বানাও তো।

একটি বউ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল, জামাইবাবু খাবেন?

শ্যামল চৌধুরী যেন হঠাৎ খুশি! খাব না মানে? আরে আর একটু বসুন।

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বলি, আমাকে আপনি বলবেন না।

শ্যামল চৌধুরী নির্বিকার মুখ করে বললেন, আমি সবাইকেই আপনি বলি।

আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোটো।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

করবী দরজার কাছে জুতো পরছিলেন বোধহয়। বললেন, মেয়ের বন্ধুরা ফোন করলেও বলবে, একটু ধরুন ডেকে দিচ্ছি। টুবুল কোথায় গেল?

শেষ প্রশ্নটি স্বামীর দিকে।

শ্যামল চৌধুরী গ্রিলের জানলার কাছে গিয়ে নিচে তাকিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই পুকুরটা দেখছিলেন। বললেন, ছাদে।

করবী চোখ কপালে তুলে বললেন, এই বিষ্টির মধ্যে ছাদে? দেখি তো একটু। টুবুল তো পড়তে যাবে বিকেলে। সামনে পরীক্ষা, এখন ভিজছে?

—হ্যাঁ, শোনো। ওর সঙ্গে বুবুলও আছে। বুবুলকে বোলো যদি পারে যেন আমার কাছে আসে। বলে শ্যামল চৌধুরী টেবিল থেকে সেদিনের খবরের কাগজটি তুলে পিছনে খেলার পাতা দেখছেন।

করবী বললেন, ও, তোমার লেখা শেষ হয়ে গেল? এখন কপি করতে হবে?

কাগজ দেখতে দেখতেই শ্যামল চৌধুরী বললেন, হুঁ, একটু বাকি আছে। হয়ে যাবে।

আচ্ছা, বুবুলকে বলে দিচ্ছি।

তখনও জানি না তোমার ডাক নাম বুবুল। ওই জানলাম বলা যায়। বা খানিক অনুমান করছি। ভেবে যাচ্ছি, শ্যামল চৌধুরীর একটিই মেয়ে শুনেছিলাম। তাহলে ওঁর আসলে দুই মেয়ে। টুবুল বুবুল?

শ্যামল চৌধুরী কেমন যেন ছটফট করছেন। একটু ছটফটে অবশ্য আছেন উনি। আবার গিয়ে জানলায় দাঁড়িয়েছেন চায়ের কাপ হাতে। বলছেন, জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখাই

~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে নিরাপদ। ছাদে উঠে রাস্তায় গিয়ে নাকাল হয়ে ভিজে ঠান্ডা লাগানোর চেয়ে। এ বয়সে এ-ই ভালো।

এমন কী বয়স হয়েছে আপনার? কিছু বোঝা যায় না!

অদ্ভুত একটা হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলেন শ্যামল চৌধুরী। ঠান্ডা হাওয়ায় তাঁর পাঞ্জাবি উড়ছে। কাঁধের কাছটা ফুলে উঠেছে। হাড়সর্বস্ব চেহারা। তিনি জানলার নিচে, সম্ভবত পুকুরটার দিকেই তাকিয়ে থেকে বলেন, হয়েছে। হয়েছে। বয়স তো হয়েছে। তরুণ কবিদের জিজ্ঞেস করুন তারা বলবে, শ্যামল চৌধুরীর লেখা শেষ হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ।

আমি বিব্রত, না না, কী যে বলেন। কে বলবে এ কথা!

বলবে। বলবে। অনেকেই বলবে। এই ধরুন আপনারাই।

আম-রা? মা-নে?

কি চমৎকার একটা প্যারডি করেছিলেন আমাকে নিয়ে, মানে আমার কবিতা নিয়ে। বালুঘড়ি পত্রিকায়? ভালো হয়েছিল কিন্তু প্যারডিটা।

আমি চায়ের কাপ হাতে স্তব্ধ বসে। সেটাও পড়েছে এ লোকটা? মনেও রেখেছে? সময় পায় কখন? প্রয়াস আর সৈকতকে তখনই বলেছিলাম কী দরকার এসব করার? ছেড়ে দে না লোকটাকে। সবাই হইহই করে উঠল, কেন ছেড়ে দেব? কেন?

শ্যামল চৌধুরী আমার পাশে এসে বসে পড়লেন সোফায়। এসব তো ভালোই। পত্রিকায় বৈচিত্র্য আসে। কিচ্ছু মনে করিনি। কিচ্ছু মনে করিনি। তবে কি জানেন, আমি যদি দুটো খারাপ কবিতা লিখি তাতে আর সমাজের কী এমন ক্ষতি হয় বলুন। ভালো লিখতে চেষ্টা করলাম, হল না, খারাপ লেখা হল। এই তো ব্যাপার। কিন্তু এই সমাজে আরও কত বড় বড় অন্যায় শাসকদের প্রশ্রয়ে কত দুষ্টচক্র কতদিকে সক্রিয়—আপনারা তরুণ, আপনারা যদি সেসব অনাচারকেও ব্যঙ্গের কশাঘাত করতে পারেন...

এই রে! ভদ্রলোক দেখছি আবার জ্ঞান দিতে শুরু করেছেন। কী করে পালাই।

টুনি নামের কাজের বউটি এসে বলল, জামাইবাবু আমার কাজ হয়ে গেছে, চললাম।

শ্যামল চৌধুরী বললেন, শোনো, টুবুল কোথায়? একটু পাঠিয়ে দাও তো। ও পড়তে যাবে।

আমি উঠে পড়ে বললাম, চলি আজকে। খুব ভালো লাগল।

শ্যামল চৌধুরীর মুখটা কেমন অন্যমনস্ক লাগছে। আবার সেই ছটফটানিটা ফিরে আসছে। বললেন, কি জানি ভালো লাগল কি না। সবাই তো প্রথম দিন অমনই বলে।

হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আমি পড়েছি, সত্যি ভালো লেখেন আপনি। দেবেন। কবিতা দেবেন। পরের দিন লেখা নিয়ে আসবেন, কেমন?

আমি আবার অভিভূত হয়ে গেলাম। আসব, আসব।

পরমুহূর্তে শ্যামল চৌধুরীর মুখ আবার একটু বদলে গেল, অবশ্য যদি তাতে আপনার বন্ধুরা রাগ না করেন।

না না। সে কী, রাগ করবে কেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলতে বলতে, আমি প্রায় প্রাণ হাতে নিয়ে চারতলা সিঁড়ি নেমে আসি। রাস্তায় জল এখনও জমে আছে। প্যান্ট গুটিয়ে ছপছপ করে যেতে যেতে সিদ্ধান্ত নিই। কখনও নয়। আর কখনও নয়। বাপরে। কখন কী বলবে তার হদিশ পাওয়া যায় না। সারাক্ষণ চোখেমুখে কী-সব বিদ্যুৎ খেলা করছে। এখানে আর দ্বিতীয় দিন নয়।

তিন

মুশকিল হয়ে গেল তোমার সঙ্গে পরপর দুদিন দেখা হয়ে যাওয়ায়। বিশেষত দ্বিতীয় দিন অটোটা তোমার রিকশার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর আর কোনো উপায় রইল না। তোমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে যে করেই হোক।

কিন্তু কী করে?

একটাই উপায় আপাতত আমার হাতে আছে। যে উপায়ের দিকে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। কেন না নিয়তি-নির্বন্ধে ইতিমধ্যে আমি জেনেছি তুমি শ্যামল চৌধুরীর ফ্ল্যাটের নিচের ফ্ল্যাটটিতে থাকো। ইতিমধ্যে আমি জেনেছি সারাদিনের অনেক সময় তুমি কাটাও শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি। ওঁর মেয়ের সঙ্গে। আমি জেনেছি তোমার ডাকনাম বুবুল। ওঁর মেয়ের নাম টুবুল বলে অনেকে প্রথম দেখায় তোমাদের দুই বোন ভাবে। আমি এও জেনেছি, তোমার হস্তাক্ষর সুন্দর বলে মাঝে মাঝে তুমি শ্যামল চৌধুরীর লেখা কপি করে দাও। নিয়তি দেবী এগুলি আমাকে জানিয়েছিলেন সেই অপ্রত্যাশিত...রিকশা যাত্রার সময়ে যখন দুজনে এ কথা সে-কথায় পৌঁছে যাচ্ছিলাম বাঘাযতীন মোড়ে। এ কথা সেকথার মধ্যে ঢুকে ঢুকে বসে পড়ছিল এইসব অসাধারণ তথ্য। এখন, আর কোথায় যাব তোমাকে দেখতে যাওয়া ছাড়া। আর তো কোথাও আমার যাওয়ার নেই। শুধু যেখানে তোমাকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেদিকেই আমার সমস্ত পথ চলে যেতে চাইছে।

শ্যামল চৌধুরীর বাড়িই যাব তাহলে? এটা অবশ্য ঠিকই বলেছিলেন উনি, আপনার বন্ধুরা যদি রাগ না করেন? ওঁর বাড়ির হদিশ জিজ্ঞেস করতে শুভব্রত মুখটা কেমন করেছিল। ওকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম। রাজি হল না। ওঁর কাছে গিয়েছি শুনে সোহম তো সরাসরি বলেছিল, ও গিয়েছিলি! আচ্ছা! বড় কাগজে লিখতে চাস?

ওদের কেউ এটা বোঝেনি আমি মানুষটার কাছে গিয়েছিলাম। বড় আগ্রহ ছিল। অনেকদিনের আগ্রহ। মানুষটাকে ভালোবাসতাম। কিংবা তা এখনও বাসি। কিন্তু একবার দেখার পর আর যেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে মানুষটাকেও নয়। ওঁর লেখা পড়ে মনে মনে কথা বলতাম। উনি তখন থাকতেন অনেক দূরে। শহরে নয়। বিগ হাউসে চাকরি করতেন না। তখন থেকে কথা বলতাম মনে মনে। যাঁর সঙ্গে কথা বলতাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। যাঁকে দেখলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি।

তা ছাড়া, লেখা পড়ে মনে মনে কথা বলাটা যে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারে কারও সঙ্গে সে কথা আর যে-ই বিশ্বাস করুক লেখকবন্ধুরা করবে না। তারা দেখবে

~ www.amarboi.com ~

লোকটা কোথায় চাকরি করে। বড় কাগজের মেশিনারির একটা যন্ত্রাংশ হিসাবে দেখবে তাকে। লোকটাকে ফেলে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে লেখাটাও।

আমি চুপ করেই থাকি। কিন্তু এখন তো শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি আমাকে যেতেই হবে। নইলে তোমার ছায়ায় যাব কী করে। কিন্তু সেখানেও তো বিপদ। যদি বলেন লেখা এনেছি কি না। সামান্য যা লিখি, নিজেদের পত্রিকা, অন্য বন্ধুদের ছোটোখাটো কাগজে সব দিয়ে উঠতে পারি না। বন্ধুদের কাগজে আপন মনে লিখে আমি বেশ আছি। শ্যামল চৌধুরী যে পত্রিকার কবিতা সম্পাদক সেখানে লেখা কোনোদিন পাঠাইনি। তার চেয়ে যারা ভালোবেসে চেয়ে নিচ্ছে তাদের দেওয়াই তো ভালো। হ্যাঁ, শ্যামল চৌধুরীও চাইছেন, চেয়েই নিচ্ছেন, কিন্তু সে তো এখন। সে তো বাড়ি যাওয়ার পর। অর্থাৎ উনি ভেবেই নিয়েছেন, আমিও লেখা ছাপানোর উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছি, মুখে শুধু বলে উঠতে পারছি না। কিন্তু সে কথা তো সত্যি নয়। তা ছাড়া উনি তো সব পড়েন দেখে এলাম। আমার নামও তো উনি জানতেন। লেখা ওঁর ভালো লাগে বললেন। তাহলে কখনও খোঁজ করেননি কেন? না, এ অবস্থায় লেখা দেওয়া যায় না।

কিন্তু ওঁর বাড়ি আমায় যেতেই হবে। চলে যাই? আজই।

কিন্তু আজ তো ছুটির দিন। ছুটির দিন ওঁর বাড়ি যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ছুটির দিন, ওঁর ওই সেন্ট্রাল পার্ক-এর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে আঠারো জোড়া জুতো আর চপ্পল। অনুব্রত দেখেছিল। ওদের কাগজ প্যারাডাইম দেবার জন্য এক রবিবার ভুল করে সকাল ১১টা নাগাদ গিয়ে পড়েছিল অনুব্রত। ঢুকবে কি, জুতোয় জুতো। টিভির লোক ইন্টারভিউ নিচ্ছে, পুজোয় কী করবেন এ বিষয়ে একজন সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, পুজোসংখ্যায় যারা জায়গা পায়নি তারা বিশেষ কবিতা সংখ্যার জন্য লেখা দেবে কি না জিজ্ঞেস করছে, একজন অনুরাগিণী পাঠিকা কিছু লিখে দিন, কিছু লিখে দিন বলে একটি অটোগ্রাফ নেওয়ার পর পথে আসছেন অর্থাৎ নিজের কবিতার খাতা বার করে দেখাচ্ছেন, শ্যামল চৌধুরী ভুরু কুঁচকে রয়েছেন সারাক্ষণ, গুল্লিগুল্লি গোল চশমা খুলে মাঝে মাঝে সাদা পাঞ্জাবি দিয়ে কাচ ঘষছেন—থেকে থেকে খুব শ্লেষাত্মক কোনো কথায়, বা অল্প কৌতুক করছেন, সামনে যারা তারা খুব হাসছে—ছ্যা ছ্যা। এই কিনা কবি। এর নির্জনতা কই। এ তো এম. এল. এ. হলে বাড়িতে সকালে অমন ভিড় হয়। বিভিন্ন প্রার্থীর ভিড়। পত্রিকা না দিয়েই চলে এসেছিল অনুব্রত। একে পত্রিকা দেওয়ার মানে হয় না।

আর পত্রিকা দিয়েছিল প্রয়াস আর সৈকত। ওরাও ভালবাসত শ্যামল চৌধুরীকে। আমার মতো এতখানি না হলেও পছন্দ করত। ওরা খুব যত্ন করে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেটিখে বইমেলার মাঠে প্রতিরূপ-এর স্টলের সামনে পত্রিকা তুলে দিয়েছিল শ্যামল চৌধুরীর হাতে। শ্যামল চৌধুরীর আশেপাশে সারাক্ষণ লোক। উনি পত্রিকা নিয়ে, আমার ব্যাগটা কোথায়, বলে এদিক ওদিক খোঁজ করেছিলেন। শ্যামল চৌধুরীর কয়েকটি মার্কামারা ব্যাপার আছে। একটি হল, সর্বদা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। অন্য দুটি হল কাঁধের ঝোলা আর ছাতা। সেই শ্যামল চৌধুরীর কিনা সঙ্গে ঝোলা নেই? তাও বইমেলার মতো জায়গায়?

~ www.amarboi.com ~

ওর সঙ্গে যে দু-তিনজন ছিল, একজন দ্রুত বলল, আপনি ঝোলাটা বিজল্প-এর স্টলে রেখে এসেছেন শ্যামলদা। আমি নিয়ে আসব?

না দেবাশিস, আমিই যাচ্ছি, বলে শ্যামল চৌধুরী এগিয়ে যান। এ ঘটনা বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। রাত নটা নাগাদ। সোহম সৈকত আরও সব বন্ধুদের নিয়ে যখন বেরোচ্ছে মেলা থেকে, তখন ফাঁকা হয়ে আসা মাঠে স্পষ্ট দেখা যায় মহুয়ামন পাবলিকেশনের সামনে ওদের পত্রিকার দুটি সংখ্যা পড়ে আছে। ধুলো থেকে তুলে আবিষ্কৃত হয় এই দুটি সংখ্যাই শ্যামল চৌধুরীকে যথোচিত শ্রদ্ধাসহ নিবেদিত হয়েছিল।

সোহম-এর প্রথম রি-অ্যাকশন ছিল, টাক ফাটিয়ে দাও।

প্রয়াস বলল, উহুঁ। দাড়ি কামিয়ে দাও।

সমবেত জিজ্ঞাসা, কে কামাবে?

কে কামাবে? কে?

এই সময়েই নাকি আমাকে আসতে দেখা যায়। মেলা থেকে গুটিগুটি আমিও ফিরছি। ওরা আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে বলে, এ-এ-এ। এ কামাবে। শ্যামল চৌধুরীর দাড়ি, এ, কা, মা, বে। এ-ইই তো ভক্ত।

সকলেই খেয়ে আছে। কথা চলে না।

আমাকেই শেষমেশ লিখতে হল ওই প্যারডি।

সেই শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি আবার যাব! একবার তো গেছি। আবার?

হ্যাঁ, উপায় নেই, যেতেই হবে। আজই। তোমাকে দেখাটা যে জরুরি। দেখা যে হবেই তা তো নয়। হলই না হয়তো। তবু চেষ্টা তো করতেই হয়।

গেলাম। আশ্চর্য, দরজার সামনে একটাও জুতো নেই। আমার জুতোটাই প্রথম হল। বেল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আগের দিন তুমি এসেছিলে দরজায়। এসেছিলে না বলে দেখা দিয়েছিলে বলা ভালো। আবির্ভূতা হয়েছিলে। বুক ধুকধুক করছে। দরজা খুলে গেল। কাজের বউটি দাঁড়িয়ে আছে। জামাইবাবু, কে এসেছে।

ভেতরে নিয়ে এসো।

গেলাম ভেতরে। ছোটো একটা খাবার টেবিল। সেখানে খাবার নিয়ে বসে শ্যামল চৌধুরী। স্নান করে উঠেছেন বোঝা যাচ্ছে।

ওঃ হ্যাঁ। বসুন। একটু খেয়ে নিই?

আমি কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

শ্যামল চৌধুরী খাচ্ছেন নুন গোলমরিচ ছড়ানো কয়েকটি আলুসেদ্ধ। আর দুটি পাউরুটি। টোস্ট করা। টোস্ট দিয়ে আলুসেদ্ধ যে একটা খাবার হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। তিনি টোস্ট আর আলুসেদ্ধ কামড়াচ্ছেন আর টেবিলে রাখা শঙ্খ ঘোষের একটি বই পড়ছেন। নামটা পড়তে পারলাম। শব্দ আর সত্য। ইনি শঙ্খ ঘোষের ভক্ত হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি বসে আছি। শ্যামল চৌধুরী খুব ধীরে ধীরে খেয়ে যাচ্ছেন। আর বাঁ হাতে বই

~ www.amarboi.com ~

ধরে শঙ্খ ঘোষ পড়ছেন। বাড়িতে আর কোনো লোক আছে বলে মনে হচ্ছে না। আগের দিন তুমি ছিলে। ওই জানলায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলে নিচের পুকুরের দিকে।

শ্যামল চৌধুরী বইয়ের দিকে চোখ রেখেই বললেন, লেখা কি এনেছেন?

আমি কোনোমতে বলি, লেখা তো কিছু আনা হয়নি।

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। বই কি নতুন কিছু বেরোল।

না, মানে বই তো সেরকম কিছু।

শ্যামল চৌধুরী জল খান। কাজের বউটি দু কাপ চা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোয় ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকানো মাত্র শ্যামল চৌধুরী ইশারায় আমার দিকটা দেখান। বউটি দুটো কাপই এনে নামিয়ে রাখে আমার সামনের ছোট টেবিলে। শ্যামল চৌধুরী বেসিনে মুখ ধুয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে আমার সামনে এসে একটা কাপ তুলে নেন। নিন, চা খান। আমার জন্য এবার একটি প্লেটে দুটি সন্দেশ আসে।

কাজের বউটি সামনে এসে বলে, আমি তাহলে যাই জামাইবাবু। আজ যে চলে যাব বলে রেখেছিলাম। শ্যামল চৌধুরী বলেন, হ্যাঁ। এসো। তারপর আমার দিকে ঘুরে বলেন, একটাই তো বই আপনার, এখনও পর্যন্ত। সবুজ সতর্ক জানলা। তাই তো?

আমি অবাক। সে বইয়ের কথা আপনি কী করে জানলেন?

পড়েছি, তাই জানি। ভালো। খুব নতুন। নতুন একটা ভাষা! আছে আমার কাছে এক কপি।

আমি আর কথা বলতে পারছি না।

শ্যামল চৌধুরী বলেন, আসলে আজ আমাকে এক্ষুনি বেরতে হবে। দত্তপুকুর যাব। গাড়ি এসে যাবে এইবার।

আমি এক চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়াই।

কিছু মনে করলেন না তো? আসলে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। খুব নরম করে বললেন শ্যামল চৌধুরী। আমি না, না মনে করব কেন বলে দরজায় এসে জুতো পরি। উনি দরজায় এসে দাঁড়ান।

আমি জানি আপনারা বড় কাগজে লিখতে চান না। না-ই লিখলেন। বলে রাখলাম কোনো দিন ইচ্ছে হলে দেবেন। আর গল্প করার কথা মনে হলে চলে আসবেন না। ও! আমার ফোন নম্বরটা নিয়ে যান। চব্বিশ পঁচিশ বিয়াল্লিশ সাতানব্বই। মজার না? মনে রাখার সুবিধে। দাঁড়ান লিখে দিই।

চকিতে ভিতরে গিয়ে লিখে নিয়ে আসেন। এই নিন।

হঠাৎ আমার কি হয়, আমি বলে ফেলি, আমাকে তুমি বলবেন।

উনি হাসেন, পারি না যে। আচ্ছা দেখা যাক, পরে হয়ত হয়ে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি। রাস্তায় আসি। তুমি কোথাও নেই। তুমি কোথাও ছিলে না। এই বাড়িটাতেই তুমি থাকতে। এই পাড়ার লোকেরা তোমাকে রোজ দুবেলা দেখতে পায়। এই যে সরু পিচ রাস্তাটা দিয়ে চলেছি এই রাস্তাটা দিয়েই তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে

~ www.amarboi.com ~

বাসরাস্তা পর্যন্ত দাও। এই রাস্তাটা দিয়েই তুমি বাড়ি ফেরো। ওই যে গাছদুটো। ওই সব বাড়ি। ওই যে শৈলী লেখা আঁকার ইস্কুলের সাইনবোর্ডটা, এমনকী ওই ডাস্টবিনটাও তোমাকে দেখার সুযোগ পায়। আমি পেলাম না। আমার আজ তোমার সঙ্গে দেখা হল না। আমি শুধু তোমার জন্য এসেছিলাম। তুমি শ্যামল চৌধুরীর লেখা কপি করে দাও। তুমি একদিন আমার লেখা কপি করে দেবে। একবার। মাত্র একটি বারের জন্য। দেবে? তুমি জানো দ্বিতীয় দিন গাঙ্গুলিবাগানে দেখা হওয়ার পর আমি একদিনে ১১টা কবিতা লিখেছি। যেগুলো সব তুমি। তুমি। তুমি।

আমি বাস রাস্তায় পৌঁছে গেছি। রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলে গেছি কিন্তু আমার বাসে উঠতে ইচ্ছে করছে না। আমার এই মুহূর্তে কোনো কাজ নেই। তোমাকে একবার দেখা ছাড়া কোনো কাজ নেই। কীভাবে তোমাকে দেখব আমি আর জানি না। আমি আগামীকাল আর শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি আসতে পারব না। পরশুও না। কী করে তোমাকে দেখব। বুবুল? বুবুলটি?

আমি হাঁটতে হাঁটতে চলেছি রাস্তার পাশ দিয়ে। সুলেখার সামনে এসে ঢুকে গেছি একটা গলিতে। যাদবপুরের দিকে চলে যাচ্ছি এঁকেবেঁকে। একটা মাঠ পড়ল। বড় একটা ট্রান্সফর্মার বসানো মাঠের পাশে। এটাকে বলে শক্তিগড়ের মাঠ আমি জানি। সামনের দিকে গেলে ছোটো একটা পার্ক। সরু সব পিচরাস্তার গলি। আমি তোমাকে ভাবতে ভাবতে চলেছি। এ নয় যে তোমার নাম ধরে ডাকছি। আমি মনে মনে শুধু বলে চলেছি। কো-থা-য়? কো-থা-য়? কো-থা-য়?

চার

ঠিক পরের দিনের কথা। সেটাও ছুটির দিন। পরপর দুটো ছুটির দিন পড়ল। হয়ত নিয়তিনির্বন্ধে আমি একা একা রাস্তায় হেঁটে বেড়াব বলেই। আজ ঘুরে যাচ্ছি বৈষ্ণবঘাটা বাই লেন থেকে বাই লেনের অসীম সর্পিলে, এসে পড়ছি দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস রোডের অনন্তে। পথ আজ ফুরোবার নয়। শীর্ণকায় গলি আর গাছপালা ভরা বাড়ি আর রিকশার পার হওয়ার পাশ দিয়ে গিয়ে। হঠাৎ পিছন থেকে একটা গলা শুনলাম, ব্যস ব্যস, এ-এইখানে। হ্যাঁ রাখুন।

পাশে এসে একটা রিকশা দাঁড়িয়ে গেল। রিকশা থেকে যে নামল সে আর কেউ নয়, তুমি। হলুদ সালোয়ার কামিজ। কানে ঝোলা দুল।

দেখতে পেয়ে দাঁড়ালাম। এই নিন। রিকশাকে ভাড়া দিয়ে দাও তুমি।

বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম এদিকে। ও-ই পিছনের রাস্তাটা দিয়ে চলে যাচ্ছে রিকশাটা, হঠাৎ এই মুখোমুখি গলিটায় আপনাকে দেখলাম পিছন থেকে। কোথায় যাচ্ছিলেন?

কোথাও না। এমনি হাঁটছি।

বাঃ বেশ তো। বাড়ি ফিরছিলাম। এখন আমিও কাজহীন। কোথাও যাচ্ছি না। এমনি হাঁটছি। হি, হি...

~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি ওই হাঁটা শুরু আমাদের। সেই থেকে আমাদের দেখা হতে লাগল। তুমি অকারণে ফোন করলে আমাকে। আমি অকারণে ফোন করলাম তোমায়। আমি মনে রাখলাম না মাত্র আগেরবার তুমি বি. এস. সি. পাস করে বেরিয়েছ। তুমি মনে রাখলে না আমি তোমার চেয়ে ১২ বছরের বড়। রাস্তায় রাস্তায়, নাকতলা গাঙ্গুলিবাগান বিজয়গড় বাঘাযতীনের ভেতরে ভেতরে আঁকাবাঁকা গলির পর গলি ধরে হেঁটে বেড়াই আমরা। একটা বাড়িতে কুসুমকানন লেখা দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। হেঁটে বেড়াই বাইপাসের ধারে ধারে। সায়েন্সসিটিতে চলে যাই। কখনো কখনো একটু দূরে গঙ্গার ধারে চলে গিয়ে গাছের তলায় বসে একই ধরনের সূর্যাস্ত পরপর দুদিন তিনদিন দেখি। আশেপাশে জোড়ায় জোড়ায় কত ছেলেমেয়ে বসে থাকে। তুমি ভুল করেও কখনও আমার কবিতা শুনতে চাও না। তুমি কোথায় যেন ভর্তি হয়েছ, কীসের যেন ক্লাস করো কবে কবে, সে সবও আমি ভুলে গেছি। তুমি কী সিনেমা দেখলে, তার গল্প করো। কখনও এক গল্প দু-বার। যেমন মাই ব্রাদার নিখিল। তোমার সঙ্গে আমি সিনেমা দেখিনি তা নয়। আঁখে বলে একটা ছবি দেখে এলাম। অমিতাভ বচ্চন ছিলেন। অন্ধদের দিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতির গল্প। তুমি বললে পুরনো ছবি, কিন্তু তোমার ভালো লাগে।

আমাদের বাড়ি তুমি এসেছ। আমার মা হাসপাতালের নার্সের কাজ করে। বাবা নেই ছোটো থেকে। মা এখন মেট্রন। আমি প্রাইভেট ফার্মে আজ ঢুকি চাকরিতে। কাল ছেড়ে দিই। এক সপ্তাহ বসে থেকে পরের হপ্তা থেকে আবার নতুন চাকরি খুঁজতে শুরু করি। বন্ধুদের সঙ্গে পত্রিকা বের করি। সেসব পত্রিকা, আরও নানা কাগজের সঙ্গে আমার ঘরে ছড়িয়ে থাকে। তুমি উলটে-পালটে দ্যাখো। প্রথম প্রথম তোমাকে একটা দুটো দিয়েছিলাম। বাড়ি নিয়ে গেছ। পরে আর কিছু বলোনি। আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে 'বিপরীত মেরু' পত্রিকায়। তুমি সেটা পড়ছ, টেবিল থেকে তুলে। আমি ভাবছি কেমন লাগবে তোমার। একটা উৎকণ্ঠা গলার কাছে উঠে আসছে। হঠাৎ তুমি বললে, তোমার যদি কবিতা কপি করে দিতে হয়, বোলো, আমি এসে করে দেব।

আমি বলি, মানে?

মানে শ্যামল জেঠুর লেখা অনেক সময় আমি কপি করে দিই। তাই বলছিলাম।

হ্যাঁ জানি তো।

শ্যামল জেঠুর হাতের লেখা খুব খারাপ। আমি যেগুলো কপি করে দিতে পারি না, সেসব লেখার পরে অনেক প্রিন্টিং এরর বেরয়। তোমার হ্যান্ডরাইটিং কেমন? ভালো? হ্যাঁ, ভালো?

না, মানে ওই চলে যায় আর কি।

কই দেখি। দেখাও তো তোমার হ্যান্ডরাইটিং ভালো কি না? লেখার খাতা দেখাও। সত্যি, দেখে তারপর ছাড়লে। যদিও আমি অনেক সময় লুজ শিট-এও লিখি। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লে আমার এখনও ছাপা না-হওয়া কবিতা। যেগুলো দেখার জন্য বাড়ি

~ www.amarboi.com ~

এসে বন্ধুরা কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু তোমার মুখে বেশ চিন্তার ছাপ দেখা যায়। বলো, তোমার 'ট' আর হ্রস্ব-ই একরকম হয়ে যায়। তালব্য শ আর ল মাঝে মাঝে সেপারেট করা যায় না। 'ক' আর 'ম' গুলো কেমন কেমন। 'ম'টা তো আবার কখন কখন খ-এর মতোও হয়ে যায়। শ্যামলজেঠুর অবশ্য অনেক বেশি প্রবলেম। খুব খারাপ। সত্যি খুব খারাপ। তোমারটা চলে যায়। কিন্তু কী দরকার। এবার থেকে আমাকে বোলো, আমি কপি করে দেব। আমার হ্যান্ডরাইটিং দেখেছ কখনও?

আমি বলি, কী করে দেখব! তোমাকে কত করে বললাম, আমাকে কি একটাও চিঠি লিখলে, বলো?

সে তো তুমিও লেখোনি। দোষ আমার একার?

ঠিকই। আমিও লিখিনি। একদিন বলেছিলাম, তোমাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে।

হেসে গড়িয়ে তুমি বলেছিলে, চিঠি? রোজ দেখা হচ্ছে, ফোনে কথা হচ্ছে;তাও চিঠি?

আমি অপ্রতিভ, কেন চিঠি পেতে ইচ্ছে করে না!

হ্যাঁ তা করে। পেলে ভালোই লাগে।

আমি না হয় দেব চিঠি।

আচ্ছা, বেশ, দিও চিঠি। তবে উত্তর দিতে পারব কী না বলতে পারছি না। কী হল তুমি রাগ করলে? চিঠি লিখতে না আমার একদম ইচ্ছে করে না, জানো? বিজয়ার পর যে কী মুশকিল হয়।

আমি তখন নিভে গেছি। বলতে হয় তাই বললাম, মুশকিল? কীরকম মুশকিল?

খুব রাগারাগি হয় বাড়িতে। তারপর মা যে চিঠিগুলো লেখে তার তলাটায় একটু জায়গা রাখে, আমি সেখানে একলাইন করে প্রণাম নিও-টিও লিখে দিই।

সেদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি, আমার বাস এসে গিয়েছিল বলে। এখন সেই প্রশ্নটা মনে পড়ল। বলি, তোমার কখনও কাউকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না?

তুমি বেশ বিস্মিত, আমার? না তো? চিঠি লেখা বেশ বোরিং ব্যাপার।

নিজেও কিছু লিখতে ইচ্ছে করেনি কখনও?

ওরে বাবা। না না।

কেন? এত ওরে বাবা বলার কী আছে?

আছে, আছে। তুমি আগে বলো তোমার লেখা কপি করতে দেবে তো আমায়?

আচ্ছা, বেশ দেব। তুমি যখন চাইছ।

ও, আমি যখন চাইছি। মানে, তোমার ইচ্ছে নেই?

আমরা যে ঘরটায় বসে আছি, তার একধারে একটা টেবিলে স্তূপ করা পত্রিকা। দেওয়াল ঘেঁষে মেঝে থেকে উঠে থাক দেওয়া পত্রিকা। ঘরের একপাশে দুটো জানলা। জানলার বাইরে গাছপালা পাতা দোলাচ্ছে। একতলার ঘর, তাই লোকজনের কথা আর রিকশার হর্ন আর বাইক-স্কুটারের শব্দ নিজ গন্তব্যে চলে যাওয়ার সময় এ ঘরে একটু উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। জানলার ধার ঘেঁষে একটা খাট। তাতেও বইপত্র ছড়ানো। তুমি বসেছ

~ www.amarboi.com ~

টেবিলের পাশে পুরোনো চেয়ারটায়। আমি জানলার পাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। দেয়ালে পিঠ দিলেই যদি পিঠে ঘসে যাওয়া চুনবালি লেগে যায়।

আরে তা বলিনি। ইচ্ছে নেই নয়। বলতে বলতে একটু এগিয়েছি, অমনি তুমি হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এলে। দেখেছ শার্টটার কী অবস্থা হল। ঘোরো ঘোরো। আমার দিকে পিঠ করে দাঁড়াও। কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে তুমি আমার পিঠ থেকে চুন বালি ঝাড়তে থাকো।

আমি বলি, কবে না ছাদসুদ্ধু মাথায় ভেঙে পড়ে।

প্রথম দিনই তুমি আমাদের বাড়ি দেখে খুব অবাক হয়েছিলে। তোমার চোখ দেখে বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলোনি। আজও এ কথার উত্তর দিলে না।

আমিও প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম, দিও, কপি করে দিও তাহলে।

থাক। তোমার ওই দায়সারা ভাব দেখেই বোঝা গেছে।

দায়সারা কেন হবে? আমার কুণ্ঠা হয়। তুমি আবার কষ্ট করবে।

বলছি তো দিতে হবে না আমাকে।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটা লেখা আজই সকালে লিখেছি। এই নাও। একটু কাটাকুটি আছে কিন্তু।

পাণ্ডুলিপির কাগজটা হাতে নিতে নিতে তুমি বলো, তাতে কী হয়েছে। শ্যামল জেঠুর তো অমন কত কাটাকুটি থাকে। আমি জিজ্ঞেস করে নিই। বলে দেয় তখন, তুমিও বলে দেবে।

অদ্ভুত কিন্তু। কপি করে দেওয়ার তোমার এত ইচ্ছে, কিন্তু লেখাটা পড়ে কোনো মন্তব্য করো না আমি দেখি।

আচ্ছা ঠিক আছে। এবার কাগজ বা খাতা দাও। কীসে কপি করব?

একটা প্যাড এগিয়ে দিই। তুমি প্যাডের পাশে কাগজটা রেখে ব্যাগ থেকে কলম বার কর। শ্যামল জেঠুও একটা প্যাডেই কপি করায়। অবশ্য প্যাডটা আর একটু চওড়া।

আমি বলি, শ্যামল চৌধুরীর লেখা তোমার কেমন লাগে?

তুমি ছোটো করে বলো। ভালোই তো।

আমি বলি, ওই বইটা পড়েছ, সঙ্ঘ ও ঈশ্বর? ওঁর প্রথম দিকের বই। খুব ভালো।

কী বই? কবিতার বই?

হ্যাঁ।

না তো। বই তো কিছু পড়িনি। কবিতা কপি করার সময় পড়েছি। তা ছাড়া খবর কাগজে যেগুলো লেখে, সেগুলো...

পোস্ট এডিট?

হ্যাঁ, তাও কপি করে দিয়েছি। তারপর বই নিয়ে যেগুলো লেখে।

বুক রিভিউ?

হ্যাঁ, সেগুলোও কপি করে দিই। সেসব লেখা তো ভালোই। তাই না?

শ্যামল চৌধুরী এত বড় হাউসে আছেন, কম্পিউটার ব্যবহার করলেও তো পারেন। অফিস থেকে দেয় না?

~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে তো। আছে তো শ্যামল জেঠুর কম্পিউটার। জানো তো, শ্যামল জেঠু না কম্পিউটারে লিখতে পারে না। হি, হি।

আমি বললাম, তুমি তো পারো? কম্পিউটারে লিখতে?

পারিই তো।

তুমি কম্পিউটারে তুলে দাও না কেন? পরিশ্রম করে হাতে কপি করো?

তুমি চোখ তুলে তাকালে। তোমার চশমার তলায় চোখে স্নেহ টলমল করছে। শ্যামলজেঠু, জানো তো, বাচ্চারও বাচ্চা। কম্পিউটারে ছাপা কপি দেখলে নাকি লাইফলেস মনে হয় লেখাটাকে। হাতের লেখায় দেখলে জ্যান্ত মনে হয়। শ্যামল জেঠু কী যেন বলেছিল, হ্যাঁ প্রাণবান। ঠিক। ওই প্রাণবান মনে হয়। আমি কপি করে দিই। যতক্ষণ কপি করি, ঘরে আর ওই ডাইনিং স্পেসটায় পায়চারি করে। গিয়েছ তো শ্যামল জেঠুর বাড়ি? দেখেছ ফ্ল্যাটটা? কতটুকুই বা জায়গা। ওর মধ্যে হু হু করে পায়চারি করে। আর মাঝে মাঝেই বলে, বুঝতে পারছ তো। এ কথাটা হল, উন্মাদ। উন্মাদ। বোঝা যাচ্ছে তো।

মুহূর্তটা মনে পড়ে যেতে হেসে গড়িয়ে যাও তুমি। এতদিন কপি করছি এখনও বলে দিতে হবে? চিনতে পারব না কোন কথাটা কী? আমি বললাম, শোনো, শ্যামলজেঠু, এটা কেন চিনতে পারব না। দুবেলা দেখছি তাও চিনব না? শ্যামলজেঠু বলল, মানে? আমি বললাম, মানে তুমি! উন্মাদ মানে তো তুমি! তুমি-ই। ইহিহিহি। হোহো। হো, উফ্। শ্যামল জেঠুর হতভম্ব মুখটা যদি একবার দেখতে এ-হে-হেহে। হাসি কোনোক্রমে সামলে নিয়ে বললে, যেটা বলছিলাম। কপি করা হয়ে গেলে কাগজটা হাতে নিয়ে একবার জোরে জোরে পড়ে। তারপর একবার হাসে। একেবারে ছেলেমানুষ।

এবার হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠলে তুমি দাঁড়াও। গল্প কোরো না। গল্প করলে কপি করায় ডিসটার্ব হয়। ওখানে বোসো চুপ করে।

আমি গিয়ে খাটে বসলাম। যেন আমিই এতক্ষণ গল্প করছিলাম।

তুমি একমনে কপি করছ। ধীরে ধীরে যত্ন করে। পিছনে জানলার মরচে পড়া জাফরির দিকে তোমার চুলকে উজ্জ্বল ধূসর করে তুলেছে বিকেলের রোদ। একবার মুখ তুলে তাকালে আমার দিকে। অকারণ হাসলে। আবার কপি করতে শুরু করে বললে, 'ম' আর 'খ' কি করে তাড়াতাড়ি লেখার সময়ও আলাদা করা যায় আমি দেখিয়ে দেব তোমাকে। পুরো কবিতাটা কপি করা হয়ে গেল। এইবার বড় বড় চোখে চশমার ভেতর থেকে তুমি তাকালে আমার দিকে। দাঁড়াও, একবার পড়ে নিই। না, চেঁচিয়ে পড়লে না। মনে মনে পরে নিলে পুরোটা। তারপর আমার হাতে দিলে, নাও, দ্যাখো।

গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষর। ছাপাকে হার মানায়। আমার জড়ানো পেঁচানো পাণ্ডুলিপি থেকে উঠে এসে এ-কবিতাকে আমারই নতুন লাগে। তুমি বলো, ঠিক আছে?

আমি বলি, কি সুন্দর! লেখাটার যেন পুনর্জন্ম হল।

তুমি বলো, আর [illegible]

আমি ঢাকতে চাই, না না, আর কী হবে? একটাই তো যথেষ্ট। দেখি না, দেখি আর

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আছে কি না, বলে টেবিলের সামনে কাগজপত্র সরিয়ে দেখতে থাকো তুমি। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করি, আবার করিও না, শেষ পর্যন্ত নিজেই হাত লাগিয়ে একটা ছোট লেখা বের করে দিই। এই নাও, এটা যদি পারো।

দাও দাও। পারব না কেন?

চোখের নিমেষে যেন ওই ছোট কবিতাটি কপি করা হয়ে যায় তোমার। আবার এগিয়ে দাও আমার দিকে। দ্যাখো, পছন্দ?

সে কি! এমন সুন্দর হস্তাক্ষর তোমার? পছন্দ হবে না? এবার আর প্রুফেও কোনো ভুল থাকবে না।

তুমি বলে ওঠো, জানো তো শ্যামলজেঠু বলে আগে নাকি শ্যামলজেঠুর লেখার প্রুফেও অনেক ভুল বেরত। আমি কপি করে দেওয়ার পর থেকে আর ভুল থাকে না।

বাইরে বিকেল নেমে গেছে, রোদ হেলিয়ে ঢুকেছিল জানলা দিয়ে। এবার চলে যাচ্ছে। তুমিও উঠে পড়েছ। চলে যাচ্ছ। আমিও পায়ে চটি গলিয়ে এগিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তুমি এটা ওটা বলে যাচ্ছ, আর আমি ভাবছি, যে কবিতা দুটো তুমি কপি করে দিলে, যার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর তুমি স্পর্শ করলে, সে কবিতা দুটি তোমাকে, কেবল তোমাকে, তোমাকে নিয়েই, তোমাকে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েই লেখা সে কথা তুমি বুঝতেও পারলে না। তুমি এক একটা লাইন কপি করছ, আর আমি মনে মনে থরথর করে কাঁপছি। তুমি কি বুঝতে পারবে? এক একবার চশমার নিচে থেকে সোজা চোখ মেলে ধরছ আমার মুখে। আমি চমকে উঠছি, এই বোধহয় তুমি বুঝতে পেরেছ। না, তুমি বলছ অন্য কথা। শ্যামল চৌধুরীর কবিতা কপি করার কথাই বলছ তুমি। বলছ আমার 'ম' আর 'খ' কেমন একরকম। আমি মনে মনে অপেক্ষা করছি। আর ভাবছি, যদি বুঝতে পারো? কিছু বলো যদি? কী বলতে পারো তাই অনুমান করছি। এই ভাবতে ভাবতেই তোমার কপি করা শেষ হল। তুমি উঠে পড়লে। তোমাকে এগিয়ে দিলাম। তুমি বুঝতেও পারলে না। আমার ভয় কেটে গেল। তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। ফিরে আসছি। ভয় কেটে গেছে আমার। একটা পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। পরীক্ষাটা উতরে গিয়েছে। কি নিশ্চিন্ত লাগছে তুমি বুঝতে পারোনি বলে। আর কি হতাশও যে লাগছে। কি অন্ধকার লাগছে। শরীরটা টেনে যেন ফিরতে পারছি না, হঠাৎ এত ক্লান্ত লাগতে শুরু করেছে।

পাঁচ

সেদিন আমাদের একজন দেখেছে, জানো? বলে তুমি চোখটা অদ্ভুতভাবে ঘুরিয়ে নিলে। তোমার মুখে চাপা হাসির আলো পড়ল।

—কোনদিন? আমি অবাক।

—ওই যেদিন বাইপাসের ধারে বৃষ্টি এল, আমরা দৌড়ে গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম, সেদিন।

—কে দেখেছে? তোমার বাবা?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—ধুৎ। তুমি ঠোঁটটা উলটে দিলে। বাবা দেখল তো বয়েই গেল। কত বন্ধু আমার। আরও কারও সঙ্গে আমি বেরতেই পারি। বাইপাসের ধার দিয়ে দৌড়োতেই পারি। কী হয়েছে তাতে।

—তাহলে? আমি কিছু বুঝতে পারি না।

আমরা আজ ময়দানের দিকে এসেছি। আমি একটা নাটক দেখতে যাব। তুমি সিনেমা ভালোবাসো, নাটক নয়। তুমি বাড়ি চলে যাবে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ময়দানের একটা গাছের নিচে। বড় রাস্তা দিয়ে পরপর গাড়ি চলেছে। তুমি বললে, ওই যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, তার মধ্যেও কোনো একটায় থাকতে পারে। আজও দেখতে পারে আবার।

কে? কার কথা বলছ তুমি?

তুমি বললে, শ্যামলজেঠু। শ্যামলজেঠু বলছিল।

ক্ কী? কি বলছিলেন? আমি কেন জানি না, একটু চমকে যাই।

বলছিল যে, দেখেছে। আমাদের। তোমাকে আর আমাকে। চলো এবার।

বলে তুমি শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করো।

আমি তোমার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলি, কী বলছিলেন?

বলছিল যে, বাইপাসের ধারে আমরা দুজন বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে যাচ্ছি, সেটা দেখেছে।

—কী বললেন? আমার আর কৌতূহল ফুরোয় না। আমাকে কি চিনতে পেরেছেন?

—খুব পেরেছে। তোমার নাম করে বলল তো।

—নিশ্চয় খুব রাগ করলেন আমার সঙ্গে দেখে?

—কেন রাগ করবে কেন? বরং তোমার সম্বন্ধে খুব ভালো ভালো কথাই তো বলল।

—ভালো কথা? আমি আবার অবাক!

—হ্যাঁ, নয় তো খারাপ কথা বলবে নাকি? তুমি কি খারাপ যে খারাপ বলবে খামোখা? অবশ্য মাঝখানে এমন একটা কথা বলল, আমার রাগ ধরে গেছে।

—কী বললেন,

—বলে, তোমার বয়ফ্রেন্ড বুঝি? কী বোকা বোকা ব্যাপার। আমি বলে দিয়েছি, তুমি জানো না শ্যামলজেঠু আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল সম্বিত আর ওর সঙ্গে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে? তখন বলছে, হ্যাঁ জানি।

আমি পাথরের মতো ঠান্ডা। তোমার পাশে যে হাঁটছে সে আমি নয়। আমার মড়া।

কে সম্বিত? এর কথা আমি শুনিনি কখনও। ব্রেকআপ হয়ে গেছে? তাও শুনিনি। আকাশে, সন্ধেবেলা যেমন দিগন্তপ্রান্তে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, কিন্তু ঝড়বৃষ্টি হয় না, তেমনই সেই সম্বিত তোমার আমার মাঝখানে একবার ঝলক দিয়ে গেল।

—শ্যামলজেঠু তোমার খুব প্রশংসা করল।

—তাই? শুকনো গলায় বলি আমি।

—বলল, ছেলেটি খুব ভালো লেখে। শক্তি আছে লেখার। প্রতিভাবান। এই সব বলল।

~ www.amarboi.com ~

আমি কোনোমতে বলি, উনি খুব উদার। আসলে আমার বন্ধুরা এখন খুব ভালো লিখছে।

—সেটাও তো বলল। অনেকে আছও তোমরা। তবে স্পেশালি তোমার কথা বলল। ছেলেটি খুবই ট্যালেন্টেড। আমি তোমার হয়ে ঝগড়া করেছি জানো?

—ঝগড়া করেছ। সে কী কথা? কী নিয়ে ঝগড়া করেছ!

—আমি বলে দিয়েছি, এত যদি ট্যালেন্টেড মনে করো, তাহলে ওর লেখাগুলো নিয়ে ছাপাও না কেন তোমাদের ম্যাগাজিনে। তোমরা তো লেখা ছাপালে অনেক টাকা দাও শুনেছি। ওর টাকার দরকার। তাছাড়া, এও বলেছি, ওকে ডেকে নিয়ে তোমাদের চাকরি দেওয়া উচিত। কতরকম লেখার কাজ থাকে তোমাদের।

—এসব কথা বলতে তোমায় কে বলেছে? কেন বলতে গেলে তুমি, আমাকে কিছু না বলে?

—ঠিক করেছি। বললাম, ওর বাড়ির দেওয়াল থেকে চুন-বালি খসে যাচ্ছে, সারাতে পারছে না। আজ একটা চাকরি ধরে, তো কাল ছেড়ে দেয়। শ্যামল জেঠু তুমি যদি মনে করো ও ট্যালেন্টেড তা হলে ওর ভালো কিসে হয় তাও তোমার দেখা উচিত।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি গাছের নিচে। সামনে দিয়ে একটার পর একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। বিকেলের ময়দানে রোদ মরে আসছে।

তুমি আবার কথা শুরু করো, কী হল, চলো। তোমার ওই নাটক শুরু হয়ে যাবে না?

দেরি আছে। সাতটায়।

তুমি হেসে বললে, শ্যামলজেঠু খুব ঘাবড়ে গেছে। বলেছে, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই কাউকে। তবে লেখা দিতে তো বলেছিলাম, ও আমাকে লেখা দেবে না। তাই? তুমি শ্যামলজেঠুকে লেখা দেবে না?

—না, মানে, ঠিক তা নয়।

—শ্যামলজেঠু বলল, ওরা তো আমাকে পছন্দ করে না। লেখা দেবে না। তাই? শ্যামলজেঠু নাকি তোমার কাছে চেয়েছিল কবিতা? তুমি দাওনি।

—দিইনি নয়। হয়ে ওঠেনি এখনও। কী লেখা যে দেব ঠিক করতে পারি না।

—কেন এত জায়গায় যে দাও শ্যামলজেঠুদের দিতে কী হয়েছে। কত লোক পড়বে।

—কত জায়গায় দিই মানে সেসব তো বন্ধুদের কাগজ। ওরা বাড়িতে আসে, জোর করে পড়ে। নিয়ে যায়।

তুমি হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাও, তোমরা সত্যি শ্যামলজেঠুকে পছন্দ করো না বুঝি? কেন?

না, না, করি তো। ওঁর আগেকার লেখা তো ভালো। মানে খুবই ভালো।

—এখন যা লেখে তা ভালো নয়? আচ্ছা বেশ ভালো নয়। তাতে লোকটার কী দোষ? তুমি যা লেখো সব বুঝি খুব ভালো? তাই? তোমার বন্ধুরা যা লেখে? সব ভালো?

—না, মানে তা বলছি না।

~ www.amarboi.com ~

—আমি তো কবিতা কিছু বুঝি না। শ্যামলজেঠুর কবিতা কপি করে দিতে দিতে যতটুকু পড়া। কবিতার ভালোমন্দ কিছু বুঝি না। শ্যামলজেঠু বলে, ও নিজে বুঝতে পারে না ভালো হল না খারাপ হল লেখাটা। শ্যামলজেঠু বলে, একটা কবিতা ১০ লাইন লেখার পরও নাকি শ্যামলজেঠু জানে না ১১ নম্বর লাইনটা কীভাবে আসবে। এইসব বলে। বলে, অন্ধকার রাস্তায় হাঁটার মতো। এতদিন লিখে যাওয়ার পরও বুঝতে পারে না। বলে, ওই জন্যই তো অত কাটাকুটি করে লেখার মধ্যে। দ্যাখো না। তোমার কপি করার সময় দ্যাখো না। যদি বুঝতেই পারতাম কবিতাটা কেমন করে লিখতে হবে তবে কি কাটাকুটি করতাম। একবারেই তো লিখে ফেলতাম।

আমি বলি, ঠিকই তো বলেছেন।

—তোমরা বুঝতে পারো সব না? লেখার আগেই? তুমি আর তোমার বন্ধুরা? তাই তোমাদের সব লেখা ভালো হয়।

—আমি থতমত খেয়ে যাই। না, না, না। তা ঠিক নয়।

—দিয়ো না একটা লেখা শ্যামলজেঠুকে। কী হয়েছে তাতে? মুখটা কেমন করে বলল আমাকে। আমাকে তো ওরা পছন্দ করে না। আমাকে বলেছে, তোমার কাছ থেকে লেখা এনে দিতে! দেবে? বলো? দেবে তো?

—হ্যাঁ। নিশ্চয় দেব। উনি বলেছেন বলেই দেব। একদিন গিয়ে দিয়ে আসব।

খুশিতে ঝলমল করে উঠল তোমার মুখ। তবে জানিয়ে যেও। ফোন করে। জেঠিমা আর টুবুল তো এখন নেই। রাজস্থানে বেড়াতে গেছে। শ্যামলজেঠু এখন একা। কিছু ঘরের কাজ জানে না। আমাদের বাড়ি এসে খাচ্ছে এখন। কাজের বউটাও চলে গেছে হঠাৎ।

তাই নাকি! উনি বুঝি রান্নাটান্না করতে জানেন না।

কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। তবে শোনো আমি কিন্তু কিছু বলব না। তুমি হঠাৎ লেখাটা নিয়ে গিয়ে শ্যামলজেঠুকে অবাক করে দেবে, কেমন?

আচ্ছা, বেশ। কিন্তু তুমি যেন ওইসব চাকরি চাকরি কিছু আর বলতে যেও না। কোনো পত্রিকায় আমি চাকরি করতে চাই না।

আচ্ছা বাবা। আচ্ছা। বলব না আর।

হঠাৎ বলতেই বা গেলে কেন বলো তো?

হেসে ফেললে তুমি। বলব না কেন? রাগ হয়ে গেল যে। ওই যে বয়ফ্রেন্ড বলল। তুমি কি আমার বয়ফ্রেন্ড যে বলবে ও কথা।

সূর্য পাটে নেমে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে এসে পৌঁছেছি। রাস্তায় ট্রাফিকের স্রোত। দিন মরে এসেছে বলে হেডলাইটের আলো বোঝা যাচ্ছে। তোমার নাটক শুরু হবে তো এবার?

চলো, আগে বাসে তুলে দিই তোমাকে।

কিচ্ছু দরকার নেই। দেরি হয়ে যাবে তোমার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ কী যেন হয় আমার মধ্যে। মরিয়া হয়ে বলি, যাবে আমার সঙ্গে? চলো না, নাটকটা দেখি।

—কী নাটক?

—নির্ণয়। একজন গণিতজ্ঞ আর তার মেয়েকে নিয়ে গল্প। আমি আগে একবার দেখেছি। খুব ভালো।

—বাব্বা! ধৈর্য আছে তোমার। একবার দেখেছ। আবার যাচ্ছ? ধুস্। নাটক দেখতে মোটে ভালো লাগে না আমার।

—ও। ঠিক আছে। আমি নিজে যাই।

—রাগ করলে গেলাম না বলে? আসলে শ্যামলজেঠু না সন্ধেবেলা একটু যেতে বলেছে। বললাম না, জেঠিমারা নেই। আমি গিয়ে একটু হেল্প করে দেব। আমাদের বাড়িতে মা-ও নেই। ছোটমাসির ওখানে গেছে কদিনের জন্য। আমি রান্না করে দেব আর কি! বুঝেছ তো? নইলে যেতাম।

—না, না, সে ঠিক আছে। আমি তাহলে এগোই।

তোমাকে পিছনে রেখে ক্যাথিড্রাল রোড ধরে আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের দিকে হাঁটতে থাকি আমি।

ছয়

তিনদিন পরের কথা। সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি হয়ে বিকেলে থেমেছে। রাস্তায় একটু একটু জল জমে আছে। আমি এসে পৌঁছোলাম। শ্যামল চৌধুরীদের ফ্ল্যাটবাড়ি ওই অঞ্জলির সামনে। পকেটে দুটো কবিতা, আগের রাতে লেখা। দুপুরে বৃষ্টির সময় ঘরে বসে কপি করে নিয়েছি। হ্যাঁ, শ্যামল চৌধুরীকে আমি লেখা দেব। সিনিয়র কবি। বলেছেন। নিশ্চয়ই দেব। কাউকে আমার অকারণ দুঃখ দিতে ইচ্ছে করে না। উনি বলেছেন, আমি ওঁকে পছন্দ করি না। এ কথা সত্যি নয়। ওঁর কথায় একটা মর্যাদা রাখার জন্য এনেছি কবিতা দুটো। আমাদের লেখা অত খুঁজে খুঁজে না পড়লেও তো ওঁর চলে যেত। আমি তো শ্যামল চৌধুরীকে কখনও বই দিতে যাইনি। কিন্তু উনি নিজেই আমাদের বই, পত্রিকা, সব খুঁজে খুঁজে নিজের কাছে রেখেছেন। উনি অবশ্য আমাকে আসবার আগে ফোন করতে বলেছিলেন, নম্বরও দিয়েছিলেন। কিন্তু ফোনে ওঁকে আজ পাইনি। যতবার ফোন করি বলে এই নম্বরে পরিষেবা আপাতত বন্ধ আছে। এদিকে আমারও কেমন ঝোঁক চেপে গেল আজই শ্যামল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে ওঁকে লেখা দেব। চলে এলাম।

চারতলায় থাকেন। আগে তো এসেছি। আজ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি দরজাটা অল্প খোলা। বেল দিলাম। কোনো আওয়াজ হল না। আবার দিলাম। আবার। প্রতিবারই একই নৈঃশব্দ্য। বেল বাজছে না। মেঘলা বিকেলের আলো চারিদিকে। অদ্ভুতভাবে সব চুপচাপ।

ওঃ বুঝেছি। নিশ্চয়ই লোডশেডিং চলছে। লোডশেডিং হলে তো বেল বাজবেই না। ঠিক।

~ www.amarboi.com ~

দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে ভেতরে এলাম। আগের দিনের চেনা ঘর। অনেকটা জায়গা। ডাইনিং কাম ড্রইং যাকে বলে। ছোটো একটা খাবার টেবিল। টেবিলের চেয়ারে দু-তিনটি বই রাখা। আগের দিন দেখেছিলাম বটে। খেতে খেতে শ্যামল চৌধুরীর বইয়ের পাতায় চোখ রাখার অভ্যেস আছে। সামনের ছোটো কাচের টেবিলে খবরের কাগজ, লিট্‌ল ম্যাগাজিন, সাময়িকপত্র রাখা। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। সামনেই রান্নাঘর। সেটাও ফাঁকা। অন্যদিন সেখানে একজন কাজের বউকে টুকটাক কাজ করতে দেখেছি। কী ব্যাপার। দরজা খুলে রেখে সবাই বেরিয়ে গেল নাকি?

পায়ের কাছে কি একটা নড়ল।

তাকিয়ে দেখি, বড় একটা খাতার পৃষ্ঠা জানলা দিয়ে আসা ভেজা বাদলা হাওয়ার ঝোঁকে একটু বেঁকে ঘুরল। তুলে নিলাম।

অজস্র কাটাকুটি ভরা একটা পৃষ্ঠা। কবিতা কি? হ্যাঁ কবিতাই। লাইন সাজানো আর স্তবক ভাগ দেখে বোঝা যায় কবিতা। এ-ই তাহলে শ্যামল চৌধুরীর পাণ্ডুলিপি? নতুন কবিতার? কিন্তু পড়ব কী করে? আলো কম। তাতেও পড়া যেত, কিন্তু অসম্ভব জড়ানো হস্তাক্ষর। দুর্বোধ্য শব্দগুলো একটা যদি অনুমান করলাম তো পরেরটা সব আন্দাজের বাইরে। প্রচণ্ড দ্রুত লিখে যাওয়া, সেটা বোঝা যায়। কাগজটা হাতে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। শ্যামল চৌধুরী কি লিখছিলেন? তারপর অন্যমনস্কভাবে দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছেন? কাগজপত্র ঠিকমতো চাপা দিয়ে যাননি? অথবা লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন কি? এই পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাটি হাওয়ার ধাক্কায় দরজা দিয়ে উড়ে যেতেও তো পারত?

পাশাপাশি দুটো ঘর। এক পা এগোতেই প্রথম ঘরটা চোখে পড়ল। ফাঁকা, কেউ নেই। অন্য ঘরটির দরজার সামনে মেঝের ওপর হাওয়ার ঝাপটায় ভেসে এল আর একটি পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা। তুলব বলে এগোলাম। তুলতে পারলাম না। সামনে একটি শব্দ পেয়ে আমি স্থির।

দ্বিতীয় ঘরের মাঝামাঝি আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে। তোমার পিঠ সম্পূর্ণ খোলা। ছাইরঙা একটা সালোয়ার শুধু। পিঠে শ্যামল চৌধুরীর রোগা লম্বা ফরসা আঙুলগুলো ঘুরছে। হাতের তালু ঘষে ঘষে ভূপতিত কোনো অন্ধ মানুষের মতো মাটি হাতড়াচ্ছে যেন। আঙুলগুলো আসলে তোমার কালো অন্তর্বাসের হুক খুলতে চেষ্টা করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। ঝুলন্ত বিনুনি বাধা দিচ্ছে যে। শ্যামল চৌধুরীর অবকাশ নেই তোমার পিঠের দিকে এসে চক্ষু রাখবার, কারণ তিনি তোমার সঙ্গে প্রবল ও অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী এক চুম্বনে আবদ্ধ।

তাঁকে সাহায্য করার জন্য তুমি অনায়াস তৎপরতায় নিজের ডান হাত পিঠের দিকে ঘুরিয়ে এনে হুক খুলে দিলে। আর আশ্চর্য, কেমন যেন ককিয়ে কেঁদে উঠলেন শ্যামল চৌধুরী। প্রথম থেকেই আমি তাঁর ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ পাচ্ছিলাম আবছা অস্পষ্ট ভাবে। অদ্ভুত! এই লোকটা আদর করতে করতে কাঁদে। কি অদ্ভুত! শ্যামল চৌধুরীর মাথা তোমার ঠোঁট ছেড়ে বুকের দিকে নেমে এল। তুমি অন্তর্বাসটি হাত গলিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে

~ www.amarboi.com ~

দুহাতে ওঁর মাথাটি বুকে আঁকড়ে নিলে যেন এক শিশুকে সামলাচ্ছ। আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন শ্যামল চৌধুরী। কাঁদে না। ছিঃ, এইসময় কাঁদতে হয় না। এ্যাই ছেলে। এ্যাই...ঘন ঘন নিশ্বাস মিশিয়ে বলা তোমার এই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি। মেঝের ওপর তোমার অন্তর্বাস আর হাওয়ায় অল্প অল্প নড়াচড়া করা ছড়িয়ে রাখা পাণ্ডুলিপি। দেওয়ালে ছুঁইয়ে রাখা বড় একটা খাটের ওপর কোমর ভেঙে এলিয়ে পড়ছ তুমি।

আরে! এ আমি কী করছি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছি আমি? কী দৃশ্য দেখছি?

চকিতে পিছিয়ে আসি। পা টিপে টিপে তিন-চার পদক্ষেপে দরজায় যাই। বেরোতে গিয়ে খেয়াল হয় হাতে সেই কাগজপৃষ্ঠা—শ্যামল চৌধুরীর নতুন কবিতার পাণ্ডুলিপি! কী করব? কী করি? খাবার টেবিলের পাশের চেয়ারের ওপর কাগজটা রাখি। বই নিয়ে সন্তর্পণে চাপা দিই। দ্রুতই সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে আসবার পর মনে হয় ওরা দরজা খোলা রেখেছে। আমার বদলে যদি অন্য কেউ আসত? যদি এর পর আসে? এসে পড়ে? ওদের তো এখন বাহ্যজ্ঞান নেই যে উঠে বন্ধ করবে। দ্রুত উঠে যাই ফেলে আসা কয়েক ধাপ। খুব ধীরে ধীরে দরজাটা টানি। শেষমুহূর্তে 'ক্লপ' করে একটা শব্দে লক লেগে যায়। ওইটুকু শব্দ আটকানো গেল না বলে আমার সিঁড়ি দিয়ে নামার গতি বেড়ে যায় দ্বিগুণ। কয়েক সেকেণ্ডে আমি রাস্তায় এসে পড়ি।

যাক। কেউ দ্যাখেনি আমায়। শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি থেকে যথাসম্ভব দ্রুত দূরে সরে যেতে থাকি। সামনে একটা খালি রিকশা। সেই, ছাদঢাকা রিকশা। উঠে পড়ি।

সাত

সেই বিকেলের ঘর তারপর থেকে বুক ভেঙে ঢুকে পড়তে লাগল। তোমাকে কিছু জানতে দিলাম না। তুমি কোথাও এতটুকু মলিন হওনি আমার কাছে। কিন্তু আমি যে তোমার কেউ নই, কিছু নই, তা আজ জানি। সত্যিই কি নই? আর তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছিলে?

একদিন বললে, তুমি কি এর মধ্যে গিয়েছিলে শ্যামলজেঠুর বাড়ি? যেদিন খুব বৃষ্টি হল?

চমকে উঠি, কই না তো!

পাশের ফ্ল্যাটের মিষ্টুদি বলল, তোর বন্ধুকে দেখলাম যেন। এল, আবার চলে গেল।

কোন বন্ধু আবার?

ওই যে, যে ছেলেটাকে তোর সঙ্গে দেখি। মনে হল—ও-ই।

না তো, আমি যাইনি।

কি জানি কাকে দেখতে কাকে দেখেছে।

হঠাৎই, যেন খুব মজার কথা বলছ, এভাবে হেসে তুমি বললে, জানো তুমি একবার শ্যামলজেঠুর বাড়ি গিয়েছিলে, তখন আমিও ছিলাম শ্যামলজেঠুর বাড়ি—কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।

সে কী! এমন হয়েছিল নাকি? কবে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেশ অনেকটা আগে। তখন তোমার সঙ্গে আমার এতটা...মানে এখনকার মতো জানাশোনা ছিল না।

সে টা কবে? প্রথমদিন?

না, না—প্রথমদিন তো তোমার সঙ্গে দেখাই হল। প্রথম দেখা, তাই না? বলে তুমি আবার হাসো। খুব হাসো।

আমি মনে মনে বলি—আর নয়, আর নয়—বুবুলটি উড়ে যাও! এই বার উড়ে যাও।

তুমি বলে চলো, ওই যে বৃষ্টির মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি দুবার লেখা হয়ে গেল? ভিজতে ভিজতে? আমরা একটা ছাদ-ঢাকা রিকশা করে এলাম? মনে পড়ছে?

হ্যাঁ। পড়ছে।

উত্তর দিচ্ছি। কিন্তু আমি তোমার মুখের দিকে তাকাচ্ছি না। তোমার কাঁধের পাশ দিয়ে জানলার বাইরে গাছের ডালে কী যেন খুব মন দিয়ে দেখছি।

আহ্, শোনো না। ওই দুদিন দেখা হওয়ার ঠিক পরপরই একদিন তুমি গেলে? শ্যামলজেঠুর বাড়ি? গিয়েছিলে না? বলো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তো।

বলতে পারছি না, গিয়েছিলাম, সে তো শুধু তোমাকে যদি একবার দেখতে পাই, এই আশা নিয়ে। খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল তোমাকে।

মুখে বলি, সেদিন তো উনি কোথায় যেন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। দত্তপুকুর না ওইরকম কোথায় যেন!

কচু! কো-ও—ও—চু-উ—বলতে বলতে তুমি আবার হাসিতে ভেঙে পড়ো। শ্যামলজেঠু তোমাকে কাটাবে বলে বলল ওরকম।

আমি অবাক! কিন্তু আমি তো এমনিতেই চলে যেতাম।

হ্যাঁ। যেতে। ঠিকই। কিন্তু শ্যামলজেঠু তো আমাকে দিয়ে উপন্যাস কপি করাচ্ছিল তখন। তাই তর সইছিল না। খুব ইমপেশেন্ট তো। যদি বলি, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি? বলবে, না, তুমি পালাচ্ছ না, কিন্তু উপন্যাস পালিয়ে যাচ্ছে। বাক্য পালিয়ে যাচ্ছে। যাও না, ধরো শিগগির! ধরো! এমন করবে না! বাব্বা...

আমি চুপ করেই থাকি।

তুমি আবার বলো, আমি তো ভেতরের ঘরটায় বসে কপি করছিলাম।

তুমি ভেতরের ঘরে ছিলে?

ছিলামই তো! ওই ঘরটা তুমি কখনও দ্যাখোনি। ঘরে কেউ থাকলে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

আমার তো মনে হল, বাড়িতে কেউ নেই।

আমি ছাড়া কেউ ছিল-ই না তো। টুনি-দির সেদিন তাড়া ছিল। কাজ করে শ্যামলজেঠুর খাওয়া হতেই আগে আগে চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি বুঝতে পারিনি তুমি বা অন্য কেউ ছিল বাড়িতে।

~ www.amarboi.com ~

আহ্। আমি তো কপি করছিলাম। আমি কিন্তু তোমার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। আর খুব ইচ্ছে করছিল হঠাৎ তোমার সামনে এসে দাঁড়াই। একটু কথা বলি তোমার সঙ্গে। হঠাৎ আমাকে দেখলে চমকে যেতে না? বলো, যেতে না?

মুখে বলি। যেতামই তো?

মনে মনে আবার বলি, আর নয়, আর নয়—বুবুলটি, উড়ে যাও।

আর আমার মনে ফিরে ফিরে আসে সেই তোমার খোলা পিঠ আর শ্যামল চৌধুরীর গুমরে ওঠা কান্না। কীভাবে কোলের শিশুর মতো ওঁকে তুমি আঁকড়ে নিয়েছিলে বুকে, ফিরে আসে তাও। আদরের সময় ওইভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারে কোনো মানুষ আমি জানতাম না। তোমাকে দেখলেই এখন আমার প্রচণ্ড একটা কষ্ট হয়, চাপা একটা কষ্ট, কিন্তু আমি তা গোপন করে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকি তোমার দিকে। ফোনে তোমার গলা শুনলেই দমবন্ধ হয়ে আসে আমার। ভাবি কখন তুমি ফোনটা রাখবে। কারণ যতক্ষণ তুমি কথা বলো আমার মনে পড়ে তোমার বিনুনিটা দুলছে আর হুক খোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছে শ্যামল চৌধুরীর রোগা রোগা আঙুলেরা। আজকাল আমি অনেক সকালে বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে। কোথায় যাই? যেদিকে দু-চোখ যায়। একটা প্রাইভেট ফার্মে ঢুকিয়ে দেবে বলেছে এক বন্ধুর বন্ধু। সকালে বেরিয়ে যাই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি সারাদিন। কখনও কোনো বন্ধুর অফিসে আধঘণ্টা বসছি তারপর খুব তাড়া আছে বলে উঠে গিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে কাটাচ্ছি দুপুর আর আমার ফাঁকা বাড়িতে তোমার ফোন বেজে যাচ্ছে। বেজে যাচ্ছে। আমার কোনো মোবাইল নেই। কি ভালো আমার কোনো মোবাইল নেই। তা সত্ত্বেও রাতে কখনও তোমার ফোন এলে বলছি, চাকরির চেষ্টায় ঘুরছি। মায়ের রিটায়ার হওয়ার সময় হয়ে এল। আর ছ-মাস বাকি। শুনে তুমি চুপ করে থাকছ। আমাদের চুন-বালি খসা জরাজীর্ণ বাড়ি দেখে যেমন চুপ করে থেকেছ। তোমার আসা-যাওয়া কমছে। একটু একটু করে কমছে।

তাও মাঝে মাঝে আস। শ্যামলজেঠুর গল্প করো। লেখা দেওয়ার কথাও তুলেছিলে। বলেছি, পাঠিয়ে দিয়েছি তো। পোস্ট করে পাঠিয়ে দিয়েছি শ্যামল চৌধুরীর অফিসের ঠিকানায়। তুমি বিশ্বাস করেছ। যদি পরে আবার বলো, তা হলে বলব আগেরটা হয়তো পায়নি। আবার পাঠাচ্ছি। কিন্তু একবারও পাঠাব না।

আমি বলেছি অনিন্দ্য আমাকে নিয়ে যাবে, বা অদীপ বা অর্ক, নতুন আর একটা চাকরির চেষ্টায়। আজই যেতে হবে। তুমি সামনে বসে থাকলে একটা পাথর বসে থাকে আমার বুকে। চোখে জল আসতে চায় বারবার। আমি অনেক পুরোনো ধরনের মানুষ আসলে, বুঝতে পারি, চেহারাটা শুধু নতুন। সমস্ত কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা চেপে রাখার চেষ্টা করি। আর কী হবে ভেবে? এ কথা নিজেকে বলি, তবু কি এক-একদিন আমার মধ্যেও কোনো গোয়েন্দা জাগে না? জাগেই তো। সে কি কিছু জানতে চায় না? সে কি বলে ফেলে না...আচ্ছা, সেই প্রথম দিন, সেদিন আমি শ্যামল চৌধুরীর বাড়ি গেলাম, প্রথম...যেদিন তুমি সেই দরজায় এসে দাঁড়ালে...এই সেই খুব বৃষ্টি হচ্ছিল...সেদিন উনি কি যেন কপি করার জন্য বলছিলেন, না?

~ www.amarboi.com ~

তাই তো। তা-ই তো! বলছিল-ই তো। তোমার উৎসাহ জোরালোভাবে দেখা দেয়। কপি করাটাই তো শ্যামলজেঠুর কাছে আসল। মানে আমাকে দিয়ে ওই কপি করানোটা।

তা তো বটেই। তা তো বটেই। আমি ম্রিয়মাণ ভাবে বলি। যা বলি না, তা হল শ্যামল চৌধুরী নামটা পত্রপত্রিকায় ছাপার অক্ষরে দেখলেই আজকাল আমার প্রায় একটা শারীরিক কষ্ট হতে থাকে। মনে হয় যেন শ্বাস নিতে পারছি না।

না, না, তুমি শোনো। আসল ব্যাপারটা শোনো।

আমি শুনতে চাই না। জানতে চাই না। বুবুলটি, তুমি উড়ে যাও। আর একটা কথা বলবার আগে এই ঘর থেকে, আমাদের এই পাড়া থেকে আমার সমস্ত স্মৃতি থেকে তুমি যতদূরে খুশি উড়ে যাও। এক্ষুনি! এক্ষুনি!

তুমি বলে চলো, আসল ব্যাপারটা হল, কপি করবার সময় শ্যামলজেঠু লেখাটা আবার অনেকটা নতুন করে লিখতে থাকে। মানে, মুখে মুখে বলে যেতে থাকে।

এটা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে, বলি তা-ই। তাই আবার হয় নাকি?

হয়ই তো। মুখে মুখেই তো বলে। আমি লিখে নিই। অনেকটা জায়গা এভাবেই লেখে তো।

এতটা আমি আন্দাজ করিনি কিন্তু।

তখন যদি বাড়ির মধ্যে কথাবার্তা হয়, ফোন আসে, দরজায় বেল বাজে, লোকজন আসা যাওয়া করে তাহলে তো শ্যামলজেঠুর কাজের ডিসটার্ব হয়। তাই বাড়িটা ফাঁকা রাখতে হয় তখন, বুঝেছ?

আমার মনে পড়ে। সেই প্রথম দিন। থেকে থেকেই কেমন অধৈর্যভাব কেমন সব অজানা চঞ্চলতার রেখা ফুটে উঠেছিল শ্যামল চৌধুরীর মুখে। কিসের জন্য যেন একটা চাপা উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা। হয়তো সেটা তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছে। হয়তো অসমাপ্ত লেখাটির না-লেখা লাইনগুলো হঠাৎ হঠাৎ মনে এসে যাওয়া। লেখা কপি করা হয়তো ওঁর কাছে লেখার জন্ম দেওয়াই। লেখা কপি করা আর শারীরিক মিলন দুটোই কেমন একাকার হয়ে আছে ওঁর কাছে।

কিন্তু তোমরা সাবধান ছিলে না। যদি কারও চোখে পড়ত। আমি ছাড়া অন্য কারও চোখে? আমার বলতে ইচ্ছে করে বুবুলটি, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিতে ইচ্ছে করে। একবার যদি জানাজানি হয়, তার থেকে যে আগুন জ্বলবে, সে আগুনে পুড়ে যাবে শ্যামল চৌধুরীর যাবতীয় লেখাপত্র, তোমারও জীবন ঝলসে যাবে। সাবধানে থেকো। বলতে ইচ্ছে করে। পারি না। বদলে তুমি বলে ওঠ ইস্‌স্। দত্তপুকুর! কি গুলটাই না তোমাকে দিল শ্যামলজেঠু। বলতে বলতে আবার হাসিতে ভেঙে গড়িয়ে পড়ো তুমি। আর তোমার ওই আশ্চর্য হাসি, চতুর্দিক আলো করা, আকাশে রাশি রাশি সাদা মেঘে আর আমাদের পাড়ায়, তার পাশের পাড়ায় তারও পাশের পাড়ায়, পাঁচিলের ধারে ধারে সব শিউলি গাছে শরৎ এনে দেওয়া, রেললাইনের পাশে কাশফুল ফুটিয়ে দেওয়া ওই হাসি আমি দেখতে থাকি। আর দেখতে দেখতে ভাবি এসে পড়ুক, এসে পড়ুক—সেই দিনটা এসে পড়ুক

~ www.amarboi.com ~

যেদিন তুমি ছেড়ে যাবে আমাকে। ভাবতে ভাবতে ভেতরটা চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু তোমাকে এভাবে চোখের সামনে দেখা সে যে আরও অসহ্য! মনে মনে প্রার্থনা করি এসে পড়ুক সেইদিন। হয়ত আগামীকালই হবে সেইদিন। হয়তো তার পরের সকালে। কিংবা তার পরের দুপুরে হয়তো। যখন বলবে, আসব না আর। বলবে আর ফোন করব না কখনও। কিংবা হয়তো বলবেও না। যোগাযোগ না করতে করতে কখন যেন নিঃশব্দে মিলিয়ে যাবে শহরের ভিড়ের ভেতর। কি-ই বা এসে যায়।

তোমার দু-ডানা ধরে—'বুবুলটি উড়ে যাও' বলে, আমি তো মনে মনে তোমাকে উড়িয়ে দিয়েইছি।

শারদীয় প্রতিদিন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কড়ি ও কোমল

দ্রুত সাইকেল। দ্রুত। ভুবনডাঙার পাশ দিয়ে পিচ রাস্তা ধরে, সাইকেল। সাইকেলে একটি মেয়ে! রোগা লম্বা কালো। সাঁওতাল মেয়ে? বড় টিপ। বড় চোখ। বোলপুরের দিকে আসছে। দ্রুত সাইকেল। মেয়েটির চুলে ফুল নয়। একগোছা ধনেপাতা গোঁজা। কে মেয়েটি? না, না, সাঁওতাল নয়। বাঙালি। বাঙালি। কলাভবনের মেয়ে। বোলপুরের দিকে না গিয়ে, হঠাৎ সাইকেল ঘুরিয়ে, নেমে গেল মাঠে।

মাঠ, মাঠ, তুমি জানো সে কোথায়? মাঠ বলল, ওই তো, ওই যে, দেখতে পাচ্ছ না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছি,দেখেছি। ধন্যবাদ মাঠ। ঘাস ধন্যবাদ। ওই তো সে চলেছে।

সে চলেছে। মাথা নিচু করে হাঁটছে। কেবল ঘাসের দিকে চেয়ে। ঘাসে সকালের রোদ। সে একা চলেছে,তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে একটা গান। গিনা গিনা দে, দে রে, বামনা। গিনা গিনা দে। সাইকেল আসছে তার দিকে। সে খেয়াল করছে না। দে-রে-এ-এ বামনা। আ-জ-কা-ল, প-র-সোঁ গিনা দে...। মাথা নিচু। একটু ভারী মাথা, দুলছে, হাঁটার তালে না গানের ঝোঁকে কে জানে। হাত একটু উঠে গেল সুরকে যেন ধরবে। সাইকেল পাশে এসে গেছে এবার।

—অ্যাই! কোথায় যাচ্ছিস রে।

ছেলেটি ঘুরেছে।—আরে! চমকে দিয়েছিস।

—ও-ই মাঠের ওপার থেকে তোকে দেখে চলে এলাম।

—মাথায় ওটা কী গুঁজেছিস!

মেয়েটি হাসল। হাসলেও সাঁওতাল না হাসলেও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—ধনেপাতা। ভাল না?

—ভাল তো। ফুলের বদলে এতদিন পাতা লাগাতিস চুলে। এখন একদম ধনেপাতা?

—হ্যাঁ রে। রাস্তার ধারে চিনাভবনের গেটের ওদিকটায় একটা বউ বসেছিল শাক লঙ্কা ধনেপাতা নিয়ে।

—আর তুই এক আঁটি ধনেপাতা কিনে চুলে আটকে নিলি?

—হ্যাঁ রে! ওঠ এখন, সাইকেলের পিছনে ওঠ!

তুই বরং নাম। হেঁটে চল। এই ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করছে এখন আমার।

—বেশ বাবা। নামছি। তুই মাথা দুলিয়ে হাত-পা নেড়ে কী গাইছিলি?

—দেবগিরি বিলাবল।

—উফ! আবার সব শক্ত শক্ত নাম।

—শক্ত নয়। দ্যাখ। সা রে গ, রে,গ প ম গ, রে গ প নিধ নি র্সা র্সা—

—আবার শুরু করলি তোর সারেগামা? ওসব আমি বুঝি না।

—বুঝবি বুঝবি। মোটেই শক্ত নয়।

—কেমন সহজ দেখবি? ওই দ্যাখ। ঘাসে রোদ পড়েছে তো, গাছের পাতায়, পড়েছে? ওই সবই তো বিলাবল।

—পড়েছে। সে তো রোজই পড়ে। আর আমি রোজই দেখি। আর রোজই আঁকি। এঁকে-এঁকে এই রোদ্দুর শেষ করতে পারি না রে। এই গাছ পাতা ঘাস যত আঁকি, তত বেড়ে যায়। মনে হয়, আমি অনেক দূর দূর দৌড়ে দৌড়ে যাই, আর আঁকি। সারা পৃথিবীটা আঁকি। ধর, ধর, এই মাঠটা যদি মস্ত একটা ক্যানভাস হত আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে, বুকে হেঁটে হেঁটে, আঁকতাম! আমি বেশ সরীসৃপ হয়ে যেতাম। বেশ মাটির পোকামাকড় হয়ে যেতাম। আর আঁকতাম।

— সে তো তুই এমনিই আঁকছিস। তার জন্য পোকামাকড় হওয়ার কী দরকার? আজ ক্লাস নেই! যাবি না?

—দূর আজ যাব না। আজ কলাভবনে দিল্লির ললিতকলা থেকে কে যেন আসবে? বিরাট ঘ্যাম কেউ। আজ ওদিকে মাড়াবই না। অ্যাই, আবার গান শুরু করেছিস। আমার কথায় মন না দিয়ে গান!

—শুনছি তো তোর কথা কিন্তু গানটাও তুই একটু শোন।

—তোর খালি ওইসব খটোমটো গান। কালকে, কলাভবনের সৌমিতদারা একজন বাউলকে ধরে এনেছিল। কী সুন্দর গাইছিল রে লোকটা!

—ও হ্যাঁ দেখেছি। আমি তখন বাবাকে নিয়ে বাইকে যাচ্ছিলাম। দেখেছি, বুড়ো মতো একজন বাউল তো!

—অ্যাই। খবরদার বুড়ো বলবি না। খুব সুন্দর লোকটা। আমার ইচ্ছে করছিল তো ওর সঙ্গে চলে যাই। অজয়ের ধারে গিয়ে ওর সঙ্গে থাকি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—তাই? ইচ্ছে করছিল। হয়তো ভাল দেখতে। আমি তো বাইকে ছিলাম, একঝলক দেখেছি। তা কী গান গাইল?

ওই যে কী যেন। আমার ছাই মনে থাকে না। নদী ভরা ঢেউ।

—হ্যাঁ। নদী ভরা ঢেউ জানে না রে কেউ/তবু তরী কেন বাও বাও রে। ভবা পাগলার গান। ভৈরবী। বাট চলত মোরি চুনেরি রঙ্গদারি... দা-আ-রি...

—তোর গান থামা তো। আচ্ছা, এটা একজন পাগলার গান? ইস! কী বলিস! সেইজন্যই এত ভাল। ওই জন্যই ওর সঙ্গে আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। কাঁচা পাকা দাড়ির ফাঁকে লোকটা যখন হাসছিল, গান গাইতে গাইতে হাসছিল। কী মনে হচ্ছিল বল তো!

—কী আবার! ওর সঙ্গে চলে যাবি! বললিই তো!

—সে তো মনে হচ্ছিলই। ইচ্ছে করছিল ওর বোতাম-ছেঁড়া ফতুয়াটার বুকের কাছে গিয়ে মাথা রাখি!

— রাখলেই পারতিস!

—দূর আমি তো গান বুঝি না। গান জানি না। আমাকে ওই বাউল নেবে কেন? তুই সঙ্গে থাকলে বেশ হত। দু'জনে ওর সঙ্গে চলে যেতাম।

—দু'জন? এবার তুই আমাকেও মারবি দেখছি। কোথায় যেতাম শুনি?

—ওই যে, অজয়ের ধারে!

—অজয়ের ধারে কোথায়?

—সে তো জানি না। আমি গিয়ে বললাম তুমি এখন কোথায় যাবে? বলল, অজয়ের ধারে! আমি বললাম, কোথায় থাকবে? বলল, তা তো জানি না। অজয়ের ধারে কোথাও থাকব। গুরু যেখানে রাখবেন। বললাম, কালকে কোথায় ছিলে? কাল ছিলাম আমোদপুর। আজ আছি এই বোলপুর। রাত কাটাব অজয়ের ধারে। বলে, আবার হাসল। আর ও হাসলেই কী হয় জানিস!

—শুনলাম তো। বললি তো এক্ষুনি।

—কী বললাম।

—বললি যে, ওর বুকে গিয়ে মাথা রাখতে ইচ্ছে করে!

—তা তো করেই। কিন্তু ও হাসলেই আরেকটা জিনিসও মনে হয়।

—কী হয়, বল তাড়াতাড়ি। আমি এবার বাড়ি যাব।

—খবরদার নড়বি না। এখানে দাঁড়া। বাড়ি যাব বললেই তোকে সারাদিন এই মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখব। শোন আগে ওই বাউলের হাসিতে কী হয়।

—আচ্ছা বল বাবা। কী হয় বল?

—ও হাসলেই না চারদিকটা কেমন শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। [illegible] কেমন রোদ উঠে গেল মনে হল।

—এই তো। এই তো। এই তো। আমি তো তোকে সেটাই বলতে চাইছি তখন থেকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—তুই? তুই কী বলতে চাইছিস? তুই তো সেই বাউলকে দেখিসইনি!

—না না, শোন, আমি বলতে চাইছি রোদ্দুর। রোদ্দুর।

—মানে।

—আমি বলতে চাইছি শুদ্ধ। শুদ্ধ। সব শুদ্ধ। শুদ্ধ হয়ে গেছে।

—মানে? কী শুদ্ধ।

—সব স্বর শুদ্ধ। শোন, শোন সা রে গ, রে, গ প ম গ, রে গ প নিধ—

—ফের ওইসব শুরু করলি?

—দাঁড়া, দাঁড়া, সব স্বর শুদ্ধ বুঝলি তো।

এই মাঠের মধ্যে দিয়ে আসছিলাম। ঘাসে যে রোদ্দুর। গাছে পাতায় যে রোদ, ওই যে রুদ্রপলাশ লেখা বাড়ি, ওই রাস্তা, সব শুদ্ধ। সব শুদ্ধ।

—কী বলছিস রে!

—বলছি, এখন তুই যেদিকে তাকাবি সব শুদ্ধ পরদা। এখন তো বিলাবল-এর সময়। এখন সব শুদ্ধ পরদায় যাবে।

—যাবে মানে? কোথায় যাবে রে?

—যাবে মানে পড়বে। সব শুদ্ধ পরদায় পড়বে এখন। ওই ধর, পাতার গায়ে যে জলের ফোঁটা, ঘাসের মুখে যে শিশির— সব শুদ্ধ পরদায় পড়ছে।

—শিশির না। বৃষ্টি। কাল ভোরে বৃষ্টি হল না?

—হ্যাঁ। হল। কিন্তু ওই যে শিশির ওই যে বৃষ্টির ফোঁটা, দ্যাখ। সবই তো আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে। সব শুদ্ধ পরদায়।

—না না, ঝরে পড়েনি। কেউ ছিটিয়ে দিয়েছে বুঝলি! হিঃ হিঃ। কেউ, আমাদের চোখের আড়ালে ওপর থেকে, মেঘ থেকে, বাতাস থেকে, ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। ইস। মজা না!

—মজাই তো। শান্তিজল যেমন করে ছিটিয়ে দিতে হয়, তেমনি করে। কেউ ছিটিয়ে দিচ্ছে, আর সব শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, বুঝলি তো। গাছ, পাতা, ভুবনডাঙার হোটেলঘর। পূর্বপল্লির গেস্ট হাউস, সব শুদ্ধ। সব শুদ্ধ। গিনা গিনা দে। দে-রে-এ, বা-আ, ম-অ না-আ!

ছেলেটি মেয়েটিকে দেখা যায়, মাঠের শেষ প্রান্ত পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ছোট দেখাচ্ছে তাদের।

ছেলেটি গাইতে গাইতে চলেছে। মেয়েটির হাতে সাইকেল। রোদ্দুর আরও ছড়িয়ে পড়ছে চরাচরে।

আমার বই

চার

খোয়াই, খোয়াই তুমি জানো? ওরা কোথায়? জানি তো। ওরা এখানেই আসছে। এখন রাস্তায়। কোন রাস্তায়, খোয়াই? ওরা গোয়ালপাড়ার ভেতর দিয়ে আসছে। দু'জনেই সাইকেলে। কী বলছে, কী বলছে ওরা?

~ www.amarboi.com ~

শোনো, কান পাতো। শুনতে পাবে কী বলছে। মেয়েটি বলছে,

—তুই জানিস তো, এই খোয়াইটা কার?

—কার?

—কার আবার? আমার। আমার।

—পুরো খোয়াইটা?

—পু-রো-টা। আচ্ছা তোকে অর্ধেকটা দিয়ে দিলাম।

ওই দ্যাখো ওরা খোয়াইতে ঢুকেছে। মেয়েটি হু হু সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছে এক প্রান্তে। চেঁচিয়ে বলছে। এ-ই যে। এতটা পর্যন্ত তোকে দিয়ে দিলাম। তুই কী দিবি আমায়। কী-ই-ই—দি-বি-ই?

ছেলেটি অত চেঁচাতে পারে না। সে খোয়াইয়ের মধ্যিখানে এসে পড়েছে। মেয়েটি হু হু করে সাইকেল চালিয়ে তার কাছে এসে সাইকেল থামিয়ে বসল! আজ তার সালোয়ার কামিজ। আর আজ তাদের সন্ধ্যা। কামিজের হাতায় ঘাম মুছল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—আরে, তুই কী দিবি বললি না তো? ছেলেটি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। একটা দু'টো তিনটে চারটে তারা ফুটেছে। বলে, ক্যানেলের ধারটা নিবি? নিতে চাস? মেয়েটা দু'ধারে মাথা দোলায়। আবার সেইরকম হাসে—হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা। খুব মজা হবে।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে যায় মেয়েটির। আর, ক্যানেলটা। ক্যানেলটার কী হবে। ক্যানেলটা কি তোর?

—আমার তো বটেই। খোয়াইটা যেমন তোর। ক্যানেলটা আমার।

—ইস! তার থেকে তুই শুধু ক্যানেলের ধারটা আমায় দিচ্ছিস।

—আচ্ছা কালভার্টটাও দিলাম।

—দুর। ও দিয়ে কী হবে। ছেলেটি মাথা তোলে, ক্যানেলের সব জল তোকে দিয়ে দিচ্ছি। মেয়েটির চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে— সব জল!

—হ্যাঁ সব। এখন থেকে যত জল বইবে সব তোর।

—না এখন থেকে নয়। আজ সকাল থেকে যত যত জল বয়ে গেছে। সব আমার।

—আচ্ছা তাই। ক্যানেলের সব জল তোর।

মেয়েটি হাততালি দিয়ে ওঠে! আজ সকাল থেকে যত জল বয়ে গেছে—আজ সারারাত যত জল বইবে, কাল সকাল থেকে যত যত যত জল, উফ—সব-সব আমার। আমি ভাবতে পারছি না। ইস। তুই কী ভাল রে।

মেয়েটি ছেলেটির ভারী মাথা নিজের বুকে টেনে নেয়। ভাল! ভাল! ভাল! বলতে বলতে তার মাথাটায় চাপড় দিতে থাকে, বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর মতো।

ছেলেটি একটুও অস্থির হয় না। ধীরে ধীরে মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, কাল যদি একটা কাজ করতিস আরও ভাল হত।

—কী রে। কী কাজ?

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি চিত হয়ে খোয়াইয়ে শুয়ে পড়ে নিজের হাত দু'টো মাথার পিছনে রেখে বলে, কাল যদি তুই মনে করে ওই বাউলের কাছ থেকে অজয়টা চেয়ে নিতিস। কত ভাল হত।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। তুই ঠিক বলছিস। অজয় নদীটা ওই বাউলের, না রে?

ছেলেটি নির্বিকার ভাবে বলে, আবার কার!

মেয়েটি এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না—বলছিস, চাইলে, আমাকে অজয়টা পুরো দিয়ে দিত! পুরো একটা নদী। আমার! আমার! উফ!

—একটা নদী পুরো দিয়ে দিত তোকে। ভেবে দ্যাখ। কী কাণ্ড!

মেয়েটিও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। তার খোঁপা ধুলোয় ঘষা খায়। কথা বলার সময় মাথা নাড়ানোয় ভেঙেও পড়ে অগোছালো হাত-খোঁপা। চুল খুলে যাওয়ায় বিরক্ত হয়ে উঠে বসে সে। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বলে, আমি বেশ ওই বাউলের সঙ্গে থাকতাম। ওর জন্য রান্না করতাম। ওর সঙ্গে কোথায় কোথায় চলে যেতাম। আর দিনে একবার করে ওর ওই বোতাম-ছেঁড়া ফতুয়াটার বুকের কাছে মাথা রাখতাম। রাতে ওখানে মাথা দিয়ে ঘুমোতাম। আর আমি কিছু চাইতাম না।

—অজয় নদীটা চাইতিস না?

—ও তো দিতই আমাকে। না-চাইতেই দিত। তা হলে কী কাণ্ড হত ভাব একবার?

—অজয় নদীর যত জল সব তোর হয়ে যেত।

—আজ পর্যন্ত, যত জল বয়ে গেছে নদীতে, সেই কবে থেকে। যত জল, সব, সব আমার হত? যত জল বইবে এরপর, সব আমার।

ছেলেটি উঠে বসে— সব তোর। সব তোর।

মেয়েটি ঘুরে তাকায়— অ্যাই। ঠিক সকালবেলার মতো বললি।

ছেলেটি অবাক। সকালবেলার মতো? মানে?

সকালে বলছিলি না, সব শুদ্ধ সব শুদ্ধ। সেরকম বললি, সব তোর সব তোর! ছেলেটির মনে পড়ে, ও হ্যাঁ, শুদ্ধ পরদা। বিলাবল-এ তো সব শুদ্ধ পরদা। আবার এই বিলাবল যখন আলহিয়ায় এল, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে কোমল নি-ও এল। বাঁচতে গেলে কোমল নিখাদ একটু লাগেই, বুঝলি তো!

—অ্যাই। মার খাবি। আবার শুরু করেছিস। পরদার কথা কে বলছে। আমি বলছি, তুই যে বলছিলি না গাছ শুদ্ধ, ঘাস শুদ্ধ, ঘাসের শিশির শুদ্ধ, রোদ্দুর শুদ্ধ, পূর্বপল্লি গেস্ট হাউস, রাঙামাটি হোটেল, রুদ্রপলাশ বাড়ি সব শুদ্ধ, সব শুদ্ধ। সেইরকম বললি, সব তোর, সব তোর!

ছেলেটি একইরকম শান্তভাবে বলে, আমি জানি রে, তুই চাইলে সব তোর। এই শান্তিনি-র সব গাছ তোর।

—বলিস কী! তুই দিয়ে দিলি?

—আমার দেওয়ার কী আছে? এই তো। নদী তোর। সোনাঝুরির সব পাতা তোর।

—গোয়ালপাড়ার পুকুরের পাশে যে ঢোলকলমি দেখলাম?

~ www.amarboi.com ~

—তোর-ই তো!

—রামকিঙ্কর আমার!

ছেলেটি হাসে : কিন্তু কিঙ্করদাকে তো তুই দেখিসনি।

মেয়েটি রেগে যায়, অ্যাই, কিঙ্করদা বলছিস কোন সাহসে। তুইও তো দেখিসনি।

ছেলেটি তার ভারী মাথা দোলায়, ঠিক। দেখিনি। আমরা দু'জনের কেউই দেখিনি। মেয়েটি চিন্তায় পড়ে গেছে—তা হলে তো মুশকিল। কিন্তু রামকিঙ্করকে আমি চাই।

—শোন, অজয়ে আজ পর্যন্ত যত জল বয়ে গেছে, তাও তো তুই দেখিসনি—সে তো তোর জন্মের আগে থেকে বয়েছে। এই ক্যানেলে কাল থেকে কত জল বয়ে গেল, তাও তো দেখিসনি। কিন্তু নদীটা যদি তোর হয়, ক্যানেলের জল যদি তোর হয়, তা হলে রামকিঙ্করের বেলায় অসুবিধে কীসের!

মেয়েটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুই ভাল। তুই খুব ভাল। রামকিঙ্কর আমার। আমার। তুই এনে দিলি। ছেলেটি তেমনই শান্তভাবে বলে, আমি কেন? যার কাছে তুই যা চাইবি, সেই তা এনে দেবে তোকে। এমনি এমনি বলেছি নাকি সব তোর। সব তোর।

এই কথাটা যে কী ভাল বলিস তুই। সব তোর সব তোর। সব শুদ্ধ, সব শুদ্ধ।

ছেলেটি ওঠে, সাইকেলটা তোলে, তারপর বলে, শুধু গান তোর নয়।

মেয়েটি বলে মানে?

—মানে সব তোর। কিন্তু গান তোর নয়। তুই গানের কেউ নোস। মেয়েটিও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, নই তো নই। তাতে আমার ভারি বয়ে গেল। বলতে বলতে মেয়েটিও সাইকেলটা ওঠায় মাটি থেকে। আচ্ছা তুই শুধু একটা কথা বল,

—কী কথা?

—সকাল থেকে কথাটা আমার মাথায় ঘুরছে। ওই যে শুদ্ধ, সব শুদ্ধ। বল তো আমি শুদ্ধ।

ছেলেটি স্বাভাবিক ভাবে বলে: তুই? না তো!

—মা-আ-নে?

মেয়েটি দাঁড়িয়ে গেছে।

—দাঁড়ালি কেন?

—আমি শুদ্ধ নই?

হেসেই বলে ছেলেটি। না রে, তুই শুদ্ধ নোস। চল এবার।

—না আমি যাব না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

—আরে! রাত হচ্ছে তো।

তুই হস্টেলে খাবার পাবি না! মুশকিল হবে। মেয়েটি পা দিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে সাইকেলের স্ট্যান্ড নামায় তারপর বসে পড়ে।

ছেলেটি বিমূঢ়;—কী হল!

—আমি যাব না।

—কেন রে?

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—যাব না, যাব না। ব্যস।

ছেলেটি আবার হাসে। এ তো বিপদ হল। রাত হচ্ছে তো।

—হোক, রাত। আমি সারারাত এখানে থাকব।

—মানে? পাগল নাকি? সারারাত?

—আমি যে পাগল সেটা আজ জানলি বুঝি! বোস! বোস বলছি। তোকেও সারারাত থাকবে হবে আমার সঙ্গে। খোয়াইয়ে। আজ। সারারাত। ব্যস। আর কিছু জানি না।

ছেলেটি অগত্যা তার সাইকেল শুইয়ে রেখে বসে। বলে, হঠাৎ হল কী তোর।

—কিছু হয়নি।

—শোন, আমার কিন্তু খিদে পাচ্ছে।

—আর আমার পাচ্ছে না? তোকেও এখানে সারারাত আমার সঙ্গে না খেয়ে থাকতে হবে। সারারাত।

—মুশকিল!

—কেন! মুশকিল কেন। এখুনি তুই বলেছিস, আমি যার কাছে যা চাইব সে-ই তা এনে দেবে আমাকে। বলিসনি!

—বলেছি বলেছি।

—তা হলে সারারাত তুই এই খোয়াইয়ে আমার সঙ্গে বসে থাকবি। বসে, বসে, বসে থাকবি। ঘুমোতে পারবি না।

—কেন রে?

—এটা আমি তোর কাছে চাইছি। তাই। তুই কিন্তু আগেই বলেছিস দিবি। আমি যা চাইব।

—আরে সারারাত তাই বলে এখানে থাকা যায় নাকি।

—কেন যায় না? বাঘ-ভাল্লুক তো আর আসবে না। চোর-ডাকাত এলে আসবে। আমাদের কারও কাছে কোনও টাকাপয়সা নেই। সব পয়সা বিকেলে পরোটা, আলুর দম খেয়ে শেষ করেছি।

—ওরে সেই পরোটা, আলুর দম কোথায় উবে গেছে এখন। অতটা সাইকেল চালিয়েছি না?

—সাইকেল সাইকেল। ঠিক ঠিক। নিলে আমাদের সাইকেল দু'টো নেবে ডাকাতরা। নিক। তাও সারারাত এখানে থাকব। এটা তোর শাস্তি।

—শাস্তি? আমার? কেন আমি কী করেছি?

—তুই যে বললি আমি গানের কেউ নই? কেন বললি?

—ভুল বলিনি রে।

—আমি যদি গানের কেউ না-ই হই, তবে ওই বাউলের সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছে করেছিল কেন আমার? এখনও একবার ওর সঙ্গে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। ছেলেটি আবারও হাসে। ওঃ এই কথা। সে তো ওর গানের জন্য নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—গানের জন্য নয়? তবে কীসের জন্য?

—ওর ওই কাঁচা-পাকা দাড়ির ভেতর থেকে রোদ্দুরের মতো হাসিটার জন্যে। ওর ওই বোতাম-ছেঁড়া ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা রোগা বুকে মাথা রাখা ইচ্ছের জন্য। পরে যখন শুনলি ও কাল ছিল আমোদপুরে আর আজ রয়েছে বোলপুরে, আর রাতে থাকবে অজয়ের ধারে— তখন ওই ইচ্ছেটা আরও বেড়ে যেতে লাগল তোর।

মেয়েটা প্রথমে চুপ করে যায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, ঠিক। ঠিক বলেছিস। তাই হচ্ছিল। ছেলেটি এতক্ষণে ওর মাথায় হাত রাখে, বলে, তুই বাউলকে চেয়েছিস। ওর গানকে চাসনি।

মেয়েটি মুখ তুলে তাকায়;—এটাও ঠিক। এতক্ষণে বুঝতে পারছি। কিন্তু তুই কেন বললি আমি শুদ্ধ নই? সব শুদ্ধ সব শুদ্ধ বললি। আর আমি শুদ্ধ নই? কেন বললি? কেন আমি শুদ্ধ নই? আমি কি সত্যি কথা সব বলে দিই না? বল? ছেলেটি হাসে—হ্যাঁ, বলিস তো! কিন্তু তুই শুদ্ধ নোস।

—কেন শুদ্ধ নই।

—তা আমি বলতে পারব না। তবে তুই কী সেটা বলতে পারি।

—আমার শোনার দরকার নেই।

—রাগ করিস না। আমার কথাটা আগে শোন।

—না তোর কোনও কথা আমি শুনব না আর। ছেলেটি আবার হাসে : আচ্ছা তোকে আমার কথা শুনতে হবে না। এই সুরটা শোন। ন়ি স রে র্ম প, নি, সাঁ সাঁ নি ধ প র্ম প গ ম রে, নি সা। এই যে উঠছি। ন়ি, স রে র্ম প এই কড়ি মা, তুই হলি এই শ্যামকল্যাণের কড়ি মা। আরোহণের সময় যেটা লাগে। ফেরার সময়ও লাগে। কিন্তু সে কথা আলাদা। তুই আরোহণের কড়ি মধ্যম।

শুদ্ধ নোস। মেয়েটির ঝলমলে হাসি দেখা যায়। কড়ি মা। বেশ তো। আমার অনেক কড়ির হার গয়না আছে। কাল পরতে হবে।

—এই যে বললাম, তুই আরোহণের সময় বিশেষ করে দেখা দিস। প্রথম দেখা দিস। এই। তোর আরোহণ আর আরোহণ। অনেক অনেকদূর উঠবি তুই। তারপর আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবি।

—অ্যাই, জানিস আমার না মাথায় একটা জিনিস আসছে। একটা কাজ। কড়ি দিয়ে বাঁশ দিয়ে মাটি পুড়িয়ে একটা বড় ইনস্টলেশন... জানিস... মেটালও দিতে পারি... ধর ব্রোঞ্জ.... কী জানি কী হবে.... দারুণ হবে বল, কড়ি থাকবে কাজটার মধ্যে। কীভাবে থাকবে জানি না। কিন্তু থাকবে।

ছেলেটি আবার গান শুরু করে পায়েল মোরি বা-আ-আ-জে। বিলম্বিত বুঝলি একতাল। এখন তো কল্যাণের সময়। সকালটা যেমন ছিল বিলাবল-এর। তারপর একটু ভেবে বলে, উহুঁ না রে কল্যাণ পার হয়ে যাচ্ছে। রাত হচ্ছে। চল উঠি এবার। মেয়েটি আপন মনে বলে চলেছে কী বললি, কড়ি মা, না? ছেলেটি ধরে নি সা রে র্ম প, নি সা, সাঁ

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

নি ধ প র্ম এই মা লাগছে এটাই হল কড়ি মধ্যম। দু'টো মধ্যমই অবশ্য আছে। কিন্তু সে কথা তো আলাদা।

মেয়েটি অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ে। না, না, মধ্যম না, মধ্যম না! কড়ি মা।

হঠাৎ ঘুরে বসে মেয়েটি।— দ্যাখ, কী আশ্চর্য! আবার এই কড়ি জিনিসটার মধ্যে ভ্যাজাইনার ছবি আসে না? বল?

ছেলেটি সচকিত হয়। হ্যাঁ। তা আসে! মেয়েটি বলে চলে সম্মোহিতের মতো, মা। কড়ি। মানে জন্মদ্বার। আমরা যে পথ দিয়ে জন্মাই তার ছবি। ছেলেটি বলে, ঠিক। মেয়েটি বলে, আমার ওই কাজটার মধ্যে মা-য়ের কথা থাকবে। জননী। মাদার। আর লক্ষ্মী থাকবেন। কোজাগরীর লক্ষ্মী। হয়তো কড়ি বসানো চুবড়িও থাকবে একটা। ছেলেটি বলে, আমি তো সুর দিয়ে দেখি, তাই, অন্যভাবে আসে ওটা। ন়ি, সা রে় র্ম প নি সা এই, এই রকম করে যতবার গাইব, আমার চোখের সামনে, ওই ঘন রাত্রি-নীল আকাশের রংটা ফুটে উঠবে। সন্ধে নেমে যাওয়ার একটু পরেই, তারা ফুটে ওঠা আকাশে যে রংটা দেখা যায়, আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যায়...। মেয়েটি বলে হ্যাঁ, তুই একদিন বলেছিলি কীসে যেন তারা ফোটে?

—হ্যাঁ বলেছিলাম। ইমনে তারা ফোটে। আমার কাছে। আর তারা ফুটে যাওয়ার পরে যে আকাশ তাই শ্যামকল্যাণের। অন্তত আমার কাছে। এক-একজনের কাছে, হয়তো এক-একরকম হয়। তুই যেমন শব্দের ভেতর দিয়ে কড়ি মা ধরলি। আমি সুরের মধ্যে আরেকটা দিকে গেলাম।—কবিতা লিখেছিস এর মধ্যে?

—অনেক, অনেক। তুই? তুই লিখেছিস?

—হ্যাঁ দু'চারটে লিখেছি। চল তবে এখন। উঠে পড়ি। এখন আর রাগ করে নেই তো আমার ওপর।

—না নেই। চল। তবে সারারাত এখানে থাকতে পারলে বেশ হত।

দু'জনেই সাইকেল তুলে নেয়। হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি বলে, চোর ডাকাতের জন্য নয়। যত রাত হবে, বড়বড় ভারী রাগ সব এসে নামবেন এই মাঠে। দরবারী, বাগেশ্রী, আভোগী...কাল রাতের মতো বৃষ্টি হলে মিঞা কি মলহার-ও আসতে পারেন। কানাড়ার অঙ্গ সব নেমে আসবেন এই খোয়াইয়ের মাঠে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলব রে। সকালে উঠে আমার যদি আর মনে না থাকে আমার বাড়ি কোথায়। যদি রাস্তা ভুলে যাই।

হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি বাহুতে হাত রাখে ছেলেটির। আমি আছি তো। রাস্তা ভুলবি কেন।

ছেলেটি হাসে, বলে, আছিস। কিন্তু থাকবি না তুই।

—থাকব না মানে?

—আমি জানি, তুই থাকবি না। এখন। আমাদের কাছে আছিস। থাকবি না।

—কেন থাকব না।

~ www.amarboi.com ~

—ওই যে বললাম। সব তোর হবে। সব তোর, সব তোর। যে সব পায় সে কি আর কাছে থাকে?

—সব তোর, সব তোর। কী সুন্দর বলিস কথাটা। যেমন সব শুদ্ধ, সব শুদ্ধ। আচ্ছা, আমি তো শুদ্ধ নই। মানলাম। তা হলে তুই নিশ্চয়ই শুদ্ধ।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে— কে বলেছে আমি শুদ্ধ?

— তুই শুদ্ধ নোস। তুইও নোস? কী মজা? আমরা দু'জনের কেউই শুদ্ধ নেই।

—তা হলে তুই কী?

—আমি কোমল পরদা। জানবি, সব সময় সব শুদ্ধ পরদার চেয়ে কোমল পরদা একটু নিচু হয় রে। একটু নিচুতে থাকে সে। আর তুই কড়ি মা। তোর মতো চড়া কি হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়?

মেয়েটি বলে, আজই আমি ঘরে গিয়ে আমার কড়ির মালা আর গয়নাগুলো বার করব। মালা থেকে কড়িগুলো খুলে খুলে নেব। আমার কাজটার গায়ে গায়ে ওরা জ্বলবে। তারার মতো।

ওরা দু'জনেই উঠে পড়েছে সাইকেলে। খোয়াই ছেড়ে যাচ্ছে। মেয়েটির মনে একটু একটু করে তার শিল্পকাজ ফুটে উঠছে। আর ছেলেটি ধীর গতিতে বিস্তার করছে সুরের। আর বলছে এই দ্যাখ, এইখানে শ্যাম অঙ্গ লাগল। এইখানটা শ্যাম।

মেয়েটা বলে, শ্যাম অঙ্গ মানে?

ছেলেটি বলে, শ্যাম রাগ। কিন্তু না। তোকে রাগ দিয়ে বললে হবে না। এই দ্যাখ, বলে ছেলেটি আবার গেয়ে ওঠে, গাইতে থাকে, থেমে বলে, এই যে গ ম রে নি সা দিয়ে নেমে আমি চলে এলাম। আর তুই কিন্তু ওই বাউলের রোগা বুকে গিয়ে মাথা রাখলি। শ্যাম অঙ্গ লাগল।

—মানে? মেয়েটি অবাক।

—মানে, এই গ ম রে নি সা এটা তো শ্যাম রাগের অঙ্গ। এখানটা শুদ্ধ মধ্যম হল। যেই প্রেম আসছে, একটুখানির জন্য তুই শুদ্ধ মা হয়ে গেলি।

—কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তুই কী বলছিস।

—মানে ওই বাউলই এখন তোর শ্যাম। এখন। অন্তত আজকের জন্য। ওই তোর শ্যাম।

এখন, অন্তত আজকের জন্য আমরা দেখতে পাই খোয়াই পার হয়ে ওদের সাইকেল আলো-আঁধারের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আর সেই আলো-আঁধার গাছ-গাছালির মধ্যে থেকে ভেসে আসছে শ্যামকল্যাণের সুর :পায়েল মোরি বাজে...

তিন

সেই 'আজ, এখন'—একদিন 'কবে কখন' হয়ে গেছে। যা ছিল আজকের, তা হয়ে গেছে কবেকার, কবেকার! সেই মেয়েটি, যে কখনও গানকে চায়নি, নিজের জীবনে তার

~ www.amarboi.com ~

আরোহণ হয়েছে। অনেক, অনেক ওপরে উঠেছে সে। উঠেই চলেছে। তার সপ্তকের কাছাকাছি। নিজের শিল্পের মধ্যে দিয়েই সে চলেছে। ঠিক যেমন পাশাপাশি বাড়িতে বসবাস করে, পাশাপাশি চেয়ারে কাজ করেও দু'জন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক না হতে পারে, দু'টি শিল্পের মধ্যেও তেমনি, সম্পর্ক না-হতেও পারে। এখানেও হয়নি। গান তার কেউ নয় আজও। তাদের শান্তিনি ছেড়ে বহুদিন চলে গেছে সে। এখন মেয়েটি ফিরছে স্পেন না ইতালি কোন দেশ থেকে যেন। প্লেনের জানলার পাশে, তার হাতে, সদ্য শেষ হওয়া নিজের প্রদর্শনীর বহুবর্ণ ক্যাটালগ। প্লেনের জানলার বাইরে রাত্রি। তার হঠাৎ মনে পড়ে—নদী ভরা ঢেউ, জানে না রে কেউ। সে-ই বাউলকে মনে পড়ে। মনে পড়ে যায় ছেলেটিকে। সে জানে না ওই ছেলেটি, কিছুদিন আগেই মন্দ্রসপ্তকের তলায় ডুবে গেছে। একদম নিচের ষড়জ পার হয়ে সে এখনও ডুবছে, এখনও ডুবছে। কেউ তাকে দেখতে পায় না আর। সবার চোখ থেকে হারিয়ে গেছে সে। শুধু ক্যানেলের জল যখন বয়ে যায় অনেক রাত্রে, তার সা লাগানো বুঝি শোনা যায়। মধ্যরাত্রে, বড় আর ভারী ভারী রাগ, যাঁরা খোয়াইতে নামেন, তাঁদের সঙ্গেই এখন দেখা হয় ছেলেটির। অজয়ের যে-জল সেই কবে থেকে বয়ে আসছে, সেই জলধারার শুরু এখন সেই ছেলেটি দেখতে পায়। নদীর আরম্ভে সে অনায়াসে চলে যায়। সেই নদীর আরম্ভ থেকে সে সা লাগায়। জলের ধারায় তার গান বয়ে আসে। শালের জঙ্গলে, আর সোনাঝুরি গাছের ভেতর দিয়ে যায়। কেউ তাকে দেখতে পায় না। কিন্তু চলে সে যায়নি! একমনে, নতুন করে রেওয়াজ শুরু করেছে শুধু। রাগেরা নিজেই এখন আসেন তাকে তালিম দিতে। কিন্তু, কখন সে তালিম নেয়, রেওয়াজ করে কখন, তা কি আর আমরা জানতে পারি!

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জয় বিশ্বকাপ

শৈবাল এখন ছাদে। হাতে একটা স্টিলের গামলা। তাতে গম। শৈবাল মুঠোয় গম নিয়ে ছড়িয়ে দিল ছাদে। আর পায়রাদের দল নামছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে। শৈবাল নিজে রোদবৃষ্টিঝড়ের মধ্যেও নিয়মিত কন্ট্রোল থেকে গম নিয়ে আসে পায়রাদের জন্যই। দু'টো বেড়ালও আছে তার। তাদের জন্য মাছের দোকানে বলা আছে। মাছের পটকা, নাড়িভুঁড়ি, খুলে নেওয়া কানকো নিয়ে আসে শৈবাল, নিয়মিতই। ওই রোদবৃষ্টিঝড় সব কিছুই মধ্যেই। বেড়াল দু'টোর নাম গুণ্ডি আর দ-ধ। পায়রাদের দেখলে তারা তাড়া করত। এখন আর করে না। কিন্তু পায়রারা ভোলেনি। হঠাৎ ওরা ছাদের গম ত্যাগ করে আকাশে উঠল আবার। কেন! দ-ধ এসেছে ছাদের আলসেতে।

দ-ধ আলসে থেকে নেমে শৈবালের পায়ের কাছে মাথা ঘষতে ঘষতে শৈবালকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল। দ-ধ'র ল্যাজটা তোলা। হাতে বাটি দেখেছে তো। খেতে চাইছে।

শৈবাল দ-ধ'কে কোলে তুলে নিতেই দ-ধ'র সে কী গরগর আওয়াজ। শৈবাল গমের বাটিটা ছাদে উপুড় করে দিয়ে দ-ধ'কে কোলে নিয়ে সিঁড়ি নামতে-নামতে শুনল পায়রারা আবার ঝেঁপে আসছে ছাদে। শৈবাল, তার হাতে মুখ ঘষতে থাকা দ-ধ'কে বলল, দেব, দেব। ঠাকুমার রান্না হয়ে গেছে। দেব, দেব। কিন্তু তুই কি জানিস শালুর বিয়ে? এই বৈশাখেই! জানিস!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই

বিশ্বকাপ-এর ফাইনাল চলছে। খুব মারছে ভিভ রিচার্ডস। ভারত হারবে জানা কথা। মোটে ১৮৩ তুলে কি বিশ্বকাপ ফাইনাল জেতা যায়! অবশ্য ফাইনালে যে উঠেছে এই ঢের। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ গত দু'বার কাপ পেয়েছে। '৭৫ আর '৭৯-তে। এইবারও পাবে। ঘরের মধ্যে সেই আলোচনাই চলছে। ঘর মানে শালুদের বড় শোওয়ার ঘরটা আর কি। টিভিটা সেখানেই আছে। পাড়ার একমাত্র টিভি। সাদাকালো। কেনা হয়েছিল বছর ছয়েক আগে। যখন কসমস ক্লাবের হয়ে খেলতে আসেন পেলে। মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা। সেই প্রথম টিভি এল এপাড়ায়। পাড়ার ছেলেপুলে তো বটেই, বয়স্করাও এলেন। ঘরে জায়গা হবে না বলে ছাদে তোলা হল টিভি। এমনকী বৃষ্টি-বাদলার ভয়ে ত্রিপল অবদি টাঙিয়ে দেওয়া হল ছাদে। কে ভাড়া করল ত্রিপল? আর ত্রিপল খাটানোর লোক? কেন? শালু আর কিন্টু, দুই বোনেই তো আছে। ওদের বাড়িতে পুরুষ নেই, বাবা ছাড়া। দাদা দিল্লিতে কাজ করে। সেখানে সংসার। শালু শৈবালের থেকে দু'বছর বয়সে কম। আর কিন্টু শালুর থেকে দু'বছর কম। তখন, মানে, কসমস ক্লাব যখন এল তখন কিন্টু আঠেরো। শালু কুড়ি। ওরাই দু'বোনে মিলে একটা ছোট টেবিলে সেট করে টিভিটা। মেকানিক তখন দুর্লভ। সেই দুষ্প্রাপ্য মেকানিককেও জোগাড় করে আনে তারা। তা সত্ত্বেও খেলা শুরুর আগে গন্ডগোল হয়। মাঠে নয়। শালু কিন্টুদের ছাদে। সবাই নাকি ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছে না। এইরকম ঝিরিঝিরি দাগ হয়ে যাচ্ছে কেন? অপরিচিত যন্ত্রটির কাছে মানুষের দাবি অনেক। মেকানিক তোতলা। সে বোঝাতে ব্যর্থ হল। তখন যেন সভাপতির ভাষণ দেওয়ার জন্য ছাদের একমাত্র চেয়ারটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন শালু কিন্টুর বাবা। তাঁর চেহারা ভারী বলে তিনি চেয়ারে আসীন। বাকি সবাই ছাদে পাতা বিরাট ফরাসে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : বন্ধুগণ।

বন্ধুগণ শুনেই সবাই চুপ। শুধু চোখে চোখে পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল শালু আর কিন্টু। অর্থাৎ এ আবার কী! কিন্তু শালু কিন্টুর বাবা বললেন বন্ধুগণ। এ টিভি আমি আমার নিজের দেখার জন্য আনিনি। এ সংসারে কিছুই আমি আমার সুখের জন্য করি না।

সমাগত দর্শকবৃন্দ মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ছেলেছোকরারা এই ভদ্রলোককে আড়ালে বলে হাপ্পু। কারণ তাঁর কথা বলার ভঙ্গি। তিনি সব কথার শেষে একটি উফ্-ফুঃ ধরনের আওয়াজ যোগ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে, বন্ধুগণউফ্ফুঃ। নিজের দেখার জন্য আনিনিউফ্ফুঃ। আমার সুখের জন্য করিনাউফ্ফুঃ!

এসময় কিন্টু নিচু গলায় শালুকে কিছু একটা বলে। বাইরে কেউ শুনতে পায় না। শৈবাল মেকানিককে হেল্প করতে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বলে শুনতে পায়। কী বলল কিন্টু? কিন্টু বলল, অ্যাই দিদি হাপ্পুকে বসিয়ে দে। দে-এ-না!

বাবা, তুমি বোসো। শালুর শান্ত গর্জন। এবং সভাপতির বসে পড়া।

সেই কসমস-মোহনবাগান ম্যাচের পর থেকেই যাবতীয় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ

~ www.amarboi.com ~

শালুদের বাড়িতে এসেই পাড়ার লোক দেখতে শুরু করে। সেইসূত্রে বিশ্বকাপ দেখতেও আজ এসেছে অনেকে। অনেকে, কিন্তু সবাই নয়। কারণ শালু কিন্টু কট্টর ইস্টবেঙ্গল। ফলে মোহনবাগানীরা তাদের বাড়ি খেলা দেখা বন্ধ করেছে। লোকসংখ্যা কমেও গিয়েছে। হাপ্পুকে এঘরে অ্যালাউ করা হয় না। কারণ, হাপ্পু প্রচুর কমেন্ট করেন। তার চেয়েও বড় কারণ, হাপ্পু যখনই খেলা দেখতে বসেন ইস্টবেঙ্গল গোল খায়। ওই যে ১৭ সেকেন্ডে উলগানাথনের দৌড়, আর আকবরের গোল, সেই মর্মান্তিক ঘটনা কী জন্য ঘটে? তখনও টিভি আসেনি। বড় ঘরের টেলিরাড রেডিও-তে যখন সবাই রিলে শুনবে বলে এসেছে, তখনই নিজের ছোট ট্রানজিস্টর কানে নিয়ে ঘরে ঢোকেন হাপ্পু। তৎক্ষণাৎ আকবর গোলটি করে। সেই গোলেই মোহনবাগান জেতে। ফলে খেলা যেখানে দেখা বা শোনা হয় সেখানে হাপ্পুর প্রবেশাধিকার নেই।

তা ছাড়া হাপ্পুর আরও একটি গোপন দোষ আছে। কী দোষ? ওই বাড়িতে বাস করলেও হাপ্পু একজন কনফার্মড মোহনবাগানী এবং হাপ্পু নিজেও তাঁর ছোট ট্রানজিস্টরে খেলা শোনা পছন্দ করেন। আজও হাপ্পু তাঁর নিজের ঘরে। কিন্তু এঘরে অনেক লোক। শৈবাল বসেছে নিচু একটা মোড়ায়। বড় খাটের গা ঘেঁষে মোড়া রাখা আছে। খাটে মেয়ে ও মহিলারা তিনজন। চেয়ার টুল সতরঞ্চি মিলিয়ে জনা চারেক আরও। ভিভ রিচার্ডস আবার একটা চার মারল। পরের বলে আবার। একটা করে চার মারছে আর হেঁটে একটু এগিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পিচে ওপর অদৃশ্য কুটো লক্ষ করছে। মাটিটা একটু ব্যাট দিয়ে ঠুকল। যেন কিছুই হয়নি। আর চুইংগাম চিবিয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ। এই লোকটা, শৈবাল ভাবল, একাই একশো উননব্বই করেছে একটা খেলায়। ওয়ান ডে-তে ওটাই হাইয়েস্ট স্কোর। ভারত এগারোজন মিলে ওর থেকে ছ'রান কম করেছে। ও তো একাই তুলে দেবে সব রান। বলবিন্দর সন্ধু গোড়ায় একটা উইকেট পেয়ে গিয়েছে কপালজোরে। ওরে বাবা, আবার চার। মদনলালের বলে। ৩৩ করেছে এরই মধ্যে, তাতে সাতটা চার। শর্ট রান মাত্র পাঁচটা। একে ঠেকাবে কে। চুইংগাম চিবিয়েই যাচ্ছে।

হঠাৎ পাঁজরে একটা খোঁচা খেল শৈবাল। কী ব্যাপার! খাট থেকে কারও ঝুলন্ত পা লেগে গিয়েছে হয়তো ভুল করে। সামান্য সরে বসল শৈবাল। আবার মদনলাল বল করতে আসছে। মেরেছে রিচার্ডস। আরে আউট। হ্যাঁ। আউট। দুর্দান্ত ক্যাচ। অনেকটা ছুটে গিয়ে নিয়ে নিল কপিল দেব। সমস্ত ঘর হইহই করে উঠছে। শৈবাল সেই হইহই-তে অংশ নিতে পারছে না। তার পিঠের ওপর একটা পায়ের আঙুল ঘষে ঘষে নামছে। মাঝে মাঝে চাপ দিচ্ছে।

শৈবাল কাঠ। ঘরের আলো নেভানো। আলো জ্বালা থাকলে শালু কিন্টুর দেখতে অসুবিধে হয় তাই। সবাই একমনে খেলা দেখছে। আবার আউট। কে আউট? শৈবাল খেয়াল করছে না কারণ সেই পা-টা খুব ধীরে ধীরে তার পিঠের দিকের বুশশার্টটা তুলছে। শৈবালের গেঞ্জি না-পরা খালি পিঠে নখের আঁচড় কাটছে। আবার আউট। কে এবার তা বোঝার অবস্থায় নেই শৈবাল। হতবুদ্ধির মতো সে একবার পিছনে তাকায়। দুই

~ www.amarboi.com ~

পা ঝুলিয়ে দু'টো হাত দুই হাঁটুর পাশে খাটের ওপর রেখে, মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে, এক দৃষ্টিতে টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে কে বসে আছে তার পিছনে? শালু! মুখে কী একটা চিবোচ্ছে।

মুখ ঘুরিয়ে আবার টিভির দিকে তাকায় শৈবাল। পাঁচ উইকেটে ৬৬। লর্ডস নামক মাঠটি আগুন হয়ে উঠেছে। তার চেয়েও আগুন হয়ে উঠছে এখন শৈবালের মাথা ও শরীর।

শৈবাল পরিস্থিতি দেখল। চুপচাপ। চারদিকে তাকিয়ে। স্লিপে কে। মনোজকাকু। গালিতে কে। পিন্টুদা। স্কোয়ার লেগ নেই। সিলি মিড অফে গেনো মেসোমশাই। সকলেই এদিকে দেখছে। টিভির দিকে। ইতিমধ্যে খাট থেকে ঘষে একটু নেমেও এসেছে শালু। যেন খেলা দেখার সময়কার স্বাভাবিকতা মেনেই ঘটেছে এই সামান্য স্থান পরিবর্তন। ধীরে ধীরে চারদিকে ফিল্ডার দেখে নিয়ে নিজের ব্যাটিং-এ মনোনিবেশ করল শৈবাল। সিঙ্গলস এর ওপরই তার নির্ভর। একটা হাত আস্তে আস্তে পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির ওপরটায় চেপে ধরল শক্ত করে। শালুর মুখ থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই মহিন্দর অমরনাথের বলে ব্যাটসম্যান বিট হয়েছে। সারা ঘরভর্তি সমবেত হুসহাস-এর সঙ্গে মিশে শালুর এতক্ষণের চেষ্টা সফল হওয়ার উল্লাস আত্মগোপন করল। হাতটা একবার ঘষে একটু ওপরে তুলতেই শৈবাল বুঝতে পারল পায়ের হালকা রোমগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে। হাত ধীরে সরিয়ে নিল শৈবাল।

এই পার্টনারশিপ-টা অনেকক্ষণ স্টে করে গিয়েছে। রান একশো পার হয়ে একশো কুড়ির কাছাকাছি। ঘরে সমবেত হতাশা। বিশ্বকাপের এত কাছে এসেও কি হবে না? সবাই বলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কি সোজা টিম? এত সহজে ছেড়ে দেবে মনে করেছিস। শালার ব্যাটসম্যানগুলো একটু ভাল করে বেশি বেশি রান তুলে রাখতে পারে না। সেইসব আলোচনায় শালুও মন্তব্য করছে।

আবার অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মুখটা ঘুরিয়ে শালুকে দেখল শৈবাল আড়চোখে। কী যেন একটা চিবিয়ে যাচ্ছে। যেন এই টিভি ছাড়া জগতে কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কিছুক্ষণ আগেই ভয় পেয়ে হাত সরিয়ে এনেছে শৈবাল। আবার শুরু হয়েছে পায়ের আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে পিঠের দিকে শার্ট উঠিয়ে নখ বসিয়ে নীচে টেনে দেওয়া। এমনই যে, জ্বালা করছে। ছড়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। আবার সন্তর্পণে হাতটা পিছনে নিল শৈবাল। নিজের ডান হাতটা ঘুরিয়ে পিছনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে বলে খেলা দেখার ঝোঁকেই যেন ঘষে ঘষে পিছনে একটু সরে বসল। এবার আরও ভালভাবে পাওয়া গেল গ্রিপটা। ওঃ। উইকেট পড়েছে। এতক্ষণের প্রতিরোধ ভাঙল। ঘর ভরে হইহই। টিভি ভাষ্যকারের গলায় আর মাঠে উত্তেজনা। শৈবাল তার হাতটা পায়ের ডিম ঘষে ঘষে তুলে নিয়েছে হাঁটুর ঠিক পিছন দিকটা পর্যন্ত। কিন্তু এবার হাতটায় অসহ্য ব্যথা লাগছে। আর তোলা যাবে না। শাড়িটাও কতটা উঠেছে কে জানে। যদি কারও চোখ পড়ে যায় সেদিকে? মুখ ঘুরিয়ে সেটা বুঝে নেওয়াও তো অসম্ভব। কিন্তু আর একটু পরেই উরু পাওয়া যাবে। এইখান থেকে ফিরে যাওয়াও তো সমান অসম্ভব।

~ www.amarboi.com ~

হঠাৎই শালু খাট থেকে নেমে পড়ল। একটু আসছি বলে বেরিয়ে গেল। ঘর থেকে ইতিমধ্যে বাইরে ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। গ্রিলের গেট খুলতে গিয়েছে কিন্টু। কারণ অসন্তুষ্ট মোহনবাগানীরাও সব বিভেদ ভুলে চলে আসছে একে একে চার-পাঁচজন আরও। কারণ সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটতে চলেছে। ভারত বিশ্বকাপ ফাইনাল জিততে চলেছে। পাড়ার লোক এবার ভেঙে পড়ছে পাড়ার একমাত্র টিভিওলা ঘরটিতে।

কিছুক্ষণ পরেই নীচের ঘরে প্রবল উল্লাসধ্বনির মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ উইকেটটি যখন পড়ল, তখন শালুদের ছাদের দরজার সামনে শৈবালের দুই হাত সমানে চলছে। আর শৈবালের ঠোঁট আর জিভে চলে আসছে জোয়ানের দু'টো-তিনটে চিবোনো টুকরো। কেউ কোনও কথা বলতে পারছে না। দরকারও হচ্ছে না। বাইরে বাজি ফাটছে। হাঁপাতে হাঁপাতে শালু বলছে, কাল দুপুরে বাবা মা থাকবে না। পিসির বাড়ি যাবে। এসো কিন্তু।

শ্বাসরুদ্ধ গলায় কোনওরকমে শৈবাল জিগ্যেস করে, আর কিন্টু? কিন্টু থাকবে না?

আঃ, ম্যানেজ করে নেব! থামছ কেন! শালু ধমক দেয়।

রাতে স্নানটান করে নিজের ঘরে শুতে এসেছে শৈবাল। বাজিফাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। গুড্ডি এল। তখন দ-ধ হয়নি। মাথার কাছে গুটিয়ে শুয়ে পড়ল গুড্ডি। শৈবাল বলল, জানিস গুড্ডি। ভারত বিশ্বকাপ পেয়েছে। আমিও পেয়েছি আজ। বিশ্বকাপ। না চাইতেই।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে, আগামীকাল দুপুরের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল শৈবাল। তার পিঠের আঁচড়গুলো জ্বালা করছে। নির্ঘাত দাগ হয়েছে। সকালে মায়ের সামনে শার্ট খোলা যাবে না। জিগ্যেস করবে কী করে হল। আর তার মনে পড়ছিল খেলা দেখার সময় শালুর মুখের ভিতরকার জোয়ানগন্ধ এখনও যেন নিশ্বাসে রয়েছে। শৈবাল বলল! উঁ! একেবারে ভিভ রিচার্ডস।

তিন

সেটা বর্ষাকাল ছিল। এটা চৈত্র মাস। এর মধ্যে সুযোগ পেলেই শালু কল দিয়েছে। আর শৈবাল ছুটে গিয়েছে অসম্ভব সব রান নিতে। একবারও ভুল বোঝাবুঝিতে আউট হয়নি তারা। শৈবালের বাবা শনিবার রাতে বাড়ি আসে। সোমবার সকালে ট্রেনে চলে যায় কলকাতায়। শৈবালের বাবার বয়স ৫৬। শৈবালের, ঠিক অর্ধেক। বাড়িতে শৈবালের মা ঠাকুমা। শৈবাল এত বয়সেও চাকরি-বাকরি পায়নি। চেষ্টাও করে না তেমন। ছেলে পড়ায় বাড়ির বারান্দায় তক্তপোশ পেতে। দু'টো শিফ্‌টে। সবে চেষ্টা শুরু করেছিল। আদাজল খেয়েই। যখন শালুর এক-একটা ভঙ্গি মনে পড়ত তখনই পাগলের মতো বিজ্ঞাপন দেখত আর কাজ করার কথা মনে হত শৈবালের। কারণ, শালু তাকে বলেছিল, বিয়ে করব। করতে পারি। কিছু তো একটা করো আগে। কাজ-টাজ। করবে তো! না কি! চাকরি করলে বিয়ে। চাকরি না-করলে বিয়ে কীসের। উঁঃ! কীসের! কীসের! কীসের! উঁ! উঁ! উঁ!

জোয়ানগন্ধ আবার শ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল শৈবালের। জোয়ানের কৌটো কিনে নিজের ঘরে রাখতে শুরু করেছিল শৈবাল। রোজ তো আর কাছাকাছি হওয়া যায় না।

~ www.amarboi.com ~

তখন জোয়ানের কৌটো খুলে দু'টো চারটে মুখে দেয়। রাত্তিরে শোওয়ার আগে তো দেবেই। এক-একদিন দু'বার তিনবার ঘুম ভেঙে উঠে জোয়ান মুখে দেয়। শেষে ভোরের দিকে উত্তাপ নামলে, উপযুক্ত ক্লান্তি এলে ঘুমিয়ে পড়ে। সাড়ে ছ'টায় স্টুডেন্টরা এসে ডাকলে উঠে পড়তে হয়। তাদের সামনে বসে চায়ের কাপ হাতে বড়বড় হাই তোলে শৈবাল। সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে স্টুডেন্টরা চলে গেলে বাজারে বেড়ালের মাছ আনতে যায়। কন্ট্রোলের গম আনতে যায়।

আজ রেশন শপ থেকে ফেরার সময় কিন্টুর সঙ্গে দেখা। ফিরতি পথে প্রথমে একটা ছোট মাঠ পড়ে। ক্রিকেট ফুটবল হয় সেখানে। মাঠটাকে বলে নবোদয় সঙ্ঘের মাঠ। তারপরই ভাঙা একটা বাড়ি আর জঙ্গল মতো ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে রাস্তা। ওটাকে বলে ভুতোর বাগান। রেশন শপ থেকে শর্টকাট হয়। সাইকেলের রডে গমের থলে ঝুলিয়ে মাঠ পার হচ্ছিল শৈবাল। দেখল আগে আগে কিন্টু চলেছে। সাইকেল নিয়ে পাশে এসে বলল, উঠে পড়। কিন্টু তড়াক করে ক্যারিয়ারে লাফিয়ে উঠল।

বাব্বা। বাঁচালে।

কোথায় গিয়েছিলি এই রোদ্দুরে?

এই একবার না কি! সকাল থেকে এই থার্ড টাইম গেলাম স্টেশন বাজারে। এখন বাড়িতে কত কাজ। ইতিমধ্যে মাঠ পার হয়ে ভুতোর বাগানের সরু পায়ে-চলা পথ এসে পড়ল। নামতেই হবে এখন। এই ঝোপজঙ্গল পার হলেই আবার একটা মাঠ। বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয় এখানে। ওই মাঠ থেকে হুস করে বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়া যাবে। যা রোদ্দুর। সাইকেল থেকে নেমে পাশে হাঁটতে হাঁটতে শৈবাল বলল, বিজয়ার তো দেরি আছে। এত পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড কিনেছিস কেন! হঠাৎ?

কিন্টু আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। রিলেটিভদের চিঠি লিখতে হবে। বৈশাখে দিদির তো বিয়ে। নেমন্তন্ন কার্ড-টার্ড সব পরে। এখন প্রাইমারিলি জানাতে তো হবে। আমি সব লিখব। বাবা নিচে নিজের নাম লিখে দেবে শুধু। কত খাটুনির ব্যাপার বলো তো!

শৈবাল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিয়ে! কার? শালুর? কিন্টু চোখটা নামাল। হ্যাঁ। চলো। দাঁড়িয়ো না। শৈবালের পা চলছে না। পাশাপাশি বাড়ি। ঠিক এক সপ্তাহ আগে শালু ছাদে এল। বলল। অ্যাই শৈবালদা। তোমার ছোট বেড়ালটা আজ আমাদের বাড়ি এসেছিল। দুধ দিয়েছি। শৈবাল বুঝে গেল। বলল কখন? শালু আঙুল দিয়ে দুই দেখাল। অর্থাৎ দুপুর দু'টো। সকালের দিকে যখনই আঁচ পেয়ে যায়, আজ বাড়ি কখন ফাঁকা থাকবে, শালু জানিয়ে দেয়। শালু যখন আঙুল দিয়ে দুই দেখাচ্ছে, তখন তাদের বাড়িতে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কাজের লোককে বকাবকি করছে শালুর মা। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল। দু'টো রিকশা এল বাড়ির সামনে। কিন্টু তার বাবা মা-কে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপরই সেদিনের দুপুরবেলাটা হয়ে গেল তাদের নিজস্ব দুপুরবেলা। কই? সেদিনও তো কিছু বলল না শালু।

কিন্টু আবার বলল। চলো শৈবালদা। অমন করে না। চলো।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শৈবাল হাঁটছে। জিগ্যেস করল, কবে বিয়ে? বৈশাখে। সাতই বৈশাখ। একুশে এপ্রিল।

শৈবাল বলল, আজ! আজ কত? এপ্রিল-এর তিন তারিখ? না?

তোমাকে দিদি কিছু বলেনি?

না রে। কবে এসব স্থির হল।

অনেক দিন ধরেই তো কথা চলছে। দু'মাস আগেই সব ঠিকঠাক। এই তো গেল হপ্তায় বাবা আর মা'কে নিয়ে কলকাতায় মাসির বাড়ি গেলাম, ওখানে পাত্রপক্ষ আবার এল।

শৈবাল হাঁটতে হাঁটতে বারোয়ারি পুজোর মাঠে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

চলো শৈবালদা। অমন করতে নেই।

শৈবাল ঘুরল, কিন্টু। তুই শালুকে একটু বুঝিয়ে বল।

লাভ হবে না। দিদির নিজের সিলেকশন।

মানে।

মানে যখন সম্বন্ধ এসেছে তখন এইটাতে দিদি খুশিমনে মত দিয়েছে।

বারোয়ারি মাঠে রোদ্দুর ঝকঝক করছে।

আসছে রবিবারের আগে পাড়ার কেউ জানবে না— দিদির বিয়ে। নিশ্চয়ই জানো, দিদির অর্ডারই আমাদের বাড়ির শেষ কথা।

শোন কিন্টু। আমি একবার দেখা করব।

কোরো না। লাভ হবে না। দিদি আমাকে বলে দিয়েছে আলাদা করে, শৈবালদা যেন কিছু জানতে না পারে। আর রবিবারের আগে, শনিবার দিনই দিদি কলকাতায় মাসির বাড়ি চলে যাবে। ওখানেই থাকবে। বিয়ে হবে মসির বাড়ি থেকেই। ছেলে-পক্ষের তাই ইচ্ছে। আর শোনো, দিদিরও তাই ইচ্ছে। হ্যাঁ দিদিরও।

শৈবাল দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। কালীমন্দিরের সামনে লোকজন রিকশা সাইকেল ভ্যানরিকশার ভিড়।

কী হল?

শৈবালের মুখ কিন্টুর দিকে ঘুরল। কিন্টু! আমার একটা উপকার করবি?

না। কোনও উপকার করতে পারব না শৈবালদা।

তুই ওকে আমার ব্যাপারটা একটু বল।

কী বলব। আবার দাঁড়ালে কেন? চলোওও!

শৈবাল হাঁটতে হাঁটতে শুনল কিন্টু বলছে, দিদি বলে দিয়েছে বাবাকে, একদম নেমন্তন্নর চিঠি নিয়ে যেন পাড়ার সব বাড়িতে যায় বাবা। তোমাদের বাড়িতেও তাই যাবে বাবা। আসছে রবিবার।

আসছে রবিবার?

কিন্টু চাপা গলায় বলল, আবার দাঁড়াচ্ছ? হাঁটো। হাঁটতে হাঁটতে শোনো। কী হলটা কী?

~ www.amarboi.com ~

তুই চলে যা কিন্টু, আমি একটু পরে বাড়ি ফিরব। আর শোন, আসছে রবিবার আমি বাড়ি থাকব না।

থেকো না। ঠিক। তুমি বাড়ি থেকো না শৈবালদা। কিন্তু একটা কথা শোনো।

কী কথা বল্।

শুনবে তো? বলো? বলো শুনবে?

শৈবাল তাকায় কিন্টুর দিকে। ওরা ছোট মফস্‌সল টাউনের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। কিন্টুর চোখে একটা ব্যাকুলতা। একটা অন্য কোনও জিনিস। যা কখনও কোনও মেয়ের চোখে আগে দ্যাখেনি শৈবাল।

কী কথা সেটা বলবি তো আগে!

এখন সোজা বাড়ি যাও প্লিজ। রোদে ঘুরো না। রোদ্দুর লাগলেই তোমার জ্বর হয়।

কী করে জানলি?

আমি জানি। প্লিজ বেশিক্ষণ রোদে সাইকেল চালিয়ো না।

সে দেখা যাবে। এখন চললাম।

শৈবাল সাইকেলে উঠতে উঠতে শুনল, তোমার বাড়িতে পায়রারা আছে, তুমি ওদের গিয়ে গম দেবে না! বেড়ালরা আছে? ওদের খেতে দেবে না!

হ্যাঁ দেব, বলে শৈবাল সাইকেল চালিয়ে দেয়। কিন্তু মোড় পর্যন্ত গিয়েই শৈবালের হঠাৎ মনে পড়ে পায়রাদের কথা। গুন্ডির কথা। মনে পড়ে দ-ধ'র কথা। দ-ধ'র বয়স মাস চারেক। গুন্ডির বাচ্চা ও। জুন মাসে, বিশ্বকাপ ফাইনালের সময় ও হয়নি। ওরা তিনজন হয়েছিল। দু'জন চোখ ফোটার আগেই মারা যায়। মাছের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে গেলে মা রান্না করবে। তবে ওরা খাবে। বাড়ির দিকে সাইকেল ঘোরাল শৈবাল।

চার

মে মাসের এগারো তারিখ আজ। প্রচণ্ড গরম। কুয়োর ঠান্ডা জলে চান করে থালা পেতে নিয়ে রান্নাঘরে খেতে বসেছে শৈবাল। ভাত, ডিমভাজা, আলুভাতে পেঁয়াজ-ফোড়ন দিয়ে মুসুরির ডাল। নিজে রান্না করে, নিজেই বেড়ে নিয়েছে। ঠাকুমা এখন জ্যাঠার বাড়ি আছে। মা দিন সাতেকের জন্য বড়মাসি আর দিদিমার কাছে গিয়েছে। বাড়িতে এখন কয়েকদিন একাই কাটছে শৈবালের।

খেতে বসার আগে, রান্নাঘরের লাগোয়া দাওয়ায় দ-ধ আর গুন্ডিকে দু'টো থালায় মাছ-ভাত মেখে দিয়ে এসেছে। দুই বেড়াল তাই নিয়ে ব্যস্ত।

হঠাৎ কিন্টু ঢুকল রান্নাঘরে। তার পরনে একটা নীল রঙের ম্যাক্সি। বাড়িতে ওই পরেই ঘোরে। কিন্টু বলল, খাচ্ছ! খাও! খাও! আসনপিঁড়ি হয়ে মেঝেতেই বসে পড়ল কিন্টু।

শৈবাল একটু বিব্রত। কারও সামনে খেতে তার একটু অস্বস্তি হয়। মা ঠাকুমা আলাদা কথা।

~ www.amarboi.com ~

কিন্টু মাঝে মাঝে এসে সব খবর দিয়ে গিয়েছে। সাবধান করে দিয়েছে। দিদি অষ্টমঙ্গলায় আসবে তিন দিনের জন্য। তারপর দু'বছর আর আসবে না। পুনা চলে যাবে বরের সঙ্গে। বরকে তার অফিস বাইরে পাঠাবে। কী সব কী সব হবে আরও।

কিন্টুর কাছে কৃতজ্ঞ শৈবাল। ওই তিনদিন শৈবাল জ্যাঠার বাড়িতে কাটিয়ে দেয় ঠাকুমাকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে গিয়ে। কলকাতার বিয়েবাড়িতে বাবা গিয়েছিল নেমন্তন্ন রাখতে। বিয়ের পর শালুকে আর দেখেনি শৈবাল। সত্যি বলতে, সেদিন ভুতোর বাগানে কিন্টুর মুখে শালুর বিয়ের খবর শোনার পর থেকেই সে এত সতর্কভাবে থেকেছে যে শালুকে একবারও দেখতে হয়নি তাকে। শালুও তাকে খোঁজেনি। বৃহস্পতিবার খবরটা শুনেছিল। শনিবারেই শালু রওনা হয়ে যায় কলকাতায়।

তারপরই জোয়ানের কৌটোটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল শৈবাল ছাদ থেকে পিছনের জংলায়। তিনদিন হল মা বড়মাসির কাছে গিয়েছে। কিন্টু রান্না করে দিতে চেয়েছে। শৈবাল বলেছে, আমি পারব।

খুব তো বললে নিজে পারবে। কেমন রান্না করেছ দেখি।

শৈবাল বলে, দাঁড়া, একটা থালা নামাই।

উঁহু। তোমার পাত থেকেই খাব। ডালমাখা ভাত খাবলা মেরে তুলে খেতে শুরু করে কিন্টু।

আরে এ কী করছিস! দাঁড়া তোকে একটা প্লেটে দিই।

কে খাবে তোমার অখাদ্য ডাল-ভাত। যা-তা হয়েছে একেবারে। দেখি তো ডালটা কেমন করেছ।

কিন্টু ডালের বাটিটা তুলে সুড়ুৎ করে চুমুক মারে।

অ্যাঃ। অতি বাজে ডাল!

তাই বলে ওটায় চুমুক দিলি। আগে বললে একটা আলাদা বাটিতে দিতাম।

কেন। এঁটো করে দিলাম বলে? দিদি তোমায় এঁটো করে দেয়নি! তুমিও তো এঁটো!

শৈবাল স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। রান্নাঘরের জানলায় দু'টো চড়ুই। দাওয়ায় একটা কাক। লেবুগাছ আর পেয়ারাগাছের তলায় ছায়ায় জাফরি। কথা বলতে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে শৈবাল।

থালার সামনে থেকে উঠে শৈবালের সামনে এসে বসল কিন্টু। কী! রাগ হয়ে গেল অমনি! খাও, খেয়ে নাও।

হুঁ।

কী হুঁ। আমি এঁটো করে দিই তোমায়? দিই? বলতে বলতে মুখ এগিয়ে শৈবালের ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরল কিন্টু। শৈবাল ঠেলে দেয়, কী শুরু করেছিস।

ক্যানোওঃ! আমি কি কেউ না? দিদিকে যা দিয়েছিলে, আমাকেও দিতে হবে। দাও দাও-ও। দা-আ-ও।

ঝাঁপিয়ে ঠেলে শৈবালকে রান্নাঘরের মেঝেতে চুলের মুঠি ধরে শুইয়ে দেয় কিন্টু।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্টুর মুখে পেঁয়াজ ফোড়ন দেওয়া ডালের গন্ধ। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়েও পারে না শৈবাল। তার একবার স্বাদ পাওয়া শরীর আবার স্বাদ চাইতে শুরু করে। তবু সে কোনওক্রমে বলে, শোন আমি কিন্তু তোকে বিয়ে করতে পারব না। মেঝেতে শায়িত শৈবালের কাঁধের পাশে দু'টো হাতের ভর রেখে শৈবালের ঠোঁট থেকে মুখটা তুলে নেয় কিন্টু। বলে, কে তোমাকে বিয়ে করতে চায়? তোমাকে বিয়ে করলে দিদি আমার সারাজীবন বিষ করে দেবে না? কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু, এটা, এটা, এখন এখন, এটাতে তো দিদি কিছু করতে পারবে না। কিছু না! কিচ্ছু কিচ্ছু না-আ-আ!

ওদের ঝটাপটিতে ভাতের থালা উল্টে যায়। ওরা ভিতরের ঘরেও যায় না। শৈবাল শুধু বলে বাইরের দরজাটা দেখে আসি। শৈবালের মুখ নিজের বুকের ওপর টেনে শৈবালের শ্বাস বন্ধ করে দিতে দিতে কিন্টু বলে, আমি লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। তুমি দেরি কোরো না।

বেড়াল দু'টো এসে মেঝেতে ছড়ানো ভাত খেতে থাকে। দু'টো সাহসী কাক ঢোকে ভাতের জন্য। আবার পালায়। ওদের শায়িত শরীরের খুব কাছে এসে, একটা চড়াই ডিমভাজার টুকরো মুখে নিয়ে উড়ে বেরিয়ে যায় রান্নাঘরের জানলা দিয়ে। ওঠার সময় কিন্টু দ্যাখে তার ম্যাক্সির কাঁধ-পিঠটা ডাল লেগে ভেজা। কারণ ডালের বাটি উল্টে ঘরে তখন ডাল-সমুদ্দুর।

শৈবালের সেদিন দুপুরে খাওয়া হয়নি। তবে রান্নাঘরের ওই ছড়ানো-ছিটানো অবস্থা পুরো সামলে দিয়ে গিয়েছিল কিন্টু। পরিষ্কার করে মুছে, ভাতগুলো দাঁড়িয়ে কাক চড়াইদের দিয়ে, বাসন সব কুয়োতলায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

চারটে নাগাদ আবার ফিরে আসে কিন্টু। হাতের থালায় পরোটা আর মাংসের ঘুগনি। কিন্টু বলে, বাড়িতে হয়েছিল ঘুগনিটা। পরোটা শুধু বানিয়ে আনলাম। খাওয়ার পর আরেকপ্রস্থ ঝড়বাদল হয়েছিল। চলে যাওয়ার সময়, চোখে অদ্ভুত একটা রং নিয়ে বলেছিল কিন্টু। বিয়ে? তখন বিয়ের কথা বলছিলে না! এমন একটা বিয়ে করব, দেখো শৈবালদা, দিদি ভাবতেও পারবে না। দেখবে তো নিজেই। দিদির থেকে কোনওকিছু কম আছে আমার, বলো! কোথাও কম আছে?

বেড়ালছানা একটু বড় হয়ে গেলে বেড়াল-মায়েরা আর বাচ্চাকে কাছে নেয় না। কাছে যেতে গেলেই ফ্যা-স্স্ করে। বেচারি দ-ধ'টা কেবলই গুন্ডির বকুনি খায় তাই। গুন্ডির বদলে, এখন দ-ধ শৈবালের কাঁধে বা বাহুতে বা হাঁটুতে মাথা দিয়ে ঘুমোয়। আর গুন্ডি নিয়ম করে ঘুমোয় শৈবালের মশারির চালে। যেদিন দ-ধ শৈবালের বালিশের পাশে ঘুমিয়ে পড়ছে। জানলা দিয়ে নারকোল গাছের ফাঁকে বড় একটা চাঁদ। বুদ্ধপূর্ণিমা বোধহয় দু-একদিনের মধ্যেই।

দ-ধ'র নরম গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে শৈবাল বলল, দ-ধ, বুঝলি তো। আমি দু'বার বিশ্বকাপ পেয়ে গেলাম। ইন্ডিয়া আবার কবে বিশ্বকাপ পাবে কে জানে!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

একটু আগে ২ এপ্রিল মধ্যরাত পেরিয়ে ৩ এপ্রিলে পৌঁছেছে। চৈত্র মাসের আজ কত তারিখ। ১৮? ১৯? ভারত আজ দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ পেয়েছে। ইতিমধ্যে শৈবালের বয়স ও জীবন বদলে গিয়েছে আমূল। বদলে গিয়েছে বসবাসের শহর। শৈবাল এখন মহানগরবাসী। প্রথমবার যখন ভারত বিশ্বকাপ পায় তখন শৈবাল ছিল ২৮। এখন শৈবাল ৫৬। একটু আগে টিভি বন্ধ করেছে। এই রাত দেড়টায় মহানগরের রাস্তায়-রাস্তায় নেমে পড়েছে মানুষজনের ঢল। শৈবাল শুতে যাওয়ার আগে এক কাপ কালো চা খায় রোজ। আজ তার বিছানার পাশে কালো চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শৈবাল ভাবল, নিশ্চয় কোথাও অন্য কোনও যুবক আজও বিশ্বকাপ পাচ্ছে। নির্জনে, গভীর অন্তরালে তীব্র উত্তেজনায় জয় করছে বিশ্বকাপ। সেই অজানা যুবকটির উদ্দেশে শৈবাল তুলে ধরে তার চায়ের ভরাভরতি কাপ। জানলায় বয়ে আসা চৈত্রপবন বলছে সামনেই বৈশাখ। সামনেই গ্রীষ্মঋতু। শৈবাল বলল, জয় বিশ্বকাপ!

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওগো সুন্দর

পরদা উড়ছে জানলায়। আলো আর হাওয়া ঢুকছে। জানলার দিকে পিছন করে বসে এক যুবতী। তার পাশে একজন যুবক একই সোফায়। উলটোদিকে একটা চৌকি। তাতে উনি বসে আছেন। যুবতী বলল, আপনার শরীর এরকম ভেঙে গেল কী করে মাস্টারমশাই? কিছুদিন আগেও কথাটা মনে হয়েছিল। কিন্তু এতটা দেখিনি তখন।

উনি বললেন, তুমি যেখানে রয়েছ সেখানে তোমার মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছি না। পিছন দিয়ে আলো আসছে তো। তুমি উঠে এই দেওয়ালটার ধারে একটু বসবে? ওই চেয়ারটায়?

যুবকটি মেয়েটির দিকে একবার তাকাল। মেয়েটি ভ্রুক্ষেপ করল না। উঠে গিয়ে, দেওয়ালের ধারের চেয়ারে বসল। এইবার দেখতে পাচ্ছেন, মাস্টারমশাই?

উনি হাসলেন। আগের চেয়ে ভাল। তবে দেখতে কি আর পাচ্ছি ঠিকমতো? চোখও আর দেখতে দিতে চায় না।

ঘরটি বড়। তিনটে জানলা। দরজার বাইরে এককালি বারান্দা। তাতে ছোট ছোট ফুলের টব। কিন্তু ফুলগাছ লাগানো হয়নি অনেকদিন। উনি যে চৌকিটায় বসেছেন, সেই চৌকিটায় একটা বেডকভার পাতা। চৌকিটা দেওয়ালে লাগানো। উনি ওঁর পিঠের ভর দেওয়ালে রেখেছেন।

যুবতী বলল, এখনও আমাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না মাস্টারমশাই? আমি কি গিয়ে আপনার পাশে বসব? চৌকিতে? বলে যুবতী উঠে পড়ল।

উনি হাসলেন আবার। না। অত কাছে বসলেও ঠিক দেখা যায় না। দেখতে হলে একটু দূরে থাকা দরকার। কী, তাই না শেখর?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুবকটি বলল, শোভন। আমার নাম শোভন।

উনি বললেন, দেখেছ, বয়সের এই দোষ, নাম ভুলে যাই।

যুবকটির মুখে ছায়া পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তার মুখের পিছনদিক থেকে আলো আসছে বলে, সেই ছায়া উনি দেখতে পেলেন না। যুবতীটি দেখতে পেল।

যুবতী বলল, আপনি ভুল করেননি মাস্টারমশাই। আমি আগে যার সঙ্গে আসতাম তার নাম শেখর। ও আমার নতুন বন্ধু, শোভন।

শোভন উঠে দাঁড়াল, আমি তা হলে আমার কাজটা একটু সেরে আসি।

যুবতী বলল, আচ্ছা! উনি তাকালেন স্মিত মুখে। যুবকটি বলল, যাই স্যার। বলে, এগিয়ে এসে হাঁটু ছোঁবার একটা ভঙ্গি করল। উনি বললেন থাক, থাক। যুবকটি বেরিয়ে যাওয়ার পরে-পরেই গাড়ি স্টার্ট করার আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে থেকে।

যুবতীটি বলল, আগে আমি শেখরের সঙ্গে থাকতাম, এখন এর সঙ্গে থাকি। শোভনকে আগে আপনি মাত্র একদিন দেখেছেন। শেখরকে অনেকবার।

উনি বললেন, আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ওকে বোলো যেন কিছু মনে না করে। যুবতীটি উঠে এসে চৌকির সামনে মেঝেতে বসল। উনি বললেন, এ কী, এখানে বসছ কেন! মেঝেতে? কী কাণ্ড বলো তো।

যুবতীটি বলল, মাস্টারমশাই, এখানে বসলে আমি যে আপনার মুখটা ভাল করে দেখতে পাব। তাই বসলাম। কিন্তু আপনার সামনে আজ হারমোনিয়মটা নেই কেন মাস্টারমশাই? আগের দিনও ছিল না।

উনি হাসলেন। পানের বাটা খুলে একটা পান বানাচ্ছেন তখন। বললেন, হারমোনিয়মের কাজ ফুরিয়েছে।

যুবতী বলল, আমাকে একটা দেবেন কিন্তু। পান।

উনি হাসলেন, কোনওদিন এমন হয়েছে, তুমি পাওনি। নাও, প্রথমটাই তো তোমার।

পানটা এগিয়ে দিলেন। যুবতী বলল, হারমোনিয়মের কাজ ফুরিয়েছে বলছেন কেন মাস্টারমশাই?

উনি বললেন, কারণ আমার গলা ফুরিয়েছে।

যুবতী বলে, কিন্তু আপনি যে বলতেন গান গলা থেকে হয় না। গান হয় জীবন থেকে। বলতেন যেটুকু পারবে গাইবে। আমিও যেটুকু পারি, সেটুকু গাই। বলতেন তো?

উনি বললেন, দাঁড়াও, একটু আসছি।

যুবতী বলল, কোথায় যাবেন? কী দরকার বলুন আমাকে।

যুবতী জানে, এ-বাড়িতে অনেকদিন হল কেউ থাকে না, মাস্টারমশাই ছাড়া। রান্নার লোক একজন আসে। বাসন ধোয়া ঘর মোছার একজন। আজ ভেতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। যুবতী জিগ্যেস করল, আজ মীরার মা রান্না করতে আসেনি?

উনি বললেন, এসেছিল। চলে গিয়েছে। আমি বাথরুমে যাব।

উনি ধীরে-ধীরে উঠলেন। দেওয়ালের ধারে দাঁড় করানো লাঠিটা নিলেন, কষ্ট করে

~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ালেন। যুবতী বলল, আমি ধরব মাস্টারমশাই? উনি মাথা নাড়লেন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভেতরে চলে গেলেন।

যুবতী ঘরে বসে রইল একা। তার মনে পড়তে লাগল, এই সেই ঘর। একদিন ছাত্রছাত্রী ভরা এই ঘরটার চেহারা কত অন্যরকম ছিল। বরাবর মাস্টারমশাইয়ের কাছে সে এই বাড়িতেই আসে। হ্যাঁ, ১৮ বছর হল। তখন তার বয়সও ছিল ১৮। এখন ৩৬। গানে ভরে থাকত ঘর। জানলা দিয়ে গান বেরিয়ে যেত বাইরে। যুবতীটি এই বাড়ির গলিতে পা দিয়েই তার ভেতরের রক্তস্রোত দ্রুত হয়ে উঠছে বুঝতে পারত। গলিরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গান যেন তাকে ডাকত। আর একথা আজকে সে অস্বীকার করতে পারবে না কেবল গানই তাকে ডাকত না। তাকে ডাকতেন মাস্টারমশাইও।

সে যখন মাস্টারমশাই-এর কাছে আসে তখন মাস্টারমশাইয়ের বয়স ৫৬। নামকরা গাইয়ে ছিলেন না কোনওদিনই। ডাক পেলেও সব জায়গায় যেতেন না। সে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখত মাস্টারমশাই হারমোনিয়ম ধ'রে একটা করে লাইন বলছেন, সবাই গেয়ে উঠছে। সে মাস্টারমশাইয়ের দিকে না-তাকিয়ে দেওয়ালের একটা কোণ ঘেঁষে বসে পড়ত। অনেকক্ষণ পর হয়তো মাস্টারমশাইয়ের খেয়াল হত। বলতেন, কী, তুলেছ আগের দিনের গানটা? গাও তো একটু।

সে কোনওদিন গাইতে পারত না। গলা কেঁপে, সুর ছুটে গিয়ে, কথা ভুলে বিচ্ছিরি একটা অবস্থা তৈরি করত যা মাস্টারমশাইয়ের কোনও স্টুডেন্ট করত না। মাস্টারমশাই বকতেন না। হাসতেন। প্রথম প্রথম এইরকম কেটেছে বছর দেড়েক তো বটেই। অথচ বাড়িতে যখন সে নিজে প্র্যাকটিস করছে, কই ওরকম তো হচ্ছে না। ঠিকঠাকই তো যাচ্ছে সব। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের সামনে এলেই সমস্তটা অন্যরকম হয়ে যেত।

দরজার বাইরে ঠুকঠুক লাঠির শব্দ পাওয়া গেল। ঘরের ভেতরকার অন্ধকার থেকে মাস্টারমশাইয়ের সাদা ফতুয়া আর ধুতি পরা চেহারাটা দৃশ্যমান হচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন যখন, মাস্টারমশাইয়ের মুখটা দেখে সে চমকে উঠল।

সে বলল, কী হল? খুব কষ্ট হল মাস্টারমশাই?

উনি স্রেফ হাসলেন। কষ্ট তো হয়ই। কখনও কখনও বাড়ে। এখন যেমন...

সে বলল, তাই দেখলাম, অনেকটা সময়ও লাগল।

উনি বললেন, যত সময়, তত কষ্ট। জরা তো। এইসব তো হয়ই। এসব জরার ব্যাধি। বিছানা কত সময় নষ্ট হয় রাতে, জানোই তো। সে বলে, আমি তো অয়েলক্লথ দিয়ে গিয়েছিলাম মাস্টারমশাই। আরও দু'টো দিয়ে যাব তা হলে। না না। আর লাগবে না।

আস্তে-আস্তে চৌকিটায় উঠে বসলেন উনি। অল্প-অল্প হাঁফাচ্ছেন। যুবতী যেখানে বসেছে সেখান থেকে বাড়ির প্রায়ান্ধকার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। যুবতী এ বাড়িতে এতদিন আসছে বলে, সবটাই তার মুখস্থ। এই বাড়িটায় মাস্টারমশাই আছেন ২৫ বছরের বেশি। ভেতরের দিকে কোনও জানলা নেই। এই জায়গাটায় খাওয়ার টেবিল পাতা। যদিও ব্যবহার হয় না। ভেতরটা অন্ধকার থাকে। বারান্দায় যে ফুলের টবগুলো রাখা তার

~ www.amarboi.com ~

একটাতে মরা শুকনো ফুলগাছের শব। বাকিগুলো শুধু মাটি ভরা। পড়ে আছে। পড়েই আছে। কতদিন যে হল।

যুবতী বলল, টবগুলো বারান্দায় পড়ে আছে। আজ তো রোববার। আপনার তো একজন মালি আসত। এখন আসে না?

উনি হাসলেন। বললেন, আজ তো রোববার। রোববার কত ছাত্রছাত্রী আসত। এখন তো তারাও আসে না। মালি কেন আসবে? আর আসতে বলব কোন ভরসায়?

যুবতী বলল, একটা গান করুন মাস্টারমশাই। করবেন?

উনি আবার, আবারও হাসলেন। প্রতি কথায় হাসেন। আর এই হাসিটা একেবারেই কান্নার মতো দেখাল। গান ফুরিয়ে গিয়েছে। বললাম না তোমাকে।

তা কখনও হয় মাস্টারমশাই?

হয়ই তো। সেই জন্যই তো ছাত্রছাত্রীদের আসতে বারণ করে দিয়েছি। তাও তো ক'বছর হল।

যুবতী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে। শীর্ণ মুখ ভেঙে করোটির মতো সুঁচালো। নাক আরও খাড়া হয়েছে যেন। চোখ চলে গিয়েছে আরও আরও বেশি করে কোটরের ভিতরে। শুধু চোখের তারা এক-একটা কথায় জ্বলজ্বল করে ওঠে। যুবতী বলল, গান কখনও ফুরিয়ে যায় মাস্টারমশাই?

উনি মাথা নাড়লেন। না। তা যায় না।

তা হলে বলছেন কেন আপনার গান ফুরিয়ে গিয়েছে?

বললেন, তুমি একটা কাজ করবে? ভেতরের টেবিলটা থেকে আমাকে একটা জলের বোতল এনে দেবে?

মীরার মা রোজই কয়েকটা বিসলেরি-র বোতলে খাওয়ার জল ভরে রেখে যায়।

যুবতী দ্রুত উঠে জলের বোতলের সঙ্গে একটা গ্লাস এনে জল ঢেলে দিল তাতে।

উনি বললেন, গ্লাসের দরকার ছিল না। বোতল থেকেই খেতে পারতাম জল। বলে গ্লাস থেকে একটু জল খেলেন। এবার হাঁফ ধরাটা একটু কমেছে। বললেন, তুমি কি চা খাবে? ইচ্ছে করছে?

যুবতী মাথা নাড়ল। না। খাব না। ইচ্ছে করছে না। আপনি খেলে খাব।

উনি বললেন, শোনো, চা বানাতে গেলে তো তোমাকেই গিয়ে বানাতে হবে। তার চেয়ে আমার সামনে দু'দণ্ড বোসো। উঠে যেও না এখন।

যুবতী মাথাটা নামাল। উনি দম নিলেন। হ্যাঁ, গান কখনও ফুরিয়ে যায় না। ভেতরে-ভেতরে চলে। ও কথাটা অবশ্য ঠিক।

যুবতী মাথা তুলল। তবে যে বলছেন গান ফুরিয়ে গিয়েছে আপনার।

বাইরে থেকে। বাইরে থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে। ভেতরে ভেতরে তো অবিরাম গান শুনি আমি।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

যুবতী বলে, গান শোনেন? গান করেন না?

~ www.amarboi.com ~

উনি আবারও হাসলেন, করতে গিয়ে বুঝি আর হবে না। তাই মনে-মনে শুনি।

বলে আর একটু জল খেলেন উনি। এই সময় মোবাইলের আওয়াজ হতে থাকল। উনি সচকিত হয়ে তাকালেন, তোমার... তোমার টেলিফোন বোধহয়... হ্যাঁ-অ্যা, বলে যুবতী উঠে গেল দ্রুত। আগে যে-সোফায় সে বসেছিল সেখানেই তার ব্যাগটা রেখে সে মেঝেতে, মাস্টারমশাইয়ের চৌকির সামনে বসে আছে এখন। ব্যাগ খুলে ফোন ধরে বলল, আমার দেরি হবে, তুমি চলে যাও। আমি পৌঁছে যাব। কখন যাব বলতে পারছি না। তুমি চলে যাও। বলে যুবতী বলল, এবার এটা বন্ধ করে দিই। নইলে কখন আবার বেজে উঠবে।

মেঝেতে বসে যুবতী আবার বলল, মনে মনে গান শোনেন? সিডি চালিয়ে শোনেন না কেন? তাছাড়া আপনার তো রেকর্ড চালানোর সিস্টেমও আছে মাস্টারমশাই।

এখন আর নেই। খারাপ হয়ে গিয়েছে।

সে কী। কত গান আমাদের রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছেন।

উনি আবার হাসলেন। নিজের গাওয়া তো কোনওদিনই পছন্দ হত না। কী আর গাইতে পারতাম। ওইজন্য রেকর্ড বাজিয়ে দেখাতাম, কেমন হওয়া উচিত গানটা।

যুবতী বলল, ওই আপনার দোষ মাস্টারমশাই। সব সময় বলে এসেছেন, আমি আর কী এমন গাইতে পারি। আমার কিন্তু আপনার গাওয়া খুব ভাল লাগে। এখনও।

সে তো তুমি আমায় পছন্দ করো তাই। কাউকে পছন্দ করলে কী হয় জানো তো? জানো না!

যুবতী মুখ তুলে তাকাল। এখন, যদি কেউ যুবতীর ওই মুখ তুলে তাকানোটা দেখতে পায়, তার কী মনে হবে? যুবতীর ওই মুখ তুলে তাকানোটা যে কোনও জায়গা থেকে দেখলে হবে না কিন্তু। উনি যেখানে বসে রয়েছেন, ওঁর পিঠ আর দেওয়ালের মাঝখানে সামান্য ফাঁক। উনি কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু পিছিয়ে বসে পিঠের ভর দেওয়ালে রাখেন। কখনও একটু সামনের দিকটায় ঝুঁকে বসেন। এখন সামনের দিকটায় একটু এগিয়ে বসেছেন, ফলে দেওয়াল আর ওঁর পিঠের মাঝখানে সামান্য ফাঁক। সেই ফাঁকের মধ্যে যদি কেউ দাঁড়ায়, এবং ওঁর কাঁধের পাশ দিয়ে বা মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে যুবতীর মুখ তোলাটা দেখতে পাবে।

কিন্তু ওই সামান্য একটু জায়গার মধ্যে গিয়ে কে দাঁড়াবে? কারও কি দাঁড়ানো সম্ভব?

একজনের পক্ষে সম্ভব। সে গিয়ে দাঁড়াল।

কে দাঁড়াল?

সুর।

কী দেখল?

দেখল যুবতীর ওই মুখ তুলে তাকানো দেখে মনে হবে না তার সামনে কোনও ৭৪ বছরের রোগজীর্ণ বৃদ্ধ বসে আছেন। ওই দৃষ্টি দেখে মনে হয়, যে সে দেখছে কোনও রূপবান প্রেমিককে।

~ www.amarboi.com ~

সুর আপনমনে হাসল। সুর জানে উনি কী উত্তর দেবেন। উনি সেই উত্তরটাই দিলেন।

উনি বললেন, যখন কেউ কাউকে পছন্দ করে তখন যাকে পছন্দ করে তার দোষটাকেই গুণ বলে ভাবে সে। কিন্তু তাতেও তো দোষটা দোষই থেকে যায়।

যুবতী মুখ নামাল। তারপর বলল, আপনাকে একটা সিডি প্লেয়ার এনে দেব আমি। আর শোভনকে বলে দেখছি রেকর্ড বাজানোর সিস্টেমটা কোথাও থেকে সারানো যায় কি না। খোঁজ নিতে হবে।

উনি বললেন, কোনও দরকার নেই। আমি মনে-মনে বেশ শুনতে পাই। যখনই ইচ্ছে করে শুনতে পাই। যেমন ধরো 'সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে/পিছে পিছে তব উড়ায়ে চলুক তারে/ধূলায় ধূলায় দীর্ণ জীর্ণ না হোক সে পলে পলে।'

ধীরে-ধীরে লাইনগুলো উচ্চারণ করলেন উনি। যুবতীর মুখ আলো হয়ে উঠল। মেঝেতে ঘষে-ঘষে একটু এগিয়ে বসল সে। বলল, করুন না মাস্টারমশাই, একবার করুন না গানটা।

সুর তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সুর দেখল যুবতীর ওড়নার একটি প্রান্ত তার কাঁধে, অন্য প্রান্তটি খসে পড়েছে হাঁটুর ওপর। তার কামিজের নীলচে রঙের ওপর ঘরের দেওয়ালে লেগে প্রতিফলিত রোদের প্রতিক্রিয়া তার মুখকেও উজ্জ্বল নীলের আভা দিচ্ছে। সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যুবতীর চোখের তারা। সে উজ্জ্বলতা দেওয়াল থেকে ঠিকরে আসা রোদের উজ্জ্বলতা নয়। সুর জানে, সুর খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে, যুবতীর মনের ভেতরে, এইমাত্র রোদ উঠল। মাস্টারমশাইকে গানের কলি মুখে বলতে শুনেই রোদ উঠল। কারণ এইবার যদি মাস্টারমশাই একটা গান করেন— এ হল সেই সম্ভাবনার রোদ।

যুবতী আবার বলে, করুন না, মাস্টারমশাই, একটু করুন না। হারমোনিয়মটা নিয়ে আসি ভেতর থেকে। উনি আবার কান্নার মতো হাসলেন—না। পারব না। এই গান পারব না। হবে না।

যুবতী বলে, সে কী মাস্টারমশাই। এই গান তো আপনি আমাদের তুলিয়েছিলেন। কতবার এই গান গেয়েছেন আপনি। পারবেন না, কেন?

উনি বললেন, মনে আছে কীভাবে শিখিয়েছিলাম?

যুবতী বলল, হ্যাঁ, আগে একটা রেকর্ড বাজিয়েছিলেন। উনি বললেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত-র গাওয়া। আমি মনে-মনে সন্তোষবাবুর গলাটা শুনতে পাই যে। এই গান তো কত শিল্পীই গেয়েছিল। কিন্তু সন্তোষবাবু যখন বলেন 'আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে/লুপ্ত আলোয়, পাখির সুপ্ত গানে/শান্তি-আবেশে যদি অবশেষে ঝরে ফুল ধরাতলে'— তখন তো আমার কথাই বলেন। যখন বলেন, 'ধূলায় ধূলায় দীর্ণ জীর্ণ না হোক সে পলে পলে', তখন সেটা আমারই প্রার্থনা। আমি তো এখন আর কিছু চাই না। একটু শান্ত ভাবে মরতে চাই। হাসপাতালে, প্রত্যেকদিনের বেড়ে উঠতে থাকা যন্ত্রণায় টুকরো-টুকরো হতে-হতে যেন মরতে না হয়। বলো, তাই না?

~ www.amarboi.com ~

যুবতী একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর শিরা ওঠা, নখ বড় হয়ে ওঠা, কালো-কালো পিগমেন্ট ফুটে ওঠা পায়ের পাতা চেপে ধরল। চুপ করুন। যুবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ। আমরা তো আছি।

যুবতী ওঁর পা চেপে ধরায় ওঁর কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। উনি আপন মনে বলে চললেন, প্রশ্ন করতে পারো, এসবই তো রবি ঠাকুরের কথা। তিনিই তো এসব, আমাদের সবার জন্য, সব বয়সের জন্য বলে রেখে গিয়েছেন। তবে আমি সন্তোষ সেনগুপ্তের কথাই বলছি কেন। এক-একজন মেয়েকে যেমন এক-একজন পুরুষের হঠাৎ ভাল লেগে যায়। তারপর সেই হঠাৎ ভাললাগার পর দু'টো অবস্থা হয়। এক তো ধরো সেই ভাললাগার ক'দিন পরে, কয়েক মাস পরে সরে গেল। এটা হয়। আর অন্য যেটা হতে পারে, সেই ভাললাগাটা দিনে-দিনে বেড়েই চলল। আমার দ্বিতীয়টা হয়েছে। সন্তোষবাবুর ক্ষেত্রে।

যুবতী বলে, এসব ভাববেন না মাস্টারমশাই। অসুখ কি মানুষের হয় না? গানই আপনার ওষুধ। গানটা একটু করুন না। যে গান গাইতে ইচ্ছে করছে, করুন।

উনি চুপ করে বসে রইলেন। দরজার পাশ থেকে সুর তখন গাইছে : আমি বাঁধিনু তোমার তীরে, তরণী আমার। একাকী বাহিতে তারে পারি না যে আর।

যুবতী বলে, কী মাস্টারমশাই, চুপ করে রইলেন কেন? গান একটাও শোনাবেন না?

যুবতী বুঝতে পারছে না সুর তখন গাইছে। মাস্টারমশাই শুনছেন। যুবতী একটু চুপ করে রইল। উনিও। প্রথম দু'কলি বার দুয়েক ফিরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে সুর চুপ করে গেল।

যুবতী বলল, বেলা হয়ে গিয়েছে অনেক। আপনি খেয়ে নিন মাস্টারমশাই। অবেলায় খেলে শরীর খারাপ করবে।

উনি বললেন, আমি সকালে উঠে স্নান করে একেবারে খেয়ে নিই। মীরার মা এসে রান্না করে দেয় যখন। তখনই। তুমি তো কিছু খেলে না। এক কাজ করো। ও-ঘরে খাবার টেবিলটার ওপর একটা কৌটোয় মুড়ি আছে। নিয়ে আসবে? যুবতী উঠে যায়। উনি দেখেন সামনের বাড়ির ছাদে রোদ ঢালু। মেয়েটার কিছু খাওয়া হল না। দু-চারটে সন্দেশ ফ্রিজে থাকতে পারে। বাইরের লোকের জন্য রাখা। ওঁর নিজের তো খাওয়া বারণ। ইচ্ছেও করে না। আর এ-মেয়েকে বললেও খাবে না। যেভাবে সব ছেড়ে এসেছেন জীবনে, কাউকে 'খাও' বলার অনুরোধটুকুও ছেড়ে দিয়েছেন। যুবতী ঘরে ঢুকল। একটা বড় পাত্রে মুড়ি মেখে এনেছে। বাদাম, তেল, লঙ্কা। বাটিটা চৌকির ওপর রেখে যুবতী বলল, পেঁয়াজটাই পেলাম না। উনি বললেন, ফুরিয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। মীরার মা তো বাজারটাও করে। নিয়ে আসবে আবার। বাঃ বেশ হয়েছে। বাদাম পেলে কোথায়?

একটা শিশিতে দেখলাম রাখা ছিল। এক বাটি থেকেই দু'জনকে হাত ডুবিয়ে মুড়ি তুলতে হচ্ছে। উনি বললেন, কেন রেকর্ড চালিয়ে তোমাদের শোনাতাম জানো? চাইতাম সবচেয়ে ভাল জিনিসটা শোনো। ভাবটা শোনো। ভাবটা। যুবতী বলল, এত যে বলতেন সন্তোষ সেনগুপ্তের কথা, একদিনও ওঁর কাছে তো গেলেন না।

উনি একমুঠো মুড়ি তুললেন। অন্য মুঠোয় একটু ঢাললেন। তারপর দু'হাতে দু'মুঠো মুড়ি নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। কেন যাইনি জানো?

~ www.amarboi.com ~

কেন?

তখন সন্তোষ সেনগুপ্ত একবার বললেই রেকর্ড কোম্পানিরা সবার রেকর্ড বার করে দিত। উনি যদি ভাবতেন আমিও ওঁকে দিয়ে আমার রেকর্ড বার করানোর জন্য এসে ওঁর গানের সুখ্যাতি করছি? না না...সে বড় লজ্জার হত। সে বড় লজ্জার...। যুবতী বলে, এইটুকুর জন্য গেলেন না মাস্টারমশাই? এটা হতেও তো পারত, উনি আপনার গান শুনে রেকর্ড বার করার ব্যবস্থা করে দিলেন? যদি হত? আপনি সারাজীবন ধরে গাইলেন মাস্টারমশাই, এত ছাত্রছাত্রী তৈরি করলেন—কিন্তু আপনার গানের তো কোথাও কোনও চিহ্ন রইল না। আমি কয়েকটা গান ভাগ্যিস টেপ করে রেখেছি। ওইগুলোই আছে।

ছাত্রছাত্রীদের আমি তৈরি করিনি। ওদের নিজের শক্তিতেই ওরা দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়ান, আমি একটা নতুন সিডি প্লেয়ার এনে দেব আপনাকে। গান শুনতে-শুনতে আবার আপনার গাইতে ইচ্ছে করবে। উনি বললেন, ওই যে বললাম, মনে-মনে গান শুনি। এখন, একলা বাড়িতে, তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর আগে শোনা গানগুলো মনে এসে একেবারে অবিকল ধরা দেয়। তখন যেমন শুনেছিলাম, এখন যেন তার চেয়েও বেশি করে শুনতে পাই। আচ্ছা তোমার ওই গানটা মনে আছে তো, আলোকের এই ঝরনাধারায়। মনে আছে না?

যুবতী সাগ্রহে মুখ তুলে বলে, গাইব মাস্টারমশাই? শুনবেন আপনি?

শুনব। কিন্তু পুরো গানটা নয়। গানের ওই লাইনটা করো তো একবার... ওই যে...

যুবতী একটু বিভ্রান্ত। বলে, পুরো গানটা নয়? একটা লাইন?

হ্যাঁ হ্যাঁ একটা লাইন। ওই যে, হ্যাঁ মনে পড়েছে "বিশ্ব-হৃদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া', এই জায়গাটা করো।

যুবতী যেমন অবাক, তেমন একটু হতাশও যেন। বলছে, শুধু এই লাইনটা মাস্টারমশাই? এই লাইনটা গাইব? এবার উনি সোজা হয়ে বসেছেন। কোটরে ঢোকা চোখের তারা জ্বলজ্বল করছে। করো, করো, হ্যাঁ।

যুবতী আচমকা একটা গানের একদম মাঝখানটায় এসে পড়ে কিছুটা হতচকিত। বলল, একটু আগে থেকে ধরব?

না-আ। বলছি তো। শুধু ওই লাইনটা। দেরি কোরো না। শীর্ণ শরীরটা খাড়া হয়ে বসেছে। মুখে উত্তেজনার আভা। গলার স্বর হঠাৎ কঠোর। যুবতী জানে এই কঠোরতা তার প্রতি নয়। উনি আসলে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এই মুহূর্তে শুনতে চান। যুবতী অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে গানটা শুরু করতে সাহস পাচ্ছিল না। যদি ভুল হয়। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে সুর একটু হেসে নিঃশব্দে বলল, আমি তো আছি। করো। যুবতী হঠাৎই শুরু করে দিল বিশ্ব-হৃদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হা-ও-য়া-য়া-য়া, মাস্টারমশাই চৌকিতে এগিয়ে বসলেন, বললেন আবার—আবার করো। যুবতী কিছু না বুঝেই গাইল বিশ্ব-হৃদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হা-আ-ও-য়া-য়া-য়া-য়া। এবার থামতেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাস্টারমশাই ছটফট করে উঠলেন : আঃ থামছ কেন? করো করো। ওই গানটাই। একদম থামবে না। করো। করো না-আ।

মাস্টারমশাই উঠে দাঁড়িয়েছেন চৌকি থেকে। লাঠি ছাড়া। যুবতী মাস্টারমশাইয়ের মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে ওই লাইনটাই বারবার গাইতে থাকল, আর কী অদ্ভুতভাবে তার মনে পড়ল এক্ষুনি মাস্টারমশাই তাকে যেভাবে গান থামানোর সময় বকে উঠে বললেন আঃ থামছ কেন, ঠিক ওইভাবেই, বলে, বকে ওঠে শোভন, আদরের সময়। আর সেটা তাকে ওইসময় আরও সক্রিয় করে। এই আদর করার সময়টা এখন মনে পড়ল ভেবে যুবতী একটা অস্বস্তি বোধ করলেও, জগতের সবকিছু ভুলে ওই লাইনটাই গেয়ে গেয়ে চলবার চেষ্টা করে চলল চোখ বুজে। কয়েকবার এই লাইনটি গাইবার পর সে নিজেই, 'সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও' গেয়ে 'আলোকের এই ঝর্নাধারায়' পৌঁছে গেল। তারপর আরও দু-তিনবার গাইল প্রথম কয়েকটা লাইন। হঠাৎ সে খেয়াল করল মাস্টারমশাই যেন কিছু বলছেন। যুবতী চোখ খুলল। মাস্টারমশাই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটা অনেক শান্ত। চোখ দু'টো দরজার বাইরে তাকিয়ে আছে। মাস্টরমশাই কী বলছেন! বলছেন, দেখলে কী কাণ্ডটা হল?

যুবতী অস্ফুটে বলল, কী।

দেখলে না, হাওয়াটা আমাদের জানালার পরদা উড়িয়ে, পাশের বাড়ির ছাদে শুকোতে দেওয়া কাপড়জামা দুলিয়ে, ওই বড় বড় গাছগুলোর পাতা ঝাঁকিয়ে দিয়ে কো-ও-থায় চলে গেল। হাওয়াটা কেমন গেল দেখলে? করো। করো আবার।

যুবতী আবার গাইল। হা-ও-ওয়া-য়া-য়া-য়া।

দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো। দেখলে তো? মাস্টারমশাইয়ের চোখ আবার উজ্জ্বল। মুখে আনন্দের আভা।

যুবতী মাস্টারমশাইয়ের মুখ থেকে চোখ সরাতে পারে না। বলে, হ্যাঁ-অ্যা।। হ্যাঁ মাস্টারমশাই, দেখলাম। তার গলা রুদ্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু তার মাস্টারমশাই সেকথা খেয়াল করেন না। বলেন, এবার ওইটা বলো তো। ওই টা। ওই টা।

যুবতী মুখ তুলে ধরে আছে। সে হাঁটুর ওপর ভর করে অর্ধেক উঠে তাকিয়ে আছে উদগ্রীব। তার ওড়না মেঝেতে এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে। অপরাহ্নের আলোতে সেই ওড়না যেন এক সরু নদী। সুর শুধু সেই নদীকে দেখতে পাচ্ছে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে।

যুবতী শুনল, আচ্ছা, মনে পড়েছে। ওইটা গাও তো । ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান।

যুবতী বলল শুধু এই একটা লাইন গাইব মাস্টারমশাই? না। পরের দু'টো লাইনও গাও। বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ পর্যন্ত। তার ওদিকে যাবে না। হয়ে গেলেই আবার ফাগুন-এ ফিরে আসবে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

যুবতী গাইতে শুরু করল। ফাগুন, হাওয়ায়-হাওয়ায় করেছি যে দান—/ তোমার

~ www.amarboi.com ~

হাওয়ায়-হাওয়ায় করেছি যে দান/আমার আপন হারা প্রাণ আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ/ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায়...তিনবার চারবার পাঁচবার। যুবতী দেখছে, এইটুকু বারবার গাইতে গাইতেই কেমন ঘোর তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যেন গানটার অন্তরায় যাওয়ার দরকারই হচ্ছে না তার।

যুবতী থামতেই উনি বললেন, দেখলে এই হাওয়াটা কত অন্যরকম? দেখলে তো? যুবতী হাওয়াটাকে দেখতে পাচ্ছে তা নয়, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের মুখে একটা হাসি দেখছে। যে-রকম হাসি সে যখন প্রথম-প্রথম ক্লাসে আসত তখন দেখত। আর এখন, কত কতদিন যে ওই হাসিটা দেখেনি মাস্টারমশাইয়ের মুখে, যুবতী মনেও করতে পারে না। মাস্টারমশাই অবশ্য যুবতীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেননি। বলছেন, দেখেছ, এই হাওয়াটা কেমন তোমাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরছে। দেখেছ? করো করো, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় আবার করো। প্রথম দু'লাইন এবার। আহ্। করো না।

যুবতী বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা আবার অনুভব করল কিন্তু গাইতে শুরু করে দিল তৎক্ষণাৎ, আর প্রথম দু'টো লাইন গাইতে গাইতে সে দেখল মাস্টারমশাইয়ের মুখে আবার সেই হাসিটা। মাস্টারমশাই বলছেন, দেখলে হাওয়াটা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না। তোমাকে বেষ্টন করেই রয়ে যাচ্ছে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। হাওয়াটা। আচ্ছা এবার, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া' এই লাইনটা মনে করো। না, না। গাইতে বলছি না। শুধু মনে করো। মনে করছ? করো। মনে মনে করো। করছ?

যুবতীর মুখটা তার অজান্তেই নিচু হয়ে আসে। বলে, হ্যাঁ মাস্টারমশাই। যুবতী শোনে, মাস্টারমশাই বলছেন, আহ্। মুখটা নিচু কোরো না। আমার দিকে তাকিয়ে শোনো। কী দেখছ? সাদা পালে একটা হাওয়া ঢেউ দিয়েই চলে গেল। কী, তাই না? দেখছ তো? হ্যাঁ মাস্টারমশাই। যুবতী এবার পূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে মাস্টারমশাইয়ের দিকে। বলে, আপনি বসুন মাস্টারমশাই, দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

আহ্। কথাটা বলতে দাও। কথার মাঝখানে কথা বলছ কেন? বলছি, এই তিনটে হাওয়া কেমন তিনরকমের দেখলে তো? দেখলে না? এই যে 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'। এখানে পালে যে অল্প ঢেউ লাগল সেটা সুরের মধ্যে আছে। আর হাওয়াটা যে-ঢেউ দিয়ে চলে গেল হাওয়া-আ। সেটাও সুরের মধ্যে আছে। আবার বিশ্বহৃদয় থেকে যে হাওয়া ধেয়ে আসছে তার মতো সর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে দিগন্তের দিকে চলে যাওয়া হাওয়া এটা নয়। এই হাওয়া মন্দ মধুর। তাই পালে ঢেউ দিল। তাই 'পালে' কথাটায় সুর এসে সেই ঢেউটুকু মাত্র দিচ্ছে। আর এই হাওয়া, বিশ্বহৃদয় থেকে ধেয়ে আসছে না বলে দিকে-দিগন্তরে চলে গেল না ঠিকই—কিন্তু পালের সঙ্গে থাকলও না। একটু থেকেই, একটু ঢেউ দিয়েই, চলে গেল। হ্যাঁ। এই হাওয়াও চলেই গেল। সেইজন্যই সুরে যখন পড়ছে 'হাওয়া' কথাটা তখন হাওয়াটা কেমন একটু ছুঁয়েই তার চলে যাওয়াটা দেখিয়ে দিচ্ছে বলো। দিচ্ছে তো, তাই না?

মাস্টারমশাই এবার আপনি একটু বসুন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ বসব। আমার... আমার লাঠিটা? যুবতী দ্রুত উঠে বলল আমি ধরছি। চলুন। উনি অবসন্ন হয়ে পড়েছেন এতক্ষণ কথা বলার উত্তেজনায়।

যুবতী ওঁর হাত ধরল। রোগা হয়ে যাওয়া হাত। শিরা উঠে উঠে আছে। হাতের লম্বা আঙুলগুলো কঙ্কালের আঙুলের মতো। যুবতী খুব যত্ন করে মাস্টারমশাইয়ের হাত আর কাঁধ ধরে তাঁকে বসিয়ে দিল চৌকির ওপর। বলল, মুড়িটা কিন্তু পড়ে আছে মাস্টারমশাই। উনি বসলেন, বসে বললেন, ধরো 'বৃষ্টি শেষের হাওয়া' গানটা। ধরো। 'তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন'। কিংবা, 'কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন'। এ গানগুলো জানো তো? যুবতী বলে, সবগুলো জানি না।

জানতে হবে না। শুনেছ তো। শোনোনি?

হ্যাঁ মাস্টারমশাই। শুনেছি। অনেকবার। তোলা হয়নি।

তুলতে হবে না। মনে মনে শুনে দ্যাখো। এর প্রত্যেকটা হাওয়া আলাদা।

এমনভাবে রয়েছে সবটা এক-একটা হাওয়া যে এক-একরকম, সেটা সুরটাই বলে দিচ্ছে।

যুবতী আবার মেঝেতে বসেছে। বলল, এরকমভাবে তো কোনওদিন ভাবিনি মাস্টারমশাই। গানগুলো গেয়ে গিয়েছি।

মাস্টারমশাই বললেন, শুধু গেয়ে গেছ বলছ কেন? শুনেছ তো। শুনেও গেছ। এই আমার কাছেই। শোনোনি?

হ্যাঁ মাস্টারমশাই।

উনি মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেঝের ওপর এঁকে বেঁকে পড়ে থাকা যুবতীর ওড়না রোদের সঙ্গে মিলেমিশে যে নদী তৈরি করেছিল, তার ওপর থেকে আলো সরে যাচ্ছে তখন। উনি বললেন, ভুল শিখিয়েছি তোমাদের। আজীবন ভুল শিখিয়েছি।

যুবতী ভয় পায়, কেন মাস্টারমশাই? আমি লাইনগুলো কোথাও ভুল গাইলাম? কোন জায়গাটায় ভুল গাইলাম মাস্টারমশাই? আচ্ছা আপনি গাইতে না চান, ভেতরের ঘর থেকে স্বরবিতান নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখব একটু? দেখব, মাস্টারমশাই?

উনি আবার হাসলেন। আবার সেই হাসি কান্নার মতো দেখাল। শীর্ণ চোয়ালের উঁচু হয়ে থাকা হাড়ের ওপরের ত্বকে কাঁপন উঠল একটু। কান্না চাপলেন কি? যুবতী হতবুদ্ধি। কী এমন বলে ফেলল সে? না-বুঝে? মাস্টারমশাইয়ের মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন? এত কি ভুল গাইছিল সে? তা হলে সে গাইবার সময় মাস্টারমশাই অত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন কেন? ভুল যদি গায় উনি তো থামাবেন। চিরকালই ভুল গাইলে তো থামিয়ে দিতেন গানের মাঝখানেই। শেখানোর সময় তেমনই তো করতেন। তবে?

সারাজীবন তোমাদের স্বরলিপি ধরে ধরে শিখিয়েছি। নিজে যতটুকু গেয়েছি, কেবল স্বরলিপি অনুসরণ করে গিয়েছি। গানটাকে শুনিনি। গান গেয়েছি। গান শিখিয়েছি। গানটাকে শুনিনি। এখন মনে-মনে যখন শুনি তখন বুঝি, গানকে শুনিইনি।

যুবতী বিমূঢ়। এ কী বলছেন মাস্টারমশাই? স্বরলিপি ধরেই তো চলতে হবে। রবি

~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরের গান স্বরলিপির এদিক-ওদিক তো করা যায় না। আপনিই বলতেন। সকলেই তো তাই বলেন।

বাইরের রোদ এখন পাশের বাড়ির ছাদের জলের ট্যাঙ্কের মাথা ছেড়ে পিছন দিকে চলে গিয়েছে। ঘরে হাওয়া মাঝে-মাঝে ঢুকছে। আলো প্রবেশ করার সময় অতিক্রান্ত। সুরকেও আর দেখা যাচ্ছে না দরজার ধারে। উনি বললেন।

ওই যে হাওয়াগুলোর কথা বললাম। তার তিনটে হাওয়া তুমি গাইলে। গাইলে তো, তিনটে হাওয়া তো গাইলে নিজেই? বলো?

হাওয়া? গাইলাম?... হ্যাঁ তাই তো। গাইলাম তো। তিনরকম হাওয়া। গাইলাম।

আরও অনেকরকম হাওয়া আছে। শুধু হাওয়া কেন।

আরও অনেক কিছু আছে। অন্ধকার আছে অনেকরকম। আলো আছে। ধরো 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো', আর 'আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে', এই দু'টো আলো কি এক? বলো? দু'টো আলো তো আলাদা। তাই না? একটা আলো ধীরে-ধীরে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত সকাল ভরে দিয়ে : আর একটা আলো যেন পাতাল থেকে ছিটকে বেরনো তীক্ষ্ণ রশ্মি। দু'টো আলোর ধরন, এমনকী, দু'টো আলোয় গতি দু'ধরনের। আর সবটাই বলে দিচ্ছে গানটা।

যুবতী বলে, মাস্টারমশাই আপনি যখন শেখাতেন ঠিক এমনি করে বলতেন না কিন্তু। ভুল শুধরে দিতেন। ঠিক গাইলে বলতেন ঠিক আছে। যুবতী শুনল মাস্টারমশাই বলছেন, তোমরা ঠিক গাইলে বলতাম ঠিক আছে। কিন্তু আমি যে সারাজীবন ভুল পথে চললাম।

যুবতী বলে, আমি বুঝতে পারছি না মাস্টারমশাই। আপনি কী বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি ভুল পথে চলবেন কেন? কে বলেছে একথা? উনি আবার হাসলেন। কেউ বলেনি। আমি বুঝতে পেরেছি নিজে। নিজেই। নিজের মনে-মনে গানগুলোকে শুনে। যুবতী বলে, কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই। আপনি আবার স্টুডেন্টদের ডাকুন। অল্প দু-চারজনকেই ডাকুন। আমি সুদীপ্তাকে বলছি। বিশ্বরূপদা। পাকলু। রঞ্জনাদি। এই চার-পাঁচজনকে নিয়ে বসুন মাস্টারমশাই। নইলে এইসব ভাববেন একা-একা থাকলে।

আমি একা থাকি না। আর আমি বুঝেছি কোথায় আসল ভুলটা। তুমি শোনো।

না আমি ওসব শুনব না। পরের রোববারেই আমরা যে-কজন পারি আসব। আমার হারমোনিয়মটাই রেখে যাব এখানে।

ঘরের মরা আলোর মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের মুখ বোঝা যাচ্ছে। চোখও। মরা আলোর মতোই স্তিমিত। ওই যে তিনটে হাওয়া তুমি গাইলে। ওই তিনটে হাওয়া তিনরকম কেন জানো। তিনটে হাওয়ার ভাব তিনরকম। ওইজন্যই বলছি, তিনটে হাওয়া। 'হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন', আর 'বৃষ্টি শেষের হাওয়া', দু'টো আলাদা হাওয়া, কারণ দু'টোর ভাব আলাদা। অন্ধকারের উৎস থেকে যে আলো ছিটকে বেরচ্ছে, আর যে আলোর পদ্মফুল ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে—দু'টো আলাদা চরিত্রের আলো। দু'টার ভাব আলাদা। বুঝলে?

~ www.amarboi.com ~

যুবতী বলল, হ্যাঁ, এটা নতুন শুনলাম আজ আপনার কাছে। কিন্তু বোঝা শক্ত নয়। যেটা আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেন বলছেন, ভুল করেছেন সারাজীবন?

শোনো। তুমি যখন বাড়ি থেকে বেরলে, আমার বাড়ি আসবে বলে তো বেরলে? তুমি কোথায় থাকো এখন?

যুবতী বলল, আমরা থাকি হরিদেবপুর। আমি আর শোভন।

কোন রাস্তায় এলে?

ভেতর দিকের গলি-গলি দিয়ে চলে এলাম।

ধরো তুমি একটা রাস্তায় হাঁটছ কারও বাড়ি যাবে বলে। এবার সারাদিন ধরে যদি তুমি রাস্তাতেই থাকো, তুমি বাড়ি পৌঁছতে পারবে?

না পারব না। কিন্তু আপনি এসব বলছেন কেন আমাকে? আমি কি এই সামান্য জিনিসটা বুঝব না?

উনি হাসলেন। স্নেহের হাসি। মরা আলোতেও স্নেহ ফুটে উঠল ঠিক। বললেন, স্বরলিপি হল পথ। রাস্তা। যে রাস্তা দিয়ে ভাব-এ পৌঁছতে হয়। আমি সারাজীবন স্বরলিপি অনুসরণ করলাম। পথেই রয়ে গেলাম। ভাবলাম স্বরলিপি নিঁখুতভাবে মেনে চলাই গান। আমি হাঁটতেই থাকলাম। হাঁটতেই থাকলাম। ভাব দুরেই রইল। আমি স্বরলিপির পথ ধরে হেঁটেছি। সেখানেই থেকেছি। ভাব হচ্ছে আমার গৃহ। আমি গৃহ পাইনি। আমি পথবাসী। আমি গৃহহারা।

যুবতী হাত বাড়িয়ে মাস্টারমশাইয়ের পায়ের পাতা চেপে ধরল। এমন বলবেন না, মাস্টারমশাই। আমরা কত পেয়েছি আপনার কাছে। কত শিখেছি।

উনি বললেন, রাস্তায় লোক শুয়ে থাকে দেখতে পাও? যেতে-আসতে? আমি সেইরকম পথে শুয়ে থাকা লোক। আমার গৃহ নেই। আমার গানের কোনও থাকার জায়গা নেই। রেকর্ড হয়নি ভাল হয়েছে। নিখুঁত নির্ভুল গান। কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি নেই, স্বরলিপি থেকে। একেবারে ওই যা বললাম, নিঁখুত। নির্ভুল। আর, হ্যাঁ, নিষ্প্রাণ। স্বরলিপির পথে পা-মেপে, পা-মেপে হাঁটতে-হাঁটতে আমার বেলা শেষ। আমার গানের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকত, রেকর্ড হলে। তার চাইতে এই ভাল। হ্যাঁ এই ভাল। কিন্তু তুমি পা-টা ছাড়ো এবার।

যুবতী বলে, না ছাড়ব না। আপনি এখন গান করুন। আমরা নিজেরা সিডি বার করব। আপনার গানের। তা হলে আপনার আর এত একা-একা লাগবে না। দেখবেন কতজন আছে, যারা শুনছে আপনার গান।

বাইরে পুরো সন্ধে নেমে এসেছে। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। উনি বললেন, ঘরের অলোটা জ্বালিয়ে দাও তো। যুবতী আলো জ্বালাল। ম্লান অল্প আলো। যুবতী জানে মাস্টারমশাইয়ের চোখের অসুখ আছে। তাই আলোটার ওপর একটা ঢাকনা দেওয়া। যুবতী দেখল, মাস্টারমশাই, দেওয়ালে এলিয়ে বসেছেন। সামনের দিকে কপাল বড় হতে-হতে পুরো মাথাটা প্রেতের খুলির মতো। চোখে ম্লান জল। যুবতী খুব কষ্টে নিজেকে ধরে

~ www.amarboi.com ~

রাখল। শুনল মাস্টারমশাই বলছেন, তুমি ভাবছ অন্যকে গান শোনাতে পারি না বলে আমার এত কষ্ট। সকলে যেমন করে ভাবে, তুমিও তেমন করেই ভাবছ। আমি আর শোনাতে চাই না। শুধু শুনতে চাই। তুমি উঠে পড়ার আগে আমাকে একটা গান শুনিয়ে যাবে? না না, এক লাইন দু'লাইন নয়। পুরো গান।

যুবতী বলল, এখুনি শোনাব যদি জানা থাকে।

তুমি জানো।

তবে গীতবিতান নিয়ে আসি ও-ঘর থেকে। আলমারির সামনেই রয়েছে।

উনি বললেন, এই গানের জন্য গীতবিতান দরকার হবে না।

যুবতী অবাক, হবে না? কোন গান?

আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার।

যুবতী আরও অবাক। এ তো রবি ঠাকুরের গান নয়। অতুলপ্রসাদী।

হ্যাঁ তাই। আমার কাছে রবি ঠাকুর অনেক অনেক বড়। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে সবসময় পাই না। অতুলপ্রসাদ তো অত বড় নন। ওঁর গান যখন তুলিয়েছি তোমাদের, অত কিছু স্বরলিপি নিয়ে ভাবিনি। আর এই গানটা জানো তো, শুনেছি, সন্তোষ সেনগুপ্তের সুর করা। শোনা কথা অবশ্য। জানি না সত্যি কি না। কিন্তু গানটা রেকর্ডে বড় দরদ দিয়ে গেয়েছিলেন সন্তোষবাবু। গাও না। গাও।

যুবতী গানটি শুরু করল। প্রথম দু'লাইন গাইবার পর চুপ করে গেল। আর মনে নেই মাস্টারমশাই। প্র্যাকটিস নেই তো।

উনি আবার হাসলেন। তাতে কী হয়েছে। এমন তো হয়ই। তুমি উঠে পড়ো এবার। দেরি হয়ে গেল কত। সন্ধে ঘোর হয়ে গিয়েছে। যুবতী বলল, না মাস্টারমশাই। আমি যাব না। আমি কোথাও যাব না। আমি আপনার কাছে এসে থাকব। আপনার এই অবস্থায় এই স্বাস্থ্য নিয়ে একা থাকা ঠিক নয়।

উনি হাসলেন। সেই স্নেহ আবার এসে দেখা দিল হাসিতে। পাগলামি কোরো না।

কেন? কেন মাস্টারমশাই? আমার কি কোনও দাবি নেই?

যুবতী শুনল তার মাস্টারমশাইয়ের গলা শান্ত কিন্তু দৃঢ়। না। কারওরই কোনও দাবি নেই আমার ওপর। আমারও কারও কাছে কোনও দাবি নেই। এসব কথা আর বলবে না। যুবতী মুখ নিচু করে বসে রইল। ওড়নার খুঁট থেকে সুতো তুলছে। তার চোখের জল এসে পড়ছে হাঁটুর ওপর।

উনি উঠে লাঠিটা নিলেন। চলো, তোমার সঙ্গে বারান্দা পর্যন্ত যাই। চোখ মুছে যাও। শান্ত, নির্বিকার গলা। যুবতী এই কণ্ঠস্বর আগেও শুনেছে। সে নিঃশব্দে ওড়না দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। পিছন ফিরে চেয়ারের কাছে গিয়ে ব্যাগ নিল। ঘর পার হয়ে ছোট্ট বারান্দায় পড়ল। বলল, একদিন এসে এই টবগুলো নিয়ে যাব মাস্টারমশাই? ফুলগাছ লাগাব? উনি হাসলেন। নিয়ে যেও। এগুলো তো এখানে পড়েই আছে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

উনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোলেন। চাবি দিয়ে খুললেন বারান্দার সামনে গ্রিল-গেটের

~ www.amarboi.com ~

তালা। বললেন, মাঝে-মাঝে এসো, কেমন? যুবতীর তখন বারান্দা থেকে নেমে রাস্তায় যেতে আর তিনটে পদক্ষেপ বাকি। হঠাৎ সে ঘুরল, স্ট্রিটলাইটের আলো তার মুখে। তার চোখের ব্যাকুলতা ফুটে উঠল। আপনাকে এইভাবে একা রেখে কী করে চলে যাব মাস্টারমশাই? এইরকম একা-একা থাকবেন আপনি? মাস্টারমশাই? কী হবে?

উনি হাসলেন। অমি একা থাকি কে বলল? একা থাকি না।

এবার তো আপনি পাগলামি করছেন মাস্টারমশাই। কেন করছেন এরকম।

বলছি তো, আমি একা থাকি না।

যুবতী বলল, কে থাকে আপনার সঙ্গে?

উনি হেসে গ্রিলের গেটে আবার তালা আটকাতে লাগলেন চাবি ঘুরিয়ে।

ঠিক তখনই, পিছনে, বারান্দার বড় দরজায় সুর এসে দাঁড়াল।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গানের শিউলিগাছ

শেখর বিরক্ত মুখে বাইরের ঘরে একা বসে আছেন। গান শেখানোর আওয়াজ আসছে ভিতর থেকে। শেখরের ছাত্রী শিখছে। গান শেখা শেষ হলে শেখরের কাছে আসবে সে। বাংলা পড়তে। বাংলায় অনার্স নিয়েছে। আজ একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়েছেন শেখর, গানের দিদিমণি বিদায় নেওয়ার আগেই। শেখরের মুখে বিরক্তির ছাপ অপেক্ষার জন্য নয়। গানে সামান্য উঁচু দিকের পরদা এলেই গলাটা একটু চেপে, ভিতর দিকে টেনে নিয়ে স্বরগুলো লাগানো হচ্ছে। শেখরের বিরক্তি সেইখানেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে মধ্যবয়স্কা গানের দিদিমণি বেরিয়ে গেলেন শেখরের সামনে দিয়েই। ছাত্রী বাইরের দরজা বন্ধ করে বলল, "আসুন স্যর?" শেখরের পড়ানোর ঘরে খাটের ওপর হারমোনিয়ম। ঘরের অন্য দিকে পড়ানোর জন্য দুটো চেয়ার, একটা টেবিল। টেবিলে থাক দিয়ে উঁচু করা বই। শেখর ছাত্রীকে বললেন, "কিসের নোট লেখাতে হবে যেন আজকে? তারাশঙ্করের গণদেবতা? তাই তো? খাতা বের করো।" ছাত্রী খাতাপত্র নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এ সময় ছাত্রীর মা এসে এক কাপ চা আর দুটি বিস্কুট নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

শেখর দুপুরে মাস্টারি করেন স্কুলে। সন্ধেয় গৃহশিক্ষকতা। কলকাতা থেকে ট্রেনে আধ ঘণ্টা দূরের এই টাউনে ভাল টিউটর হিসেবে খ্যাতি অছে তাঁর। বাংলার শিক্ষক শেখর স্কুলটিচার হলেও প্রধানত কলেজ স্টুডেন্টদের পড়ান।

ছাত্রী খাতাকলম নিয়ে বসেছে, শেখর লেখাতে শুরু করবেন, হঠাৎ কী এক ভূত চাপল শেখরের মাথায়। বলে বসলেন, "গানে উঁচু পরদার জায়গাগুলো এলেই গলাটা হঠাৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চেপে ছোট করে, আওয়াজটা একটু ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গাইছিলে কেন?” ওইভাবেই যে শেখানো হচ্ছিল, সে কথাটা উল্লেখ না করে যোগ করলেন, “গলাটা খুলে সাহস করে নোট লাগানোর চেষ্টা করতে পারো না? ভয় কিসের?”

ছাত্রী হতভম্ব। বাংলার স্যার হঠাৎ এ সব কী বলছেন? সে প্রায় কিছু না বুঝে বলে, “মানে? আপনি কী বলতে চাইছেন স্যর?” ভূতটা আরও চেপে বসল শেখরের মাথায়। তিনি এবার উত্তেজিত। বলছেন, “কেমন জানো? তুমি শিখছিলে যে-গানটা, ওই যে ওই ‘শুনেছি মুরতি কালো’ এই জায়গাটা এ রকম হবে...” গেয়ে উঠলেন শেখর, “শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখা ভাল। সখী, বলো আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি। এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি...”

শেখরের দরাজ গলার গানের সুরভরা খোলা আওয়াজ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। জানালার পরদা উড়িয়ে যেন চলে গেল বাইরের গাছপালার দিকে। গান মাঝপথে থামিয়েই শেখর বলে উঠলেন, “ওই ‘শুনেছি’র জায়গায় যেখানে ‘শুনেছি মুরতি কালো’ বলছ, ওই ‘শুনেছি’টা আরও খোলা করে বলো। স্বরটা সাহস করে লাগাও। বনানী ঘোষের রেকর্ড শুনে দ্যাখো। এখন তো তোমাদের ওই ইউটিউবে সব গান পাওয়া যায়!”

ছাত্রী স্তম্ভিত, “আপনি এত ভাল গান করেন স্যর? কখনও বলেননি তো?”

“গানের কথা কখনও ওঠেনি, তাই বলা হয়নি। নাও, খাতাকলম নাও। ‘গণদেবতা’র নোটটা লেখাতে হবে আজকে।”

ছাত্রীর বিস্ময় কাটছে না, “আপনি এই রকম ভাবে গাইতে পারেন, স্যর? এই স্টাইলটাই তো আমার একদম অচেনা!”

শেখর কাজে ফিরতে চাইলেন, “আর কথা নয়। আমি বলছি, তুমি লিখতে শুরু করো।”

ছাত্রী ছাড়বে না, “আর একটা গান অন্তত শোনান স্যর। ওটা তো পুরো গাইলেন না। অন্তত একটা গান পুরো শোনান।”

“করুন না একটা গান।” দরজায় ছাত্রীর মা দাঁড়িয়ে। শেষ যৌবনের আভা ছুঁয়ে আছে তাঁর মুখ। চশমার পিছনে বড় বড় চোখ। তারা তাকিয়ে আছে শেখরের দিকে, “ও তো রোজই পড়ে, আজ না হয় একটু গানই শুনলাম আমরা।”

ভূতটা শেখরের মাথায় আবার চেপে বসল। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে শেখর শুরু করলেন, ‘সে কেন দেখা দিল রে। না দেখা ছিল যে ভাল, বিজলীর মতো এসে সে কোথা কোন মেঘে লুকাল...’

এ বার পুরো গান গেয়ে থামলেন শেখর। চেয়ারে ছাত্রী। দরজায় ছাত্রী মা। চিত্রবৎ স্থির। শেখরের উদাত্ত গলার গান ঘরের আবহাওয়া পুরো পালটে দিয়েছে। শেখর এবার তাড়া দিলেন ছাত্রীকে, “নাও, নোট নেওয়াটা শুরু করো। অনেকটা লেখাতে হবে। উপন্যাসটা পড়ে নিয়েছ তো?”

ছাত্রী খাতাপত্র নিল। ছাত্রীর মা দরজা থেকে নিঃশব্দে অদৃশ্য হলেন। নোট লেখানো চলল।

~ www.amarboi.com ~

এ বার শেখর বাড়ি যাচ্ছেন। বাইরের দরজা খুলে দিচ্ছে ছাত্রী। শেখর বললেন, 'আজ কিছুটা বাকি রয়ে গেল। এর পর তো শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' আছে। পরের দিন আগে এটা শেষ করতে হবে।"

"সে দিন আবার গান শোনাবেন তো?"

শেখর ঘুরে দেখলেন, পিছনে ছাত্রীর মা দাঁড়িয়ে। তিনিই বলেছেন কথাটা। অমনি ছাত্রীও বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে দিনও গান শোনাতে হবে।"

"আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে," বলে শেখর দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন।

শেখরের বয়স পঞ্চাশ। মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা চুল। সাদা পাজামা পাঞ্জাবিই একমাত্র পোশাক তাঁর। বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি চারটে বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে। অনেক ধারদেনা এখনও রয়ে গিয়েছে সে-বাবদ। একটু একটু করে শোধ করে চলেছেন। একতলা এক ছোট্ট বাড়িতে থাকেন। বাবার করা বাড়ি। বাবা-মা দু'জনেই গত হয়েছেন। মা গিয়েছেন শেখরের কৈশোরে, ছোট বোনটার বয়স তখন মাত্র দশ। শেখর একাই থাকেন। একাই রান্না-খাওয়া তাঁর। শেখরের ধারেকাছে একটা গানের ভূত ঘোরাফেরা করে। ভূতটা মাথায় চেপে বসলেই শেখরকে গানে পায়। গান শেখর পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে। বাবা গাইতেন ডি এল রায় আর অতুলপ্রসাদ। মাঝে মঝে দু'একখানি রবীন্দ্রসংগীতও। বাবা যৌবনকালে দস্তুরমত শিখেছিলেন গান। শেখরের সবই শেখা বাবার কাছে। বাবা যখন শেষ শয্যায়—তখন শেখর এক দিন গাইছেন, হঠাৎ দেখলেন, বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বাবা যখন গেলেন, তখনও দুই বোনের বিয়ে বাকি। ঋণ করতেই হত। হলও। শেখর তাই গৃহশিক্ষকতার কাজটা করে চলেছেন ঋণ সব শোধ করবেন বলে। এখন গানের ভূতটা মাথায় ঢুকলে শেখর বারান্দায় বসে একা একা গান গেয়ে চলেন। শেখরের বারান্দার সামনে অনেকটা উঠোন। উঠোনে দুটো শিউলি গাছ। শরৎকালের সকালে মনে হয়, কেউ যেন সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে উঠোনে। শেখর যখন বারান্দায় গান করেন, তখন সামনে থাকে শিউলিগাছেরা। শিউলিগাছকেই গান শোনান শেখর। আর কোনও শ্রোতা নেই তাঁর।

পর দিন পড়াতে গিয়েছেন শেখর, দেখলেন মা মেয়ে দু'জনে খাটের ওপর উপবিষ্ট। দাবি, আগে গান শোনাতে হবে, তারপর পড়া। বারবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন শেখর, কিন্তু ওই বাধা দেওয়ার ফাঁকেই গানের ভূতটা আবার ঢুকে পড়ল শেখরের মাথায়। শেখর ধরলেন, 'ওগো আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন বিমানে। আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ওই করুণ গানে। লয়ে তব মোহন বরন, শুকনো ডালে রাখলে চরণ, আজ আমার জীবন-মরণ কোথা আছে কে বা জানে..."

গানের তোড়ে সে দিন আর বইখাতা খোলাই হল না। একের পর এক গেয়ে চললেন শেখর। এক সময় ছাত্রী বলে, "এমন করে গাইতে তো আর কাউকে শুনি না।" শেখর

~ www.amarboi.com ~

বলেন, “বাবা এমন করে গাইতেন, খোলা আওয়াজে। আমি বাবার মতো করে চেষ্টা করি। হয় না হয়তো।”

ছাত্রী উঠে একটু ভিতরে গেল। আজ চা বানাবে সে। ছাত্রীর মা তাকিয়ে আছেন। চশমার নীচে কাজল টানা বড় বড় চোখ। “আপনি কাকে গান শোনান?” প্রশ্ন শুনে শেখর হাসেন, “আমার গান আর কে শুনবে? বারান্দায় বসে গান করি। উঠোনে শিউলিগাছ আছে দুটো, ওরা নিশ্চয়ই শোনে,” বলে আবারও হাসেন শেখর। হাসলে শেখরের একটা গজদাঁত দেখা যায়। ভারি সুন্দর লাগে শেখরকে তখন। কিন্তু তিনি সাধারণত হাসেন না। এর পর থেকে রোজই শেখরকে পড়াশোনা হয়ে যাওয়ার পর দু'একখানা করে গান শোনাতেই হয়। রোজ মানে প্রতি বুধবার আর শনিবার। সপ্তাহে এই দু'দিন এ বাড়িতে পড়াতে আসেন শেখর। সপ্তাহের অন্য দিনগুলো অন্যান্য বাড়িতে পড়াতে যান।

ছাত্রীর বাবা সন্ধেয় বাড়ি থাকেন না কখনও। শেখর শুনেছেন, বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তিনি রোজ তাসের আড্ডায় যান। ফিরতে রাত হয়। এক দিন গান শোনাতে গিয়ে বাড়ি যেতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে শেখরের, দরজায় মুখোমুখি দেখা—“চললেন মাস্টারমশাই? স্টুডেন্ট কেমন পড়াশোনা করছে আপনার?” মদের গন্ধ ধক করে নাকে এসে লাগল শেখরের। জোর করে হাসির চেষ্টা করে বললেন শেখর, “ভালই তো।”

এক সন্ধেয় শেখরের ছাত্রী বলল, “স্যার, আমরা চলে যাচ্ছি। বাবার বদলির অর্ডার বেরিয়েছে।” খুব একটা অবাক হলেন না শেখর, “কোথায় যাচ্ছ তোমরা?” ছাত্রী বলে, “অনেক দূর। সেই একেবারে জলপাইগুড়ি। আর মোটে এক মাস আছি এখানে। কলকাতায় মাসির বাড়িতে থেকে পরীক্ষাটা দেব।” ছাত্রীর কলেজ কলকাতা। যাতায়াত করে রোজ। শেখর বলেন, “কোর্স তো তোমার কমপ্লিট। এ বার ভাল করে প্রিপারেশন নাও।”

ছাত্রী বলে, “এই এক মাস কিন্তু আপনি আসবেন, স্যার। আসা বন্ধ করলে চলবে না।” শেখর বলেন, “আচ্ছা, আসব।”

নিয়মিতই আসতে লাগলেন শেখর। নির্দিষ্ট এক মাসও দ্রুত ফুরিয়ে যেতে লাগল। একদিন পড়াতে গিয়ে শেখর শুনলেন, ছাত্রী বাড়ি নেই। সে তার বাবার সঙ্গে কিছু দরকারি জিনিসপত্র কিনতে বেরিয়েছে। ছাত্রীর মা বললেন, “সামনের শনিবারই আমরা চলে যাচ্ছি তো।”

শেখরের মনে পড়ল, আজ বুধবার। শেখর বলেন, “ওহ্, তাই বুঝি। তা হলে তো ওর সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না। বলে দেবেন, আমি এসেছিলাম। তা হলে চলি, কেমন?”

ছাত্রীর মা বললেন,“একটু বসুন না। অনেকক্ষণ বেরিয়েছে, ফিরে আসার সময় হল।” কী ভেবে শেখর বাইরের ঘরে বসে পড়েন। ছাত্রীর মা বললেন, “[illegible] তো আর আপনার গান শোনা হবে না। আর কোনও দিনই আপনার গান শোনা হবে না। আমাদের জলপাইগুড়ির বাড়িতে আসবেন, যদি আমরা ডাকি?”

শেখর বলেন, “দেখি, নিজের কাজকর্ম সামলে, তারপর...” কথা শেষ করেন না শেখর। ছাত্রীর মা বলেন, “আপনার উঠোনের শিউলিগাছেদের কত ভাগ্য!

~ www.amarboi.com ~

শেখর বুঝতে পারেন না কথাটা। বলেন, "মানে?"

"তারা তো রোজ আপনার গান শুনতে পায়। আমি যেন পরের জন্মে আপনার বাড়ির শিউলিগাছ হয়ে জন্মাই।"

শেখর উত্তর দিতে পারেন না।

"আমাকে মনে থাকবে না আপনার। ভুলে যাবেন নিশ্চয়ই। তবু বলে রাখছি, এর পর থেকে বাড়ির শিউলিগাছেদের যখন গান শোনাবেন, মনে রাখবেন, আমিও শুনছি।"

চশমার নীচে কাজল পরা টানাটানা চোখ জলে ভরে উঠল। চোখ উপচে জলের ফোঁটা নেমে এল দুই গাল বেয়ে।

শেখর স্তব্ধ বসে রইলেন।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যাসঙ্গীত

মাস্টারমশাই খুব অবাক হয়ে গেলেন চিঠিটা পেয়ে। মোটরসাইকেল করে এসেছে পত্রবাহক। দরজায় বেল দিতে মাস্টারমশাই বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়। পত্রবাহক জানাচ্ছে সে আসছে 'নবান্ন' থেকে। মাস্টারমশাই প্রথমটা ভাল বুঝতে পারলেন না। তারপর খামের ওপরে ছাপ দেখে ধরতে পারলেন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এসেছে। হ্যাঁ, রাইটার্স বিল্ডিং তো এখন 'নবান্ন' নামের একটা বাড়িতে উঠে গিয়েছে। মাস্টারমশাই টিভি দ্যাখেন না। কারণ তাঁর বাড়িতে টিভি নেই। ট্রানজিস্টর রেডিওটাও খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সারানো হয় না। তবে মেয়ে একটা পোর্টেব্‌ল সিডি প্লেয়ার দিয়েছে তাতে মাঝে-মাঝে গান শোনেন মাস্টারমশাই। খবর কাগজ নেওয়া অনেক দিনই বন্ধ। তাই 'নবান্ন' থেকে আসছি—কথাটা পত্রবাহকের মুখে শুনে প্রথমটা বুঝতে পারেননি। পত্রবাহককে বারান্দার গ্রিলের তালা খুলে ভেতরে ডাকলেন। যুবকটি এল না। তার আরও কোথাও যাওয়ার আছে। একটা খাতায় সই করিয়ে নিয়ে বিদায় নিল সে।

মাস্টারমশাই চিঠি খুলে দ্যাখেন তলায় মুখ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষর। চিঠিতে যা-লেখা আছে তা পড়ে বিশ্বাস করতে কষ্টই হল মাস্টারমশাইয়ের। মাস্টারমশাইকে এবার রাজ্য সরকারের সংগীতমেলায় 'সংগীত মহাসম্মান' প্রদান করা হচ্ছে। চিঠিটা ছাপানো চিঠি। তলায় মুখ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষর। চিঠির পাশে ও তলায় অনেকটা অংশ সাদা পড়ে আছে। সেখানে নীল কালিতে দ্রুত হস্তাক্ষরে লেখা : 'আপনি আসবেন কিন্তু। খুব খুশি হব আমরা।' শেষে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম নামটি শুধু। পুরো নাম নয়।

মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ ভেবে উঠতে পারলেন না এমন কাণ্ডটা কীভাবে সম্ভব হল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গান গাওয়া তো বহু-বহু দিন ছেড়ে দিয়েছেন মাস্টারমশাই। তারও অনেক আগে থেকেই কেউ আর ডাকত না। ছাত্র-ছাত্রীরাও আসে না। তাদেরও তো বয়স হল। সবচেয়ে বড় কথা এই সম্মানের অর্থমূল্য দু'লক্ষ টাকা। মাস্টারমশাইকে এই বয়সে কে দু'লক্ষ টাকা দেবে? কে হতে পারে? মাস্টারমশাই কিছুই ভেবে পান না। বাইরের ঘরের বিরাট চৌকিটায় গিয়ে বসে থাকেন চিঠিটা হাতে নিয়ে।

দুগ্গার মা এসে বলে, রান্না হয়ে গিয়েছে। দুপুরেরটা ঢেকে রেখেছি টেবিলে। রাতেরটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিলাম। এবার চলে যাব। একবার চা খাবেন না কি, বাবা? তবে বানিয়ে দিয়ে যাই।

নাহ্। চলেই যাও। চা আর খাব না। মাস্টারমশাইয়ের বাইরের বড়ঘরে বসে জানলা দিয়ে গাছপালা দেখা যায়। রোদ্দুর ঝকঝক করছে। ফাল্গুন শেষ। চৈত্র শুরু হয়েছে। এ পাড়াটা নির্জন। ফাঁকা-ফাঁকা আছে এখনও। জানলা দিয়ে হলুদ রাধাচূড়া দেখা যায়। রোদে জ্বলছে। পাশের ঘরে হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল।

মাস্টারমশাই উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলেন। মাস্টারমশাই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারেন না। মেয়ে-জামাই একটা কিনে দিয়েছিল। কী করে চালাতে হয় মাস্টারমশাই সেটা শিখে উঠতেই পারলেন না। জামাই বা মেয়ে ফোন করলে উনি ফোনটা ধরতে গিয়ে কেটে দিতেন, না-জেনে। ওই না-জানাটাই থেকে গেল। ফোনটা পড়ে আছে। কী একটা যন্ত্রও দিয়েছিল সঙ্গে, চার্জ দিতে হয় নাকি আবার ওই ফোনে। কে করবে অত? ফলে পুরনো ল্যান্ডলাইন-ই সম্বল মাস্টার মাশাইয়ের।

ফোন ধরলেন, ওপার থেকে ভারী গলা ভেসে এল, কেমন আছেন? খবর কী?

মৃগেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স মাস্টার মশাইয়ের চেয়ে দু'-তিন বছর কম, কিন্তু হাইট অন্তত দু'ইঞ্চি বেশি। এখনও প্রতি বছর মহালয়ার সময় মৃগেনবাবুর গভীর ও উদাত্ত কণ্ঠে দেবীকে জাগানোর বন্দনা-গানটি সকলেই মন দিয়ে শোনে। অনেক দিন হল মহালয়ার সিডিও বেরিয়ে গিয়েছে। পুজো প্যান্ডেলেও মাঝে-মাঝে বাজে। মাস্টারমশাই ঘরে বসে শুনতে পান। মহালয়ার বিরাট গানের টিমে অবশ্য মাস্টারমশাই ছিলেন না। কোথায়ই-বা তেমনভাবে থাকতে পেরেছেন মাস্টারমশাই! তবু ওই মৃগেনবাবুই বছরে দু'-তিনবার ফোন করেন।

মাস্টারমশাই বললেন, আজ এক আজব ব্যাপার হয়েছে মশাই। আমার তো ধাঁধা লেগে আছে। মৃগেনবাবু কিন্তু কী সেই আজব ব্যাপার তা জানতে চাইলেন না। বললেন, চিঠিটা পেয়েছেন তো। আসবেন কিন্তু।

মাস্টারমশাই এখন দ্বিতীয়বার অবাক, মানে?

মৃগেন বন্দ্যোপাধ্যায় হাসলেন, সরকারি অফিসাররা ফোন করে নেবে আপনাকে। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। আপনাকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসবে। আবার গাড়িই পৌঁছে দিয়ে আসবে বাড়িতে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

মাস্টারমশাই এখনও কিছু বুঝতে পারছেন না। চিঠি এল একটু আগে আমার কাছে, আপনি

~ www.amarboi.com ~

কী করে জানলেন? আবার হাসির পালা মৃগেনবাবুর। আমিই তো প্রোপোজ করলাম মশাই আপনার নামটা। ওদের বললাম। যাই হোক, কনগ্র্যাচুলেশন্‌স। আপনার মতো গায়ক। আপনি ডিজার্ভ করেন। আচ্ছা তা হলে, ওই দিন দেখা হবে।

মাস্টারমশাই ফোন রেখে আবার বাইরের চৌকিতে এসে বসলেন। মেয়ে-জামাইকে একটা ফোন করে খবরটা দেবেন কি না ভাবলেন। তারপর ইচ্ছে করল না। হ্যাঁ অনেকগুলো টাকা। ভাবতেও পারেননি। যখন গাইতেন রেডিওতে, বা ছাত্রছাত্রী আসত, তখন গানের জন্য দু'লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, কখনও কল্পনা করেননি। এখন পেতে চলেছেন। ওরা খুশি হবে। বলা যাবে পরে কখনও। যাই, চানটা সেরে নিই। ভেবে মাস্টারমশাই উঠেছেন। এই সময় বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ পাওয়া গেল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বেল বাজল দরজায়। দু'টি যুবক, তাদের সঙ্গে অল্পবয়সি একটি মেয়ে। আপনার কাছে এসেছি, স্যর। আমাদের একটু সময় দেবেন? মাস্টারমশাই দরজা খুলে ভেতরে ডাকলেন তাদের। তারা এসেছে এই সম্মানপ্রাপ্তির বিষয়ে মাস্টারমশাইয়ের প্রতিক্রিয়া জানতে। সম্মানপ্রাপ্তির দিন যে-অনুষ্ঠানটি হবে তাতে প্রাপকদের প্রতিক্রিয়া বড় দু'টি পর্দায় দেখানো হবে। স্ক্রিন দু'টি রাখা থাকবে মঞ্চের দু পাশে। মেয়েটি বুঝিয়ে দিল সযত্নে। ততক্ষণ তার সঙ্গী দু'জন ক্যামেরা দাঁড় করানো, আলো ঠিক করা এইসব নিয়ে ব্যস্ত রইল। মাস্টারমশাই এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিলেন। মেয়েটি মাঝে-মাঝে বলে যাচ্ছে, আপনি বসুন স্যর। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ছিছি। এসব কয়েকবার বলার পর এবার বলল, আপনাকে স্যর এই চৌকিতে একটু বসতে হবে, নইলে আমরা আপনার কথাগুলো নিতে পারব না।

মাস্টারমশাই চৌকিতে বসলেন। চৌকির ওপর নীল রঙের কাপড় ঢাকা দেওয়া। চৌকির এক কোণে বাক্সবন্দি হারমোনিয়ম। মেয়েটি, তার সঙ্গীদের সঙ্গে একটু কথা বলল, তারপর মাস্টারমশাইয়ের বসে থাকার ভঙ্গিটি জরিপ করল যেন তার দৃষ্টি দিয়ে। তারপর বলল, স্যর, ওই হারমোনিয়মটা নিয়ে আপনি দু'লাইন একটু গান গাইবেন!

মাস্টারমশাই অবাক : গান? গান গাইব? মেয়েটি বলে, হ্যাঁ, গান গাইতে-গাইতে থামবেন। থেমে আপনার প্রতিক্রিয়াটা জানাবেন। আপনার হাতে তখন হারমোনিয়মটা থাকবে। যেন গাইতে-গাইতেই বলছেন আর কী! অ্যাই রাজু, হারমোনিয়মটা বাক্স থেকে বার করে স্যারের সামনে রাখো তো।

মাস্টারমশাই বললেন, হারমোনিয়ম হাত দেওয়ার দরকার নেই। মেয়েটি বলল, না, স্যর, মানে, আপনি...।

কী জানতে চান বলুন। বলে দিচ্ছি। গানের দরকার নেই।

মেয়েটি বলে, আপনি বুঝতে পারছেন না স্যর, এতে ভিজ্যুয়াল এফেক্ট-টা ভাল হত।

আমি গান গাইতে পারি না আর। যা বলার এমনিই বলছি। আপনারা দেরি করবেন না। আমার স্নানাহারের সময় হয়ে গেছে। মেয়েটি থমকে গেল। ওকে, স্যর। ওকে, ফাইন। আমরা গান ছাড়াই করে নিচ্ছি।

মাস্টারমশাই আবার বললেন, বলুন কী বলতে হবে?

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি বলল, ওই যে বললাম, 'সংগীত মহাসম্মান' পেয়ে আপনার কী মনে হচ্ছে, মানে, এত দিন তো আপনি গানের লাইনে আছেন... তা কত দিন হবে?

মাস্টারমশাইয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, লাইনে আছি? মেয়েটি ধরতে পারল না। বলল, হ্যাঁ, মনে অনেক দিনের এক্সপিরিয়েন্স তো আপনার, মানে কত বছর হবে?

মাস্টারমশাই সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে, বললেন, ষাট বছরের বেশি তো হবেই, কম নয়। যাই হোক, বুঝেছি, আপনাদের সবাইকে নমস্কার...

মেয়েটি হাসল, না না, এখন, যখন ক্যামেরা রেডি করার পর আমি 'রোল' বলব আর আপনার দিকে তাকিয়ে হাতটা নাড়ব, এইরকমভাবে, কেমন? তখন আপনি বলতে শুরু করবেন।

মাস্টারমশাই বললেন, কতক্ষণ বলতে হবে? মেয়েটি বলে, বলুন না, আপনি আপনার মতো বলে যান। আপনি যেমন কমফর্টেবল ফিল করবেন, তেমনই বলে যান। যেটুকু দরকার দেখানো হবে, বাকিটা আমরা ফেলে দেব।

মাস্টারমশাইয়ের মুখ দিয়ে আবারও বেরিয়ে গেল, ফেলে দেবেন? মেয়েটি এবারও ধরতে পারল না কথাটা। স্বাভাবিকভাবেই বলল, হ্যাঁ-আ, মানে 'এডিট' করে নেব। এগারোজন তো এই মহাসম্মান পাচ্ছেন, সেখানে টাইম একটা ফ্যাক্টর। মানে, বুঝতেই পারছেন স্টেজে মাইক পেলে বয়স্ক মানুষরা ন্যাচারালি একটু বেশি কথা বলেন। টাইম ম্যানেজমেন্টটা তো জরুরি। তাই এইরকম প্ল্যান নেওয়া হয়েছে আর কি!

মাস্টারমশাই বললেন, আচ্ছা, আমি তৈরি। মেয়েটি তার সঙ্গীদের বলল, রেডি, হ্যাঁ, বলেই 'রোল' কথাটা উচ্চারণ করে মাস্টারমশাইয়ের দিকে হাতটা নাড়ল। মাস্টারমশাই দেখলেন জানলার বাইরে রাধাচূড়া গাছে হলুদ-হলুদ ফুল জ্বলছে রোদ্দুরে। পাতা দুলছে হাওয়ায়। হ্যাঁ, ওইখানে আছে গান। আর এইখানে?

মাস্টারমশাই বলতে শুরু করলেন : নমস্কার...

দুই

আজ অনেকগুলো খবরের কাগজ পড়ে আছে মাস্টারমশাইয়ের বাইরের ঘরের বড় চৌকিটার ওপর, বাক্সবন্দি হারমোনিয়ামর পাশে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে একটা খবরকাগজও আসে না অনেকদিন হল। আজ সকালে অফিস যাওয়ার আগে জামাই এসে দিয়ে গেছে। আজকের প্রায় সব কাগজেই একটা ছবি আছে। মুখ্যমন্ত্রী মাঝখানে, আর তাঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে 'সংগীত মহাসম্মান' প্রাপক এগারোজন শিল্পী। তার মধ্যে মাস্টারমশাইকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ডান পাশ থেকে দ্বিতীয়। সকলেরই গলায় উত্তরীয়, হাতে কাচঢাকা সম্মানফলক। দু'টো কাগজে প্রথম পাতাতেই রয়েছে। অন্য গুলোতে মধ্যমপৃষ্ঠায়। দু'টো ইংরেজি কাগজেও ছবি আছে।

গতকাল মেয়ে-জামাই নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে। আজ সকালে মাস্টারমশাই অন্তত দু'শোবার পড়া একটা বইতে আবার চোখ বোলাচ্ছিলেন। 'সঙ্গীতচিন্তা'। এই সময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ

~ www.amarboi.com ~

পেয়ে দ্যাখেন জামাইয়ের গাড়িটা এসে দাঁড়াচ্ছে। কী ব্যাপার? এই দেখুন, সব ক'টা কাগজে আপনার ছবি। আপনাদের নিউজটা দিয়েছে। না, না, আমি ভেতরে যাব না। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে কাগজগুলো ঢুকিয়ে দিতে-দিতে জামাই বলেছিল, আপনারা যখন স্টেজে তখন চারদিকে কত ক্যামেরাম্যান ভিড় করেছিল দ্যাখেননি? কত ছবি উঠছিল? হ্যাঁ, স্টেজে বসে দেখেছেন বটে মাস্টারমশাই। জামাই জানিয়ে দিল, তখনই বুঝেছি সব কাগজে দেবে। আজ আগে বেরিয়ে সব ক'টা কাগজ কিনেছি। এই আপনাকে দিয়ে গেলাম। এখন আসি।

মাস্টারমশাই বললেন, এক কাপ চা খেয়ে যাও। রুন্টি সকালে ফোন করে বলল, বাবা তোমাকে কালও 'সি.এম'-এর সঙ্গে টিভির নিউজে দেখিয়েছে। আজ সকালেও একবার দেখাল। জামাইয়ের আফসোস, আমার আজকের সকালেরটা দেখা হয়নি। চান করতে ঢুকেছিলাম তখন। মিস হয়ে গেল। নাহ্, আজ আর বসা যাবে না। সেক্টর ফাইভ তো। অনেকটা রাস্তা। আমি চলি এখন। জামাই গাড়িতে উঠে বসল।

এসব সকাল সাড়ে ন'টার কথা। তারপর বাড়িতে বার চারেক বেল বাজল। পাড়ার কোনও-না-কোনও বৃদ্ধ। আরে, দারুণ ব্যাপার তো মশাই! কনগ্র্যাচুলেশন্স। বাড়িওলা ভদ্রলোক নেমে এসে জানলাটার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁরও বয়স হয়েছে। বললেন, 'আমরা খুবই প্রাউড ফিল করছি।'

সকালে 'সঙ্গীতচিন্তা' আর পড়া হল না। দুপুরে স্নান-খাওয়া সেরে আলমারি থেকে একটা অনেক পুরনো গানের খাতা খুঁজে বার করলেন মাস্টারমশাই। চৌকির ওপর বসে খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন সাবধানে। ওদেরও বয়স হল। পৃষ্ঠাগুলোর। মানুষের শরীরের মতোই ওরাও বয়স হলে জীর্ণ হয়। যে-গানটি খুঁজছিলেন, এই তো পেয়ে গেছেন, সেই গানটিকে। মাস্টারমশাইয়ের বয়স তখন পঁচিশ, যখন বড়মামা গানটা শিখিয়েছিলেন। মানে, এই খাতার পৃষ্ঠার বয়স এখন ষাট হয়ে গিয়েছে। গানের কথাগুলো বড়মামার নিজের হাতে লিখে দেওয়া। বড়মামার হাত তখন কাঁপে। ভালভাবেই পড়া যায় সব কথা। গোটা-গোটা হস্তাক্ষর ছিল বড় মামার। গানটা পড়তে সবে শুরু করেছেন মাস্টারমশাই হঠাৎ বেল বাজল দরজায়।

এবার সত্যিই বিরক্ত লাগছে। এখন, এই বেলা একটায়, কে এল?

গ্রিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। তুমি? দাঁড়াও, চাবিটা নিয়ে আসি। লীলার বয়স এখন ৫০ হল। এ বছর। মাস্টারমশাইয়ের চেয়ে ৩৫ বছরের ছোট। লীলার জন্মদিন জানুয়ারিতে। এসেছিল। এসে বলল, ৫০ বছর বয়স হয়ে গেল মাস্টারমশাই। ৫১-য় পা দিলাম। প্রতি বছর দু'বার আসে লীলা। একবার নিজের জন্মদিনে। একবার বিজয়া দশমীর পর। মাস্টারমশাই তাঁর নিজের জন্মদিনে ছাত্রদের আসাটা কোনও দিনই পছন্দ করেননি। তাই লীলা ওই দু'দিনই আসে। আজ তো, ওই দু'দিনের কোনওটাই নয়। তা হলে?

হাতের সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। ফ্রিজ খুলে ঢুকিয়ে দিল। নিজেই টেবিল থেকে জলের বোতল নিয়ে জল খেল। ওর তো এ-বাড়ির সব চেনা। রোববার-রোববার আসত শিখতে। তারপর ঘরে এসে মাস্টারমশাইকে প্রণাম করল। বলল, ও আচ্ছা, আপনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাগজগুলো সব দেখেছেন তা হলে। আমিও সব ক'টাই কিনেছি। আপনি কী করে পেলেন? রুন্টি পাঠিয়েছে কিনে? তাই না?

—জামাই দিয়ে গেল।

গতকাল খুব ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। কিন্তু গতকালই আমার শ্বশুরমশাইয়ের অপারেশনের ডেট পড়ে গেল। বেড়ে দিল সাড়ে পাঁচটায়। এখন একবার নার্সিং হোম থেকে ঘুরে এখানে আসছি। আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওঁকে দেখে বাড়ি ফিরব।

মাস্টারমশাই বললেন, এলে কেন এত কষ্ট করে? রোদের তেজ কেমন বেড়ে গেছে— দেখছ না?

লীলা আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল। তারপর বলল, এলাম আপনাকে একটা প্রণাম করার জন্য। আপনার সম্মান তো আমাদের সম্মান।

লীলা নিচু হয়ে প্রণাম করল। মাস্টারমশাই বললেন, সম্মানের চেয়ে বড় কথা এই বয়সে টাকাটা খুব কাজে লাগবে গো লীলা। বলতে-বলতে মাস্টারমশাই চৌকিতে নিজের জায়গায় বসেন। আর তাছাড়া সবটাই তো মৃগেনবাবুর জন্য হল। সেই কবে '৬৫ সালে আমার শেষ রেকর্ড বেরিয়েছে। রেডিওতে শেষবার গেয়েছি '৭৪-এ। এখন তো আর আমার নামটাই কারও মনে রাখার কথা নয়।

লীলা একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসেছে জানলার ধারে। বলল, অত জানি না। আমরা আপনার ছাত্রছাত্রী। আমাদের কাছে এটা খুব বড় জিনিস। তবে যাই বলুন মাস্টারমশাই, টাকাকড়ির কথাটা আপনি আমাকে বলছেন, ঠিক আছে— কিন্তু গতকাল স্টেজে দাঁড়িয়ে ওই কথাটা বলা আপনার মোটেই উচিত হয়নি। আজকে দু'টো কাগজে আপনার এই কমেন্টটা উল্লেখ করে, একটু কটাক্ষও করেছে।

মাস্টারমশাই সত্যিই অবাক। কটাক্ষ করেছে বুঝি? আমি তো সব কাগজই দেখেছি। হ্যাঁ আমার বলা কথাটা কোথায়-কোথায় যেন দিয়েছে। তবে ওটার মধ্যে কোনও বিরূপ ব্যাপার আছে বুঝি? কী জানি, ধরতে পারিনি।

লীলা স্পষ্টতই বিরক্ত। আপনি ধরতে না-পারলেও অন্যরা ধরেছে। গান নিয়ে দু'টো কথা বলতে পারতেন। স্টেজে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে টাকার কথা বলতে আছে? আপনাকে এভাবে বলছি, এটা আমার আস্পর্ধা হয়ে যাচ্ছে। তবু কথাটা বলে আপনি ঠিক কাজ করেননি মাস্টারমশাই।

ঘরে চারটে বড়-বড় জানালা। একটা জানালার পাশে মোড়া নিয়ে বসেছে লীলা। লীলার টকটকে রং রোদ্দুর লেগে লাল, না কি ক্ষোভের জন্য তাতে রক্তাভাব ফুটল তা বোঝা যায় না। লীলার মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত কাটা। তাতে অনেক-অনেক রুপোলিরেখা স্পষ্ট। মাস্টারমশাই লীলার দিকে দেখছেন না। আরেকটা জানালা দিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন বাইরে। লীলা জানে, মাস্টারমশাই ওই চৌকিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে কোন জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন। লীলা সেই জানালাটা ছেড়ে বসে। অন্য জানালার পাশে। যাতে মাস্টারমশাইয়ের দৃষ্টি বাঁধা না-পায়। মাস্টারমশাই যখন শেখাতেন, তখন ওই চৌকিটায়

~ www.amarboi.com ~

বসতেন। আর তারা, ছাত্রছাত্রীরা, সব বসে থাকত মাস্টারমশাইকে ঘিরে। কেউ পায়ের কাছে, মেঝেয় বসে মুখ তুলে মাস্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে, কেউ ডান পাশে বসে নিজের খাতার দিকে তাকিয়ে, কেউ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে, মেঝেতেই, কেউ মাস্টারমশাইয়ের বাঁ পাশে চৌকিতে। যে যেখানে পারত বসে পড়ত। আর লীলা? লীলাই তো, মেঝেতে, একদম সামনে, মাস্টারমশাইয়ের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকত। লীলাই তো! ওই তো। ওই যে, এখনও লীলা দেখতে পাচ্ছে একুশ বছরের লীলাকে। একপিঠ চুল। কোনও দিন খোলা। কোনওদিন লম্বা বিনুনি বাঁধা। লীলা। ওই তো। আজ, এই মুহূর্তে, জানলার পাশে বসে সেই লীলা দেখছে মাস্টারমশাই কেমন নিরুত্তর হয়ে গেছেন। লীলার অভিযোগটা মেনেই নিয়েছেন যেন।

খুব খারাপ লাগতে শুরু করল লীলার। কেন বললাম? যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। ছি ছি, এই মানুষটাকে এইরকম করে বললাম। এই মানুষটা তার কতখানি, সে তো কেবল লীলাই নিজে জানে কিন্তু কী করবে? সকালবেলা প্রশান্তর ফোন। তারপর আভাদি। মণিকা। শ্যামলদা। ঝরনা। সব পরপর ফোন। তাদের পুরনো সব গানের বন্ধু। মাস্টারমশাইয়ের কাছে যারা দল বেঁধে রোববার-রোববার শিখতে আসত—প্রায় সবাই ফোন করেছে। শ্বশুরমশাইকে দেখতে গেছে, লীলা নার্সিংহোমের কেবিনের ভেতরে মোবাইলে ফোন এল। সকলের এক কথা : মাস্টারমশাই এটা কী বললেন? মাথাটা গেছে। বয়স হয়েছে বোঝা যাচ্ছে এবার। টাকার কথা কেউ স্টেজে দাঁড়িয়ে বলে?

লীলা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই বলে ফেলল। নইলে কেনই বা বলবে? যে-মানুষটা খবরকাগজ পড়ে না বলে কাগজের খোঁচাটাও ধরতে পারে না তাকে এসব বলে লাভ কী? প্রশান্ত আর আভাদি আর শ্যামলদা তো একথাও বলল, কাগজে আসলে খোঁচাটা দিয়েছে মাস্টারমশাইকে নয়, গভর্নমেন্টকে। গভর্নমেন্ট তো মাস্টারমশাইকে এই সম্মান দিয়ে একটা ভাল কাজই করেছে। তা হলে অনর্থক মাস্টারমশাই এই মন্তব্য করতে গেলেন কেন?

লীলা অবশ্য নিজেও বুঝতে পারেনি এর মধ্যে গভর্নমেন্টকে খোঁচা দেওয়ার ব্যাপারটা আসছে কী করে? মাস্টারমশাইকে যারা একটুও চেনে তাদের তো জানা উচিত মাস্টারমশাই এসব জিনিস বোঝেন না কোনও দিনই। কিন্তু প্রশান্ত, শ্যামলদা, আভাদি এরা তো তিরিশ বছরের বেশি মাস্টারমশাইকে চেনে। তা হলে তারা কী করে এসব বলল? না কি মাস্টারমশাইয়েরই মতিচ্ছন্ন হয়েছে? যা-ই হয়ে থাকুক, লীলার এখন মনে হচ্ছে কথাগুলো মাস্টারমশাইকে বলা খুবই অনুচিত কাজ হয়ে গেল তার পক্ষে। অন্তত, কথাগুলো শোনার পর ওই সম্পূর্ণ নীরব হয়ে বাইরে চেয়ে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে লীলা ভাবছে বড় একটা অন্যায়ই করে ফেলেছে সে।

মাস্টারমশাইয়ের মাথায় পাতলা সাদা চুল জানালা দিয়ে আসা হাওয়ায় অল্প কাঁপছে। চশমার তলায় চোখ দু'টো যেন কিছুই দেখছে না। হালকা গেরুয়া রঙের হাফ হাতা ফতুয়াটার তলা দিয়ে নেমেছে শীর্ণ দু'টি হাত। হাতে ফুটে উঠেছে বড়-বড় শিরা। লীলা মাস্টারমশাইয়ের পায়ের দিকে তাকাল। মাস্টারমশাই আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন একটু আগে। এখন মেঝেতে পা নামিয়ে বসেছেন। পাজামার তলায় দু'টি পায়ের পাতা। একসময় ফরসা ছিল পায়ের পাতা

~ www.amarboi.com ~

দু'টি এখন লালচে কালো রং ধরেছে অনেক দিনই। লীলা চুপচাপ উঠে গিয়ে সেই আগেকার মতো মেঝের ওপর বসল। বসে মাস্টারমশাইয়ের দু'টি পা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল। বলল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে মাস্টারমশাই। আপনাকে আমার এভাবে বলা অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন।

তিন

মাস্টারমশাইয়ের তেমন কোনও ভাবান্তর হল না। পা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করলেন না। অমনই জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই শান্ত গলায় বললেন : ওঠো।

কিন্তু ওইভাবেই বসে রইল লীলা। মাস্টারমশাই আবার বললেন,যাও, উঠে ওই মোড়াটায় বোসো। যাও। মাস্টারমশাইয়ের গলার আওয়াজটা শুনে লীলার ভেতরটা কেমন থেমে গেল। লীলা পা ছেড়ে দিল তক্ষুনি। কিন্তু উঠে গিয়ে মোড়াটায় বসার শক্তি আর যেন তার নেই। এমনভাবে কখনও লীলা নিজেকে প্রকাশ করেনি। হঠাৎ যে কী হল তার! লীলা, মেঝের ওপরেই বসে রইল, তবে মাস্টারমশাইয়ের দ্বিতীয়বারের কণ্ঠস্বর শুনে সম্বিত ফেরা মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যেন একটু পিছিয়ে গিয়ে বসে ছিল। তেমনিই বসে রইল। আর শুনতে পেল মাস্টারমশাইয়ের গলা : তুমি বললে না স্টেজে দাঁড়িয়ে টাকার কথা বলাটা ঠিক হয়নি? বললে তো?

কথাটা বলে মাস্টারমশাই একবার তাকালেন লীলার দিকে। লীলা কোনওমতে ঘাড় নাড়ল। মাস্টারমশাইয়ের নিরুত্তাপ উদাসীন গলা শুনে এখন তার চোখে জল আসতে চাইছে। কিন্তু লীলার মনে পড়ছে তারও বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হয়েছে। এখন চোখে জল এসে পড়াটা কোনওমতেই ঘটতে দেওয়া যায় না।

লীলার চোখে জল এসে গেলেও অবশ্য সেটা দেখতে পেতেন না মাস্টারমশাই। জানালার বাইরে-দূরে আবার ফিরে গেছে তাঁর দৃষ্টি। আপনমনেই মাস্টারমশাই বললেন, স্টেজে দাঁড়িয়ে আমি কিছুই বলিনি। স্টেজের ওপর কারওরই কিছু বলার সুযোগ ছিল না। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীই তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন স্টেজে। দু'জন অ্যানাউন্সারের একজন আমার নাম ডাকতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর ওই ফলক আর চেক এসব নিলাম। কিছু তো বলিনি স্টেজে দাঁড়িয়ে।

লীলা অবাক এবং ক্রুদ্ধ! তবে? কাগজে যে ছাপল? ওরা কি মিথ্যে লিখল? কী অন্যায় কথা!

মাস্টারমশাই লীলার দিকে তাকালেন না এবারও। বললেন, না, ওরা মিথ্যে লেখেনি। কথাগুলো আমি বলেছিলাম। কিন্তু স্টেজে দাঁড়িয়ে বলিনি। স্টেজে বসে আমার সবটাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল। মাথাটা একেবারে কাজ করছিল না। ভাবছিলাম, আমি এখানে? কীভাবে? কী করছি? মাইক যদি এগিয়েও দিত কেউ, কিছুই বলতে পারতাম না।

লীলা একটু এগিয়ে বসল, তবে, কোথায়? কোথায় বলেছিলেন? রিপোর্টারদের কাছে? লীলার গলায় উৎকণ্ঠা।

~ www.amarboi.com ~

মাস্টারমশাই এবার তাকালেন লীলার দিকে। স্থির হয়ে বোসো। অত চঞ্চল হয়ো না। আমি বুঝতে পারছি কী হয়েছে।

লীলা এখনও অধীর, কী হয়েছে?

মাস্টারমশাই বললেন, বলছি। কিন্তু এত উতলা হওয়ার কিছু নেই। দু'দিন পরেই আমার ছাত্রছাত্রীরা সব ভুলে যাবে। নিজের-নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

—ছাত্রছাত্রী? মানে আমরা?

মাস্টারমশাই লীলার দিকে তাকালেন, তুমি নও। অন্যরা। যারা তোমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। তারা ভুলে যাবে।

লীলা মাথাটা নামিয়ে নিল মেঝের দিকে। মাস্টারমশাইয়ের লালচে-কালো ছোপ পড়া পায়ের পাতা দু'টো আবার দেখতে পাচ্ছে লীলা। মাস্টারমশাই জানলার বাইরেই তাকিয়ে আছেন। বলছেন, ক্যামেরায় আমার কথাগুলো তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আমার নাম ডাকার আগে আমাকে দেখা গিয়েছিল দু'টো বড় বড় পর্দায়। দেখা গিয়েছিল আমি কথা বলছি। কিন্তু আমি যা-যা বলেছিলাম সবটা দেখায়নি। অর্ধেকটা দেখাল। টাকার কথাটা দেখিয়েছে। গানের কথাটা যেখানে ছিল সেটা দেখায়নি।

লীলা আবার অবাক, গানের কথা বলেছিলেন? কী? কী বলেছিলেন আপনি?

—সত্যি-সত্যি কী বলেছিলাম সেকথা বলে এখন আর কী লাভ! আমার ছাত্রছাত্রীরা তো আর বিশ্বাস করবে না।

—আমাকে বলুন, আমি বিশ্বাস করব। লীলার চোখ যেন মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই সমস্তটুকু জেনে নিতে চাইছে এখন। মাস্টারমশাই বললেন, এদিকে এসো, এই যে, এইখানে—মাস্টারমশাই চৌকির ওপর নিজের পাশের জায়গাটা দেখালেন।

লীলা এগিয়ে গিয়ে মাস্টারমশাইয়ের পায়ের অনেকটা কাছে গিয়েও সেই মেঝের ওপরেই বসে রইল। মাস্টারমশাই বললেন, এখানে উঠে বসো, নইলে দেখতে পাবে না। লীলা বাধ্য ছাত্রীর মতো উঠে বসল।

মাস্টারমশাই জানালার বাইরে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। ওই দ্যাখো। রাধাচূড়া গাছ দু'টো দেখতে পাচ্ছো?

লীলা কিছুটা বোঝা-না-বোঝা স্বরে অস্ফুটে বলে, হ্যাঁ পাচ্ছি। মাস্টারমশাই বলেন, তুমি যখন এলে, বেলা একটা-দেড়টা হবে, তাই না? লীলা আবার বলে হ্যাঁ। বলে, আবারও মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে তাকায়।

মাস্টারমশাই বলেন, আমার দিকে নয়, ওই গাছ দু'টো দ্যাখো। তুমি যখন এসেছিলে, তখনও ওই রাধাচূড়ার হলুদ ফুলগুলো জ্বলছিল রোদ্দুরে। কিন্তু ঠিক এইরকম রোদ্দুর নয় সেটা। তখন সারং ছিলেন ওখানে। স্বয়ং শুদ্ধ-সারং অধিষ্ঠান করছিলেন ওই গাছের ঝলসানো রোদ্দুরে। আর এখন মূলতান এসে বসেছেন। রোদ্দুরটা বদলে গেছে। ফুলগুলোর রং বদলেছে। অল্পই। কিন্তু বদলেছে। লীলা আবার মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকায়, ক্-কী? বলছেন মাস্টারমশাই? মাস্টারমশাই এবার একটু যেন চঞ্চল। ওইদিকে তাকাও লীলা, ওই যে গাছ

~ www.amarboi.com ~

দু'টো? পাতা হাওয়ায় দুলছে। ফুল জ্বলতে-জ্বলতে খসে পড়ছে। রোদ এখন হেলে যাচ্ছে। হেলে যাবে ধীরে-ধীরে। বেলা গড়াবে। তারপর ওই গাছেদের মাথায় এসে দাঁড়াবেন পুরিয়া ধ্যানেশ্রী। আর সূর্য নেমে চলে যাওয়ার পর কী হবে জানো?

লীলা, প্রায় রুদ্ধস্বরে বলে— কী হবে?

—তারা ফুটবে। একটা দু'টো তিনটে তারা। ফুটে উঠবে গাছের মাথার ওপর। আকাশে। আর তখন কী হবে বলো তো?

—কী হবে মাস্টারমশাই বলুন, বলুন কী হবে?

মাস্টারমশাই এতক্ষণে হাসলেন। ইমন আসবেন তখন। ইমন। হ্যাঁ আমি রোজ দেখতে পাই। যখনই তারা ফোটে তখনই ইমন। তারও কিছুক্ষণ পরে, ধরো সাড়ে সাতটা বাজলেই আমি বুঝতে পারি... না না বুঝতে পারি বলা ভুল, দেখতে পাই। ওই সময় আমি 'কড়ি-মা' লাগছে দেখতে পাই, গাছগুলোর মাথায়, ওই আকাশেই।

লীলার অবাক হওয়ার ক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়েছিল একটু আগেই। আবার যেন সেটা ফিরে আসে। লীলা আবারও অবাক হয়। বলে 'কড়ি-মা'?

মাস্টারমশাই গান শেখানোর সময় যেমন বোঝাতেন, সেইভাবে যেন বুঝিয়ে বলেন: তুমি যখন এসেছিলে আজ, তখনও আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম তো? তখন ওই তীব্র মধ্যমকেই দেখছিলাম। শুদ্ধ-সারং-এর আরোহণে তীব্র-মধ্যম আসেন, আবার শ্যামকল্যাণের আরোহণেও অনেকটা ওইরকম ছদ্মবেশে আসেন তীব্র-মধ্যম। শ্যামকল্যাণের সময়টায় আকাশ ঘন নীল, সন্ধেরাতের আকাশ, আর দুপুরে তীব্র-মধ্যম আসেন ওই রোদ্দুরে জ্বলন্ত হলদে-হলদে ফুলদের কাছে। গান ওইখানে চলে গেছে লীলা। ওইখানে। আমি সারা দিন গানের দিকেই তাকিয়ে থাকি।

লীলা মাস্টারমশাইকে যেন ঠিক চিনতে পারে না। বলে, গান ওইখানে চলে গেছে মানে? মানে কী!

মাস্টারমশাই বলেন, আমার গলা থেকে গান চলে গেছে। সুর আর আমার সঙ্গে থাকে না। পুরনো খাতাগুলো নিয়ে আমি পাতা উলটে-পালটে আঙুল বোলাই স্বরগুলোর ওপর। স্বর এসে স্পর্শ দেয়। আর বাইরে তাকাই। 'রাগ'-দের দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে গানের সঙ্গে থাকি।

লীলা কথা হারিয়ে ফেলেছে। মাস্টারমশাইয়ের পা ছুঁতে ইচ্ছে করে। সাহস পায় না আর। মাস্টারমশাই বলেন, তুমি উঠে পড়ো। তোমাকে তো নার্সিং হোমে পৌঁছতে হবে পাঁচটায় বোধহয়, তাই না।

হ্যাঁ, মাস্টারমশাই।

ভিজিটিং আওয়ার তো ওই সময়টাতেই হয়। আমি তো কয়েকবার হাসপাতাল নার্সিং হোমে থেকেছি। সময়টা জানি। আর এ-ও জানি যে বড্ড খরচ। চিকিৎসার বড্ড খরচ। আর এই বয়সে চিকিৎসাটা খুব বেশি-বেশি দরকার হয়। ওই কথাটাই বলেছিলাম। দু'লক্ষ টাকা তো। চিকিৎসা আর জীবনধারণের জন্য দরকার। বলেছিলাম। গানের কথাটাও বলেছিলাম।

~ www.amarboi.com ~

গানের কথা তো বলবই। কিন্তু সেটা আর দেখায়নি। মেয়েটা বলেছিল ফেলে দেবে। গানের কথাটা ফেলে দিয়েছিল।

লীলা উঠে দাঁড়িয়েছে। বারান্দায় এখন দু'জন। মাস্টারমশাই গ্রিলের গেট খুলেছেন। লীলা বলে, মেয়েটিকে কী বলেছিলেন, গানের কথা?

—ওই যে বললাম, গান চলে গেছে। ওটাই বলেছিলাম।

—চলে গেছে? মানে?

মাস্টারমশাই আবার গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখান। গান ওইখানে, ওই গাছে পাতায়, রোদ্দুরে, রাত্রির আকাশে, জানলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া হাওয়ায়, ভোরের শিশিরে, সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে গান। শুধু আমার গলাতেই আর গান নেই।

লীলা বেরিয়ে গেছে দরজা দিয়ে। তবু একটু দাঁড়ায়। বলে, একথা বলবেন না মাস্টারমশাই।

হ্যাঁ, এটাই বলেছিলাম পুরস্কার পেলাম বটে, কিন্তু পুরস্কার পেলেই তো আর গলায় সুর ফিরে আসবে না। পুরস্কারের সঙ্গে গান আর সুরের সম্পর্ক নেই। এইটুকুই বলেছিলাম। এটা ওরা ফেলে দিল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। এগোতে পারছে না। মাস্টারমশাইয়ের শিরা ওঠা হাত দুটি দেখছে। জীবন কেটে গেল লীলারও। ওই হাত দুটো একবার ধরা হল না। আজ একবার দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলে কী ক্ষতি হয়?

মাস্টারমশাই বললেন, এসো এবার লীলা। আমি একটু বারান্দায় একা বসব এখন। গাছগুলো এখন সন্ধেকে ডাকছে। সন্ধে নেমে আসাটাও আসলে একরকম গান। নিঃশব্দ গান। আমি শুনি। তুমি এগিয়ে পড়ো, কেমন?

লীলা মাথা নিচু করে গলি রাস্তার দিকে এগোয়।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বসন্ত উৎসব

সকাল দশটার মধ্যে স্নান করে তৈরি হয়ে নিয়েছেন অবিনাশ চৌধুরি। বাইরের ঘরে এই চৌকিটায় এসে বসলেই ভাল লাগে। সামনে হারমোনিয়মটা রাখা। হারমোনিয়মের কাছে বসলেই কেমন আসর-আসর ভাব। অবশ্য শ্রোতা নেই কোথাও।

কী করে থাকবে? আজ পনেরো বছর তো হল কোথাও কোনও প্রোগ্রাম পাননি অবিনাশ চৌধুরি। ছাত্রছাত্রীদের যাওয়া-আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেক দিন। সে-ও তো দশ বছর হবেই। অবিনাশ চৌধুরি বোঝেন তাঁর কোনও শ্রোতা অবশিষ্ট থাকার কথা নয় আর। এও ভাবেন, কোনও দিন ছিল কি তাঁর? কোনও শ্রোতা? এই তো গতকাল দোল গিয়েছে। যদি কেউ আবির দিতে আসে, এই ভেবে, অন্য দিনেরমতো সকাল দশটার মধ্যে আর স্নান করেননি অবিনাশ চৌধুরি। রুখু মাথায় বসেছিলেন। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা গড়ালে, তবে স্নানে গিয়েছেন। কেউ আসেনি। আগে দোলের দিন এই বাইরের ঘরটা ভরে যেত ছাত্রছাত্রীর ভিড়ে। আবির নিয়ে দল বেঁধে হাজির হত সব। একজন—দু'জন পরে এসে জমত। কত গান তখন, বেলা তিনটে পর্যন্ত।

বাইরের রোদ্দুরের দিকে তাকালেন অবিনাশ চৌধুরি। হাওয়ায় গাছের পাতা দুলছে। রোদ্দুর-মাখা পাতার ঝাঁক। রোদই ওদের আবির। গাছকে কি রং দেয় কেউ? দেয় না। তবু গাছেরা তো দলেরই অঙ্গ। ওই রোদে-ঝলমল গাছদের দেখে অবিনাশ চৌধুরির মনে হচ্ছে, আজও যেন দোলেরই দিন। রং খেলতে কেউ বেরয়নি বটে, চারদিকের সেই 'রং দাও, রং দাও' বাতাস কিন্তু আজকেও বয়ে চলেছে।

অবিনাশ চৌধুরি পাশ থেকে পানের বাটা খুলে একটা পান সাজতে লাগলেন। পানের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাটা'টাও পুরনো হয়েছে। কাঁসার তৈরি। মায়ের ছিল। মা চলে যাওয়ার পর থেকে তাঁরই সম্পত্তি।

অবিনাশ চৌধুরির দ্বিতীয় রেকর্ড বেরল আর মা চলে গেলেন। '৬৩ সাল। পরপর তিনখানা রেকর্ড বেরিয়েছিল অবিনাশ চৌধুরির। '৬০ সাল থেকে '৬৫ সালের মধ্যে। '৬৫-র পর আর বেরয়নি। সেই তিনখানা রেকর্ডের একখানাও এখন নেই। না, বাজারে তো থাকার কথাই নয়। এখন তো সিডি-র যুগ! রেকর্ডের চল কবে উঠে গিয়েছে। কিন্তু নিজের রেকর্ড অবিনাশ চৌধুরির নিজের কাছেও নেই। ছাত্রছাত্রীদের কেউ-কেউ শুনবে বলে নিয়ে গিয়েছে। ফেরত দিতে দেরি করতে-করতে এক সময় তাঁর কাছে গান শেখাও ছেড়ে দিয়েছে।

অবিনাশ চৌধুরি পান মুখে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দোতলা এই বাড়ি বাবা বানিয়েছিলেন, অবিনাশ চৌধুরির জন্মের বছরে। এই বাড়ির বয়স হল ৮৩। অবিনাশ চৌধুরি এখনও ভোরে হাঁটেন। বাড়িতে রান্না করার লোক আছে, বাজার করে আনে। সকালে রান্না করে দিয়ে চলে যায়। রাতে দুধ-খই খান অবিনাশ চৌধুরি। কোনওদিন দুধ-মুড়ি। রান্নার বউটি এখন যাচ্ছে। অবিনাশ চৌধুরি তাকে সদর দরজা খোলা রেখেই যেতে বললেন। কেই-বা আসবে আর কীই-বা নেবে? জানলার কাঠে আর লম্বা-লম্বা গরাদে হাত বোলাতে লাগলেন অবিনাশ চৌধুরি। সেই ছোট থেকে এরা সঙ্গে আছে। অবিনাশ চৌধুরির যেমন চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছে, হাতের শিরা ফুটে উঠেছে, এই জানলার কাঠগুলো ফেটে গিয়েছে জায়গায়-জায়গায়। গরাদে মরচে পড়েছে। অবিনাশ চৌধুরি ঘরের ভেতর দিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এর বড় বড় পাল্লা দু'টোও ফাটা-ফাটা। পাল্লার গায়ে হাত রাখলেন। ওরা কত দিনের সঙ্গী!

অবিনাশ চৌধুরি বাথরুমে গিয়ে পানটা ফেলে দিয়ে জল ঢেলে দিলেন। হাত তোয়ালে দিয়ে মুছে আবার এসে বসলেন হারমোনিয়মের সামনে। আর বসা মাত্রই মনে হল, ঘর-ভরা ছাত্রছাত্রী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

আসে না আর কেউ। কিন্তু খুব অসুবিধে হয় অবিনাশ চৌধুরির। মেনে নিয়েছেন। এমনটাই হবে। সত্যি তো, ছাত্রছাত্রীদের জন্য অবিনাশ চৌধুরি কিছুই করে দিতে পারেননি। তাঁর নিজেরই '৬৫ সালের পর আর কোনও রেকর্ড বেরয়নি। যে-তিনটে রেকর্ড বেরিয়েছিল, তাও অমিয় সেনগুপ্ত ছিলেন বলে। অবিনাশ চৌধুরিদের অফিসে একটি অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য সেকালে নামকরা রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ে অমিয় সেনগুপ্তকে নিয়ে আসা হয়। তাতে উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে অবিনাশ চৌধুরি দু'টি গান গেয়ে চোখে পড়ে যান অমিয় সেনগুপ্তর। তখন সব জায়গায় অমিয় সেনগুপ্ত-র বিরাট হাত ছিল। অমিয়বাবুর চেষ্টাতেই ওই খানতিনেক রেকর্ড বেরয় অবিনাশ চৌধুরির। রেডিওতে গাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন অমিয়বাবুই। অবশ্য অডিশন দিয়ে পাস করতে হয়েছিল। কয়েকবার প্রোগ্রাম পেয়েওছিলেন অবিনাশ চৌধুরি। কিন্তু যোগাযোগ রাখতে পারেননি। যাওয়া-আসা না-করলে হয়! যেতে হয় বারবার। নইলে তাঁকে মনে রেখে কেনই-বা কেউ ডাকবে।

আমার বই

অবিনাশ চৌধুরি যে যাওয়া-আসা করবেন রেডিও অফিসে কিংবা রেকর্ড কোম্পানির

~ www.amarboi.com ~

বড় কর্তাদের কাছে— সে-সময়ই তো তাঁর ছিল না। দাদা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন পক্ষাঘাতে, বউদি হঠাৎ মারা গেলেন। বাড়িতে পাঁচটি বালক-বালিকা। তাদের বড় করে তোলা, তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা— সারাদিনে সময় বার করতে পারতেন না অবিনাশ চৌধুরি। সকাল সাড়ে ন'টায় অফিসে ঢুকতে হত। অফিস থেকে বেরিয়েই গানের টিউশনি। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শেখাতেন সপ্তাহের দিনগুলোতে। ফিরতে রাত সাড়ে দশটা। কোনও দিন এগারোটা। আর রবিবার সকালে-বিকেলে দু'টো শিফ্‌টে শেখাতেন। টাকার খুব দরকার ছিল তখন। অমিয় সেনগুপ্ত সে-সময় কয়েকটা ফাংশনে গান গাওয়ার জন্য অবিনাশ চৌধুরির নাম বলে দিয়েছিলেন অর্গানাইজার'দের। এক জায়গায় দু'শো টাকাও পেয়েছিলেন অবিনাশ চৌধুরি। এখনও মনে আছে। একটা খুব ঘরোয়া মতো জায়গা। এইরকম দোলের পরপরই। দু'দিকে বড়-বড় বাড়ির মাঝখানে চওড়া গলি। গলিটা একটা বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে থেমে গিয়েছে। সেখানেই স্টেজ বেঁধে গান হচ্ছে। বারান্দা থেকে জানলা থেকে বাড়ির মেয়েরা দেখছে। সামনে জনা তিরিশেক লোক। সবই ওই পাড়ার লোক বলেই মনে হয়। দু'টি গান গেয়ে উঠে আসছিলেন। অনুরোধে আরও একটি গাইতে হয়। যেসব ফাংশনে গান গেয়েছেন অবিনাশ চৌধুরি, মনে পড়ে না তাঁকে আরও একটা গান গাওয়ার জন্য কেউ অনুরোধ করত কিনা। ওই ফাংশনটা মনে আছে, দু'শো টাকার জন্য তো বটেই—তা ছাড়া একটি যুবক, তাঁরই বয়সি হবে, স্টেজের কাছে এসে বলল, আর একটা করুন, ভাই। আর একটা। সময় আছে।

গান হয়ে যাওয়ার পর, ওই পাড়ারই একটা বাড়িতে বসিয়ে চা দিয়েছিল পাড়ার ছেলেরা। শিঙাড়া আর দু'টো রসগোল্লাও দিয়েছিল। জলের গ্লাস হাতে ঢুকেছিল একটি মেয়ে। বলেছিল, আমাকে শেখাবেন? আমি আপনার কাছে শিখতে চাই।

অবিনাশ চৌধুরি একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে নিজের বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন। অফিসের পর এত দূর তো আসতে পারব না। তবে রোববার-রোববার বাড়িতে শেখাই। কোনও একটা রোববার দেখে আসবেন। মেয়েটি ফাঁকা কাপ আর প্লেট তুলে নিতে-নিতে বলেছিল, আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি অনেক ছোট।

আজ সেকথা মনে করে হাসলেন অবিনাশ চৌধুরি। '৬৫ সালের কথা। বোকার মতো ঠিকানা লিখে দিলেন। হঠাৎ-হঠাৎ গান শিখব অনেকেই বলে। তাই বলে, অত দূর থেকে, কেউ আসতে পারে নাকি! কলকাতার সামান্য বাইরে, ট্রেনে যেতে হয়েছিল খড়দা না কোথায় যেন। মনেও নেই ঠিক। এখনকার মতো মেট্রো রেল তো হয়নি তখন। দু'শো টাকা পেয়ে অবশ্য ভালোই হয়েছিল। মাংস হয়েছিল একদিন। ভাইপো-ভাইঝিরা খুব খুশি। মেয়েটি অবশ্য আসেনি আর।

তবে অনেক মেয়েই তো এসেছিল শিখতে। সামনে বসে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত অবিনাশ চৌধুরি যখন গাইতেন। কিন্তু না। অবিনাশ চৌধুরির এক পা-ও এগোননি কোথাও। অতগুলো ছেলেমেয়েকে বড় করার দায়িত্ব তখন তাঁর কাঁধে। শুধু গান গাইতে বসলে এক-একটা 'তাকানো' মনে করতেন। আরও ঢুকে যেতেন গানে।

এই সময়ই অমিয় সেনগুপ্ত আচমকা মারা গেলেন। আর অবিনাশ চৌধুরির ভাগ্যের চাকা

~ www.amarboi.com ~

থেমে গেল। মানে, গানের ভাগ্য। রেকর্ড বেরনো তো বন্ধ হলই, ফাংশন করে টুকটাক রোজগারও বন্ধ হল। এদিকে ভাইপো-ভাইঝিরা বড় হচ্ছে। তাদের পড়ার খরচ বাড়ছে। দাদার ওষুধপত্রের খরচ বাড়ছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। মাইনের ক'টা টাকায় কি চলে?

ছোট ভাইঝিটার বিয়ে দিলেন যখন, তখন ৫৫ পেরিয়ে গিয়েছে বয়স। সংসার পাতার চিন্তা ওই বয়সে আর করে কেউ? যাকগে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। বড্ড কষ্ট করতে হয়েছে তখন। এখন পেনশন যা পান, চলে যায়। দু'টো ভাইপোর একটা বাইরে থাকে। একটা নিজের ফ্ল্যাট কিনে উঠে গিয়েছে। অবিনাশ চৌধুরি ভাবলেন, যাই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিই। ওটাও একটা কাজ।

টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়াই ছিল। ভাত-ডাল, একটা বেগুনভাজা। আর মাগুর মাছের ঝোল। টক দই। খেতে-খেতে ভাবলেন অবিনাশ চৌধুরি, শরীর-স্বাস্থ্যটা এখনও ঠিক আছে। এতটা বয়স হল, বার্ধক্যের কোনও রোগ সেভাবে ধরল না। শুভেনবাবু থাকেন কাছেই। গান-বাজনার শখ আছে। ডাক্তার। সরকারি হাসপাতালে ছিলেন। উনি একটু দেখে-টেখে দেন দরকার হলে।

খাওয়া শেষ হতে অবিনাশ চৌধুরি একটা তোয়ালে জড়িয়ে কলতলায় গিয়ে বাসনগুলো ধুতে লাগলেন। বাসন মাজার পাউডার দিয়ে থালা ঘষতে-ঘষতে গুনগুন করতে লাগলেন :

নিয়ে আয় তোর কুসুম রাশি
তারার কিরণ চাঁদের হাসি
মলয়ের... মলয়ের... কী যেন, মলয়ের...

নাঃ, আর মনে পড়ছে না! থালা-বাসন রান্নাঘরে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে, তোয়ালেটা জড়িয়েই বাইরের ঘরে এসে বইয়ের র‍্যাকের সামনে দাঁড়ালেন। সেখানে সার-সার খাতা রাখা। একটা খাতা টেনে নিয়ে খুললেন। খুব সাবধানে পাতা ওল্টাতে হবে। লালচে হয়ে যাওয়া পাতাগুলো আঙুলের সামান্য জোর লাগলেই ফেটে যাবে। তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা ওল্টাতে গেলে পাতা খুলে আসবে। সাবধানে গানটাকে খুঁজতে লাগলেন অবিনাশ চৌধুরি। এই তো পেয়েছেন। 'মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।' এই তো লাইনটা। আজকাল গানের লাইন ভুলে যান খুব।

ঘরে গিয়ে তোয়ালের বদলে পাজামাটা পরে নিলেন অবিনাশ চৌধুরি। ঘড়িতে দু'টো বাজে। এখন একটু গড়িয়ে নেবেন। ওই হারমোনিয়মের পাশেই, বড় চৌকিটায়। আগে সদর দরজাটা বন্ধ করা দরকার।

দুই

ঘুম ভাঙল জোরে-জোরে জানলা পড়ার শব্দে। হাওয়া উঠেছে। দেখতে-দেখতে বৃষ্টি নেমে গেল। পাতা উড়ে যাচ্ছে হাওয়ার তোড়ে। অবিনাশ চৌধুরি জানলা দুটো বন্ধ করলেন না। ভালো করে আটকে দিলেন পাল্লাদুটো যাতে হাওয়ায় না পড়ে বারবার। তারপর জানলার ধারে পুরনো চেয়ারটা টেনে বসে রইলেন অবিনাশ চৌধুরি। দোলের পরপরই এইরকম বৃষ্টি

~ www.amarboi.com ~

এক-একবার হয় বটে। থেমেও যায় তাড়াতাড়ি। শুধু জোরে বইতে থাকে ভেজা হাওয়া। সামনের গাছগুলো পাতা নাড়াচ্ছে। হঠাৎ অবিনাশ চৌধুরি খেয়াল করলেন টপটপ করে একটা আওয়াজ হচ্ছে কোথাও। খানিক পরে-পরে। ছাদের পাইপ বা কার্নিশ থেকে জল টোপাচ্ছে ফোঁটায়-ফোঁটায়। বাড়িটা অনেকটা ভেতর দিকে। তাই রাস্তার আওয়াজ আসেই না। জল পড়ার আওয়াজটায় কখন যেন কান পেতেছেন অবিনাশ চৌধুরি। কখন যেন গুনতেও শুরু করেছেন শব্দগুলো। আশ্চর্য! কী করে যেন একটা লয় মেনে ফোঁটাগুলো পড়ছে। ঠিক যেন কোথাও কেউ গান গাইছে, অতি বিলম্বিতে—আর জলের ফোটারা তার-লয়'টা ধরে আছে। শুধু গানটা শোনা যাচ্ছে না এই যা। অশ্রুত কোনও সংগীত কোথাও হয়ে চলেছে কি? জলের ফোঁটারা সেই ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে কি অবিনাশ চৌধুরিকে?

জলের ফোঁটার গতি ধীর, অতি ধীর হতে-হতে এক সময় জল-পড়া বন্ধ হয়ে গেল। গায়ক কি উঠে পড়লেন তবে? এখনকার মতো গাওয়া শেষ করে? অবিনাশ চৌধুরি সেই গান শুনতে পাননি, ঠিকই, শুধু তার সংগতটুকু শুনতে পেলেন।

সন্ধে নেমে গিয়েছে। অবিনাশ চৌধুরি উঠলেন। নরম আলো জ্বালালেন ঘরে। ভেতর-ঘরে গিয়ে সারা দিনের পাঞ্জাবিটা বদলে অন্য পাঞ্জাবি পরলেন। এক গোছা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বাইরের ঘরে রাখলেন। দুপুরে শুয়েছিলেন হারমোনিয়মের পাশে। চাদরটা টেনে সমান করলেন, তাকিয়া দু'টো একটু সরিয়ে পিছন-করে আর পাশ-করে রাখলেন। তারপর হারমোনিয়ম ধরে গেয়ে উঠলেন :

এসো প্রাণ সখা এসো প্রাণে
কর তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত
তব প্রেম সুধারস দানে
এসো প্রাণে

গানটা পুরো গেয়ে থামতেই জানলার একজন পাল্লা বলে উঠল, এই তো, পুরোটাই তো গাইলি। কই, খাতা দেখতে হল না তো?

অন্য জানলার পাল্লা বলল, বাতিক-বাতিক! নিজে মনে করে যে, মনে রাখতে পারে না।

দরজা বলল, ধর, ধর, আরেকটা ধর।

দ্বিতীয় দরজা বলল, ওই গানটা কর তো একবার। ওই যে, হিন্দি গানটা। কোনটা বুঝেছিস তো?

অবিনাশ চৌধুরি একটু লাজুক হেসে বললেন, বুঝেছি! ওটা তো ছাত্রছাত্রীদের সামনেও গাইনি কোনও দিন। শুধু তোরা শুনেছিস। তোদের সামনেই করি।

তাই-ই তো। ৮৩ বছর ধরে একসঙ্গে থাকতে-থাকতে এখন এ-বাড়ির দরজা-জানলার কাঠও অবিনাশ চৌধুরির গান শুনতে পায়। বাইরের লোক জানে না। কিন্তু ওরাই শ্রোতা। দেওয়াল বলল, কর, কর, ওটাই শুরু কর। আমরাই তো ক'জন আছি। আমরা কি আগে তোকে এটা গাইতে শুনিনি? অবিনাশ চৌধুরি বললেন, ভয়, ভয় করে। বলেই শুরু করলেন : আজু বহত বসন্ত পবন সুমন্দ মধুর বসন্ত মে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখতে-দেখতে সারা বাড়ি ভরে গেল বাহার রাগের আলোয়। পাখোয়াজের অশ্রুত বোল জানলা দিয়ে বেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে। 'সম' থেকে উঠছে এই গান, যতবার পুরো ঘুরে মুখে এসে 'ধা' পড়ছে, ওই অশ্রুত পাখোয়াজ বোল যেন বলে উঠছে, 'শুভম'। একটা করে 'সম' আসছে, আর বোলে বোলে সব বাণী শুভম।

শুভ দরজা-জানলার কাঠ, শুভ শুভ মরচে-ধরা জানলার গরাদ, শুভ বুড়ো হয়ে যাওয়া দেওয়াল, শুভ শুভ পলেস্তারা খসে যাওয়া দেওয়ালের ক্ষতচিহ্ন, শুভ ছাদ বারান্দা ভাঙা কার্নিস, শুভ শুভ পুরনো লোহার পাইপ, শুভ সব, শুভম শুভম—গানে-গান আজ ওদের সকলের সঙ্গে শুভ বসন্ত উৎসব পালন করছেন অবিনাশ চৌধুরি।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

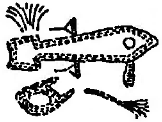

স্পর্শ

সকাল। ক'টা হবে? সাতটা বাজেনি। সুকুমার বারান্দার তক্তপোশে বসে ছিল। দরজায় ক্যাঁ-অ্যা-চ করে একটা আওয়াজ। সুকুমারদের ভাঙাচোরা একতলা বাড়িটার সদর দরজা পিছন দিকে। দরজার পায়ের দিকটা ক্ষয়ে গিয়েছে। কলকব্জা প্রায়-ভাঙা। কে ঢুকল, দেখতে সুকুমার ঘাড় ঘোরাল। সাবু এসেছে। সাবুর হাতে বেতের ছোট ঝুড়ি। রোজই আসে। ফুল নেবে। সাবুর পিছন-পিছন আরেকটা মেয়ে ঢুকল। সাবুর চেয়ে একটু লম্বা। সাবুর মতোই সেও ফ্রক-ই পরা। কিন্তু সাবুর চেয়ে বড়সড়। সাবু বলল, আমার মাসির মেয়ে। হাওড়া শিবপুরে থাকে ওরা। পিটুদি, এ সুকুদা। মেয়েটা বড়-বড় চোখে তাকিয়ে একটু হাসির ভাব আনল মুখে। সাবু বলল, ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। বলে, সাবু, সুকুমারের সামনের বারান্দা দিয়ে উঠে, বারান্দার উলটো দিকে ঝোপ জংলায় নেমে গেল। সাবুর এখন ক্লাস নাইন।

সাবু ফুল নিতে আসে সুকুমারদের বাড়ি। সুকুমারদের বাড়ির ভেতরে অনেকটা পোড়ো জমি। অযত্নের গাছপালায় ভরা। তার মধ্যে দু'টো গন্ধরাজ গাছ। চাঁপাফুলের গাছ একটা। শিউলি। তিনটে লেবুগাছও আছে। অনেক লেবুফুল হয়। তার গন্ধও অনেক। কিন্তু লেবুফুল নেয় না সাবু। সাবুর ঠাকমা গৃহদেবতার পুজো করেন। পোড়ো জমিটায় ঘাস বেড়েছে। মাথা তুলেছে আগাছা। দু'টি কিশোরী তার মধ্যে দিয়ে ফুল নিচ্ছে ঘুরে-ঘুরে। সঙ্গের নতুন মেয়েটি দু'বার আড়চোখে দেখল সুকুমারকে। সুকুমারের কেমন একটু লাগল। মেয়েটা ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। সুকুমার ভাবল, মানে, পরের বছর হায়ার সেকেন্ডারি মেয়েটার। সুকুমার বিএসসি সেকেন্ড ইয়ার। বাবা সকাল ছ'টায় বেরিয়ে যায়। 'ইছাপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি'-তে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাজ করে। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সন্ধে ছ'টা। মা নেই সুকুমারের। স্কুলে পড়তে-পড়তেই রান্না করতে শিখে নিয়েছে সুকুমার।

সাবুরা ফুল নিয়ে চলে গেল। একেবারে পাশের বাড়িটাই সাবুদের। যাওয়ার আগে সঙ্গের মেয়েটা আরেকবার দেখল সুকুমারকে। সুকুমার একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা পরে বসেছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর উঠে গায়ে একটা বুশ শার্ট গলাল। তারপর নিজের বোকামি দেখে নিজেই হাসল সুকুমার। এখন আর জামা গলিয়ে কী হবে! সাবু এলে অবশ্য যেমন ছিল তেমনই থাকে। সাবু ওকে গামছা পরে কুয়োতে দড়ি-বালতি ফেলে হুড়মুড় চান করতেও দেখেছে। সুকুমার রান্নাঘরে গিয়ে 'জনতা স্টোভ' জ্বেলে চা বসাল। বাবা সকালে উঠে শুধু চা-বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে যায়। অফিসে গিয়ে খায়। কখনও স্টেশনের দোকান থেকে একটা কেক কিনে খেয়ে নেয়। সুকুমার অবশ্য দু'টো ভাত ফুটিয়ে নেবে। দু'টো আলু ফেলে দিল তার মধ্যে। একটা ডিম সেদ্ধ করে নিল। খেতে বসার সময় ভাতে একটু ঘি ফেলে দেবে। তারপর কলেজে বেরবে।

বেরনোর সময় দরজায় তালা একটা দিতে হয়। যদিও ভাঙা দরজা। তবু তালা না-দিয়ে কি বেরনো যায়? তালা আটকাচ্ছে। টেনে দেখল। দেখে ঘুরল। দরজা থেকে বাঁ-দিক ঘুরবে। হঠাৎ উলটো দিকের জানলায় চোখ পড়ল সুকুমারের। সাবুদের জানলা। এই মেয়েটা, পিটু! তাকিয়ে আছে সুকুমারের দিকে। সুকুমার একটু থতিয়ে গেল। একটু হাসির চেষ্টা করল। পিটু হাসল না। জানলা থেকে সরলও না। একদৃষ্টে চেয়ে আছে। সুকুমার নিজে থেকেই বলল, চলি, কলেজ যাব। বলেই অর্ধেক-হাসি ফুটিয়ে চাবিটা পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটা শুরু করল। কিন্তু অনাবশ্যক একটা তাড়াহুড়ো হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। ওর বগলে ধরা খাতাটা পড়ে গেল মাটিতে। সুকুমার নিচু হয়ে খাতাটা তুলে আনতে-আনতেই খিলখিল হাসি শুনতে পেল। চমকে ঘুরে জানলায় তাকিয়ে দ্যাখে—মুখে হাত-চাপা দিয়ে সরে যাচ্ছে পিটু।

দুই

পরপর তিন দিন সাবুর সঙ্গে এল পিটু। কখনও, কোনও দিন, সাবু ফুল নিতে আসার আগে মনে-মনে অপেক্ষা করেনি সুকুমার। এই তিন দিনই অপেক্ষা করে থেকেছে। বুশ শার্ট পরতে ভোলেনি। এমনকী, ঝাঁকড়া চুলে চিরুনিও বসিয়েছে। প্রতিদিনই, সাবু যখন ফুল তুলে নেয় ঘাস থেকে পিটু সাবুর সঙ্গে কথা বলে চলে। আর সাবুর অলক্ষে একবার ক'রে, দু'বার ক'রে, এমনকী তিনবারও তাকিয়ে নেয় সুকুমারের দিকে। এই প্রতিদিনই, সুকুমার খুব একাগ্রমনে তালা দিয়েছে দরজায়। টেনে দেখেছে। তারপর ঘুরে তাকিয়েছে। পেয়েও গেছে। সর্বদা জানলায় নয়। কখনও ছাদে। কখনও দোতলার বারান্দায়। চার দিনের দিন সাবু এল না। একা পিটু এল। হাতে বেতের ছোট্ট ঝুড়িটা। কী? না, সাবুর আজ থেকে পরীক্ষা। ১০টায় শুরু। সাবু একটু পড়ে নিচ্ছে। এখন ক'দিন পিটু-ই ফুল নেবে। পিটু ফুল নিচ্ছে। সুকুমার গম্ভীরভাবে বইপত্র দেখছে কলেজের। কেউই কোনও কথা বলছে না। পিটু চলে যাচ্ছে। সুকুমার তক্তপোশে। যাওয়ার আগে একবার সুকুমারের দিকে তাকিয়ে নেয় পিটু। সব সময়।

~ www.amarboi.com ~

প্রথম দিনগুলোয় সাবু থাকত আগে, পিটু পিছনে। সাবুর মুখে, 'পিটুদি, আয়'—অথবা 'এবার চল পিটুদি' কথাটা শুনলেই সুকুমার টানটান হয়ে যেত। আবারও বইপত্রের দিকে মনোনিবেশ করত। তারপর ঠিক সময়মতো একবার তাকাত। সময়টা এই তিন দিনেই ঠিক করে নিতে পেরেছে সুকুমার। বলা দরকার, প্রথম দিন যখন সাবুর সঙ্গে পিটু ঢোকে তখন সুকুমারের সামনে কোনও বইখাতা ছিল না। আগেও থাকত না। সকালে উঠে চুপচাপ বসেই থাকত সুকুমার, বারান্দার তক্তপোশে।

আজ তো সাবু নেই। সুতরাং 'চললাম' কথাটা শুনে পিটুর দিকে তাকাল সুকুমার। পিটু যে এতক্ষণ একা-একা ঝোপজংলায় ঘুরে-ঘুরে গন্ধরাজ গাছ থেকে ফুল পাড়ছে, ঘাস থেকে শিউলি তুলছে—পুরো সময়টাই সুকুমারের বুকের ভিতরে ধকধক করে চলেছে। এরকম কখনও আগে হয়নি সুকুমারের। তাই সুকুমার একদৃষ্টে পিটুর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, যতবার তাকাচ্ছে, পিটু যেন একবারও দেখতেই পাচ্ছে না সুকুমারকে। পিটুর পায়ের গোছ ফরসা। তাতে হালকা কালো রোম। পিটুর গলায় একটা সরু হার, সোনার। সকালের রোদ লেগে মাঝে-মাঝে চিকচিক করে উঠছে।

পিটু বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজার দিকে মুখ। যেন দরজাকেই বলল, আজকেও কি কলেজ আছে?

সুকুমার বলল, হ্যাঁ, মানে, আছে তো।

রোজ-রোজ কলেজ যাওয়ার দরকার কী? একদিন দুপুরে তো বাড়িতেও থাকা যায়।

মানে?

কারও যদি গপ্পো করতে ইচ্ছে হয় সে তো আসতে পারবে না। দরজা তালা বন্ধ! আজ কলেজ যেতে হবে না। বলে, এতক্ষণে একবার তাকাল পিটু। তারপর বেরিয়ে গেল। সুকুমার বসে রইল তক্তপোশে। তার হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেছে!

তিন

সেদিন কলেজ যাওয়া হল না সুকুমারের। শুধু সেদিনই নয়। মনে-মনে, পরে, গুনে দেখেছে সুকুমার—মোট ১৮ দিন সাবুদের বাড়ি ছিল পিটু। তার মধ্যে ঠিক-ঠিক ৮টা দুপুর পেয়েছিল সুকুমার। সাবুর মা-ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়ার পর পিটু চলে আসত গপ্পো করতে। গপ্পো? প্রায় কোনও কথাই বলত না পিটু। পিটু কথার লোক নয়।

যা বলার প্রথম দিন বলেছিল। দুপুরে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল সুকুমার। পিটু এল। 'সিগারেট খাচ্ছ? সিগারেট খেলে ঠোঁট কালো হয়ে যায়। দেখি তো কালো হয়েছে কি না?' বলে, সুকুমারের দু'টো গাল ধরে মুখ খুব কাছে এনে দেখতে শুরু করেছিল। সুকুমারের হৃৎপিণ্ড একবার চালু হচ্ছে। একবার বন্ধ। আবার চালু হল। এইরকম অবস্থায় পিটু বলল, চোখে দেখে বোঝা যায় না। ঠোঁট দিয়ে বুঝতে হয়। বলে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। সুকুমার কোনওমতে বলল, সদরটা... খোলা... হাঁফাতে-হাঁফাতে পিটু বলল, বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।

~ www.amarboi.com ~

সুকুমার আবার বলল, কাকিমারা? খুব বিরক্ত পিটু। ঘুমোচ্ছে। দেখে এসেছি। আঃ, কথা বোলো না তো!

প্রথম দিনেই পিটু বুঝিয়ে দিয়েছিল পিটু কথায় নয়, কাজে বিশ্বাস করে।

চার

পিটু চলে গেছে। বলে গেছে পরের ছুটি সামনেই। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা হয়ে গেলে যে-ছুটিটা পাবে সেই ছুটির সময় আসবে। সুকুমার কলেজ যায়। কিন্তু যাওয়া না-যাওয়ার সমান। ছটফট করতে-করতে দিন গুনছে কবে হায়ার সেকেন্ডারি শুরু হবে। শেষ পর্যন্ত একদিন পরীক্ষা শুরু হল। শেষও হয়ে গেল। সাবু ফুল নিতে আসে। একদিন জিগ্যেস করে ফেলল, সাবু তোর পিটুদি পরীক্ষা কেমন দিল? সাবু মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর করে বলল, আমি জানি না। থমকে গেল সুকুমার। সাবু কি কিছু সন্দেহ করেছে? সাবুর বাড়ির লোকরা?

সে-কথা জানার কোনও উপায় নেই সুকুমারের। সুকুমার শুধু দেখল, পিটু এল না।

সুকুমার বিএসসি পরীক্ষায় ফেল করল সে-বছর। অনেক পরে সুকুমার জানতে পারে, সাবুর কাছেই জানতে পারে, পিটু, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা না-দিয়ে তার প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে পালিয়ে গেছে! বিয়েও করেছে। প্রাইভেট টিউটর অবশ্য এখনকার নয়। এ ছেলেটি আগে পড়াত। ছ'মাস আগে চাকরিতে ঢোকে। পিটুর বিয়ে পিটুর বাবা-মা মেনে নেয়নি। সাবুরাও মানে না। তাই পিটু এখন কোথায় আছে জানা নেই তাদের। এরপর সুকুমার পাস করল। বাবার অফিসেই চাকরি পেল, বাবার চেষ্টায়। বাবা বিয়ে দিল। সুকুমার একজন গৃহস্থ হয়ে উঠল। তাদের ছোট্ট টাউনে প্রোমোটার ঢুকল। সাবুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই। সাবুর বড়দা সাবুদের বাড়ি প্রোমোটারের হাতে দিয়ে বারাসতে চলে গেল। সুকুমার ছ'টায় বেরিয়ে যেতে লাগল বাবার মতোই। সুকুমারের বাবা দেহ রাখলেন। সুকুমারের ছেলে নিজের মতো করে উপযুক্ত হয়ে সুকুমারকে এসে একদিন বলল, বাবা, আমি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চান্স পেয়েছি।

সুকুমারের বুকটা ধক করে উঠল! শিবপুর? ছেলে জানে না। বউও জানে না। সুকুমারকে সারা জীবন কুরে-কুরে খাওয়ার জন্য থেকে গিয়েছে সেই ৮টা দুপুর। 'শিবপুর' বললেই সেই দুপুরগুলো ভেতরে জ্বলতে শুরু করে।

পাঁচ

বেশ কয়েক বছর পর একদিন ক্যান্সার হাসপাতালের বিশেষ একটি কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সুকুমার, গত কয়েক দিনের মতোই। এখন শেষ-বিকেল। এখন সে অন্যান্য দিনের মতোই পৌঁছেছে ভিজিটরদের বসার জায়গায়। বসেনি। দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে আছে ভেতরে, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে। বাইরে কয়েকটা গাছ। আলো মরে গিয়েছে। কিন্তু অন্ধকার নামেনি। সুকুমার অসাড় মনে সামনে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ চমকে উঠল। এ কী! পিটু? কী

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে সম্ভব? একটা মেয়ে ব্যস্ত হয়ে ঢুকে ভেতরের দিকে চলে গেল, সঙ্গে একজন যুবক। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সুকুমার। মেয়েটি, ভেতরে যাওয়ার আগে, রিসেপশন কাউন্টারে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে কী জিগ্যেস করল। তারপর ঘুরে যুবকটিকে বলল কিছু। সুকুমার একদৃষ্টে তাকিয়ে তখন। অবিকল পিটু। শুধু বয়সটা একটু বেশি। পিটু তখন ষোলো-সতেরো ছিল। এর কত? পঁচিশ-ছাব্বিশ? তার ছেলেরই বয়সি।

সুকুমার একটা ধাক্কা খেয়েছে। সুকুমারের অসাড় হয়ে থাকা অন্ধকার মন একটা ঠেলা খেয়ে বড় পাথরের মতো আবারও কোনও গভীর খাদে গড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। পাথরটা, বেশ কিছুকাল একটা জায়গায় আটকে ছিল।

ছেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। হাতে একতাড়া কাগজ। বাবা, কাগজগুলো রাখো। আমি বাইরে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটা দেখি। ওরা তো বলছে, এখনই এসে যাবে, তবে প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স তো— কখন আসবে... তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো। এইতো, এই চেয়ারটা ফাঁকা। বোসো।

ছেলে সুকুমারকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই সুকুমার উঠে আবার আগের জায়গায় দাঁড়ায়। কত বছর হল? ৪৫ বছর। সুকুমারের এখন ৬৪। তখন ছিল ১৯। এই মেয়েটা কে? এমন অসম্ভব মিল পিটুর সঙ্গে! শুধু পোশাকটা আলাদা। এখনকার পোশাক। একটা নীলচে প্যান্ট। যাকে বলে জিন্স। আর একটা টি-শার্ট। সঙ্গে ছেলেটা কে?

বহুকাল পর ভাবনার মতো একটা অন্য জিনিস পেয়েছে সুকমারের মন। নইলে গত তিন বছর ধরে সুকুমারের মন তো একটা বিষয় নিয়েই ভেবে যাচ্ছে।

সুকুমার আবার চমক খেল। মেয়েটা বেরিয়ে আসছে করিডর দিয়ে। একা নয়। তার পাশে একটা হুইলচেয়ার। সেখানে একজন মহিলা, মাথায় কোনও চুল নেই। হুইলচেয়ারের অন্য পাশে যুবকটি হাঁটছে। চেয়ার ঠেলে আনছে একজন নার্স।

সুকুমার, প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। বলা বাহুল্য, মেয়েটি মোটেই খেয়াল করছে না যে হাসপাতালে অজস্র অপেক্ষমাণ পেশেন্ট-পার্টির ভিড়ে একজন নিষ্প্রভ বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে আছে— যার সমস্ত চুল সাদা। মেয়েটির মুখে উদ্বেগ। দৃষ্টি সামনের দিকে। মেয়েটির সঙ্গী যুবকটিও হুইলচেয়ার ধরে আছে।

সুকুদা না? অ্যাই, দাঁড়া দাঁড়া।

'সুকুদা' কানে কথাটা ঢুকতেই সম্বিত ফিরল সুকুমারের। কথাটা কে বলল? মেয়েটি ও যুবকটি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

কে সুকুদা? কোথায়?

সুকুমারের চোখ পড়ল হুইলচেয়ারে বসা মহিলার দিকে। পরনে একটা ম্যাক্সি। থলথলে মুখ। তাতে কালো-কালো ছোপ।

সুকুদা! তুমি সুকুদা তো?

সুকুমার হুইলচেয়ারের দিকে এগোল। অন্যপক্ষে হুইলচেয়ারটিকেও একটু ঠেলে আনা হল সুকুমারের কাছে।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

মহিলা বললেন, সুকুদা চিনতে পারছ না? আমি পিটু। পিটু গো! সাবুর দিদি।

সুকুমার একটা ধাক্কা এখনও সামলে ওঠেনি।

দ্বিতীয় ধাক্কাটার মুখে পড়ল। হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিনতে পারছি।

মহিলা বললেন, আর কী করেই-বা চিনবে? ওরে, এ আমার বাপের বাড়ির লোক! তোদের সুকুমামা। বুঝলি? সুকুদা আমার মেয়ে-জামাই।

মেয়ে-জামাই একটু নমস্কারের ভঙ্গি মতো করল। মহিলা নিজেই বললেন, ৭টা কেমো হয়ে গিয়েছে। আর নিতে পারি না গো।

মেয়ে বলল, মা তুমি অত কথা বোলো না!

নার্স হুইলচেয়ারটি ঠেলে খুব ধীরে এগোল। নার্সেরও তো তাড়া আছে।

সুকুমার পাশে-পাশে চলছে। মহিলার কেশহীন তালুতে ছোপ-ছোপ দাগ দেখতে পাচ্ছে—যেহেতু সুকুমার দাঁড়ানো অবস্থায় আছে।

মহিলা বললেন, কত দিন পর তোমাকে দেখলাম গো সুকুদা। তা তুমি এখানে কেন?

সুকুমার শুধু বলল, আমার স্ত্রী। ভর্তি আছে।

মহিলা নার্সকে বললেন। দাঁড়াও। দাঁড়াও। তোমার বউ? কেমন আছে এখন?

সুকুমার সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, লাস্ট স্টেজ। ডাক্তার বলেছেন বাড়ি নিয়ে যেতে। আর একমাস বড়জোর। আজ বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

কথাগুলো শুনে মেয়ে-জামাই চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহিলা একটা হাত বাড়িয়ে সুকুমারের মণিবন্ধটা চেপে ধরলেন। সুকুমার ওই অবস্থাতেও ভাবল, এই হাতের স্পর্শের কথা ভেবে-ভেবে সুকুমার রাতের-পর-রাত জেগে থেকেছে। আর আজ? কোনও সাড় নেই তার।

ছেলে ঢুকল, প্রায় ছুটে। বাবা, অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে। আমি স্ট্রেচারটা দেখছি। মা-কে নিয়ে আসছি। তুমি এখানে থাকো। ছেলে ভেতরে চলে গেল।

মহিলা বললেন, ছেলে?

সুকুমার বলল, হ্যাঁ। ওদিকটা দেখি একটু। বলে সুকুমার, কোনও কারণ ছাড়াই, বাইরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর, দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সটার উলটো দিকে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সুকুমারকে আড়াল করতে পেরেছে অ্যাম্বুলেন্স।

সুকুমার আর ওই মহিলাকে দেখতে চাইছে না এই মুহূর্তে। ওই মেয়েটিকেও নয়। এমনকী, সুকুমার, নিজের স্ত্রীকেও এখন দেখতে চাইল না আর। অন্তত এই মুহূর্তে একটু একা থাকা বড্ড দরকার তার। সুকুমার শুনতে পেল ছেলের গলা। স্ট্রেচার ধরে থাকা দু'জন হাসপাতাল কর্মীকে দেখতে পেল। সুকুমার দেখল ছেলে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিচ্ছে। তার আগে স্ট্রেচার ঢুকিয়ে দেওয়া হল অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর, তাও বুঝতে পারল সুকুমার। ছেলেকে চেঁচিয়ে বলল, তুই মা-র কাছে থাকো। আমি সামনে বসছি।

অ্যাম্বুলেন্স চলেছে জনাকীর্ণ শহরের ট্রাফিকের ভিতর দিয়ে। জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে সুকুমার। গত তিনবছরে, তার সব সঞ্চয় নিঃশেষ, রিটায়ারের পর পাওয়া সব সঞ্চয়

~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত। ছেলেটা চাকরিতে ঢুকেছে। ছেলে বাড়ির কাছে একটা নার্সিং হোমে বলে রেখেছে। বাড়িতে যদি নিতান্তই না-রাখা যায়, ওখানে দিতে হবে। বার বার এত দূর আনার আর দরকার নেই, ডাক্তার বলে দিয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স বাঁক নিল। এই রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। সন্ধের হাওয়া লাগছে সুকুমারের মুখে। অ্যাম্বুলেন্স আবারও বাঁক নিয়ে হাই রোডে পড়ল। সুকুমারের চিন্তাও বাঁক নিল একটা।

সুকুমার ভাবল, তার ৬৪ বছরের জীবনে সে দু'টি মাত্র নারীকে স্পর্শ করেছে। দু'টি মাত্র নারীকে উলটে-পালটে যেমন ইচ্ছে দেখেছে। ছুঁয়েছে। মাত্র দু'জন। এখন তার যৌনতাও শেষ। অন্যদিকে, সেই দু'জন নারীকেই কর্কটরোগ শেষ করছে। শেষ করবেও। ক্যান্সার তো কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয়। সুকুমারের মনে হচ্ছে সুকুমারের স্পর্শেই কি তা হলে কোনও মারণবীজ ছিল, কোনও বড় অভিশাপ? নইলে দু'জনেরই কেন এইরকম হবে! সুকুমার নিজের প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে বলল, নিশ্চয়ই ছিল। ছিলই।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি হাসির গল্প

বাপ্পামণি আর মজুমদার বেরিয়ে পড়ল। সকালে সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে ওরা বেরয়, তিনদিনে একবার। যেন টাইমকলে জল। ষষ্ঠীতলার মোড়ে পটলমুদির দোকানের পিছনে বাটখারার মাঠ। মাঠ কীসের, একফালি লম্বা জমি, বিকেলবেলা পাড়ার ছেলেপুলেরা ফুটবল-ক্রিকেট খেলে। তিনদিকে বাড়ি, একধারে ডোবা। কচুরিপানায় ফুল আর ফড়িং সেখানে—জল না। বর্ষার জল কাকে বলে বুঝবে,যখন মাঠে উঠবে ওই ডোবাই। ডোবার ধার দিয়ে হাঁটছে দু'জন।

মজুমদার : এনেছিস তো? আগের দিনের মতো বলিস না, যাহ্! ফেলে এলাম।

বাপ্পামণি : এনেছি এনেছি। এই যে। হাফশার্টের বুকপকেটে।

বুকে হাত রাখে সে। আর তুই?

কোনও দিন ভুল হতে দেখেছিস? দে।

মজুমদার চারদিকে তাকাল। একটা বাচ্চা ছেলে মাঠের উলটো দিকে সাইকেল চড়া শিখছে। পিছনে কেরিয়ার ধরে ওর দাদা। দু'জনেরই নজর টলমল সাইকেলে। পটলমুদির আধবুড়ো কর্মচারী পেচ্ছাপ করতে এসেছে। ডোবার ধারে বসা। এদিকে পিঠ। কেউ দেখছে না ওদের। মজুমদারের প্যান্টের পকেট থেকে একটা ঢিল আর দু'টো গার্ডার প্রকাশিত হল, বাপ্পামণির হাফশার্ট থেকে একখানা কাগজ। রুলটানা। আঁকাবাঁকা লেখা তাতে। ঢিলের গায়ে কাগজ মোড়ানো, গার্ডার আটকানো—সবই মজুমদারের আধমিনিটের কাজ। সামনের তিনতলা বাড়িটার ফাঁকা ছাদে চোখের নিমেষে ঢিলটা থ্রো করেছে মজুমদার। ঢিল অদৃশ্য হতেই দ্রুত পায়ে হাঁটা শুরু দু'জনের। এটা বাড়ির পিছন দিক। সাবেক বনেদি বাড়ি। অতএব বৃহৎ। ঢুকতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হলে 'নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর পাশে রাধেশ্যাম ঘাট লেন দিয়ে ঢুকতে হয়। এই বাড়ির আদিপুরুষ রাধেশ্যাম মল্লিকের নামে রাস্তা। এই মল্লিক বাড়ির মুখ চুর্ণী নদীর দিকে ফেরানো। কিন্তু ওদিকে যাওয়ার প্রশ্নই নেই ওদের। দু'জনে হনহনিয়ে মাঠ ছেড়ে এসেই ওজন-বাটখারার অফিসের পিছনে মিলিয়ে গেল।

এখন বাপ্পামণিদের চিলেকোঠায় মজুমদার বসে খবরকাগজ দেখছে। বাপ্পামণি নিচে। চা আর বানরুটি আনবে। সিগ্রেটও। দেরি করছে। বড়-বাইরে সারছে নিশ্চয়। অগত্যা কাগজের প্রথম পাতায় মজুমদার।

সদ্য প্রধানমন্ত্রীর পদে এসে কী বলছেন মোরারজি দেশাই। জগজীবন রাম, চরণ সিং— এঁরাই-বা কে-কী বলছেন তাও আছে। ভিতরের পাতায় সেই নেতার ছবি এখন প্রায়ই দিচ্ছে, যাঁর মাথায় ফেট্টি বাঁধা সারাক্ষণ, কেননা ইনি ইন্দিরা গান্ধীকে হারিয়ে দিয়েছেন। ইনিই রাজনারায়ণ। রাশিফল, অরণ্যদেব, গোয়েন্দা রিপ দেখে চারের পাতায় রাজ্য-রাজনীতি খুলেছে আর বাপ্পামণি ঢুকল। একটা থালায় দু'-গেলাস চা। দু'টো বানরুটি। পকেট থেকে বেরল সিগ্রেট-দেশলাই। মজুমদার বলল, পড়, পড়, কী লিখলি এবার।

পড়ব? বলেই ডাকাবুকো হাঁকা দমকা বৃষস্কন্ধ বাপ্পামণি এই মুহূর্তে, খাঁটি অর্থে, লজ্জারুণ। পড়ব? বলছিস! মজুমদার খেপে যায় এই সময়টা। আজও খেপল। রাখ্ তো! ওসব বিকচ কুসুমতা দেখাসনে। 'বিকচ কুসুমতা' কথাটা ধারে নেওয়া। লোকে ধারে সিগ্রেট নেয়। কথা নিতে দোষ কী? কথাটা বাংলার মাস্টার তলাপাত্র স্যরের। উনি একটু বেশি-বেশি ভাষা দেন। একবার দুপুরের নির্জনতা বোঝাতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন—ঘুমন্ত ঘুঘুর ডাক ছাড়া চারদিকে কোনও আওয়াজ নেই! এইবার এই প্রশ্ন গুঞ্জরিত হতে লাগল যে পাখিটা তবে ডাকছে কীভাবে? সেই থেকে রাস্তাঘাটে তলাপাত্র স্যরকে দেখলেই ছেলেপুলে 'ঘু-উ-উ-ঘুউঃ' বলেই লুকিয়ে পড়ে।

একটা দু'নম্বর খাতা বের করছে বাপ্পামণি। এটা রাফ্। এটা রাফ্। পরে ভাল করে কপি করেছি।

মজুমদার ধৈর্য হারায়। পড় না, শালা।

অষ্টবসু তরফদারকে তাঁর স্ত্রী বলছেন দু'-তিন মাস ধরে কী যেসব লেখো ম্যাগাজিনে, একটাও তো শেষ অবধি পড়তে পারি না। কী একঘেয়ে, কী একঘেয়ে! একটা হাসির গল্প লিখতে পারো না?

অষ্টবসু তরফদার টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ইন্ডিয়ার শেষ বলে জয়ের কথা দেখছিলেন কাগজে। ধোনির গ্লাভ্স খুলে দৌড়ের ছবি থেকে চোখ তুললেন। হাসির গল্প? হ্যাঁ। শিবরাম যেমন লিখতেন? পারো না? তারপর তারাপদ রায়ের 'কাণ্ডজ্ঞান'? 'বিদ্যেবুদ্ধি'? পড়োনি? 'দেশ'-এ বের হত। অবশ্য সংসারেই যার কাণ্ডজ্ঞান নেই, সে আবার লিখবে কী করে?

অষ্টবসু ও তার স্ত্রী দীপালি রোজই সকালে একসঙ্গে চা খেতে বসেন। এই ৫৭ বছরেও দীপালিকে সুশ্রীই বলা যায়। তবে হঠাৎ সুগার ধরা পড়ায় খাওয়াদাওয়ায় ধরাকাট হয়েছে। ফলে একটু রেগে থাকেন।

~ www.amarboi.com ~

বাইরে এত সুন্দর রোদ্দুর। বেরবে না। কী? না, গায়ে তাত লাগবে। বেড়াতে যাবে না বাইরে। কী? না, ধকল হবে। সিনেমা দেখবে না। কী? না, বড্ড বেশি এসি চালায় ওরা। ঘরকুনো হয়ে হাসির গল্প লিখবে কী করে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পড়ো না? কী সুন্দর কী সুন্দর! ওঁর সঙ্গে তো আলাপ আছে তোমার। একটু শিখে নিতে পারো না?

বলতে-বলতে দীপালি উঠলেন। স্নানে ঢুকবেন। পুজোয় বসবেন।

অষ্টবসু বসবেন লেখা নিয়ে।

এখন তাই বসেছেন। অষ্টবসুর বয়স ৬৪। এ-বয়সে কি আর অষ্টবসুকে শেখাতে রাজি হবেন সঞ্জীবদা? তার থেকে আগে নিজে একটা চেষ্টা করে দেখি। ফলে,এখন সেই চেষ্টা দিচ্ছেন অষ্টবসু।

বাপ্পামণি শুরু করল : মালা আমার বালা আমার সোনার বালা তুমি কেমন আছো বুচু আমার কুচু আমার ছু-ছু আমার...

অ্যাই শালাহ্! কী লিখে বসেছিস। ছু-ছু। একথা কেউ লেখে?

কেটে দিয়েছি। এটা রাফ। ফাইনাল করার সময় কেটে দিয়েছি। পরেরটা শোন : হ্যাঁ, বুচু আমার... কুচু আমার... না না, এটা তো হয়ে গেছে, এই তো পেয়েছি, তোমার জন্য আমার রিদয়ে খুব বেদোনা। হ্যাঁরে, বেদোনায় দ-য়ে ওকার চলে তো?

চলে কি না জানি না। তবে চলতে দেখিনি।

আর রিদয়ে র-এ হস্‌সি তো? রিদয় মানে হার্ট, হার্ট। হার্ট অ্যাটাক হয় না? শিবুর বাবার যা হল। হাসপাতাল থেকে এসে লাঠি নিয়ে হাঁটে। সেই হার্ট।

না, হয় না। 'হ'-এ ঋ। পাঁঠা। অত ভাষা দিতে গিয়েই মরিস তুই। প্লেন লিখতে পারিস না? প্লেন লিখবি।

ধুস শালা। প্রেমের মধ্যে প্লেন, মানে এরোপ্লেন এল কী করে?

ওরে মুখ্যু, প্লেন মানে সোজা-সোজা করে বলা। ক্লাস নাইনে ইস্কুল ছেড়ে দিলে এই-ই হয়। মরণদশা অবস্থা। এখন শেষ করে আমাকে বাঁচা। রেশন তুলতে যেতে হবে। তোর মতো পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটালে আমার তো চলে না। বল শিগগির।

বাপ্পামণি গড়গড় করে বলছে, তুমি কলেজ যাওয়ার সময় আমার দিকে তাকাও না। দু'-দিন মাত্র দাঁড়িয়ে একটুসখানি কথা বলেছ। একদিন দেড়মিনিট। একদিন ফিফটি ফাইভ সেকেন্ড। ঘড়ি দেখেছি। এই চিলেকোঠায় সেই কবে ইলেকশনের কত আগে এসেছিলে। দুপুরবেলা। তোমাকে নিয়ে কত কিছু, কুন্টুমুনু ঘুন্টুমুনু আমার। তুমি প্রায় সব কিছুতে রাজি হয়েছিলে। শুধু একটা বাকি ছিল। আসলটাই। বলেছিলে, পরের দিন। আর তো পরের দিনটা আসছে না। তুমি শুধু পারমিশন দাও। আমার বাবা গিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবে। তুমি একটা দিন এসো। তারপর বাবায়-বাবায় কথা। আমি তোমার কোনও অভাব রাখব না। জানো তো আমাদের চালের আড়ত। মাছের তিনটে ভেড়ি। গেঞ্জির কারখানা। তেলকল। অনেক কিসি খেয়ে দিচ্ছি তোমায় এই চিঠির মধ্যে। তুমি একখানার ও রিপ্লাই দাও না। শিগগির জানাও। বাপ্পা তোমারে কিস্সি হামি পাপ্পি সব দিলাম আমার জিনাত আমন রানি। আমি তোমার শশী কাপুর। তুমি আমার প্রিয়তমা মোনালিসা। আমি তোমার

~ www.amarboi.com ~

আর.ডি.বর্মন। ঝিনচাক। সত্যম শিবম সুন্দরম। ইতি তোমার লাভার শ্রী নীলরতন সরকার (বাপ্পামণি)।

পুনশ্চ : আমি একটা বাইক কিনব। পিছনে তুমি বসবে।

সিগ্রেটে টান দিয়ে মজুমদার বলে, একইসঙ্গে শশী কাপুর আর আর.ডি. বর্মন? তুই? অ্যাঁ? কী করে? কী করে হোস? আর 'সত্যম শিবম' আর.ডি-র নয়। লছমিকান্ত পেয়ারেলালের মিউজিক। যাক গে, উঠি। কাকার রেশন দোকান বন্ধ হয়ে যাবে দেরি করলে।

বাপ্পামণি কাতর আগ্রহে বলে, এতক্ষণে ঢিলটা নিশ্চয়ই ছাদ থেকে ও কুড়িয়ে নিয়েছে, বল? মাঠটা ছাড়ার আগে তুই তো জবর দু'টো সিটি মেরেই ওজন-বাটখারা অফিসের পাঁচিলের পাশে ঢুকে গেলি।

রোজই যখন পায় আজও পেয়েছে। দ্যাখ গে, পড়াও হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ। চললাম।

অষ্টবসু তরফদারের মনে পড়ল, আরে! মাঠ থেকে বেরনোর আগে সিটি মারার কথাটা লিখতে তিনি ভুলে গিয়েছেন তো। মজুমদার দু'টো আঙুল মুখে পুরে রোজই সিটি মারে, ঢিলটা ছোড়ার পরপরই। ওটাই ইশারা। নাহ্, রিভিশনের সময় অ্যাড করে দিতে হবে। বাড়ির পিছনের দিকটাতেই বাপ্পামণির যে-লক্ষ্যবস্তু, সেই মেয়েটির পরিবারের বাস। ওইটাই ওদের অংশ। শরিকের বাড়ি তো। এসব ঢোকাতে হবে গল্পে। এইসময় দীপালি ডাকলেন, খেতে এসো, ভাত বেড়েছি। অষ্টবসু উঠে ঝুপঝাপ করে স্নান করবেন। দীপালির সঙ্গে খাবেন। খেয়ে, মাসিশাশুড়ির কাছে পাওয়া বড় ইজিচেয়ারটায় বসামাত্রই ঢুলে-ঢুলে পড়তে থাকবেন। ভাতঘুমে। আড়াইটে নাগাদ তন্দ্রা ভাঙলে, গল্পটা আবার গিয়ে ধরবেন। স্নান করার সময় লেখার শেষটা অষ্টবসুর ভাবা হয়ে গেল। এখন শুধু সময় দরকার। যথারীতি, খাওয়া সেরে ইজিচেয়ারে বসামাত্র রোজকার মতোই ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগলেন অষ্টবসু তরফদার। নির্জন চৈত্র দুপুরে, তাঁদের আবাসনে কয়েকটি কাকের ডাক আর দূরে বড় রাস্তায় গাড়ি চলাচলের স্পষ্ট-অস্পষ্ট আওয়াজ। এই সময় বারান্দার দরজায় এসে দাঁড়াল গল্পটি। ইজিচেয়ারে চোখ-বন্ধ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন তার নিজের লেখকের দিকে তাকিয়ে গল্পটি মুচকি হাসল। গল্প যা জানে, তার লেখক তা জানেন না। সে ঠিক করেছে, সে এবার খেলতে শুরু করবে তার লেখককে নিয়ে।

দু'টো দশ নাগাদ ঝিমুনি কেটে গেল অষ্টবসু তরফদারের। তিনি উঠে রান্নাঘরে ছোট ইলেকট্রিক কেটলিতে জল ফুটিয়ে এক কাপ চা বানালেন। দীপালি নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। কাপ হাতে অষ্টবসু গল্পের কাছে ফিরে এসে বসলেন।

ঠক করে ছাদের জলট্যাঙ্কের গায়ে লেগে কী একটা পড়ল। ছাদের দরজার ধার থেকে এগিয়ে গিয়ে সে-বস্তুটি কুড়িয়ে নিয়ে, তাকে গার্ডার-মুক্ত করলেন জ্যাঠাসোনা। সিটির আওয়াজ এল এবার। ছাদে ওঠার সিঁড়ির জানলা থেকেই ছোকরা দু'টোকে মাঠে ঢুকতে দেখেছিলেন জ্যাঠাসোনা। লহমায় পড়া শেষ। দু'পিঠেই লেখা। মালা, সিটি শুনে, স্নানঘর থকে বেরিয়ে ভিজে চুল মুছতে-মুছতে সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে উঠছে, আর নামতে থাকা জ্যাঠাসোনা মৃদুহাসির সঙ্গে দোমড়ানো-মোচড়ানো রুলটানা কাগজটা এগিয়ে দিলেন মালার

~ www.amarboi.com ~

হাতে। গতি একটুও না-কমিয়ে নেমেও গেলেন। কাগজ হাতে মালা, ছাদের তিনধাপ আগে, স্তব্ধ। সিঁড়ির জানলাটার কাছে বাঁক ঘোরার মুখে এদিকে তাকিয়ে জ্যাঠাসোনা বললেন, ফেরত দিস কিন্তু, কার-না-কার হাতে পড়ে যায় তার ঠিক কী। হাসিমুখে অন্তর্হিত হলেন জ্যাঠাসোনা।

মালার মা স্কুলটিচার। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস। বাবা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, এখন উন্নতি করে এরিয়া ম্যানেজারের পোস্টে। সারা মাস-ই প্রায় ট্যুরে থাকতে হয়। মা স্কুলের পর মহিলা সমিতি, এবিটিএ এসবে ব্যস্ত থাকে। মালা এবার বিএ পরীক্ষা দেবে। বড়জ্যাঠা মেজজ্যাঠা মারা গিয়েছেন। বড়জেঠি গিয়েছেন বড়জেঠার আগেই। উপযুক্ত ছেলের রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়াটা দু'জনেরই দেহান্ত ত্বরান্বিত করেছে। নিঃসন্তান মেজজেঠি, স্বামী হারানোর পর, বাপের বাড়িতে চিরস্থায়ী হয়েছেন, নিজের অংশ জ্যাঠাসোনা আর মালার বাবাকে ভাগে-ভাগে বিক্রি করে।

ছোটজ্যাঠা অর্থাৎ জ্যাঠাসোনা কোনও চাকরি করেননি কখনও। বিয়েও না। পিতার অহেতুক অতিরিক্ত স্নেহ এবং রেখে যাওয়া টাকা পেয়েছেন অনেক। তারই সুদে জ্যাঠাসোনার চলে যায়। মালার মা'কে মাসে-মাসে নিজের খরচটা দিয়ে দেন। পান, তামাক, মদ কোনও নেশা নেই। শুধু তাসের নেশা। জুয়া নয়। কন্ট্রাক্ট ব্রিজ। সন্ধেবেলা আড্ডায় যান। রান্নার লোক সুখময়ী এ-বাড়িতে কত বছর আছে কারও হিসেব নেই। তার বয়স এখন ষাট-বাষট্টি।

মালা সেদিন সাড়ে দশটায় কলেজের জন্য বেরল। ফিরল দু'টোয়। দরজা খুলল সুখময়ী। তার হাতে গোটানো মাদুর। গরম পড়লে, নিজের ঘরের মেঝেতে সে মাদুর পেতে ঘুমোয়। হেঁশেলে এই মাত্তর সব গুছিয়ে-টুছিয়ে শুতে যাচ্ছি। কিছু খাবা? না সুখোমাসি। তুমি শুতে যাও। চা করে দিই এট্টু? পাগল! যা গরম পড়ছে রোজ। তুমি বিশ্রাম করো। সুখময়ী, সিঁড়ির নিচে তার ঘরে চলে গেল। মালার মা সুখময়ীর জন্য একটা টেবিল ফ্যানের ব্যবস্থা করেছেন সেখানে। ওদিকে, নিজের ঘরে গিয়ে পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে সটান শুয়ে পড়ল মালাও।

এই সময় অষ্টবসু তরফদার একবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চায়ের খালি কাপ তার আগে রান্নাঘরের সিঙ্কে নামিয়ে দিতে ভোলেননি। দীপালির এঁটোকাটার বিচার আছে। তাঁদের আবাসনের সামনের গাছগুলোতে পাতার ভিতর রৌদ্রের ঝিলিমিলি দেখতে লাগলেন। এখনও লু বইতে শুরু করেনি। হাওয়ায় পাতার হালকা আন্দোলনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঘরে ফিরলেন অষ্টবসু তরফদার। দেখতে পেলেন না ওই গাছগুলোরই একটির নীচে দাঁড়িয়ে, নিজের লেখককে একদৃষ্টে লক্ষ করতে-করতে আবার একটু হাসল গল্পটি।

মালা উঠে বসল বিছানায়। ফরসা মণিবন্ধে সরু ব্যান্ডের ছোট্ট ঘড়ির দিকে তাকাল। ২টো ১০। ব্যাগ খুলল। দোমড়ানো কাগজটা নিল মুঠোয়। উঠে, দোতলার সিঁড়ি ধরল। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেওয়ামাত্রই সে শুনতে পেয়েছে সুখময়ীর নাক ডাকার আওয়াজ।

জ্যাঠাসোনা নিজের বিশাল খাটে আধশোয়া হয়ে বসে। জানলা দিয়ে চূর্ণী নদী দেখা যায়। ওদিক থেকে ঘরের ভিতর কিছু চোখে পড়বে না। নদীর ওপর উঠে দাঁড়াবে কে? হাওয়া আসছে। বিছানায় শিবরাম চক্রবর্তীর একটা বই রাখা। হর্ষবর্ধন গোবর্ধনের অনেক গল্প এতে

~ www.amarboi.com ~

আছে মালা জানে। জ্যাঠাসোনার হাতে কিন্তু খবরকাগজ। চারের পাতা খোলা। রাজ্য-রাজনীতি। বরুণ সেনগুপ্ত। হাতে কাগজটা ধরেই জ্যাঠাসোনা বললেন, আয়, বোস। আজকে প্রমোদ দাশগুপ্তকে নিয়ে লিখেছেন বরুণবাবু।

জ্যাঠাসোনার পাশে বসেই হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে দিল মালা। তারপরেই মাথাটা এলিয়ে দিল জ্যাঠাসোনার গেঞ্জি-পরা চওড়া রোমশ বুকে।

জ্যাঠাসোনা হাসলেন, এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল!

না ক্লাস কাটলাম।

ছোকরাটা এসেছিল?

হ্যাঁ। যা বলার বলে দিয়েছি।

তাই না কি? কী বললি?

জ্যাঠাসোনার গেঞ্জির মধ্যে মুখ ঢোকাতে চেষ্টা করছে মালা।

বললাম, চারমাস পরে আমার পরীক্ষা। এই চারমাস আর কলেজের সামনে এসে দাঁড়িও না। বাড়িতে চিঠি দিও না।

কী বলল? জ্যাঠাসোনার হাত মাথা থেকে মালার ঘাড় বেয়ে নেমে গলার দিকে।

বলেছে, চার মাস? সে তো অনেক দিন। আমিও বলে দিলাম, কোনও দিন তো পড়াশোনা করোনি। পরীক্ষার মর্ম বুঝবে কী করে বাপ্পাদা। তা ছাড়া, তোমার একটা চিঠি গার্জেনের হাতে পড়ে গিয়েছে। কলেজের সামনে এসো না আর। হাবার মতো কাঁদতে শুরু করল। বিরক্তির একশেষ।

জ্যাঠাসোনার হাত গলা ছাড়িয়ে নামছে, তুমি কিন্তু বদমাইশ আছো জ্যাঠাসোনা। এই নিয়ে তিনজনকে কাটিয়ে দিলে।

জ্যাঠাসোনার জবাব : আরে, তোর জন্য খুব ভাল পাত্র খুঁজে আনব। খুউব, খুউব ভাল পাত্র।

তোমার থেকে ভাল পাত্র, জ্যাঠাসোনা? তোমার থেকেও? ক-ক্-খো-নো না...

বলতে-বলতে জ্যাঠাসোনার বুকে মুখ ঘষছে মালা।

সুখময়ী কই?

নিচে ঘুমোচ্ছে।

দেখে এসেছিস!

বলছি তো!

তাও দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয় একবার।

বাড়িতে দুপুরে কেউ থাকে না জানো তো। বিরক্ত লাগে।

সাবধানের মার নেই।

মালা দরজা বন্ধ করে আসে। জ্যাঠাসোনা সক্রিয় হতে-হতে বলেন, তোর বর তোকে কুমারী অবস্থাতেই পাবে। পরে তার কিছু সন্দেহ হবে না। তোর বাপ্পাদার সঙ্গে চিলেকোঠায় কী-কী হয়েছিল, বল, বল।

~ www.amarboi.com ~

বাপ্পাদা ভ্যাবলা। তোমার মতো কিচ্ছু পারে না। কিচ্ছু না।

তাও বল, বলবি না তো?

বলছি, বলছি। প্র-থ-মে-এ চি-লে-কো-ঠার দরজাটা ব-ন্-ধো করল...

তা-র-পর তা-র-পর...

তা-র-পর... আহ, আস্তে-আস্তে, হ্যাঁ ঠিক আছে।...

এরপর ১৯ বছর পার হয়েছে। ঠিক পরের বছর মার্চেই মালার বিয়ে হয়ে যায়। খুব ভাল পাত্রই খুঁজে আনা হয়েছিল মালার জন্য। জ্যাঠাসোনা আনেননি। এরিয়া ম্যানেজার বাবা-ই সম্বন্ধটা খুঁজে আনেন।

পাত্রের পরিবার প্রবাসী বাঙালি। এলাহাবাদের। এখন মালারা দিল্লিতে থাকে। মালার বাবা মারা গিয়েছেন বছর পাঁচেক। ম্যাসিভ অ্যাটাক। সময় পাওয়া যায়নি। মা'কে মালা আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিতে বলল। তারপর নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছে। মালার একটা মেয়ে। ১৬ পেরোল এ-বছর। মেয়ে তার বাবার মতো লম্বা। কিন্তু মুখের বালিকাভাব এখনও যায়নি। মালার বিয়ের আগেই মালার শ্বশুর বিপত্নীক ছিলেন। তিনি গত হয়েছেন ছেলের বিয়ের তিন বছরের মাথায়। ফলে, মালার মেয়ের অভিভাবিকা এখন মালার মা। যিনি নাতনিকে ধরে স্বামীশোক ভোলার চেষ্টায় আছেন। এখানে এত বড় বাড়িতে একা জ্যাঠাসোনা। কিন্তু বাড়ি যাতে বেহাত হয়ে না-যায় তাই মালা মাঝে-মাঝেই আসে। কখনও মা'কে নিয়ে। কখনও মেয়েকে। এবার মেয়েকে এনেছে। 'চিন্টু' বলে ডাকা হয় তাকে। ভাল নাম শকুন্তলা। এ-মুহূর্তে শকুন্তলা বা চিন্টুকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখা গেল। তার হাতে একটা কাঠের বাক্স। সুন্দর করে প্যাক করা। মালা ভুরু কুঁচকে নিচে দাঁড়িয়ে। মালার প্রশ্ন : ওটা কী?

চিন্টুর মুখে হাসি ধরে না। গিফ্‌ট বক্স। ছোড়দাদু দিলেন। এর মধ্যে নাকি অনেক কিছু আছে। বললেন, ঘরে গিয়ে খুলিস।

আমাকে দাও তো একটু বাক্সটা।

মালা বাক্সটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পিছন-পিছন চিন্টু।

মালা এবার চারদিনের জন্য এসেছে। মালার বাবার বন্ধু অ্যাডভোকেট সুবীরকাকা, তাঁর ওকালতি করা ছেলে এবং নিজের জুনিয়রকে নিয়ে সেদিনই সন্ধেবেলা এলেন। মালা, জ্যাঠাসোনা আর তিনজন উকিলের মধ্যে কাগজপত্র দেখানো হল। মালার মা এরপর একদিন আসবেন। প্রাথমিক কথাবার্তা লিখিত চুক্তি হয়ে গেল আজ। মালাদের 'অংশ' মালার মা বিক্রি করে দেবেন। যাঁকে বিক্রি করবেন সেই ভদ্রলোকও সস্ত্রীক এসেছিলেন। সামনের অংশ যেটুকু জ্যাঠাসোনার আছে, সেটা তাঁরই থাকবে। মালাদের পরদিন সকালে দমদম থেকে দিল্লির ফ্লাইট। ৫৫ কিলোমিটার রাস্তা এখান থেকে দমদম। তাই আগামিকালই মালারা দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধের মধ্যে মালার ননদের বাড়ি পৌঁছবে। পরশুদিন ননদাইয়ের গাড়িতে এয়ারপোর্ট। এখান থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি বুক করেছে মালা এ-বাড়ি এসেই। ১৮ বছরে এ-অঞ্চলে অনেক বদল। কার রেন্টাল সেন্টার তখন ছিল না। বাপ্পামণি

~ www.amarboi.com ~

নিজে অশিক্ষিত হলেও টাকার জোরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েছে। সকালে সেখানে গিয়ে গেটের সামনে মালিকপনা দেখায়। এছাড়া মোটামোটা কোলবালিশের মতো দেখতে একজন আড়তদার এখন বাপ্পামণি। মজুমদাররা আর এখানে থাকে না।

পরদিন দুপুর একটা থেকে দেড়টার ভেতর গাড়ি এল। বেশি লাগেজ ক্যারি করে না মালা। মালপত্র গাড়িতে তুলে দিল যে-বউটি রান্না করে, বাসন্তী ও তার মেয়ে। সুখময়ীর বয়স হয়ে যাওয়ায় অনেক দিন হল তার ছেলে এসে দেশে নিয়ে গিয়েছে। সুখময়ীর ঘরটায় বাসন্তীদের থাকতে দিয়েছেন জ্যাঠাসোনা। বাসন্তীর বর রিকশা চালায়। সেও ওই ঘরে থাকে। বাসন্তীর মেয়ে বিএ পড়ছে। পড়ার খরচ দেন জ্যাঠাসোনা। রিকশাওয়ালা ও বাসন্তী জ্যাঠাসোনাকে দেবতা মানে। মেয়েটা সিঁড়ির নিচে একটা ছোট খাটে শোয়। সেও জ্যাঠাসোনার কিনে দেওয়া। টেবল ফ্যান আছে মেয়েটার জন্য। বাবা-মা ঘরে ঘুমোয়। মেয়ে সিঁড়ির নীচে।

মালা বউটিকে বলল, যাও তো বাসন্তী, জ্যাঠামশাইকে একবার ডেকে আনো। বলো, আমরা বেরব এবার।

জ্যাঠাসোনা এলেন। মালা বলল, আমরা আসছি। মালার চোখ দেওয়ালের দিকে।

জ্যাঠাসোনার মুখে স্মিত হাসি। সাবধানে যাস। হুঁ। মালা ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

জ্যাঠাসোনা বললেন, চিন্টু মামণিকে দেখছি না?

ও বাথরুমে গেছে। কিছু বলবে?

জ্যাঠাসোনা স্নিগ্ধ হাসলেন। ওকে আমার আশীর্বাদ দিস। আচ্ছা। ঘরে ঢুকে গেল মালা। প্রণাম করেনি। জ্যাঠাসোনা আপন মনে হেসে সিঁড়ির দিকে এগোলেন।

জ্যাঠাসোনার দরজায় চিন্টু। জ্যাঠাসোনার খাটে একটা বই। চিন্টু মলাটটা পড়ল দরজায় দাঁড়িয়েই। 'কাণ্ডজ্ঞান'। তারাপদ হায়। হু ইজ দিস অথর? নেভার হার্ড অফ হিম। চিন্টু ভাবে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? দিস কাণ্ডজ্ঞান? মুখে কিছু বলে না। জ্যাঠাসোনার হাতে খবরকাগজ। জ্যাঠাসোনা বললেন, আয় মা। দেখেছিস তো বাঙালি ছেলেটা চান্স পেয়েই পরপর সেঞ্চুরি করতে শুরু করেছে। আগেরটায় ১৩১ করল। আবার কাল ১৩৬ করেছে। সৌরভ গাঙ্গুলি।

আই অ্যাম গ্রেট গ্রেট ফ্যান অফ হিম, ছোড়দাদু। চিন্টু দরজায় দাঁড়িয়েই বলছে।

জ্যাঠাসোনা বললেন, ওটা নিয়ে যাচ্ছিস তো? পছন্দ হয়েছে জিনিসগুলো?

ওটা মানে চিন্টুর হাতে সেই বাক্সটা। সেই গিফ্‌ট বক্স। চিন্টুর উত্তর, আসলে এটা তো খোলা হয়নি তাই জানি না ভেতরে কী আছে।

চিন্টু দরজাতেই দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢোকেনি।

জ্যাঠাসোনা বললেন, নিয়ে আয়, আমি খুলে দিই তা হলে।

চিন্টু বলল, না। মা খুলতে বারণ করেছে। এখন বলল, যা, এটা ছোড়দাদুকে দিয়ে আয়।

বলেই, দরজার পাশের টেবিলে গিফ্‌ট বক্সটা নামিয়ে রেখে চিন্টু চলে যেতে উদ্যত। আমরা যাচ্ছি ছোড়দাদু।

সে কী রে! প্রণাম করবি না?

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জ্যাঠাসোনা যেন চোখ কপালে তুললেন বিস্ময়ে। বেরনোর আগে দাদুকে প্রণাম করে বেরতে হয়। আয়। প্রণাম কর।

চিন্টু দরজার বাইরে তখন। ওখানে দাঁড়িয়েই বলে, মা প্রণাম করতে বারণ করেছে। বলেছে, প্রণাম করতে গেলে তার কাছে যেতে হয়। ছোড়দাদুর কাছে যাবি না। আমি আসি, কেমন? বাই, ছোড়দাদু।

চিন্টু ঘর থেকে বেরনোমাত্র হো-হো করে হেসে উঠলেন জ্যাঠাসোনা।

তাঁর বয়স এখন ৬৭। কিন্তু জোরে হাসলে আওয়াজটা অনেকখানি যায়। চিন্টু সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে শুনতে তো পেলই। নিচে, সিঁড়ির সামনে, থমথমে মুখে অপেক্ষারত ভ্রুকুঞ্চিত মালা চিন্টুকে না কি নিজেকেই বলল, এত হাসির কী হল? শিবরামের গপ্পো পড়ছে না কি?

না, না, খবরকাগজ। চিন্টুর জবাব।

মালা তাড়া দেয় মেয়েকে। চল, চল। গাড়িতে উঠে সব শুনব। বাসন্তী, এই টাকাটা রাখো। তোমার মেয়েকে কিছু কিনে দিও। খুব যত্ন করলে তোমরা।

পাঁচটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দেয় মালা।

এই ১৯৯৬ সালে, ৫০০ টাকার অনেক দাম। বাসন্তী আর বাসন্তীর মেয়ে প্রণাম করল অভিভূতভাবে।

সদর দিয়ে বেরতে গিয়েও মালা হঠাৎ থমকাল। বাসন্তী, শোনো এদিকে। না, তুই না। তোর মা।

বাসন্তীর মেয়ে দাঁড়িয়ে গেল পিছনে।

বাসন্তী মালার পাশে গাড়ির সামনে। কুণ্ঠিত, কৃতজ্ঞ মুখ। কিছু বলবেন দিদি?

আশ্চর্য। মালা চুপ করেই আছে। দরজায় চিন্টু আর বাসন্তীর মেয়ে। কথা বলছে।

বলুন, দিদি।

না, না, ঠিক আছে। কিছু না। সব কিছু সামলে রেখো। বলতে গিয়েও বলল না মালা। না কি বলতে পারল না?

ওপরে, জ্যাঠাসোনা গাড়ির স্টার্ট শুনে ঘড়ি দেখলেন। পৌনে দু'টো।

জ্যাঠাসোনার দরজায় বাসন্তী।

হ্যাঁ বলো বাসন্তী।

দিদিমণি ৫০০ টাকা দিয়ে গেলেন শিবানীকে।

আবার হাসলেন জ্যাঠাসোনা। ভাল তো।

শিনি আমাকে দু'শো টাকা দিল। সরকার বাড়ির রাঁধুনি লক্ষ্মীর মা'কে নিয়ে শ্রীমা টকিজে একটা বই দেখতে যাব, কর্তাবাবু? দুপুরে?

জ্যাঠাসোনা আবার ঘড়ি দেখলেন, এ তো দু'টো বাজতে পাঁচ। শুরু হয়ে যাবে না?

আড়াইটেয় আরম্ভ। রিকশায় যাব। শিনি রইল। আপনার বিকেলের চা-জলখাবার করে দেবে। সাড়ে পাঁচটায় নিয্যস চলে আসব।

~ www.amarboi.com ~

যাও, দেরি কোরো না। আর শিনিকে বলো, লেবু-চিনি,আর খুব অল্প নুন দিয়ে আমাকে একগ্লাস শরবত করে দিয়ে যায় যেন।

এক্ষুনি বলছি।

বাসন্তী সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হাসির শব্দ শোনে। কী এমন হল? কর্তাবাবু আজ কথায়-কথায় এত হাসছেন কেন?

শিনি ঢুকল। হাতে গ্লাস। পরনে ম্যাক্সি। শিনির শরীর ভালরকম ঝাড়া দিয়ে উঠেছে বছর তিনেকে।

এই যে, দাদু, শরবত।

শরবত দিয়ে কী হবে। তুই খেয়ে নে। ড্রয়ারটা টেনে দ্যাখ। দু'টো একশো টাকার নোট নিয়ে নে।

যাওয়ার সময় নেব।

এবার ওটা খোল।

শিনি ম্যাক্সিটা বিনাবাক্যে খুলে ফ্যালে। ১৮ বছরের মালার তুলনায়, ১৮ বছরের শিনির শরীর, অনেক লাভজনক। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবহার? তাও লাভজনকই।

সদর দিয়েছিস।

না দিয়ে কোনও দিন আসি আপনার কাছে?

জানলাটা?

নদীর ওপর কে উঠে দাঁড়াবে দোতলা অবদি? তবে দাদু রাতে আর ডাকবেন না কোনও দিন। বাবা পেচ্ছাপ করতে বেরোয়।

আচ্ছা বাবা, ডাকব না রাতে, এখন তো আয়।

শিনি আসতেই তাকে কোলে বসিয়ে হো-হো করে আবার হাসতে থাকেন জ্যাঠাসোনা।

ওমা। এ কী। হাসছেন কেন? এ সময়!

এখন সক্রিয় ভূমিকা নেয় শিনি, তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন জ্যাঠাসোনা। মালার সময় ক্রিয়াশীল হতেন জ্যাঠাসোনা। তখন বয়স ছিল। ৪৮/৪৯। সেইটাই তো আসল বয়স। আর এইটাও কি বয়স নয়? শিনি যতই সক্রিয় হয়, ততই হাসেন জ্যাঠাসোনা। শিনির কাজে সহায়তা দিতে-দিতেই হাসেন। বলেন, কী বোকা রে! হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ...

হাসছেন কেন, বাধা পেয়ে শিনি বিরক্ত। ওরে আজ খুব হাসি পাচ্ছে রে! তারাপদ রায়ের গপ্পো পড়েও এতহাসি পায় না। ভাবল, আমার বুঝি অভাব পড়েছে, হাহা, অ-ভা-ব! আমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, বিদ্যেবুদ্ধি নেই... ওরে তোর ওইটুকু মেয়েকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতেই তো বেলা কাবার হয়ে যাবে রে... তোর মেয়েকে ছাড়া আমার চলবে না নাকি? হো হো হুঁ হুঁ।

শিনি নিজের কাজ থামিয়ে দেয়। এরকম করলে আমি [illegible] চলে যাব। এমন করছেন কেন আজ?

আচ্ছা-আচ্ছা, বাবা, রাগ করিস না। আর হাসব না। শুরু কর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'হাসব না' বলতে-বলতেও হাসি আর থামতেই চায় না জ্যাঠাসোনার। পুলকের ধ্বনির সঙ্গে হাসির শব্দ মিশে যেতে থাকে, উঁহু হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, হো হো হে হে...

শোনো, আমি একটু বেরচ্ছি।

অষ্টবসুর ঘরের দরজায় দীপালি। সন্ধেটা দিয়ে দিও। স্নান করার পর তো আর বাথরুমে যাওনি?

অষ্টবসু তরফদার মাথা নাড়েন। দরজাটা আটকে দাও তাহলে। দরজা আটকে, একটু আগে-আগেই, ঠাকুরঘরে সন্ধে দিয়ে, আবার গল্পের কাছে এসে বসেন অষ্টবসু তরফদার। নাহ, এ গল্পে আর লেখার কিছু নেই তাঁর। এখন তিনি ভাবছেন, শেষ পর্যন্ত, এ কী হল? এরকম কি তিনি চেয়েছিলেন? আর এটাকে কি 'হাসির গল্প' বলা যায়? চিন্তিত মুখে লেখাটা প্রথম থেকে আবার রিভাইস করতে শুরু করলেন অষ্টবসু তরফদার। এবারও দেখতে পেলেন না, সদ্য ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁরই ঘরের জানলা দিয়ে নিজের লেখকের দিকে একটি নিঃশব্দ হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে স্বয়ং গল্পটি।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গান

সন্ধেটা বেশ ভারী হয়ে নেমেছে। এইবার নিজেদের বাড়ির সব ঘর সাবধানে নজর করতে শুরু করল শ্যামলী। বাবা সাতটায় ফিরেছে কাজ থেকে। জেঠু সাড়ে সাতটায়। মা আর জেঠিমা এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে আছে। বাবা আর জেঠুর জন্য চা-জলখাবার করতে হবে। ভাই দুটো পড়তে বসেছে। মাস্টার এসেছে ওদের। একজন নিজের ভাই। অন্যজন জেঠুর ছেলে। একই মাস্টারের কাছে পড়ে দুজন। ক্লাস সেভেন আর ক্লাস এইট। পুরো সন্তর্পণে জরিপ করে নিয়ে শ্যামলী বুঝল সবাই কোনও না কোনও কাজে আছে। এবার শ্যামলী নিঃশব্দ পায়ে ছাদের সিঁড়ি ধরল।

ছাদে এসে শ্যামলী বুঝল আজ অমাবস্যা। চাঁদ উঠবে না। ছাদের কাপড় মেলার তারে এখনও শাড়ি-সায়া টাঙানো। মা জেঠিমার অবসর হয়নি শুকনো কাপড় তুলে নিয়ে যাওয়ার। অথবা দু'জনেই ভুলে গিয়েছে হয়তো। হঠাৎ 'অ্যাঁও' করে একটা আওয়াজ হতেই চমকে উঠল শ্যামলী!

পায়ের কাছে একটা সাদা মতো কী যেন নড়াচড়া করছে। নিমবা। শ্যামলীদের বাড়ির বেড়াল। শ্যামলীর পায়ে পায়ে উঠে এসেছে ছাদে। শ্যামলী নিমবা-কে ফাঁকি দিতে পারেনি। এক প্রবল বৃষ্টির রাতে শ্যামলীর ভাই সমু বেড়ালছানার আর্তকান্না শুনতে পায়। ওই অতরাত্রে জেঠতুতো ভাই রবিকে নিয়ে ছাতা হাতে বেরোয়। তারপর আবিষ্কার করে, শ্যামলীদের বাড়ির কাছে যে নিমগাছ আছে, তার উঁচু ডালে সাদা ছোট্ট একটা মুখ বেরিয়ে আছে। আর তারস্বরে ডাকছে। কোনওভাবে ঝড়-জলের রাতে মা'কে হারিয়ে ফেলে ওই বেড়ালছানা নিমগাছের ডালে উঠে পড়েছে। হয়তো কুকুরে তাড়া খেয়েছিল। প্রাণ বাঁচাতে উঠেছে, এখন আর নামতে পারছে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমু আর রবি অনেক কসরত করে ওই বেড়ালছানাকে গাছ থেকে নামিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। মা আর জেঠিমা প্রথমে যথেষ্ট বকাবকি করলেও সেই বেড়ালছানা শ্যামলীদের বাড়িতে পাকাপাকি আশ্রয় পেয়ে গেল। এখন আর অত ছোটটি নেই। বেশ বড় হয়েছে। শ্যামলীর খুব গা-ঘেঁষা। নিমগাছ থেকে নামানো হয়েছিল বলে ওই বিড়াল বাচ্চার নাম হয়ে গিয়েছে নিমবা।

ছাদে কয়েকখানা ফুলগাছের টব। সব টবেই বেলফুল। অন্ধকারে একদিকে যেমন থোকায় থোকায় সাদা দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনই সুবাস আসে। এখনও আসছে।

শ্যামলী সামনের বাড়ির ছাদের দিকে তাকাল। কিছু দেখা যায় না। ঘুরঘুটি অন্ধকার। মাথা তুলে ওপরে তাকালে আকাশে তারাগুলো আজ বড় বেশি জ্বলজ্বলে। শ্যামলীদের বাড়ি আর উলটোদিকের বাড়ির মধ্যে ছোট একটা পিচরাস্তা। রাস্তার অপর মুখে ওই বাড়ির সদর দরজা। ও বাড়ির ছাদ পড়েছে শ্যামলীদের বাড়ির পিছন দিকে।

ঘন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ওই বাড়ির ছাদে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল। আবছা মতো দেখা গেল একটা চেহারা। সিগারেট ধরিয়েছে সে। জোনাকির মতো আলোর বিন্দু জ্বলছে একটা। শ্যামলী গেয়ে উঠল 'পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে মায়াময় এই মধুসন্ধ্যায়'।

গেয়ে চলল শ্যামলী। ওদিকে একটা সিগারেট শেষ হতে আরেকটা ধরানো হল। জোনাকির মতো আলোর বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে শ্যামলী গেয়েই চলল গানটি। তারপর একসময় দেখা গেল উলটোদিকের ছাদে আলোর বিন্দুটি আর নেই। অলোকদা ওদের ছাদ থেকে নিচে নেমে গিয়েছে। শ্যামলীরও আর থাকার কোনও মানে হয় না। শ্যামলী বলল, 'আয় নিমবা, আমরা নিচে যাই। অলকদা চলে গেছে।'

অলকদা? অলকদা বলে কেন শ্যামলী? অবশ্য কার কাছেই বা 'অলকদা' নামটা শ্যামলী উচ্চারণ করে? এক নিজের কাছে, আর দ্বিতীয়ত, নিমবার কাছে। অলকদার সঙ্গে তো কোনও দিন একটা বাক্যও বিনিময় হয়নি। শুনেছে অলকদা বিএ পাস করে বসে আছে। এখনও চাকরি পায়নি। শ্যামলীও তো দু'-বছর হল স্কুল ফাইনাল পাস করে বসেই আছে বাড়িতে। বাবা আর পড়াতে চাইল না, তাই কলেজে যাওয়া হল না শ্যামলীর। এখন পাত্র দেখা হচ্ছে। এর মাঝখানে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় পাত্র দেখায় একটু ঢিলে পড়েছে। বাজারে আগুনদর সবকিছুরই। বাবা একদিন বাজার থেকে ফিরে মা'কে বলছে, 'এরপর চাল যদি পাঁচ টাকা সেরও হয়—তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।' জেঠু বলল, 'কী আমাদের প্রধানমন্ত্রী! লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কোনও ক্ষমতা আছে বলে মনেই হয় না। ওদিকে পাকিস্তানের দ্যাখো! আইয়ুব খান। জাঁদরেল লোক। খবরের কাগজে ছবি দেখলে বোঝা যায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোকটার।'

শ্যামলী রোজই সন্ধে একটু গড়িয়ে যাওয়ার পরে ছাদে উঠে যায়। শ্যামলীর সঙ্গে সঙ্গে যায় নিমবা। একটু পরে উলটোদিকের ছাদে একটা দেশলাই জ্বলে ওঠে। আলোর জোনাকবিন্দু ছাদের এদিক-ওদিক নড়াচড়া করে। তার মানে অলোকদা সিগারেট হাতে পায়চারি করছে। সেদিন হয়তো শ্যামলী গাইছে, 'মধু মালতী ডাকে আয়...'। যেদিন পূর্ণিমা থাকে, সেদিন

~ www.amarboi.com ~

অলকদার আবছা উপস্থিতি আরেকটু স্পষ্ট দেখা যায়। অলকদা দুটো সিগারেট খায়। ততক্ষণ গান চলে শ্যামলীর। অলকদা ছাদ থেকে নেমে যাওয়ার পরেও কোনও কোনও দিন কিছুক্ষণ ছাদে থাকে শ্যামলী। তবে গান আর গায় না। নিমবাকে বলে, 'নিমবা, অ্যাই নিমবা, বল না, আমার গান ভাল লাগে অলকদার? নইলে রোজ ঘড়ি ধরে সাড়ে সাতটায় ছাদে ওঠে কেন? আমার গান শুনবে বলেই তো ওঠে। তাই না রে নিমবা?' বলতে বলতে নিমবাকে কোলে তুলে নেয় শ্যামলী। নিমবা গলা দিয়ে একটা গরগর আওয়াজ করে। আদর খাওয়ার আওয়াজ।

পাড়ার বারোয়ারি পুজোমণ্ডপে সপ্তমী-অষ্টমী-নবমীতে অলকদাকে সামনা সামনি দেখেছে শ্যামলী। লম্বা একহারা চেহারা। হালকা গোঁফ রাখে। একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছে শ্যামলী। অলকদারও এমন একটা ভাব যেন দেখতেই পায়নি শ্যামলীকে! গত দু'-বছর এমনই চলছে। শ্যামলী সন্ধে হলে ছাদে আসে। আর গান গায় দেশলাই কাঠি জ্বললে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ লাগল। অলকদা আর শ্যামলীদের বাড়ির পরেই ভট্চাজ্জি মশাইয়ের বাগান। তাতে আমগাছ, কাঁঠাল গাছ, উঁচু উঁচু নারকেল গাছ। একদিন বেলা এগারোটার সময় কানফাটানো শব্দে দুটো ছোট ছোট যুদ্ধ বিমান উড়ে গেল ভট্চাজ্জি মশাইদের নারকেল গাছের মাথার ওপর দিয়ে। শ্যামলীরা যে জায়গাটায় থাকে, তার নাম 'পারাডাঙা'। কাছেই ব্যারাকপুর। যুদ্ধের কল্যাণে সকলেরই এখন জানা যে ব্যারাকপুরে বিমান ওঠানামার একটা জায়গা আছে সেনাবাহিনীর। এদিকে বিমান দুটো উড়ে যাওয়ার পরেই চারদিকে যত বাড়ি ছিল, সব বাড়ির ছাদেই লোকজন উঠে এল। শ্যামলীরাও উঠল তাদের ছাদে। অলকদারাও উঠল। ছাদে ছাদে যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা হতে লাগল। হঠাৎ শ্যামলী দেখল অলকদা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শ্যামলীর দিকে। শ্যামলী প্রথমে চমকে চোখ নামিয়ে নিল। পরমুহূর্তে আবার চোখ তুলে তাকাল। এখনও অলকদা চেয়েই আছে।

তৎক্ষণাৎ ছাদ থেকে নেমে গেল শ্যামলী। ঘরে এসে নিমবাকে জড়িয়ে কী আদর কী আদর!

সেদিন সন্ধেবেলায় আবার ছাদে এল শ্যামলী। আবার দেশলাই জ্বলল। শ্যামলী গান ধরল, 'সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু'।

এর ঠিক দু'দিন পরে শ্যামলীকে আবার গান গাইতে হল। তবে সন্ধেবেলায় নয়, বিকেলবেলায়। আর নিজেদের বাড়িতেও নয়। কাঁচড়াপাড়ায় মামারবাড়িতে। পাত্রপক্ষের সামনে। আগন্তুকদের একজন বললেন, 'মেয়ে গান জানে? রবীন্দ্রসংগীত কি কিছু জানা আছে?'

শ্যামলী ইশকুলে পড়ার সময় তার জন্য গানের দিদিমণি রাখা হয়েছিল। স্কুল ফাইনাল দেওয়ার আগের বছরে গান শেখায় ছেদ পড়ে। এখন, পাত্রপক্ষের কথায়, মামাদের বাড়ির হারমোনিয়াম হাজির করা হল। হারমোনিয়াম হাতে শ্যামলী গান ধরল, দিদিমণির শেখানো 'হে ক্ষণিকের অতিথি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তারপরের সাতাশ বছর আর হারমোনিয়ামে হাত দেওয়ার দরকার হল না শ্যামলীর।

~ www.amarboi.com ~

শ্যামলীর স্বামী শ্যামলীর চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়। ভারিক্কি চেহারা। গান-বাজনার থেকে অনেক দূরে থেকেছেন চিরকালই। স্বামীকে একটি পুত্রসন্তান এবং একটি কন্যাসন্তান উপহার দিতে হল শ্যামলীকে। ছেলে লেখাপড়ায় খুব ভাল করল। বিয়ে হল তার। বিয়ের পর সে বেঙ্গালুরু চলে গেল স্থায়ীভাবে। মেয়ের বিয়ে হল দিল্লিতে। নাতি-নাতনি দুই-ই লাভ হল। স্বামী ভদ্রলোক সংসার ঠিকঠাকভাবে গুছিয়ে দিয়ে একদিন আকস্মিকভাবে চোখ বুজলেন। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। চিকিৎসার সময় পাওয়া গেল না। ছেলে-মেয়ে দু'জনেই এসে ঘুরে চলে গেল। শ্যামলী একদম একা। বাড়িতে রাতদিনের একজন কাজের মাসি।

শ্যামলীর সঙ্গী এখন একটি টেলিফোন। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বাবরি মসজিদ নাকি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। একবার দিল্লিতে ফোন যায়। একবার বেঙ্গালুরুতে কিন্তু ছেলেমেয়ের সঙ্গে ফোনে আর কতক্ষণ কথা হবে? ফোন তো করে স্কুলের বন্ধুরা—যাদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে। পাড়ার মেয়ে যারা ছিল, তারাও এখন বয়স্ক মহিলা। সকলেরই নাতি-নাতনি আছে। শ্যামলীর একান্ত চেষ্টায় যোগাযোগগুলো এখনও অটুট। একই পাড়ায় থাকত সীমা। সে এখনও ফোন করে খবর নেয়। দেখাসাক্ষাৎ হয় না। সীমার বিয়ে হয়েছে ডানকুনিতে। শ্যামলীর শ্বশুরবাড়ি বেহালায়। সীমা একদিন ফোন করে বলল,'জানিস তো অলকদা মারা গেছে। ওই যে, তোদের বাড়ির পিছন দিকে যাদের বাড়ি ছিল। অলক সান্যাল রে! মনে পড়ছে না?'

শ্যামলীর বুকে একটা পাথর আটকে গেল। শ্যামলীর জবাব শুনল সীমা, 'কী হয়েছিল?'

সীমা বলল,'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। ট্রিটমেন্ট করার সময় পাওয়া যায়নি। আমার সঙ্গে একদিন অলকদার দেখা হয়েছিল জানিস তো...'

—তাই বুঝি! কোথায়?

—দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। অলকদাও এসেছিল ছেলে, ছেলের বউ আর নিজের বউকে নিয়ে। একইরকম ছিল চেহারাটা। বিশেষ বদলায়নি। আমাকে তোর কথা জিজ্ঞেস করল।

—আমার কথা?

সীমা উৎসাহভরে বলল,'হ্যাঁ রে, তোর কথা। বলল শ্যামলী কেমন আছে? গান গায় এখনও? শ্যামলী তো খুব ভাল গাইত...'।

শ্যামলী ঢোক গেলার আওয়াজ সীমা শুনতে পেল না। সীমা শুনতে পেল এইটুকু, 'বলল বুঝি?'

—বললই তো। বলল অমন গানের গলা। হ্যাঁ রে, শ্যামলী তোর গান তো আমরা কখনও শুনিনি। আমরা তোর পাড়ার মেয়ে। অলকদা তোর গান শুনল কীভাবে রে? তুই গান গাইতিস নাকি?

সীমার কাছে শ্যামলীর জবাব পৌঁছল, 'সীমু ঠিকে কা[illegible] এসেছে রে। বেল দিচ্ছে। দরজা খুলতে হবে। এখন রাখি, কেমন?'

রোববার

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঈর্ষা

মাধবের সামনে একটা কাঁসার থালা। থালার মাঝখানে ছোট বাটির একবাটি পরিমাণ ভাত গোল করে চেপে চেপে বসানো। ডানপাশে লম্বালম্বি মাঝখান থেকে কাটা একটা বেগুন ভাজা যার লেজ বেরিয়ে আছে। বাটিতে গাঢ় সোনামুগের ডাল। সামনে থেকে একটু ভাত ভেঙে মাধব ডালের বাটিটা তুলে কাত করে ঢালতে যাওয়া মাত্র ডোরবেলের আওয়াজ। একবার, দু'বার, তিনবার।

ঘুম ভেঙে চোখ খুলল মাধব। জানালার বাইরে সকাল ছ'টার আলো। এসময়ে কে বেল দেয় মাধবের জানা। ড্রাইভার রতন। গাড়ি ধুতে এসেছে। অল্পবয়সি ছেলে। সকালে গাড়ি ধোয়ার কাজটাও করে দেয়। সামান্য কিছু বেশি দিতে হয় মাইনের সঙ্গে।

করবী পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছে। হাই তুলতে তুলতে কিছু বলল রতনকে। বাথরুমে ঢুকে এখন বালতিতে জল নিচ্ছে রতন। মাধব জানে। মাধব বুঝল, জল নিয়ে বাইরে চলে গেল রতন। করবী দরজা বন্ধ করল আবার। মাধব পাশ ফিরে শুলো আবার ঘুমের চেষ্টায়। যদিও জানে ঘুম আর আসবে না। এলেও ওই স্বপ্নটা আর আসবে না।

—ডাল দিয়ে ভাত মাখার স্বপ্ন।

মাধব আরও একবার ঘুমের আশায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশ্য মাধব জানে এরপর কী কী ঘটবে। রতন বালতি রাখতে আসবে। আবার বেল বাজবে। করবী উঠে দরজা খুলবে, দরজা বন্ধ করবে। টুকটাক দু'-একটা কাজের কথা হবে। রতন এখন বাড়ি চলে যায়, আবার দুটোর সময় ডিউটিতে আসে। আসার সময় কী কী কিনে আনতে হবে হাতে টাকা দিয়ে বলে দেবে করবী। ছ'টা পনেরো থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে আবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেল বাজবে। বাসন মাজার লোক। করবী আবার দরজা খুলবে। তারপর আবার বেল। খবর কাগজ এবার। আবার করবীর দরজা খোলা। ইতিমধ্যে রান্নাঘরের সিঙ্ক থেকে বাসন মাজার নানারকম আওয়াজ পৌঁছবে এঘরে। এই কমলার মা বড় শব্দ করে বাসন ধোয়। করবী উঠে গিয়ে বলবে— 'আস্তে, আস্তে কমলার মা, আস্তে। তোমার দাদাবাবুর ঘুম ভেঙে যাবে।' একদিন বাড়ির কাছের এটিএম-এ যাওয়ার সময় ফুটপাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে করবীর হাঁটুতে চোট লেগে যে-ব্যথা হল সে-ব্যথা এখনও আছে। তা সত্ত্বেও বারবার উঠে গিয়ে শশব্যস্ত করবীই দরজা খোলে—পাছে মাধবের ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

ঘুমের ব্যাঘাত তবু হতেই থাকে মাধবের। মাধব সেটা জানতে দেয় না করবীকে। আজকেও দিল না। প্রত্যেক দিনের মতোই সাড়ে আটটা নাগাদ উঠে মুখ ধুয়ে খবর কাগজ হাতে টেবিলে গিয়ে বসল। একটু পরেই মাধবের সামনে ধোঁয়া ওঠা এককাপ চা আর একটা প্লেটে চারটে মেরি বিস্কুট নামিয়ে রাখল করবী। প্রত্যেকদিনের মতো আজকেও মাধব বাথরুমে ব্রাশ করতে ঢোকা মাত্রই করবী চা বানাতে চলে গিয়েছিল রান্নাঘরে। আজ খবর কাগজে মন বসতে চাইছে না মাধবের। ভোরবেলা দেখা স্বপ্নটা এত জীবন্ত যে, মাধব ওইটাই যেন বারবার দেখতে পাচ্ছে খবর কাগজের ভেতর দিয়ে। কাঁসার থালার মাঝখানে একটা ছোটবাটির মাপমতো ভাত গোলাকারে চেপে চেপে বসানো। থালার পাশে গাঢ় সোনামুগের ডালে ভরা বাটিটা মাধব সবেমাত্র ঢালতে যাচ্ছে ভাতে...

আসলে মাধবকে এভাবে ভাত দেওয়া হয় না বহুদিন। মাধব আঙুল দিয়ে ডালভাত তরকারি মেখে খেতে পারে না অনেককাল হয়ে গেল। আঙুল দিয়ে ভাত মেখে খাওয়াটা যে জীবনের কত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সেটা মাধব বুঝতে পারল ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। প্রথমে ডাল আর একটা ভাজা দিয়ে ভাত মাখা, মাখতে মাখতে খাওয়ার ইচ্ছেটা আরও বেড়ে ওঠা, তারপর তিন-চার গরাস হাতে করে মুখে তোলা—মাঝখানে একটু থেমে ডাল বা ঝোলমাখা আঙুলগুলোকে মুখে ঢুকিয়ে একবার চুষে নেওয়া, কাঁচিয়ে নেওয়া আঙুলে লেগে থাকা চারটে-পাঁচটা-সাতটা-আটটা ভাত—তারপরই দ্বিগুণ উৎসাহে আবার ভাত মাখতে শুরু করা। এই ব্যাপারগুলো সমস্তই মাধবের নজরে এল তার ভাত খাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর।

শেষ যখন ভাত খেয়েছে মাধব, মোটেই কাঁসার থালায় খায়নি। সাদা ধবধবে কাচের প্লেটে ভাত বেড়ে দিত করবী। কাঁসার থালায় ভাত খেত মাধব মায়ের কাছে, দেশের বাড়িতে। সে আর দিলু, তার ভাই, পাশাপাশি, একই রকম দেখতে দুটো কাঁসার থালার সামনে খেতে বসত। মায়ের কিন্তু অমন সুন্দর গোলাকারে চেপে চেপে থালার মাঝখানে ভাত বেড়ে দেওয়ার অভ্যেস ছিল না। এইরকম করে সযত্নে ভাত দেওয়ার ধরন হল করবীর। মা হাতায় নিয়ে কখনো বা মুঠোয় ভরে পাতের ওপর দিয়ে দিত ভাত। ভাত পড়েই ছড়িয়ে যেত থালায়। ছোটবেলায় মায়ের কাছে খাওয়ার সময়কার কাঁসার থালা—এই প্রৌঢ় বয়সে করবীর বেড়ে দেওয়া ভাত নিয়ে মাধবের স্বপ্নে হাজির হল আজ। আর এত টাটকা সেই স্বপ্নের তেজ যে, হঠাৎ হঠাৎ মনের চোখে ভেসে উঠছে স্বপ্নের পুরো ছবিটা।

~ www.amarboi.com ~

ভাত খায় না মাধব, তবে খায় কী? রুটি? না, রুটি খেলেও তো রুটিতে আঙুল ছোঁয়াতে হয়। মাধব যা খায় তাতে খাবারে আঙুল ছোঁয়াতে হয় না। মাধবের জন্য লাউ, ঝিঙে, কুমড়ো, পটল, পেঁপে, পালং, মটরশুঁটি প্রেশারকুকারে বসিয়ে সেদ্ধ করে করবী। তারপর সব সেদ্ধ সবজি মিক্সিতে ঢেলে তার মধ্যে তিন-চার চামচপরিমাণ ভাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘেঁটে নেয়। সেই থকথকে মণ্ড একটা কাঁচের বাটিতে ঢেলে তাতে একটা চামচ ঢুকিয়ে টেবিলে রাখে। মাধব স্নান করে এসে টেবিলে বসে। তারপর চোখের জল সামলে চামচ দিয়ে সেই মণ্ড তুলে তুলে খায়। চোখের জল সামলানোর কথাটা অবশ্য করবী জানে না। রোজই একবার করে এসে সামনে দাঁড়ায় আর বলে— 'আজ কেমন হয়েছে খেতে?' কোনও কোনও দিন হাতে গোলমরিচের কৌটো নিয়ে বাটিতে রাখা মণ্ডের ওপর একটু একটু ছড়িয়ে দেয় আর বলতে থাকে, 'দ্যাখো, আজকে বেশ স্বাদ লাগবে মুখে। কেমন, ভাল না?'

মাধব বলে, 'ভাল। খুবই ভাল হয়েছে আজ।'

মাধব জানে, ওই কয়েকটা মাত্র সবজি সেদ্ধ করে শুধু একটু নুন দিয়ে মিক্সিতে ঘাঁটবার জন্য কী পরিমাণ ভয় ও উদ্বেগ সহ্য করতে হয় করবীকে। করবীর অজান্তে মাধব একদিন রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে একটা দৃশ্য দেখে ফেলেছিল। সেই থেকে মাধব সব সময় বলে, খেতে খুব ভাল হয়েছে।

করবী দুটো পুরনো আধুনিক গান গুনগুন করে। একটা হল, 'আকাশে আজ রঙের খেলা মনে মেঘের মেলা।' আর দ্বিতীয়টি, 'এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন।' দুটো গানই একলাইন ক'রে জানে। একলাইনই গুনগুন করে। পরের লাইনগুলো হুঁ হুঁ হুঁ করে সামাল দেয়। রোজ ওই সময়টায় মাধব স্নানের প্রস্তুতি নেয়। বাথরুম সারে। আগে আগে মাধবের অভ্যাসে ছিল স্নান শেষ হওয়ার পর ডান হাতের আঙুলগুলো থেকে ভাল করে সাবান ধুয়ে নেওয়া। খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হাতে কোথাও সাবান লেগে রইল কি না। খাওয়ার ব্যাপারে মাধব একটু বেশি খুঁতখুঁতে আর সাবধানী ছিল বরাবরই। তখন মাধব ডাল ভাত মেখে খেতে পারত হাত দিয়েই। তাই হাতটাকে পরিষ্কার করে ধোওয়া আর কী! এখনও প্রতিদিনই স্নান করার শেষে তার মনে পড়ে যায় পুরনো অভ্যেসটির কথা। এখনও হাতটা ধোয়, তবে অত খুঁটিয়ে আর দ্যাখে না আঙুলগুলোয় সাবান রইল কি না। কারণ আঙুলদের তো এখন আর কোনও কাজ নেই খাওয়ার ব্যাপারে। স্নানের শেষে নিজের ভেজা আঙুলগুলো মুছতে মুছতে মাধবের এখন একটা কষ্ট হয়। এই আঙুলগুলো আর ভাত মাখতে পারে না, এটা ভেবে।

ঠিক এই সময়টায় বাইরে করবীর গানের গুনগুন আওয়াজটা থেমে যায়। এতক্ষণ বেশ চলছিল। করবীর বেশ একটা আন্দাজ আছে মাধবের স্নান-বাথরুম দুটো মিলিয়ে কতক্ষণ লাগবে। বাথরুমে স্নানের ঝুপঝাপ আওয়াজটা থামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বাইরের গুনগুনও বন্ধ।

মাধব এখন জানে করবীর গুনগুন কেন থেমে যায়। একদিন মাধব একটু তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বেরিয়ে এসে কিছু একটা দরকারি কথা করবীকে বলার জন্য রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত

~ www.amarboi.com ~

চলে গিয়েছিল। ছোট ফ্ল্যাট। বাথরুম থেকে ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে কিচেন পর্যন্ত যেতে তিন-চার পা মাত্র সময় লাগে। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাধব স্তম্ভিত!

প্রত্যেকটা কাঁচা তরকারিকে প্রণাম করছে করবী। প্রণাম লাউ, প্রণাম কুমড়ো, প্রণাম প্রণাম মটরশুটি-গাজর-পালং শাক! প্রার্থনা করছে করবী সবজিদের ছুঁয়ে—ঠাকুর, দেখো ঠাকুর, যেন খাওয়ার পর ওর সহ্য হয়! যেন হজম করতে পারে! খাওয়ার পর যেন আগের মতো সব বেরিয়ে না যায় ঠাকুর, দয়া কোরো ঠাকুর!

মাধব যা খেতো সব বেরিয়ে যেত। যত সাবধানে, যত যত্নেই তেলমশলা ছাড়া রান্না করে দিক করবী, কিছুই মাধব পেটে রাখতে পারত না। খানিক পরেই সব বমি করে দিত। এটাই মাধবের রোগ। কিছুই হজম করতে পারে না। বারবার ডাক্তার দেখিয়েও ফল হচ্ছিল না। দিনে আট-দশবার করে বমি। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকে ওয়াক ওঠা শুরু। বমি তক্ষুনি হয়তো হচ্ছে না। কিন্তু ওয়াক উঠছে। সারাদিন ধরে বাড়িতে ওয়াক ওঠার আওয়াজ। সন্ধে বা বিকেল থেকে বমি হয়ে হয়ে পেট খালি হয়ে যাওয়ার পর রাতে একটু জল-মুড়ি খেয়ে শুতে যেত মাধব। শেষে তাও উঠে যেতে লাগল মাঝরাতে। মাধবের ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুম আছে। একদিন বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারল না মাধব। ঘরের মধ্যেই বমি হয়ে গেল। ভাগ্যিস বিছানায় পড়েনি, মেঝেতে পড়েছে সবটা। পিছনের বারান্দার ঘর মোছার দুটো ন্যাতা দাঁড় করানো থাকে। দাঁড় করানো, কারণ ন্যাতার সঙ্গে হাতল হিসেবে লম্বা লাঠি আটকানো আছে। বারান্দা থেকে সেই লাঠি লাগানো ন্যাতা আর ফিনাইল দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে মাধব— দেখল দরজায় করবী।

'সরো, আমাকে দাও।'

'আমি পারব।'

'জানি পারবে। দাও আমাকে। আর বমি হবে মনে হচ্ছে?'

মাধব বলল, 'না। ঘরে করে ফেলার পর বাথরুমে গিয়েছিলাম। আর-একবার হল। এখন আর হবে না।

করবী বলল, 'তা হলে চোখ বুজে শুয়ে থাকো। একটু পরে ঘুম এসে যাবে। ঘুমের ওষুধ খেয়েছ তো?'

'হ্যাঁ, খেয়েছি' বলে মাধব শুয়ে পড়ল। করবী মেঝে মুছে আলো নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

মাধব আর করবী বহুদিন যাবৎ আলাদা শোয়। মাধব কার ও পাশে শুতে পারে না। কেউ পাশ ফিরলে তো বটেই, এমনকী, অন্যের নিশ্বাসের আওয়াজেও ঘুমের ডিসটার্ব হয় মাধবের। তাছাড়া করবীর বারোমাসই ফুলস্পিডে ফ্যান চালানো স্বভাব। গায়ে লেপ দিয়েও করবী ফ্যান চালাবে। মাধব শুধু প্রবল গ্রীষ্মে আস্তে পাখা ঘোরায়। বসন্ত বর্ষা শরতে মাধবের ঘরে পাখা বন্ধ। সেদিনের পর করবী রাত্রে উঠে এসে বারবারই মাধবের দরজায় দাঁড়াত। ওদিকে জল-মুড়িও যখন উঠে যেতে লাগল তখন পুরনো ডাক্তার বললেন, সবজি সেদ্ধ মিক্সিতে ঘেঁটে লেই করে দিতে, চার চামচ ভাত ওই লেই-এর মধ্যে মেশানো থাকবে।

~ www.amarboi.com ~

এই খাবারই এখন খায় মাধব। খাওয়ার আগে দুটো ওষুধ, খাওয়ার পর দুটো। কিছুই যে-লোক হজম করতে পারে না, তারজন্য আর কী-ই বা বিধান দেবেন ডাক্তার? সলিড ফুড বলতে মাধব খেতে পারে মেরি বিস্কুট। অন্য কোনও বিস্কুটও সহ্য হয় না। রাতে শোবার আগে জল দিয়ে ভিজিয়ে চারখানা করে বিস্কুট খায় মাধব। বেলা তিনটে নাগাদ যখন কাজে বেরোয়, সঙ্গে বিস্কুটের একটা ছোট প্যাকেট নিয়ে নেয়। জলের ছোট বোতলও থাকে। জরুরি মিটিং চলাকালীন একটা বিস্কুটে কামড় দিয়ে মুখে একটু জল নিয়ে নিল। অল্প একটু বিস্কুট আর একবারে মুখে যতটুকু জল ধরে ততটুকু জল—মাধবকে সারাদিনে মাঝে মাঝে খেতে হবে এমনই নির্দেশ। মাধবের জন্য সারাদিনের জলও মেপে দিয়েছেন ডাক্তার এখন। তা ছাড়া এম্পটি স্টম্যাক রাখা চলবে না, কারণ তাতেও বমি পাওয়ার আশঙ্কা।

মাধবের সামনে অন্যরা খায়, দোকান থেকে ভাল খাবার আনিয়ে। সুখাদ্যে মাধবের কোনও আকর্ষণ নেই। বরং ভীতি আছে। ওইসব খাবার তার পেটে গেলে কতটা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে সে, একথা ভেবে, দোকানের সুখাদ্য দেখলেই শিউরে ওঠে মাধব। তার বিন্দুমাত্র স্পৃহা জন্মায় না বিরিয়ানি মাটন চাপ দইবড়া চিকেন পকোড়া বা ফিশ ফ্রাইয়ের প্রতি। বাইরের লোকে ভাবত মাধবের কত সংযম। আসলে ওটা মাধবের আতঙ্ক। বহুদিন ধরেই মাধব বাইরের খাবার স্পর্শমাত্র না করে করবীর হাতের ডাল, লাউ কুমড়োর তরকারি আর পাতলা মাছের ঝোল দিয়ে দুটো সাদা ভাত খেয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কোনওদিন একটা বেগুন ভাজা। ছাঁকা তেলে নয়, ফ্রাইপ্যানে এদিক-ওদিক উল্টেপাল্টে স্বল্পতম তেল দিয়ে প্রায় সেঁকে নেওয়া। এটুকুই যথেষ্ট ছিল মাধবের।

বছর দেড়েক আগে নতুন যুবকটি মাধবকে বলল, মাধবের লেখা ছোট করতে হবে। লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে মাধবের। লেখালেখিই মাধবের কাজ। তা ছাড়া দু'-তিনটে সরকারি কমিটির সে সদস্য। ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত লেখার ডাক পেয়ে প্রাণ খুলে লিখছিল মাধব। ছাপাও হচ্ছিল। নতুন যুবকটি হাতে দায়িত্ব পেয়ে সবদিক খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে দ্রুত আবিষ্কার করল, মাধবের লেখা একটু বেশি জায়গা নিচ্ছে। যুবকটি মাধবকে বলল, আপনার লেখা রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝেই আমাকে অন্যদের লেখা ড্রপ করতে হয়। তাঁরাও তো লেখক। কী যুক্তিতে তাঁদের বাদ দেব বলুন? আপনার লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে বলে তো আমি পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না।

অকাট্য কথা। যুবকটি মাধবের চেয়ে তিরিশ বছরের ছোট। তার কাছে মিনতি করা যায় না। তর্ক তো করা যায়ই না কারণ তার হাতে সদ্যপ্রাপ্ত দায়িত্বভার।

যুবকটির জায়গায় মনে মনে নিজেকে বসিয়ে দেখল মাধব। একদিক দিয়ে দেখলে যুবকটির এছাড়া সত্যিই করার কিছু নেই। তবে গত আট বছর ধরে এ-পত্রিকায় মাধবের যে-কোনও আকারের লেখা ছাপা হয়ে এল কী উপায়ে? যে-আকারের লেখা দিয়েছে মাধব সে-আকারের লেখাই ছাপা হয়েছে। তখনও তো পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়েনি পত্রিকায়। এরকম ধারাবাহিক লেখা

~ www.amarboi.com ~

মাধব আগেও লিখেছে এখানে। তখন তো লেখা ছোট করার কথা ওঠেনি। এ প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে পেল না মাধব। অবশ্য তখন এই নতুন যুবকটির হাতে দায়িত্ব যায়নি।

একটি লেখা যখন লিখিত হতে থাকে তখন লেখার ভেতরে একটি ত্বরণ তৈরি হয়। ক্রমশ লেখাটি বিকাশলাভ করে সেই ত্বরণেরই ফলে। একসময় সে পূর্ণ আকারটি প্রাপ্ত হয়ে সমাপ্ত হয়।

এক-এক লেখার জন্য তাই এক-এক আকার। সব লেখা একই আকারের হওয়া সম্ভব নয়।

এর আগে ধারাবাহিকভাবে যে-লেখাটা লিখত মাধব, তার জন্য কখনও সে নিজের হস্তাক্ষরে ৩৭ পৃষ্ঠা জমা দিয়েছে, কখনও ২৮ পৃষ্ঠা জমা দিয়েছে, কখনও-বা জমা দিয়েছে ১৫ পৃষ্ঠা। কোনওদিনই লেখা বড়-ছোট নিয়ে কোনও কথা ওঠেনি। সেই লেখাগুলি পরে তিন খণ্ডে বই হয়ে বেরিয়েছে।

বর্তমানে যে-লেখাটা লিখে চলেছে মাধব, সেটিও একটি বই হিসেবে তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে। অন্তত অগ্রসর হচ্ছিল। এখন সে থমকে যেতে বাধ্য হল।

গত চল্লিশ বছরে ৬০-৬২টা বই লিখেছে মাধব কবিতা-গদ্য মিলিয়ে। গত চল্লিশ বছরে একটি বই থেকে আর-একটি বইয়ের ভেতর প্রবেশ করার লিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মাধব পথ হেঁটেছে। নতুন যুবকটির এখনও সেই অভিজ্ঞতা নেই। সেই বয়সও হয়নি। কিন্তু যুবকটি কর্তব্যে নিষ্ঠাবান। দৃঢ়ভাবে নিয়মানুবর্তী। মাধবের লেখা কম্পোজ হয়ে যাওয়ার পর যুবকটি কম্পিউটারের পরদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মাধবকে বলে, 'কত শব্দ হবে আপনার লেখাটা?' অথবা কখনও বলে "আপনার লেখাটা প্রিন্ট আউটে চার পাতা আসবে দেখছি, এটা তিন পাতা হলে ঠিক হত।'

খুব শান্ত গলায় বলে সে কথাগুলি, কিন্তু একদিন মাধব অনুভব করল একটা অদ্ভুত জিনিস। যুবকটি যখন কম্পিউটারের পরদার দিকে তাকিয়ে আর মাধব অপেক্ষা করে আছে এবার যুবকটি কী বলবে তার জন্য, তখনই সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হল মাধব। ওই নীরব অপেক্ষার দেড়-দু'মিনিট সময়ের মধ্যেই অভিজ্ঞতাটি হল।

মাধব হঠাৎ দেখল, তার ওয়াক উঠতে চাইছে। পেটের মধ্যে পাকিয়ে উঠছে। মাধব ওয়াকটা গিলে ফেলল।

ইতিমধ্যেই মাধব গিলে ফেলতে শুরু করেছে তার পরিকল্পিত লেখাগুলি। বাড়িতে ডায়েরিতে যেসব নোট নেওয়া ছিল, সেসব কেটে দিয়েছে। ছোট করতে শুরু করেছে নিজের লেখা। কীভাবে? কিছুটা লেখা হওয়ার পর মাধব গুনে গুনে দেখে নেয় একশো শব্দ হল কি না। প্রথমে একশো, তারপর আবার একশো, তারপর আবারও একশো। এইভাবে শব্দ গুনতে গুনতে লিখতে গিয়ে মাধবের ওয়াক ওঠে। একদিন বাথরুমের প্যানে গিয়ে বমি করে দিল। একটু আগেই খেয়ে উঠেছিল সেদিন। সব খাবারটা বেরিয়ে গেল।

সেই শুরু। লিখতে বসলেই ওয়াক ওঠে। লেখা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখল। তারপর যখন সে লিখছে না, তখনও ওয়াক উঠতে থাকল। যা খায় বমি হয়ে যায়। বারবার ডাক্তারের

~ www.amarboi.com ~

কাছে দৌড়নো। ডাক্তার নানারকম ওষুধ দেন হজমের। কিন্তু ওয়াক ওঠা কমে না। ডাক্তারকে মাধব বলতে পারে না, পরিকল্পিত যে-লেখাগুলি মাধব গিলে ফেলেছে, নতুন যুবকটির সঙ্গে উদ্ভূত যে-পরিস্থিতি মাধব গিলে ফেলতে বাধ্য হয়েছে, তারাই ওয়াক তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তার পাকস্থলির খাদবস্তুকে সঙ্গে নিয়ে। বারবার মাধবের শরীর তার জীবনে ঢুকে পড়া পরিস্থিতিগুলোকে বের করে দিতে চাইছে। কিন্তু পরিবর্তে উগরে দিচ্ছে কেবল তার গ্রহণ করা খাদ্যকে। তবে সে কথা তো আর বলা যায় না ডাক্তারকে। শেষমেশ ডাক্তারের পরামর্শে ওই মিক্সিতে ঘেঁটে দেওয়া মণ্ডে এসে ঠেকেছে মাধবের খাদ্যাভাস। যেখানে আঙুল দিয়ে ভাত মাখার কোনও দরকার আর নেই।

দুই

আঙুল দিয়ে কাউকে ভাত মাখতে দেখলে সে জায়গা থেকে সরে যায় মাধব। মাধব একজন লেখক। প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছে তার কিছু চেনাজানা হয়েছে। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবরা বাড়িতে এলে করবী তাদের রেঁধে খাওয়ায়। করবী লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে মাধবরা যায় অন্যের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। মাধব যে কিছু খেতে পারবে না, এখন সেটা সকলে জেনে গিয়েছে। মাধবকে কেউ খাওয়ার জন্য জোর করে না। বদলে সকলেই নিয়ম করে দুঃখপ্রকাশ করে, 'আপনি তো কিছুই খাবেন না, জানি। কী খারাপ যে লাগছে আমাদের।' মাধব ফিকে একটা হাসি নিজের মুখে টাঙিয়ে রাখে তখন। কিন্তু মাধব কারও খাওয়ার সামনে না-থাকার যথাসম্ভব চেষ্টা করে, অন্তত আঙুল দিয়ে ভাত মেখে খাওয়া হচ্ছে যেখানে। অন্যদের খাওয়ার সময় মাধব এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকে বলা যায়।

কেন সেখানে থাকে না মাধব? মাধব নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেছে। বুঝেছে যে, তার ভিতরে একটা কষ্ট হয়। সেই কষ্ট ক্রমে একটা জ্বালায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। ওই জ্বালার মুখোমুখি হতে চায় না মাধব। সে নিজেকে বোঝায়। যে ভাবে মাধবের মা একদিন মাধবকে বুঝিয়েছিল।

মাধব আর দিলু শৈশবেই পিতৃহারা হয়। মা ইশকুলে পড়াত। মাধব আর দিলুকে সব সময় একই রকম জিনিস কিনে দিত। একই রকম জামা, একই রকম জুতো। একই রকম খাবার।

একবার মাধবের জ্বর হল। ভালরকমের জ্বর। এই ছেড়ে যায় তো আবার আসে নতুন করে। মাধবের বাড়ির সামনেই ছোট্ট একফালি মাঠ। সেখানেই তারা বিকেলে খেলাধুলো করে। দু'ভাই যখন পাড়ার অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মাঠে খেলে, মাধব লক্ষ্য করেছে, মা জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে প্রায়ই। এখন বোঝে দুই ছেলের লাফাঝাঁপি দেখত মা। দেখে একরকম সুখ পেত। ছেলে দুটো আনন্দ করছে। এইটা দেখে এক ধরনের আনন্দ মায়ের। সন্ধের ঠিক আগে ওই জানালা থেকেই দু'ভাইকে ডেকে নিত মা—পড়তে বসাত।

মাধবের আবার নতুন করে জ্বর এল একদিন দুপুরে। মাধব শুয়ে আছে। পাশে চিন্তিত মুখে মা বসে। বিকেল হওয়ামাত্রই গেঞ্জির ওপর জামা চাপিয়ে লাফাতে লাফাতে খেলতে

~ www.amarboi.com ~

বেরোচ্ছে দিলু। অন্য সঙ্গীসাথীরা মাঠে এসে ডাকাডাকি শুরু করেছে তখন। দিলু মাকে এসে বলল, 'মা, খেলতে যাচ্ছি।'

মা বলল, 'যাও।'

হঠাৎ মাধব বলে উঠল, 'না, দিলু খেলতে যাবে না।'

মা খুব অবাক, 'কেন? দিলু খেলতে যাবে না কেন?'

মাধব বলে, 'তুমি বলেছ যে-কাজই করবে দু'ভাই একসঙ্গে করবে। আমি ঘরে শুয়ে থাকব আর দিলু খেলতে যাবে কেন? দিলুও যাবে না।'

মা দিলুকে বলল, 'যাও তুমি খেলতে,আমি দাদার কাছে আছি।' দিলু মুখটা একটু বেঁকিয়ে মাধবের দিকে একবার তাকাল, তারপর প্রায় দ্বিগুণ আনন্দে বেরিয়ে গেল।

মা তখন মাধবকে বলেছিল, 'এখন গরমের ছুটি চলছে, তাই দিলু স্কুলে যাচ্ছে না। নইলে দিলু তো স্কুলেও যেত। জ্বর হলে তুমি তো স্কুলে যেতে পারো না। দিলু তো যায়। এখন শুধু খেলতে যাওয়াটা দেখলে? শোনো, ভাইকে হিংসে কোরো না, বুঝলে। হিংসে করলে মনে খুব কষ্ট হয়। জ্বালাপোড়া হয়। তোমার গায়ে জ্বর। তার একটা কষ্ট আছে। অসুখের কষ্ট। তার সঙ্গে হিংসের কষ্ট যদি থাকে তাহলে একসঙ্গে দুটো কষ্ট পাবে তুমি। কষ্ট বাড়িয়ে কী লাভ? তার চেয়ে উঠে ওই জানালায় বোসো, আমি মোড়া পেতে দিচ্ছি। ওরা খেলুক, তুমি জানালা দিয়ে দ্যাখো। আমি তো দেখি রোজ।'

মা মোড়া এনে জানালার নিচের দিকের পাল্লাটা খুলে দিল। মাধব এসে বসে দেখতে লাগল ওরা খেলছে। সেদিন একটা মাঝারি সাইজের এবারের রবারের বল দিয়ে ফুটবল খেলছিল ওরা। মাধব অবশ্য বেশিক্ষণ বসতে পারেনি। আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল।

হিংসে কোরো না। তাতে কষ্ট বাড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত হতে হতে, মায়ের এই কথাটা নানা কারণে বারবার মনে করতে হয়েছে মাধবকে। মার কথাটা সত্যি। আরও একটা অতিরিক্ত কষ্ট যোগ করবার কোনও দরকার তো নেই। যারা আঙুল দিয়ে ভাত মেখে খেতে পারছে তারা খাক না। একমাত্র মাধব ছাড়া সকলেই আঙুল দিয়ে ভাত মেখে খেতে পারছে। তাতে মাধবের কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

মাধব নিজেকে সামলানোর জন্য তাই অন্যদের ভাত খাওয়ার সময় সামনে থেকে সরে যায়। খাওয়ার শেষে হাত ধোওয়ার পর অনেকে রুমাল দিয়ে আঙুলগুলো আলাদা করে মোছে। মাধব সেদিকেও তাকাতে পারে না।

ওদিকে করবীর সব কিছু খাওয়ার ক্ষমতা থাকলেও করবী সপ্তাহে তিনদিন উপোস করে। মঙ্গল, বেস্পতি, শনি। তা ছাড়া প্রতি পূর্ণিমায় তার উপবাস। এ ছাড়াও দশরকম ব্রতপালন তো আছেই। সেসব দিনেও খাওয়া নেই করবীর। সবই স্বামীর কল্যাণ কামনায়। সারাদিন উপোস করে, সন্ধ্যায় পুজো শেষে পুরো ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে প্রদীপ দেখায়। তারপর শিখার ওপর হাত রেখে সেই করতল ছোঁয়ায় মাধবের মাথায় আর বুকে। বমি শুরু হওয়ার পর এখন পেটেও ছুঁইয়ে দেয়। অধিকাংশ দিন উপোসের পর রাতে একটু দুধ-মুড়ি খেয়ে নেয়

~ www.amarboi.com ~

করবী। কিছু বললে উত্তর দেয়, 'একলার জন্য আর কী-ই বা রান্না করব?' একদিন বলেছিল, 'তুমি কিছু খেতে পারো না, আমি বসে বসে সেটা দেখি। এরপরেও একা একা রান্না করে খাব! ক'দিন খাওয়া যায়!' ফলে সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষটা অর্ধেক দিন-ই মাধবের কারণে না-খেয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে এটা বুঝতে পারে মাধব।

এদিকে মাধব তার লেখাকে ছোট থেকে অধিকতর ছোট করে এনেছে—যাতে নতুন যুবকটির কাজের সুবিধে হয়। মাধব নিজের কাছে নিজে মেনে নিয়েছে যুবকটিকে সে মান্য করে চলবে। যুবকটির কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল লেখার আকার। মাধব মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে, যুবকটির কাঙ্ক্ষিত আকার-ই মাধব সরবরাহ করে চলবে তাকে। এই বয়সে পৌঁছে মাধবের নিজের মনমতো ভাল কিছু লেখার চেষ্টা মাধব আর না-ই বা করল! নতুন করে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ার চেয়ে পরাজয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়াই ভাল নয় কি? মেনে নাও, মাধব, মেনে নাও। মন থেকে মেনে নাও। সত্যিই মেনে নেয় মাধব যে এখন মাধবের সময় চলে গেছে। যখন মাধবের সময় ছিল তখন নিজের হস্তাক্ষরে ৩৭ পৃষ্ঠা অথবা ২৮ পৃষ্ঠা কিংবা ১৫ পৃষ্ঠা জমা দিলেও লেখার আকার নিয়ে কোনও কথা উঠত না।

এখন গোধূলিবেলা। লম্বা ছায়া পড়ে গেছে মাঠে। অবশিষ্ট ওভারগুলো ঠুকঠুক করে উইকেটে কাটিয়ে দাও মাধব। যদিও জানো না তোমার জীবনের খেলায় ঠিক কত ওভার আর বাকি। তবু, বশ্যতা স্বীকার করে নাও। আনুগত্যকে এগিয়ে ধরো সামনে। কোনও মনের কথা বলতে যেয়ো না আর— জীবনে বা লেখায়।

তিন

সেদিন দুপুরের প্রথমদিকে, একটু তাড়াতাড়িই, মাধব বেরোলো বাড়ি থেকে। একটা কমিটি মিটিং আছে আজ। বসন্তকাল শুরু হয়েছে। গাছগুলোর গায়ে নতুন পাতা বেরিয়ে বাতাসে কাঁপছে। ঝকঝক করছে রোদ্দুর। কাছেই একটা কলেজ। তরুণতরুণীরা জুটি বেঁধে হাঁটছে রাস্তায়। তাদের পিঠে ব্যাগ। মাধবের গাড়িটা একটা সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে। সিগন্যালটা ছাড়ছে না। হঠাৎ মাধবের চোখে পড়ল একটা দৃশ্য। ফুটপাথে বসে একজন লোক। স্নান না করা রুক্ষ চুল, ছেঁড়া ময়লা জামা, হাতে একটা এনামেল থালা। থালায় ভাত তরকারি। একাগ্রমনে কোনওদিকে না তাকিয়ে, লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে লোকটা ভাত মাখছে আর খাচ্ছে।

পেটের কাছে পাকিয়ে উঠল মাধবের। এই সময় সিগন্যাল ছেড়ে দিল। মাধব বলল, 'রতন সামনের মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। বাড়ি চলো।'

রতন অবাক হয়ে বলল, 'বাড়ি ফেরত যাব!'

'হ্যাঁ। তাই চলো।'

দরজা খুলল করবী। স্নান করে উঠেছে। টেবিলে থালা গেলাস রাখছে। মাধব একেবারেই খেয়াল করল না আজকে সেই বিরল দিনগুলোর একটা, যেদিন করবী দুপুরে খেতে বসছে।

~ www.amarboi.com ~

মাধব বাথরুমে ঢুকে গেল। একবার-দু'বার আওয়াজ করে ওয়াক উঠল তার। তিনবার। কিন্তু বমি হল না। করবী দৌড়ে এল বাথরুমের দরজার কাছে, 'কী হল তোমার? আবার সেরকম হচ্ছে?'

'না কিছু হচ্ছে না', বলতে বলতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে মাধব নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

'কী জানি বাবা! কী হল আবার!' করবীর উদ্বিগ্ন গলা ভেসে এল। আর মাধবের মনে ভেসে উঠল ফুটপাথবাসী লোকটির ছবি। একহাতে এনামেল থালাটা ধরে আঙুল দিয়ে ভাত মাখছে। আবারও প্রবল একটা ওয়াক আওয়াজ উঠল মাধবের গলা থেকে।

ডাইনিং স্পেস থেকে শোনা গেল করবীর গলা, 'এই আওয়াজটা আমি আর নিতে পারি না। দিনরাত্তির এই ওয়াক-ওয়াক। বাবাহ্‌, আর পারা যায় না। মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ ছিল, আবার শুরু হল। কী ঘেন্না করে এক-একসময়!'

ঘেন্না কথাটা শুনে মাধব ঘর থেকে বেরিয়ে এল উদ্যত বমি চাপতে চাপতে। বেরিয়ে এসে মাধব দেখল একটা কাচের প্লেটে ডাল দিয়ে ভাত মাখছে করবী। প্লেটের পাশে মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি কাটা একটা বেগুন ভাজা যার একটু লেজ বেরিয়ে আছে। খেতে খেতে করবী তার আঙুলে লেগে থাকা চারটে-পাঁচটা-সাতটা-আটটা ভাত মুখ দিয়ে কাঁচিয়ে নিয়ে আবারও ভাত মাখতে শুরু করল আঙুল দিয়ে।

মাধবের মাথার ভেতর সব যেন কীরকম তালগোল পাকিয়ে গেল। মাধব বলে উঠল, 'ঘেন্না! ঘেন্না করো? আমি রোজগার করে আনি বলে ওই ভাতটা আঙুল দিয়ে মেখে খেতে পারছ, আমি, আমি ওয়াক, রোজগার করে আনি বলে, ওয়াক, নইলে ডাল দিয়ে ভাত দিয়ে মেখে খেতে পারতে না... ওই বলতে বলতে মাধব একহাতে করবীর খাওয়ার প্লেটটা ধরে মেঝেতে ছুড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ওয়াক আওয়াজ তুলে মাধবের দুপুরের খাবারটা বমি হয়ে ছলকে পড়ল মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা প্লেটের টুকরো আর ডাল-মাখা-ভাতের ওপরে।

খাওয়ার টেবিলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল করবী।

দেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোটোবেলা নামক শহরে

সেরা পুজো কোথায় হচ্ছে এ বার? কেন, আমার ছোটোবেলায়। এখনও? হ্যাঁ, এখনও। সেরা প্যান্ডেল, সেরা ধুনুচিনাচ, সেরা প্রসাদ। সব ওই ছোটোবেলায়। ওই যে, সেরা প্রতিমা আসছে, পাড়ার যুবকবৃন্দের কাঁধে, বাঁশের মাচায় চ'ড়ে। আসছে শেখপাড়ার কাঁচা সড়ক দিয়ে। শেখপাড়া তো মোছলমানপাড়া! সেখানো দুগ্গোপুজো? হয়ই তো। আগসর আলি মণ্ডল আর খোকনেশ রায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দেবে তো প্রতিবারের মতো, তাই এবারও মা আসছেন, যুবকবৃন্দের সর্বজনীন-এর মণ্ডপের দিকে, আসছেন, আর আসার হুড়োতাড়ায় প্যাঁক প্যাঁক করে হাঁসগিন্নি পালাচ্ছে হেলেদুলে, ফড়ফড় ক'রে একটু উড়ে একটু ছুটে মুরগি নামছে পাশের ডোবায়, আর মুরগি মায়ের গুঁড়ি গুঁড়ি ছানারা, তারা তো এক লাফও উড়তে পারে না, তাই ছুটতে গিয়ে ছাইগাদা আর কচুগাছের ফাঁকে লুকিয়ে পড়ছে।

কচুগাছের ঝকঝকে সবুজ পাতায় তখন কী রোদের ঝলক! সকাল সকালই আজ ঠাকুর নিয়ে আসছে পাড়ার মাথারা। আসগরদা, খোকনেশদা ভবানী পাল এরাই সব রাত জাগে পুজোর সময়। যখন প্রতিমা বানানো চলছে, তখন পাড়ার ছোটোদের নিয়ে কোন ঠাকুর আমরা পছন্দ করেছি, দেখাতে নিয়ে যায়, পালেদের পাড়ায়। হাসিখুশি খোকা পাল বলে, রঙে হাত দিয়ো না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখো। ব্যাজারমুখো কেষ্ট পাল বলে, এতগুলো ছেলেপিলে এনেছ, এ তো বড়ো সমস্যা হল। কিন্তু ঠাকুর গড়া দেখতে দেয়। মুখ আঁকার সময়ে খোকা পালের মেয়ে বাবার পাশে আলো ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। যুবকবৃন্দের চোখ আলো-হাতে মেয়েটির দিকে বারবার চলে যায়। এই যে প্রতিমা আজ আসছেন, এঁর মুখে ওই কিশোরীর আদল। বাবা গ'ড়ে ফেলেছে না-বুঝে। দেবী, ক্ষমা ক'রে দিয়ো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চতুর্দিক ক্ষমা করতে করতে, প্রসন্ন করতে করতে দেবী চলেছেন, আর পড়শি দরজা খুলে, বউরা দাঁড়াচ্ছে ছুটে এসে, হাতের কাজ ফেলে, কাজের হাত ঘরোয়া আঁচলে মুছতে মুছতে, এসে দাঁড়াচ্ছে। তাদের হাঁটু ধ'রে দাঁড়িয়ে এন্ডিগেন্ডি বাচ্চা। ওই হাঁস-মুরগির মতোই।

এরাও পালন করে। ছোটো ছোটো, ঘুপচি ঘুপচি সব সংসার, পরিবার। তাই বউরা গলায় আধময়লা শাড়ির আঁচল জড়িয়ে প্রাথমিক প্রণাম সেরে নিচ্ছে তাদেরই মতো যিনি পালন করেন, তাদেরই মতো যিনি পিছু পিছু গন্ডাখানেক ছেলেপুলে নিয়ে আসেন, তাঁকে।

পাড়ার রাস্তা দিয়ে ঠাকুর চলে যাওয়ার পরেই, হালকা গল্পের মধ্যেই সব জটলা ভেঙে ফিরে যাচ্ছে সংসারের কাজে। যে বাচ্চা মুখে বুড়ো আঙুল দিয়ে চুপ করে বড়ো বড়ো চোখে ঠাকুর না-দেখতে পেয়ে লোকজনের মাথা দেখছিল, সে তার মায়ের কাছে বায়না শুরু করেছে আবার। কাঁচা রাস্তা ঠেকে গিয়ে পাকা রাস্তা উঠছে একটু দূরে। সেই বাঁকের মুখে মাঠ। সে মাঠে মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে। বাঁশবোঝাই গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান ধমকায় লাভ ইন টোকিও গাওয়া রিকশাওয়ালাকে। সে ড্রেনের ধারে শুয়ে থাকা অলস কুকুরের ল্যাজের ওপর চাকা তুলে দিয়েছে। ঘেঁউ-উ ঘ্যাঅ্যাক ক'রে কত ধমক দিয়েছে বেচারি। গাড়োয়ান বলে, মায়ের সামনে তার সন্তানরে চাপা খাওয়াচ্ছ। মা কই? সত্যিই তো, যুবকবৃন্দ ধরাধরি করে মাকে মণ্ডপে বসাচ্ছে। আর মা এইমাত্র এলেন বলেই বোধহয় আকাশ কী নীল, কী নীল! সেই নীলের মাঝখানে ভাসছে স্তূপ স্তূপ সাদামেঘের স্তবক। পেঁপেগাছের পাতা, কাচ বসানো পাঁচিলে, টালিছাদের দড়ির ওপর দিয়ে উঠে যাওয়া কামিনি আর লাউলতার গায়ে, পুকুরের কাচ স্বচ্ছ জলে, ঘাটের সিঁড়িতে রাখা সদ্য মাজা ডাঁই করা কাঁসার বাসন থেকে ছিটকে উঠছে রোদ। রোদ্দুর। পুজো পুজো রোদ্দুর।

এইরকম আলো ঝলমল দিনে দুটি বালককে ঘরে বন্ধ রাখা হয়েছে বই খাতা আর মাস্টারমশাই দিয়ে। তারা জাফরিকাটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। নীলের ভেতর একটা ঘুড়ি। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন নাকি তার আগে থেকেই এই টাউনে একটার পর একটা ঘুড়ি নীলের মধ্যে ভেসে উঠেছে। আর বলেছে, পুজো আসছে। পুজো পুজো রোদ্দুরও নিয়ে এসেছে সেইসব ঘুড়ি।

পুজো কিন্তু মাত্রই পরশু দিন। তবু এখনও পড়তে বসতে হচ্ছে। এর চেয়ে খারাপ কিছু হয়? তবুও পড়ছিল এরা, কিন্তু পাশের বাড়িতে হইচই উঠল। এদেরই বয়সি দুটি ছেলেমেয়ে আছে ও-বাড়িতে। ঝিন্টু, বাবলু। এই পুজোর টাইমে প্রতিবার বাবলু-ঝিন্টুদের বাড়িতুতো ভাইবোনরা আসে। তাদের মধ্যেও মেলা বাচ্চা। তাদের কাঁইমাই আনন্দ শোনা যাচ্ছে এ বাড়ি থেকে। বাবলু-ঝিন্টুদের বাড়িটা দোতলা আর মস্ত ছাদ। বাচ্চাগুলো এসেই আগে ছাদে উঠবে। ছাদ থেকে দিগ্‌বিদিকে তাদের পরিত্রাহী উল্লাস ছুটছে।

মাস্টারমশাই দিয়ে বন্দি রাখা হয়েছে যাদের, তারা এখন কী করবে?

ছোটোজন উদাসভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মতো বলে, পুঁচকে বাবু চাঁদিয়াল তুলেছে।

~ www.amarboi.com ~

মাস্টারমশাই খবর কাগজ থেকে চোখ তুলে বলেন, তাতে তোর কী? তোর অঙ্কটা হয়েছে?

ছোটোজনের এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলার বয়স হয়নি, তবু সেইভাবেই বলে, না-আ-আ, আমার কিচ্ছু না। তবে আমাদের পাড়ায় তিনটে বাবু তো, তাই বলছি। তিনটে বাবু মানে? মাস্টার হতভম্ব।

একটা বাবু এ। ব'লে ছোটোজন আঙুল দিয়ে বড়োজনকে দেখায়। মানে আমার দাদা। আর একটা হল ব্যাঁকা বাবু। বেঁকে বেঁকে হাঁটে তো, তাই। বড়োজন যোগ দেয়, ওর ভালো নাম বাবুকান্তি। ছোটোজন বলে, হ্যাঁ, ভালো নাম। এ জানে। এর বন্ধু তো তাই ভালো নাম জানে। আমার দাদা। জল খেয়ে আসব?

যা! শিগগির আসবি। ছোটোজন দু-মিনিটের জন্য পালিয়ে বাঁচে।

মাস্টার খবর কাগজ সরিয়ে পাড়ার পুজোর বই ওলটাচ্ছেন। পুজোর বই। সব পাড়া থেকেই বেরোয়। সেই পাড়ার পড়শিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সেখানে সভাপতি, সম্পাদক, পৃষ্ঠপোষক, সদস্যগণ। পাশে আমোদ প্রমোদে মন্টু, কান্টু, সোনা, ঝুম্পি, গোপাল, মনাই এইসব নাম থাকে। স্থানাভাবের কারণে ভালো নাম কেটে ডাকনাম ছাপা হয়। আমাদের বড়োজন ছোটোজনের নামও সেখানে পাবেন। মাস্টার একটু বিভ্রান্ত। বলছেন, কীসব নাম, বাবুকান্তি! এই বইতে দেখছি কোষাধ্যক্ষ খোকনেশ ধর। খোকনেশ আবার কী? তোদের পাড়ায় যে কী সব নাম হয়। বড়োজন এ বার ক্ষুণ্ণ। বলে, আমাদের পাড়ার কথা কেন বলছেন স্যার? আপনাদের পাড়ার মানে, 'মেঘনাদ-মাঠ' তো আপনাদের পুজো স্যার। মেঘনাদ মাঠের বইতে দেখলাম সহ-সম্পাদক পল্টুবরণ পাল। পল্টুর কী করে বরণ হয় স্যার?

তাতে তোর কী? অ্যাঁ। যে করে হোক, হোক গে যাক। তোর কী!

বোঝা যায় মাস্টার যুক্তি হারিয়েছেন। কারণ, যুক্তি হারালেই তিনি বলেন, তাতে তোর কী! বড়োজন ব'লে চলে, আরও আছে স্যর। আপনাদের পুজো বইতে একটা পদ্য ছাপা হয়েছে রাইটারের নাম হারুলতা সেন। সামনে রাখা জলের গেলাসে চুমুক দিয়েছিলেন মাস্টার। তিনি বিষম খান। য্যাঃ, তাই আবার হয় নাকি।

আপনি পড়ে দেখবেন। upon god বলছি। ওটা স্যর হরেনদার লেখা। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যারের ছেলে। ডাক নাম হারু। দু-বছর আগেও স্যর আপনাদের পাড়ার বইতে আমোদপ্রমোদে হারু নাম ডাকত। পদ্য লিখলে বাবার কাছে ঠ্যাঙানি খাবে বলে ওইভাবে লিখেছে। আপনাদের পাড়ার তো স্যর এটাই হয়।

আমাদের পাড়ায় না। ওটা আমাদের পাড়া না। অ্যাসিস্টেন্ট হেডস্যার গণেশবাবু তো থাকে ময়দাকলের পাশে। ওটা, উঁহু আমাদের পাড়া না।

ইতিমধ্যে ছোটোজন ফিরে এসেছে। ছোটোজন বলে, আমাকে একটা পদ্য লিখে দেবেন স্যর! মাস্টার আঁতকে ওঠেন। পদ্য? পদ্য কীসের?

ছোটোজন গম্ভীরভাবে বলে, এই আমাদের এত দুঃখ, তাই নিয়ে।

মাস্টার আরও দিশাহারা। ভুরু কুঁচকে বলেন, দুঃখ তোর দুঃখ কিসের!

~ www.amarboi.com ~

ছোটোজন আরও মনমরা হয়ে যায়। বলে, এই যে পাড়ার মণ্ডপে ঠাকুর আসছে, পাশের বাড়িতে লোক সব আসছে। পুঁচকে বাবু ঘুড়ি তুলছে, আর আমাদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে। দুঃখটা নিয়ে আপনি একটা পদ্য লিখে দিন না স্যর।

দিন না, দিন না, ও'রকম কচ্চেন কেন, স্যর? দিন না। নাম দেবেন, পুজোর পদ্য। কেমন? দেবেন তো?

মাস্টার কিছুই আর বুঝে উঠতে পারেন না। রেগেমেগে বলেন, কিন্তু পদ্য দিয়ে তুই কী করবি?

ছোটোজন বলে, আমার নামে ছাপাব। ইস্কুল ম্যাগাজিনে। পুজোর পরই ম্যাগাজিন বেরোবে। তাই না, দাদা।

বড়োজন বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তবে স্যর আমাকেও একটা পদ্য দেবেন। ওকে একা দিলে হবে না।

ছোটোজন বলে, ঠিক আছে, দুটো পদ্য দেবেন। দুটো। মাস্টারের চুল খাড়া হয়ে যায়। চোখ গোল্লা গোল্লা। তিনি বলেন, দু-টোও? পদ্য! এক লপ্তে দুটো! আমি কোনোদিন এক লাইনও লিখিনি রে।

ছোটোজনের মায়া হয়। আচ্ছা থাক। একটাই দেবেন। একটাই। আমরা দু-জনের নাম দিয়েই ছাপব। একটা দেবেন তো!

বড়োজন বলে, হ্যাঁ, দু-জনের নামে। যেমন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল, সেরকম নারে? বলে এ বার বড়োজন জল খেতে যায়। বড়োজন উঠোমে নেমে দেখে পিছনের পুকুরটা এই বর্ষায় যে দিঘি হয়ে গিয়েছিল তার পাশেপাশে কাশফুলের গাছ দাঁড়িয়ে গেছে। আর সাদা কাশফুলের পাশ দিয়ে নামছে ধূসর বক। এদের বাড়িতে পাঁচিলটা ভাঙা। মস্ত হয়ে যাওয়া পুকুরের পিছনের রাস্তাটা দিয়ে পিয়ন নিতাইদা আসছে।

আজও কি আসবে না? পুজো তো পরশু দিন। আজও যদি না আসে, কী হবে! ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঝাঁপ খেয়ে অনেকটা নিচে পড়ে বড়োজন। বুনো জংলা ফুল কাঁটায় হাত পা ছড়ে যায়। লাফ দেয় কেন? কারণ, পুকুরের ওপার থেকে এইটুকখানি হয়ে যাওয়া নিতাইদা তাকে হাত নেড়ে ডেকেছে। তার মানে আছে, আছে।

ঝোপঝাড় ভেঙে ছুট দেয় বড়োজন। আর ওই দৌড়োনো দেখে পাশের বাড়ির উঠোনে জাবনার বালতি থেকে মুখ তুলে গাভি ডাক দেয়। আম্মা। মোরগ লাফিয়ে ওঠে কলঘরের ছাদে। দিঘির পাশের গাছপালা থেকে উড়ে যায় ঝটপট পাখি। ঢাল বেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ইটরাস্তায় উঠে বলে, আছে নিতাইদা?

পিয়ন বলেন, আছে বলেই তো হাত-ইশারা দিলাম।

বড়ো বড়ো দুটো প্যাকেট। ভেতরটা নরম। বেশ ভারী। গালার সিল দেওয়া।

সই করে প্যাকেট নিয়ে আবার ছুট। মামাদের পাঠানো পার্সেল। মেজোমামা আর ছোটোমামা পাঠিয়েছে একটা প্যাকেট। বড়োমামা অন্যটা। দূরে দূরে থাকেন তাঁরা। দেখা হয় না। চিঠি আসে। আর পার্সেল আসে পুজোর আগে। প্রতিবার। মাস্টারমশাইয়ের

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

সামনেই দুজন কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলল যত্নে লাগানো মোড়ক। তিনজোড়া শার্ট, প্যান্ট। রেডিমেড।

আয় পরে দেখি।

এখন না, মা আসুক।

মা আসার তো দেরি আছে।

তবে চল, আমরাই যাই।

মাস্টার বলেন, কোথায় যাবি তোরা?

যাব স্টেশনে। বড়োজন বলে।

স্টেশনে? কেন?

মায়ের কাছে যাব। একটু দুপুরে ট্রেন আছে।

এদের বাবা নেই। মা কাজ করতে যান ট্রেনে করে কয়েকটি স্টেশন দূরে।

মায়ের আসতে দেরি, ছোটোজন বলে, আপনি আমাদের একটু নিয়ে যাবেন, মায়ের ইস্কুলে।

আমি, মাস্টার আবারও একটু ভাবেন।

বড়োজন বলে, মা বলেছিল। মামারা কী পাঠায় দেখে নিয়ে তবে আমাদের জামা কিনবে। আপনি যাবেন স্যর?

ছোটোজন বলে, আমরা তো একা একা ট্রেনে উঠতে পারব না।

দুটি বালক, আর একজন মধ্যবয়সি ব্যক্তি এসে পৌঁছোল একটি গ্রাম্য ইস্কুলের সামনে। তখন অপরাহ্ণ বেলা। রোদ হেলেছে। ইস্কুলের ছাদে করোগেট টিন। সামনে অনেকটা জমি। তার পাশে কাশফুলের জঙ্গল হয়ে আছে। সামনে মাঠ। প্রতিমা সেখানেও সদ্যই এসেছে। ছাত্রীদের ভিড় সেই মাঠে। চুলে অনেক রুপোলি, কালো সরু পাড়ের সাদা শাড়ি পরা একজন ছোটোখাটো মহিলা মুখ নিচু করে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রতিমার দিকে তাকালেন। ঠিক সেই সময় তাঁকে কে ডেকে উঠল, মা।

মহিলা ঘুরে দেখেন। দেখলেন, তাঁর দুই বালক পুত্র মাঠের পাশে কাশ জঙ্গল ভেঙে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। মাথার ওপর উড়ে যাচ্ছে বক।

সেই মুহূর্তে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে স্বর্গের প্রাকারে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালেন দেবতারা।

সূর্য তাঁর পূর্ণ অস্তালোক ঢেলে দিলেন। সেই মুহূর্তে এই দৃশ্যের সামনে দুর্গোৎসব শুরু হল।

আজও এত বছর পরেও তুমি যদি দাঁড়াও ছোটোবেলা নামক শহরে, এইদৃশ্য মনে করো, তবে আজও শুনতে পাবে [illegible] পুজোর ভেরি।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাঠে ফেরা

দিনের প্রথম বল। মন্টে দৌড় শুরু করেছে। শ্যামল দেখল, মন্টের পিছনে, মাঠের বাইরে বেলগাছটার নিচে একটা সাইকেল যেতে যেতে থামল। মন্টে বলটা দিল। ফুল লেংথ বল। শ্যামল বাঁ পা-টা বাড়িয়ে দিতেই খট করে একটা শব্দ শুনল। সঙ্গে সঙ্গে মাঠ ঘিরে সমবেত আর্তনাদ উঠেই থেমে গেল। শ্যামল পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল অফ স্টাম্পটা ফার্স্ট স্লিপের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে উইকেটকিপার।

শ্যামল হাঁটতে শুরু করল। মাঠের পিছনে বেলগাছটা ছাড়িয়ে, পালচৌধুরীদের ভাঙা নহবতখানার নিচে ত্রিপল খাটিয়ে প্যাভিলিয়ন হয়েছে। যেমন প্রত্যেকবার হয়। শ্যামল আম্পায়ারকে পেরিয়ে সেদিকে চলেছে। বলটা হাতে নিয়ে বোলিং মার্কে ফিরে চলেছে মন্টে। দুজনে প্রায় পাশাপাশিই। মন্টে বলল, পরের দিন প্যান্ট পরে আসিস, শ্যামলা। শ্যামল কথাটা বুঝতে পারল না। বলল, প্যান্ট পরে আসব? মানে!

মন্টে বলল, আজকে তো ন্যাংটো করে দিলাম। এক বলে; তাই বলছি।

শ্যামল সবে গ্লাভস দুটো খুলে বাঁ হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছিল। ডান হাতটা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল মন্টের চোয়ালে। মন্টে মুখে হাত চেপে বসে পড়ল। দুজন ফিল্ডার দৌড়ে এগোল শ্যামলের দিকে। মারবে। আম্পায়ার বটাইদা মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সারা মাঠে বিরাট হল্লা।

শ্যামল সেদিন অবশ্য মার খেল না। কিন্তু শ্যামলকে ফিল্ডিং করতেও নামতে দিল না দুই আম্পায়ার। বটাইদা আর নেপাল বোস। বটাইদার পিছন দিকে ঘটনাটা ঘটেছিল। কিন্তু লেগ আম্পায়ারের দিক থেকে সবটাই দেখেছে নেপাল বোস। দুজনেই কড়া রিপোর্ট দিল। এক বছরের জন্য সাসপেন্ড হয়ে গেল শ্যামল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই

কোথা থেকে সাসপেন্ড হল? পূর্বপাড়ার বাৎসরিক ক্রিকেট লিগ থেকে। পূর্বপাড়া টাউনে এই ক্রিকেট লিগের খুব রমরমা। কল্যাণগড়, বাজারপাড়া, টাইগার সংঘ, তরুণ ব্যায়াম সমিতি এইসব জাঁদরেল জাঁদরেল ক্লাব। নবীন সংঘ দুটো আছে। ঘাটের মোড় নবীন সংঘ। আর দি নিউ নবীন সংঘ। এই টাউনের একপাশ দিয়ে সরু একটা নদী বয়ে গেছে। তার যে প্রধান ঘাট, যেখানে বিসর্জন হয়, সেটাকেই বলে ঘাটের মোড়। সেই ঘাটের মোড়ে যে-ক্লাব তারই নাম ঘাটের মোড় নবীন সংঘ। আর নবীন গরাই বলে একজন চালের আড়তদার আছেন তিনি দি নিউ নবীন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। নবীন গরাই-এর বড়ো ছেলে রবীন গরাই এখন গদিতে বসে। বাবা নবীন গরাই সমাজসেবা এবং খেলাধুলোর বিষয়ে উৎসাহদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নিজের নামে ক্লাবও প্রতিষ্ঠা করেছেন। মোটা চাঁদা ব্যবসায়ী লোকজন দিচ্ছে বলেই না ক্লাবগুলো চলছে। এই টাউনের লোকজনের ক্রিকেট খেলায় খুব উৎসাহ। এই যে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তার যে ক্যাপ্টেন হয়েছে এখন, সে তো একজন নবাব বংশের লোক। পতৌদির নবাব। আসল নাম একটা আছে বটে, কিন্তু সবাই তাকে পতৌদি বলেই চেনে। বাড়ির খুড়িমা জেঠিমারা অবধি ক্রিকেট খেলা হলে রেডিয়ো চালিয়ে রান্না করেন। রিলে হয় রেডিয়োতে। আর ওই যে পতৌদির নবাব, সে নবাব বংশের ছেলে বলেই না একটা চোখ নিয়েই খেলে যাচ্ছে।

পঞ্চাশ করছে, একশো করছে। অন্য চোখটা যে বিলেতে থাকার সময় মোটর অ্যাকসিডেন্টে নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের ক্যাপ্টেনের এ কথা পূর্বপাড়ার সবাই জানে।

সেই পূর্বপাড়া টাউনে ভালো খেলতে যে পারে, টাউনে তার নামডাক হয়। শ্যামলেরও হয়েছিল। শ্যামল ওপেনিং ব্যাটসম্যান। বাজারপাড়ার হয়ে খেলে নাম করে। এই পূর্বপাড়ার ক্রিকেট লিগের নিয়ম হল ২৫ ওভার করে দু'দলই খেলবে। প্রথম একটা দল ২৫ ওভার ব্যাট করবে। তারপর লাঞ্চ দেওয়া হবে। লাঞ্চে পাউরুটি কলা ডিমসেদ্ধ আলুর দম থাকে। কোনও কোনও টিম নিজের প্লেয়ারদের একটা করে দরবেশ দেয়। লাঞ্চের পর অন্য দল ব্যাট করে রান কভার করার চেষ্টা করবে।

শ্যামলের নামডাক হওয়ার কারণ, শ্যামল দু-বছরের মধ্যে সাতবার পঞ্চাশ করেছে। এমনকী একবার ১০৪ নট আউট। সেই শ্যামল একবছর সাসপেন্ড হয়ে গেল।

এর পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে। আর প্রথম বলে আউট যে-কেউ হতে পারে। তাতে ঘুসি মারাটা বাড়াবাড়ি। প্রশ্ন হচ্ছে কেন শ্যামল ঘুসিটা মারল।

শ্যামলদের বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। শ্যামল কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ই পাড়ার নন্দীবাবুকে ধরে পূর্বপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজে ঢুকে যায়। কী কাজ? বিকেল ৫টা থেকে রাত ন'টা শ্যামল লাইব্রেরির গ্রাহকদের বই খুঁজে দেয়। লাইব্রেরি দোতলা। দোতলায় রিডিং রুম। বিকেলে বেকার যুবক আর রিটায়ার্ড বৃদ্ধরা এসে স্টেটসম্যান অমৃতবাজার আনন্দবাজার যুগান্তর দৈনিক বসুমতী এইসব হরেক খবর কাগজ পড়ে। লাইব্রেরির একতলায়

~ www.amarboi.com ~

একটা কাউন্টার আছে। সেখানে ঘণ্টাদা আর শ্যামল দাঁড়িয়ে থাকে। একটা ছাপানো স্লিপে কী বই চাই লিখে সেই কাগজটা গ্রাহকরা জমা দেয়। কীভাবে জমা দেয়? আগের বার যে বইটা পড়তে নিয়েছিল সে-বইটা এখন ফেরত দিচ্ছে তো! সেই ফেরত দেওয়া বইটার মধ্যে স্লিপটা গুঁজে দিয়ে কাউন্টারে রাখে। সেই স্লিপে গ্রাহকের নামও লিখে দিতে হয়। শ্যামল আর ঘণ্টাদা লাইব্রেরির ভেতর ঘরে ঢুকে আলমারিতে সাজানো অজস্র বইয়ের ভেতর থেকে একের পর এক বই খুঁজে আনে।

শেফালি বলে একটি মেয়ে খুব বই পড়ে। ভালো ছাত্রী বলে নাম আছে। ভালো দেখতেও। লাইব্রেরির উলটোদিকের চায়ের দোকানে যারা আড্ডা মারে তাদের মধ্যে বেচাদা শেফালির জন্য পাগল হয়ে উঠেছে কিছুদিন। সে খবর শ্যামল কী করে জানবে? শ্যামল পড়াশোনা করে রাত দশটার পর থেকে। সকালে ক্লাস সিক্সের দুটো ছেলে পড়তে আসে। তারপর কলেজ যায়। প্র্যাকটিস করে সারা বছর। শ্যামলের জানার কথা নয়। একদিন শেফালি নীহাররঞ্জন গুপ্তর বই ফেরত দিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটা বইয়ের নাম লিখে কাউন্টারে জমা দিল। শ্যামল সামনে ছিল। কিন্তু ঘণ্টাদা কাউন্টারের ওদিক থেকে এসে চট করে শ্যামলের সামনে থেকে বইটা তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলও ঢুকেছে লাইব্রেরির ভেতর ঘরে। জরাসন্ধর একটা বই খুঁজছে শ্যামল। ঘণ্টাদা হঠাৎ এগিয়ে এসে হাতে একটা বই দিয়ে বলল, কাল তুমি আলেয়া কে চাইছে তাকে দিয়ে দে। শ্যামল একটু অবাক! বইটা তো ঘণ্টাদা আনল। ওকে ফেরত দিতে বলছে কেন? যা হোক, ঘণ্টাদা লাইব্রেরির একেবারের প্রথম থেকে আছে। নন্দীবাবুর সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করে। শ্যামল চুপচাপ বইটা নিয়ে নিল। ঘণ্টাদা বলল, তোর কী বই! দেখি? ও জরাসন্ধ। আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুই এটা নিয়ে যা। কাউন্টারে এখন একটু ভিড়ই বলা যায়। জনা পাঁচেক দাঁড়িয়ে। শ্যামল হাঁক দিল, কাল তুমি আলেয়া কে চাইলেন? সরু রিস্টওয়াচ পরা একটা ফরসা হাত বইটা নেবার জন্য উঠে এল। শ্যামল মুখের দিকে না তাকিয়েই বইটা দিয়ে কাউন্টারের ওপর জমা করা থাক থাক পাঁচ-সাতখানা বইয়ের প্রথম দুটো তুলে স্লিপ দেখতে দেখতে ভেতরে চলে গেল। এখন কাজের সময়। বই দিতে হবে। তারপর যে বইগুলো ফেরত আসছে তাদের আবার যথাস্থানে রাখতে হবে। অনেক কাজ। শ্যামল কাজে ডুবে গেল।

দুদিনের মধ্যে কেলেঙ্কারি। ওই শেফালি বলে মেয়েটির বাবা কাকা লাইব্রেরিতে এলেন। ওর মধ্যে একটি চিঠি ছিল। শেফালিকে লেখা। যেখানে আই লাভ ইউ তো ছিলই। আরও অনেক কথা ছিল। শ্যামল কী করে জানবে? কিন্তু শ্যামলকে যেটা জানতেই হল, সেটা হল চিঠির নিচের সইটা। চিঠির নিচে ইংরেজিতে লেখা ছিল S অক্ষরটা।

সকলেই বলল, শ্যামলের কাজ। S মানে নিশ্চয়ই শ্যামল। আর কে হবে। শ্যামল আত্মপক্ষ সমর্থন করার পথই পেল না। কারণ শ্যামল তো জানেই না বইয়ের মধ্যে চিঠি ছিল। শ্যামলকে কোনও কারণে নন্দীবাবু স্নেহ করতেন। চাকরিটা যেতে যেতেও গেল না। তবে সমস্ত পূর্বপাড়ায় রটে গেল শ্যামল নাকি পূর্বপাড়ার সেরা মেয়ে শেফালিকে চিঠি দিয়েছে!

শ্যামল একটু একটু করে পিছন দিকে ফিরে সব মনে করতে চেষ্টা করত। আর মাঠে

~ www.amarboi.com ~

নেমে ৭,৩,৪, ১২ করে আউট হত। শ্যামল ধীরে ধীরে মনে করতে পারল এই শেফালি নামে মেয়েটি যখনই আসত তখনই আড্ডা থেকে উঠে বেচাদা এসে দাঁড়াত। এটা ওটা কথা বলত ঘণ্টাদার সঙ্গে। লাইব্রেরির মেম্বারও হয়েছিল। বই কখনও বদলাতে আসত না। ওই মেয়েটি যখন আসত, তখন এমনই এসে একটা বই এগিয়ে দিত। ঘণ্টাদাকে বলত, একটা ভালো বই দে, ঘণ্টা। ক্যাটালগ দেখে কোনও বইয়ের নাম বলত না।

শ্যামল রাতে লাইব্রেরি বন্ধ করে। তারপর নন্দীবাবুর বাড়ি চাবি জমা দিয়ে বাড়ি ফেরে। ঘণ্টাদা রাত ন'টা বাজার আগেই বেরিয়ে যেত। একদিন পৌনে ন'টায় ঘণ্টাদা বেরিয়ে যাবার পর লাইব্রেরির শাটার নামিয়ে খাতাপত্র দেখে শ্যামল ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ওই বেচাদার ভালো নাম সতীশ চাকলাদার। তারই আদ্যক্ষর S।

আর কে না জানে বোলার মন্টের ঠিক ওপরের দিদি হল শেফালি। দিনের পর দিন অন্যায় অপবাদ সহ্য করে গেছে শ্যামল। মন্টেকে সেদিন মাঠে দেখে অবধি শ্যামল ঘণ্টাদা আর বেচাদা-র কথা ভাবছিল। যাদের কোনওদিন কিছু বলতে পারবে না। যখন গার্ড নিচ্ছে শ্যামল। তখন মন্টে কেমন করে যেন তাকাল। বল করতে যখন দৌড় শুরু করল মন্টে ঠিক সেই সময়ই একটা লোক সাইকেল নিয়ে বেলগাছটার তলায় থামল। হয়তো খেলা দেখবে বলে। হয়তো চেন পড়ে গিয়েছিল। যাই হয়ে থাকুক। তারপরেই বোল্ড হয়ে গেল শ্যামল। আর তারপর... যাকগে। আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি শ্যামল। ফলে একটা পুরো সিজনে শ্যামল মাত্র একটা বল খেলবার সুযোগ পেল।

তিন

পরের সিজনের শুরুতেই অন্য ক্লাবে চলে গেল শ্যামল। শ্যামল খেলত বাজারপাড়ার হয়ে। তবে শ্যামলের ঘুসি মারার ব্যাপারটা তার ক্লাবেরও কেউ সমর্থন করেনি। সাসপেন্ড হওয়ার পরও শ্যামল বেলদার মাঠে যেত। বেলদার মাঠে বাজারপাড়ার নেট পড়ত। শ্যামল লক্ষ করত, যেখানে তার এত কদর ছিল, সেখানে বিশেষ কেউ কথা বলছে না তার সঙ্গে। প্যাড পরে নেটে নামবে বলে, একটা ব্যাট হাতে উঠিয়েছে এইসময় নেবুদা বা নির্মলদা কেউ বলল, তুই ব্যাটটা নিয়েছিস কেন? ভোলাকে দে। তুই তো খেলবি না ম্যাচে। ভোলা খেলবে। গুম হয়ে মাঠের ধারে বসে থাকত শ্যামল। প্যাডটা যে খুলে রাখতে হবে সেটাও ভুলে যেত। সলিল শীল, ওদের ট্রেনার, বলতেন, শ্যামলাবাবা প্যাডটা খুলে দাও। নেবু নেটে ঢুকবে। তুমি প্যাডটা অকুপাই করে রেখো না মিছিমিছি। শ্যামল দেখল, আর যাওয়া যাবে না ক্লাবে। এরমধ্যে শ্যামলের পরীক্ষা পড়ল সামনে। ভয় ছিল, কিন্তু ভালভাবেই উতরে গেল। পরের সিজনের শুরুতে শ্যামল ভাবল আর খেলাধুলো করব না। শ্যামলের এটাও মনে হত আর লাইব্রেরিতে যাওয়া যাবে না। কারণ ঘণ্টাদার সঙ্গে রোজ দেখা হওয়া চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বেচাদার সিগারেট ধরানো এগুলো রোজই দেখতে হয়। সবচেয়ে কঠিন সময় হল যখন ওই শেফালি বলে মেয়েটি আসে। মাটির তলায় লুকোতে চায় শ্যামল। ঘণ্টাদাই শেফালির বইগুলো নিয়ে পালটে দেয়। মেয়েটির মুখের দিকেও কখনও তাকায় না শ্যামল। দৈবাৎ

~ www.amarboi.com ~

চোখে পড়ে যায় রিস্টওয়াচ পরা ফরসা একটা হাত একখানা বাঁধানো বই তুলে এগিয়ে দিচ্ছে। লাইব্রেরির কাজটা যদি আজই ছেড়ে দেওয়া যেত?

শ্যামলের আর একটা বছর আছে কলেজে। ভালোভাবে পাস করতেই হবে। ক্রিকেটটা আর খেলা যাবে না। পূর্বপাড়ার সমস্ত ক্লাবই জানে মন্টেকে ঘুসি মারার ব্যাপারটা। আর তার কারণ যে মন্টের বোন শেফালি সেটা বুঝেও অনেকে মুখ টিপে হাসে!

একদিন রাতে লাইব্রেরি বন্ধ করে বেরোচ্ছে শ্যামল, শাটার নামিয়ে তিনটে ভারী ভারী তালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে টেনে টেনে দেখা শেষ হল। উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য এগোতে গিয়ে দেখে ওই চায়ের দোকানটার সামনে হারুদা আর নবীন গরাই। নবীন গরাই পাঞ্জাবি আর পাজামা, হারুদা শার্টটা গুঁজে পরেছে। হারুদা তাকেই ডাকছে। শ্যামলা, এই শ্যামলা, এদিকে আয়। শ্যামলকে এগোতে হল না। ওরাই দুজনে বরং পিচরাস্তা পার হয়ে এদিকে আসছে। কী ব্যাপার? হারুদা প্রায় শ্যামলের মতোই লম্বা। শ্যামল ছয়। হারুদা পাঁচ-এগারো তো বটেই হাঁটার মধ্যেই হারুদা যে ক্রিকেটার সেটা বোঝা যায়। বড়োলোকের ছেলে। বাবা নামকরা উকিল। দাদা উকিল। নিজেও ওকালতি পাশ করে এখন টাউন ইশকুলে টিচারি করতে ঢুকেছে।

নবীন গরাই বলল, ভালো আছ শ্যামল? শ্যামল অবাক মুখে ঘাড় হেলায়। কেন-না এই প্রথম নবীন গরাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। হারুদা বলল, কচুরি খাবি? শ্যামল বলে, না, বাড়ি যাব।

হারুদা বলে, এক কাপ চা তো খাবি! চল! দরকার আছে। নবীন গরাই বলে, মিষ্টিমুখে বসি চল। ওখানে পান্তুয়াটা ভালো। দোকানে চা দিয়ে যাবার পর হারুদা বলল, বাজারপাড়ায় আর যাচ্ছিস না শুনলাম?

শ্যামল মুখ নিচু করে চায়ে চুমুক দেয়। হারুদা আবার বলে, তাহলে এবার কোথায় খেলছিস?

শ্যামল বলে, কোথাও না। হারুদা অবাক, মানে?

আর খেলব না। বাড়ির অবস্থা তো জানো হারুদা। যে-সময়টা পাব, দু-একটা নিচু ক্লাসের ছেলে পড়াব। হারুদা বলে, সে তো পড়াবি। কিন্তু খেলবি না কেন? একবার মাথা গরম করে ফেলেছিস তাতে কী হয়েছে শ্যামলা! ওরকম কত হয়! নবীন গরাই বলল, এবার আমাদের নিউ নবীনে খেলো! কেমন? হারুদা বলল, শোন, নবীনকাকা বলছেন তুই আমাদের ক্লাবে আয়। শ্যামল বলে, আমার আর ব্যাট ধরতে ইচ্ছে করে না হারুদা।

হারুদা বলে, তা বললে কখনও হয়। তোকে খেলতেই হবে।

শ্যামল একবার মাথা নাড়ায়। হারুদা বলে, আমার কথাটা শোন, এই সিজনটা বাদ দিস না। একবার নাম, দেখবি ইচ্ছে করবে খেলতে।

শ্যামল চুপ। নবীন গরাই বলে আমাদের নিউ নবীনে প্র্যাকটিসের পর খাওয়াদাওয়াটা খারাপ নয়। কী বলো হারু? সে কথার উত্তর না দিয়ে হারুদা বলে, নেট পড়ছে। রোজই। তুই কবে থেকে আসবি বল?

তিনজনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। নবীন গরাই দাম মেটাচ্ছে। দোকানের মালিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্যাশে বসে একটা ছোটো টেবিলে। নবীন গরাইয়ের বন্ধু লোক। দুজনে কথা বলছে। হারুদা বলে, শ্যামলা, মন্টে তোকে মাঠের মধ্যে ইনসাল্ট করেছিল। আমি জানি। বটাইদা আম্পায়ার ছিল। বটাইদা শুনেছে। আর ওই বেচা আর ঘণ্টা ওই দুটোর জন্যই তুই ফেঁসে গিয়েছিলি। আমি জানি।

শ্যামল ঘুরে তাকাল। শ্যামলের মুখে রাস্তার আলো পড়েছে। বিশ্বাস করো হারুদা, আমি কিচ্ছু জানতাম না।

হারুদা শ্যামলের কাঁধে হাত রাখে। আমি তোকে জানি রে শ্যামলা। তোকেই বিশ্বাস করি। ওই দুটো ছুঁচোর জন্য তুই খেলবি না? খেলাটা কত বড়ো আনন্দ বল তো! কাল আসবি তো নেটে?

শ্যামল বলল, কাল হবে না। পরশু যাব, হারুদা। নবীন গরাই এগিয়ে এসে বলল, কোথায় যাবে বাবা শ্যামল?

হারুদা বলল, আমাদের প্র্যাকটিসে।

চার

প্রথম ম্যাচে ৮ করল শ্যামল। পরের ম্যাচে ৪। তার পরের ম্যাচে ১। নিউ নবীন দুটো জিতল, একটায় হেরে গেল। পরের খেলা ঘাটের মোড় নবীন সংঘের সঙ্গে। সেই দলেরই এক নম্বর বোলার মন্টে। ম্যাচের দুদিন আগে লাইব্রেরি থেকে বাড়ি ফেরার পরে শ্যামলা চলে গেল হারুদার বাড়ি। হারুদা তখনও ফেরেনি। নিউ নবীনের হয়ে খেললেও হারুদা আড্ডাটা মারে তরুণ সংঘে। শ্যামল বাইরে, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। দশটা বেজে গেছে তখন, দেখা গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে হারুদা আসছে।

কী ব্যাপার! শ্যামলা! তুই? এখন?

আমাকে এই ম্যাচটায় খেলিয়ো না হারুদা।

হারুদা আকাশ থেকে পড়ে! সে কী রে! তুই খেলবি না? কীসের জন্য?

না। আমি তিন ম্যাচে তেরো করেছি। ঘাটের মোড়-এর সঙ্গেই তো গতবার এক বলে আউট হলাম। তারপর... ওইসব...গন্ডগোল...আমায় এবার বসিয়ে দাও হারুদা। আমার রিকোয়েস্ট।

হারুদা বলল, তুই কী রে! হাতে ব্যাটটা ধরেছিলি কেন? পালিয়ে যাচ্ছিস। ছ্যা ছ্যা। তোকে এরকম ভাবিনি শ্যামল। শ্যামল ধাক্কা খেয়ে গেল। পালিয়ে যাচ্ছে সে? তাই তো! শ্যামল তো পালাচ্ছিলই। এটাকেই তো পালানো বলে!

শ্যামল এবার যেন, নিজের মনে মনেই বলে, নিচু গলায়, কিন্তু... হারুদা... যদি... ভালো খেলতে না পারি? হারুদা ধমক দেয়, তাহলে খারাপ খেলবি! খুব বেশি হলে কী হবে? বল কী হবে! কী রে বল?

শ্যামল মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

খারাপ মানে কত খারাপ? গোল্লা করবি? গোল্লা? তার চেয়ে কম তো আর পারবি না!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবে কে না গোল্লা করেছে? ব্র্যাডম্যানেরও চারটে জিরো আছে। তুই কোথাকার কে রে হরিদাস যে খারাপ খেলবি না? সব বড়ো প্লেয়ার কখনও না কখনও খারাপ খেলেছে? তুই খেলবি না এ হয় নাকি!

শ্যামল চুপ করে দাঁড়িয়ে।

যা বাড়ি যা। এবার ক্লাবে আমরা তোকে খারাপ খেলবি বলেই এনেছি। ব্যস। আর কিছু? আর শোন, যদি গোল্লা করিস তো গায়ে কি ফোসকা পড়বে! মন্টে কত বড়ো রে তোর কাছে? খেলাটার চাইতেও বড়ো? মন্টের ভয়ে খেলছিস না! শ্যামল মুখ তুলল। রাস্তার আলো শ্যামলের মুখে। চোখ দপদপ করছে। মন্টেকে আমি ভয় পাই না। একটা লোক সাইকেল নিয়ে বেলগাছটার তলায় যেতে যেতে নেমে পড়ল মন্টের পিছনে। এইজন্য বলটা দেখতে পাইনি। মন্টেকে আমি ভয় পাই না হারুদা।

যা বাড়ি যা। কাল নেটে চলে আসবি। খেলবি। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবি। জিরো করলে করবি। তোকে কেউ ভালো খেলার জন্য মাথার দিব্যি দিচ্ছে না।

শুধু খেলব। মাঠে দাঁড়াব। এটা মনে রাখবি। বাড়ি যা।

পাঁচ

ঘাটের মোড় ৯১ রানে অলডাউন হয়ে গেল। ৯২ করতে হবে। ২৫ ওভার হাতে। হয়ে যাবে। বঙ্কুর সঙ্গে শ্যামলকেই ওপেন করতে পাঠাল হারুদা। মন্টে অন্য এক ফিল্ডারের দিকে তাকিয়ে কী একটা বলল। বলে, বাঁকা হাসল। ঘাড়ের কাছে দপদপ করে উঠল শ্যামলের। আবার মন্টে আর শ্যামল মুখোমুখি। শ্যামল এবার ঠিক করে নিল জগতে কোনও বেলগাছ নেই কোনও সাইকেল নেই। কেবল মন্টের হাত আছে। প্রথম ওভার মেডেন। তিনটে বল উইকেটের বাইরে ছিল। শ্যামল ছেড়েছে। তিনটে স্টাম্পের ভেতরে এসেছে। শ্যামল ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলেছে। দুবার মন্টে এগিয়ে এসে বল উইকেটের কুড়িয়ে নিয়েছে। শ্যামল মন্টের দিকে তাকায়নি।

শ্যামল পড়ে রইল। বঙ্কু রান করতে লাগল। ২০-তে এক উইকেট। হারুদা নামল। এলবি, ৩। তরঙ্গ নামল, দুটো ৪। তারপর বোল্ড। এইভাবে ৪৫ রানে ৭ উইকেটে গিয়ে পৌঁছোল নিউ নবীন। মন্টে ৪টে নিয়েছে। খাস্তগীর দুটো। একটা রান আউট। শ্যামল আছে তখনও। ১২। একটাও চার নেই। সব সিংগলস। খোকা দাস নামছে,উইকেটকিপার। মারকুটে ব্যাট। পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, হারুদা বলেছে, আমি চালাব, তুই যেমন পড়ে আছিস পড়ে থাক। খোকা দাস কথা রাখল। মন্টেকে প্রথম বলেই একটা বাউন্ডারি করে। দুটো বল পরেই ঘাটের মোড়ের কিপার মন্টেকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। মন্টের পাঁচ উইকেট হয়েছে। স্কোর ৮ উইকেটে ৪৯ করে দিয়ে খোকা দাস চলে যাচ্ছে বোল্ড হয়ে। বুড়ো আসছে। কুণ্ডুবুড়ো। এর পর আর একজন বাকি, হালদার বুড়ো। ঘাটের মোড় কোনও দিনই নিউ নবীনকে পাত্তা দেয় না। আজ তাদের সমর্থকদের উল্লাস ফেটে পড়ছে। শ্যামল ভেবে দেখল ৮ ওভার বাকি। হাত দুটো উইকেট। করতে হবে ৪৩ রান। অসম্ভব কাজ।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

মন্টে পাঁচটা উইকেট পেয়েছে বটে কিন্তু শ্যামলকে একবার বিট করতেও পারেনি। ওভার শেষ হতে যখন ফিল্ডিং বদল হচ্ছে, শ্যামলকে শুনিয়ে শুনিয়ে মন্টে বলল, একজন তো ভয়ে ঘরের ভেতর ঢুকেই রইল। ব্যাটই তুলছে না।

শ্যামল খাস্তগীরকে দেখছে এখন। খাস্তগীরের হাত। হাত থেকে বেরোনো বল। শ্যামল দেখছে। বল বেরোল, আর মাঠের লোক দেখল বল মিড অফ দিয়ে ছুটছে। মাঠের বাইরে চলে গেল বল, খাস্তগীর অবাক। পরের বলটা মাথা নিচু করে ব্লক করল। তার পরের বলটাও।

ঘাটের মোড়-এর ক্যাপ্টেন সুকু ব্যানার্জি বলল, কপিবুক দেখাচ্ছে রে। ৮টা গেছে। এখনও কপিবুক। মন্টে বলল, নেট প্র্যাকটিস করছে সুকুদা। ওভারের পঞ্চম বল স্কোয়্যার লেগে ঠেলে একটা রান নিয়ে ওদিকে গেল শ্যামল। ওভারের আর একটা বল বাকি। কুণ্ডুবুড়ো নিশ্চয়ই সামলে দিতে পারবে।

পারল না। অফস্টাম্প উপড়ে গেল। ৯ উইকেটে ৫৪। আর-কোনো আশা নেই। হালদারবুড়ো এসে বলল, হেরে গেলাম রে শ্যামলা। নবীনকাকা সাইকেল রিকশা ধরে বাড়ি চলে গেলেন। হেরে তো গেলামই। শ্যামল ভাবল। আর ৭ ওভার বাকি। খেলা ততক্ষণ গড়াবে না। কিন্তু মন্টেকে তো পাব। হয়তো একটা ওভারের বেশি পাবও না। ভাবল শ্যামল।

মন্টের পরের ওভারে প্রথম বল উঁচু হয়ে বেলগাছতলায় পড়ল। তারপরের বলটা উড়ে গেল পালচৌধুরীদের ভাঙা নহবতখানায়। তার পরের বলটা ব্লক করল শ্যামল। তার পরেরটাও। ফিফথ বল স্কোয়্যার লেগ বাউন্ডারি পেরিয়ে গেল। চার রান। শেষ বল মিড উইকেটের দিকে ঠেলেই একটা রান।

স্কোরবোর্ড দেখাচ্ছে ৯ উইকেটে ৭১। ৯১ তো! কাছাকাছিই এসেছিলাম। শ্যামল ভাবল। যাক, কী আর করা যাবে।

খাস্তগীরের চোখে একটা সমীহ লক্ষ করল শ্যামল। খাস্তগীরের ওভারে একটা বাউন্ডারি হল কভার দিয়ে, একটা হল মিডউইকেট দিয়ে। কিন্তু সিংগলটা আর হল না। আটকে দিল ঘাটের মোড়ের ফিল্ডাররা। হালদার বুড়ো পড়ে গেল মন্টের সামনে। বড়ো কালো বোর্ড টাঙানো মাঠের ওপারে পালচৌধুরীদের ক্লাবঘরের বাইরে। সেখানে চক দিয়ে লেখা নিউ নবীন সংঘ ৯ উইকেটে ৭৯।

১২ রানে হারব। ভাবল শ্যামল। প্রথম বলেই নিশ্চয়ই হালদার বুড়োকে নিয়ে নেবে মন্টে। বড়োজোর গোটা তিনেক ডেলিভারি লাগবে। হালদার বুড়োকে ঘিরে ফেলেছে ফিল্ডাররা।

মন্টে বল দিল। মরিয়া হয়ে ব্যাট হাঁকড়াল হালদার বুড়ো। বলটা ব্যাটের কোনায় লেগে উঁচু হয়ে ফিল্ডারদের বৃত্তের বাইরে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে এক রান নিতে নিতে শ্যামল স্তম্ভিত হয়ে শুনল মন্টে চেঁচাচ্ছে! ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলটা চার হোক চার হোক। কিন্তু চার হল না। বলটা কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নতুন করে গার্ড নিল শ্যামল। ইচ্ছে করে লেগ স্টাম্পটা ফাঁকা রেখে দাঁড়াল। জানত মন্টে লেগ স্টাম্প লক্ষ্য করেই বল দেবে। দিলও। বলটা স্কোয়্যার লেগের উপর দিয়ে তুলে মারল শ্যামল। ছয়।

খোকা দাস ছুটতে ছুটতে মাঠের পাশ দিয়ে চেঁচাচ্ছে, ওভার আছে হাতে। দেখে খেল রে শ্যামলা।

ঘাটের মোড়ের ফিল্ডারদের দূরে দূরে ছড়িয়ে দিয়েছে সুকু ব্যনার্জি। নিউ নবীন-এর সমর্থক চিরকালই মুষ্টিমেয়। যে-ক'জন আছে তারা লাফাচ্ছে। শ্যামল দেখল, হারুদা এসে মাঠের ধারে দাঁড়িয়েছে। কুণ্ডুবুড়ো, বঙ্কু, তরঙ্গ সবাই।

আচ্ছা, ওভার যখন আছে, দেখে খেলি। শ্যামল ঠিক করল, আর পাঁচ রান। দুই দুই করে নেব। কিন্তু খেলার কথা কি বলা যায়—শ্যামলা ঠিক করল মারব না, কিন্তু ব্যাটের ওপর সোজা ফুলটস ফেলল মন্টে। বল মন্টের মাথার ওপর দিয়ে আবার বেলগাছের তলায়।

দলের জয়। শ্যামলের নিজেরও ৫০ হয়ে গেল। ৫৪ রানে নট আউট শ্যামল। ফিরছে।

খোকা, বঙ্কু, তরঙ্গ, মাঠের মধ্যে ঢুকে দৌড়োচ্ছে শ্যামলের দিকে। সুকু ব্যানার্জি এসে হাত মেলাল। ওয়েল প্লেড। শ্যামল দেখল, মন্টে, পাঁচ উইকেট নেওয়া মন্টে ওর দিকে তাকাচ্ছে না। মুখ নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফেরার সময় সবাই ধন্য ধন্য করছে। হারুদাই বিশেষ কিছু বলল না। জিজ্ঞেস করল, এখন কোথায় যাবি? শ্যামল বলল, বাড়ি গিয়ে, জামাকাপড় পালটে বেরোব। লাইব্রেরি খুলতে হবে।

হারুদা বলল, কী, খেলে আনন্দ পেয়েছিস তো।

শ্যামল মুখ নিচু করে থাকে। হারুদা বলে, ব্যস! তাহলেই হবে। পরের ম্যাচ ৭ তারিখ। নেটে আসিস।

চিরসবুজ লেখা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডেড বল

মজুমদার মশাই আর বসার জায়গা পেলেন না। রোজ গিয়ে মাঠের পাশে, সরকারদের ভাঙা বাড়ির উঁচু রোয়াকটায় বসবেন একটা লাঠি হাতে। আর সেখান থেকে ডাকবেন, ও সরকারবাবু, সরকারবাবু। কিছুক্ষণ পর গুপো সরকার এসে দেখা দেবেন। বোস দাদুও আসবেন। তারপর এই নেহরুর সাত তাড়াতাড়ি মরে যাওয়া, আর বিধান রায় অসময়ে চলে যাওয়ায় কত ক্ষতি হল, সেই আলোচনা করবেন। অন্য জায়গায় বসেও তো এইসব কথা বলা যায়। কেন, ছাদে? ছাদ আছে না? দোতলার ছাদেও চমৎকার হাওয়া। কিন্তু ওনারা বসবেন ওই উঁচু রোয়াকটিতেই। আসলে যে ছেলেরা খেলছে, সে হুঁশ নেই।

সেদিনও ছেলেরা খেলছিল। সেদিন তাদের ম্যাচ। তাতে ভারি বয়েই গেছে ওনাদের। মজুমদার মশাই মুখে একটা পান গুঁজে বলতে শুরু করেছেন, ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা এই লালবাহাদুর শাস্ত্রী। এ কি একটা প্রধানমন্ত্রী হল! এ দেশ চালাবে কী করে! কোথায় নেহরু! ঠিক এইসময় একটা বল এসে তাঁর চওড়া টাকের উপর ড্রপ খেল, আর আঁক করে তাঁর মুখ থেকে পানের দলা ছিটকে বেরিয়ে বোস দাদুর সাদা ফতুয়ার পেট বুকের মাঝখানে পড়ল। সদ্য মুখে ঢোকানো পানের ত্যানা, সবে পাঁচ-সাত চিবুন দেওয়া হয়েছে, রসে খয়েরে থুতুতে জর্দায় মাখামাখি একটা বড়োসড়ো ডিবলি সাইজ—কেন-না, এক সঙ্গে দুটো বড়ো সাইজের পানের কমে মুখে ঢোকান না মজুমদার মশাই। সেই রসালো ড্যালা সোজা গিয়ে বোস দাদুর ফতুয়ায় পড়তেই বোসদাদু অ্যা-হ্যা-হ্যা দ্যাখো দিকি-ই বলে রিফ্লেক্স অ্যাকশনে একবার ডান হাত দিয়ে ফতুয়াটা ঝেড়ে পানের চিবড়িটা ফেলে দিতে গেলেন। সেটা পড়ল তাঁর কোলে। তাতে তিনি আরও ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে সেই পিকমাখা চিবড়ি গিয়ে পড়ল সরকারবাবুর কাঁধে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং ঢুকে গেল সরকারবাবুর বুক পকেটে। এদিকে মজুমদারমশাই তো বিষম খেয়েছেন। খকর খোঁও-খুঁশশ করে যে কাশি দিচ্ছেন তাতে সবেগে তাঁর মুখ থেকে সুপুরিকুচি আর পিক ছিটকে জগৎ ভরে দিচ্ছে। সেই জগতের মধ্যে মজুমদার মশাই-এর এই নিত্যসঙ্গী দুই বন্ধুও পড়েন। "কেলেঙ্কারি করে দিলেন যে" বলতে বলতে সরকারবাবু তাঁর পাঞ্জাবি খুলে ফেললেন। সরকারবাবুর কাঠির মতো শরীর, পাকা চুলভরা মাথা আর পাকা ভুরু পাকা গোঁফ ভরা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রোয়াকে। রায়দাদুর হাতের সাত জায়গায় পিক মাখামাখি। ফতুয়ায় তো বটেই। সরকারবাড়ির ঠিকে কাজের লোক মানদা রোয়াক মুছতে এসে বলে ফেলল, এ কী কাণ্ড, মেসোমশাইরা কি রং খেলেছেন নাকি! দোল তো এসে পড়ল। মানদার হাসি শুনে তাঁরা তিনজন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সরকারবাবু বললেন চুপ করো। এ জায়গাটা মুছে দাও। ইতিমধ্যে মজুমদারমশাই একটু ধাতস্থ হয়েছেন। ওদিকে ছেলেপুলের মধ্যে গন্ডগোল বেধেছে। মজুমদারমশাইরা যে রোয়াকে বসেন, সেটা হল ওই ছেলেপুলেদের থার্ডম্যান থেকে পয়েন্ট অঞ্চল। ছেলেপুলেরা দুদিকে তিনটে তিনটে,ছ-টা উইকেট সাজালেও, ব্যাট একদিকেই করে। কেন-না, অন্যদিকে ব্যাট করলে রোয়াকটা মিড উইকেট মিড অন অঞ্চল হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি বল ওদিকে যাবে। তাই ওরা একদিকেই ব্যাট করে।

হয়েছে কী, আজ বিপক্ষ হচ্ছে বীরনগরের মুকুলভারতী। তাদের একটা ছেলে, বেনে বলে, অতি জোর বল করে। লাইন লেংথ খুব যে আহামরি তা নয়। তবে ব্যাটসম্যানের গা টিপ করে মারায় নামডাক আছে। দু-চারটে গায়ে লাগার পর ব্যাট হাতে ছেলেটা একটু লেগের দিকে সরে যাবেই। তাকে বল হাতে দৌড়োতে দেখলেই যাবে। তখন ফুলটসেই উইকেট বাঁধা। প্রতি বলে যদি একটু একটু সরে যায়, তবে তো গার্ড ঠিক থাকবে না। ইয়র্ক যদি করাতে পারে ভালো। নয়তো ফুলটস! কোঁকড়া চুল বোলারটি মোটমাট ওই তিন ধরনের বলই জানে। এক হল গা টিপ বল। দুই হল জোর ফুলটস। আর মাঝেমধ্যে ভাগ্য ভালো থাকলে এক-আধটা ইয়র্কার যদি বেরোয়। সুইং? আরে! এসব কী কথা। ক্যাম্বিস বলে সুইং! এক একজন বেনেকে বলেছিল সুইং-এর কথা। তখন সয়াবিনের রান্না সবে উঠেছে বাড়িতে বাড়িতে। লোকে আদা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে কষিয়ে ঝাল ঝাল করে রান্না করে। ওটাকে তখন বলা হত সয়াবিনের মাংস। মা-মাসিমার হাতে পড়লে, যদি, ওই তাঁদের ইয়র্কার পড়ার মতো হাত হয় সেদিন, অবিকল কষামাংসের মতো খেতে হয়। সাধে কি বলে সয়াবিনের মাংস। বেনে বলেছিল, ক্যাম্বিস বলে সুইং? এ যে সয়াবিনের মাংস খেতে খেতে তাতে হাড় এক্সপেক্ট করছিস রে! সয়াবিনের মাংসে কি হাড় পাবি! তারজন্য পাঁঠা চাই। পাঁঠা। দে, ডিউস বল দে। দেখিয়ে দিচ্ছি।

ডিউস বল নিয়ে বেনের একটা ব্যাপার আছে। বেনে ডিউস বলের প্রসঙ্গ তুললে সকলেই চুপ করে যায়। হাজার হোক, ক্লাবের প্রধান ফাস্ট বোলার। এই টাউনেও সবচেয়ে জোর বল করে বেনে একথা সবাই জানে। আর, তার অত্যধিক পেসের কারণেই ডিউস বলের লিগে খেলতে দেওয়া হয়েছিল। বেনে শুরু থেকে এত জোরে বল করতে লাগল, যে

~ www.amarboi.com ~

উইকেটকিপার বল ধরতে সাহস করল না। তা ছাড়া সুইং সেখানে দেখিয়েছিল বেনে। অফস্টাম্পের বাইরে পড়ে বল আউটসুইং করতে সেকেন্ড স্লিপ থেকে একজন ধরতে গিয়ে আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ল। বেনেকে যে দলে নেওয়া হয়েছিল, চোট পাওয়া ছেলেটি ছিল সেই দলের সেরা ব্যাটসম্যান। সেই ব্যাটসম্যান পরের চারটে ম্যাচ খেলতে পারেনি। লেগস্টাম্পের বাইরে পড়ছিল বেনের প্রবল ইনসুইং। ফিল্ডার দৌড়ে দৌড়ে হয়রান। বাই-তে বাই-তে ছয়লাপ। বিপক্ষ দল করে নয় উইকেটে অষ্টআশি, তার মধ্যে ৩৭টি বাইরান আর ওয়াইড ৮টা। বেনে কোনও উইকেট পায়নি। বেনের কাকাতো ভাই ছিল সে দলের ক্যাপ্টেন। ছোটোখাটো মুখচোরা ছেলেটা, খুব ভালো ব্যাট করে। ডিস্ট্রিক্ট টিমে একবার ১৪ নম্বর হয়ে রিজার্ভ বেঞ্চে বসেও ছিল। একসময় টুয়েলভথ ম্যানের পিছু পিছু ম্যাঠেও ঢুকেছিল কারও একজনের ব্যাট বদলে দিতে, লেগ আম্পায়ার আপত্তি করায় হাফ রাস্তা গিয়ে আবার ফিরে যায় ও আগের মতোই বেঞ্চে বসে থাকে। তবু সেই টিমের একমাত্র ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন পাওয়া প্লেয়ার ওই বেনের খুড়তুতোভাই, সাবু। বেনে তাকে বাড়িতে ঠ্যাঙায়। অন্তত ঠ্যাঙাত। সেই ভয়ে সাবু কাঠ হয়ে থাকে। সাবু যতই বাইরে বড়ো প্লেয়ার হোক বাড়িতে কেঁচো। বেনের কাছে। রোজ রোজ বেনের ধমকধামক, এবং বাড়িতে মায়ের অনুরোধে সে বেনেকে টিমে ঢোকায়। মাঠে হাতে বলও তুলে দেয়। কিন্তু বেনের দিকের বোলিং আর চেঞ্জ করতে পারে না। কেন-না, বেনে যখন উইকেট পাচ্ছে না এবং হুহু করে বাই রান দিচ্ছে, তখন একবার সাবু ওভার শেষে নতুন ওভার বেনেকে দেবে কি না তা নিয়ে দোনোমোনো করছিল। বেনে একটা ধমক দিল, দে বলছি! না মানে, রাঙাদা,বলছিলাম যে! কী আবার বলবি! বাড়ি ফিরতে হবে মনে রাখিস। সাবু তৎক্ষণাৎ বল দিয়ে দিল বেনেকে। বেনেকে চেঞ্জ করার কথা ভাবা হয়েছে বলে সে প্রচণ্ড রেগেছিল। পরের বলটা বেনে একটা বাউন্সার দিতে চাইল। অতি উৎসাহের ফলে বলটা পড়ল হাফপিচেরও আগে। ব্যাটসম্যান ছেলেটা ওয়াইড আর বাই হয়ে যাওয়া বলগুলো তাড়া করে ব্যর্থ হচ্ছিল। এবার মুখের উপর নারকেল নাড়ু পেয়ে পাঁই করে ব্যাট ঘোরাল। ঠং করে একটা আওয়াজ হল। বল উঠল শূন্যে। ছেড়ে দে-এ বলে দৌড়োল বেনে স্বয়ং। বলটা স্কোয়্যার লেগ আর মিড উইকেটের মাঝামাঝি। বাউন্ডারির কাছে শূন্যে ভাসছে। এসব ক্ষেত্রে ওখানে যে ফিল্ডার থাকে, তাকে স্কোপ দেওয়া উচিত। কিন্তু বেনে কাউকে ছাড়বে না। নিজে দৌড়োল। এখানে যে ফিল্ডার ছিল সে ভাবতেও পারেনি বোলার নিজে এতখানি পথ দৌড়ে আসবে। আর নিজের এরিয়ার ক্যাচ সে ছাড়বেই বা কেন অন্যের কাছে! ফলে দুজনের ধাক্কা লাগল। ছেলেটা বেনের দশাসই চেহারার ধাক্কা খেয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে পড়ল। কনুই ভেঙে গেল তার। সেও আর সেই মরশুমটা খেলতে পারল না। ওদিকে বেনের হুঙ্কার শুনল মাঠের চারপাশে ভিড় করে থাকা লোকজন। কী বাজে মিস করল রে ছেলেটা! একটু ব্যালেন্স নেই বডির!

ছেলেটাই যে মিস করছে, একথা বলার অবশ্য সংগত কারণ আছে বেনের। কারণ বেনে, ছেড়ে-দে-এ বলে ছুটছিল আকাশমুখো তাকিয়ে, তাও বলে হাত ছোঁয়াতে পারেনি। কিন্তু স্কোয়্যার লেগ থেকে ওই ছেলেটা দৌড়ে এসে এক হাতে ধরেই ফেলেছিল ক্যাচটা কিন্তু

~ www.amarboi.com ~

দৌড়ের মধ্যেই ছিল। এই অবস্থায় বেনের কাছে আচমকা প্রবল ধাক্কা খেয়ে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে ছিটকে পড়ে যায় হাত ধরা বল সমেত। ফলে আম্পায়ার ছয় রান দেয়। ক্যাচ মিস ও ছয় রান এই আঘাত বেনে আজও ভুলতে পারেনি। কিন্তু যা-ই ঘটে থাকুক, সে ম্যাচে, একদিক থেকে টানা বল করে যায় বেনে। শেষ ওভারে আর-একটা কাণ্ড হয়। বেনের একটা বল অফস্টাম্পের বাইরে পড়ে আউটসুইং করায় ফার্স্ট স্লিপ প্রাণ বাঁচাতে ডাইভ দেয় ডানদিকে। কিন্তু উইকেটকিপার রামা দেখে আর-একটা বাউন্ডারি হতে বসেছে। এটা তো তারও ডিসক্রেডিট। সে বাই বাঁচাতে লম্বা ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সময়ের গোলমালে বল তার হাতের গ্লাভসে ধাক্কা খেয়ে নেমে আসে সোজা নাক আর ওপরের ঠোঁটের ওপর। দুটো দাঁত ভেঙে যায়। নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। তখনও শেষ ওভারের তিনটে বল বাকি। কিন্তু রামা আহত হয়ে মাঠ ছাড়ায় টিমের অন্য কাউকেই কিপ করতে রাজি করানো যায় না। প্লেয়াররা সমবেতভাবে বলে তিনটে বল আর করতে হবে না বেনেদাকে। কেন-না তিনটে বল মানেই তো তিনটে বাই বাউন্ডারি! ওদের রান অষ্টআশি এখনই। আর তিন চারে বারো রান হলে একশো হয়ে যাবে। কী এক অজ্ঞাত কারণে যেন ব্যাটিং পক্ষও বেনের তিনটে বল কম খেলতে রাজি হয়ে যায়। বেনে গজগজ করতে করতে প্যাভিলিয়নে ফিরতে থাকে তাকে তিনটে বল কম করানো হয়েছে এই অভিযোগ নিয়ে। তবে যে বোলার কোনও উইকেট না নিয়ে নিজের দলের তিন-তিনটে প্লেয়ারকে উন্ডেড করে কয়েকটা ম্যাচের জন্য বসিয়ে দিতে পারে সে বোলারকে পরে আর কেউ ডিউস বলের খেলায় নিতে সাহস পায় না। উইকেটকিপার রামাও তো তিনটে ম্যাচের জন্য বসে যায় কি না। সেই থেকে বেনে, বাধ্য হয়েই কেবল ক্যাম্বিস বলের ম্যাচেই সেটল্ করে যায়। এবং তার এলাকায় এখনও তার যথেষ্টই দাপট। এ প্রশ্ন তার কাছে কেউই তোলে না যে ডিউস বল হাতে পেয়েও সে কেন কোনও উইকেটও পায়নি, এমনকী বিপক্ষের কোনও ব্যাটসম্যানের গায়েও বল লাগাতে পারেনি। একথা ঠিকই যে বিপক্ষের ব্যাটসম্যানেরা তাকে দেখে কিছুটা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু এমনিতেই বাই বাউন্ডারি হচ্ছে যখন তারা খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিল যে বল উইকেটে বিশেষ আসবে না। আসেওনি। যে দু-চারটে নাগালের মধ্যে পেয়েছে ব্যাটসমানেরা, ব্যাট ছোঁয়াতেই তা থেকে চার পেয়েছে। এবং অষ্টআশি রানের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে বেনেদের টিম আটচল্লিশ রানে অল আউট হয়। মানসিকভাবেই ভেঙে পড়েছিল টিমটা। তিনজন ব্যাট হাতে নামতেই পারেনি। সেই তিনজনই ছিল মূলত ব্যাটসম্যান। উইকেটকিপার রামা আগের ম্যাচে একান্ন করে নট আউট ছিল। একমাত্র নিজের অপরাধবোধের জন্যই হয়তো সাবু ওপেন করে ২৮ করেছিল। একদিক ধরে রেখেছিল সাবুই। বেনে করেছিল পাঁচ। তিন বলের জন্য মাঠে ছিল। প্রথমে এসেই গার্ড চাইল। লেগ-মিড দিন। আম্পায়ার লেগ মিড দিল। বেনের প্রস্তুতি হয়েছে। কিন্তু বোলার দৌড় শুরু করা মাত্র বলল, এক সেকেন্ড, আম্পায়ারদা, এক সেকেন্ড। আমাকে অফ মিড দিন তো। অফ মিড সাধারণত কেউ চায় না। আম্পায়ার হতবাক। যাই হোক, অফ মিড নিয়ে প্রথম বলটা পেয়েই হাঁকড়াল বেনে। বলটা বেনের ব্যাটের কানায় লেগে উঁচু হয়ে গেল একজন ফিল্ডারের মাথার পিছনে। সে পেছোতে পেছোতে

~ www.amarboi.com ~

হাত লাগিয়েও ধরতে পারল না লোপ্পা ক্যাচটা। হঠাৎ একটা ধ্বনি শোনা গেল—... মিস করেছে— চো-ও-লে-আ-য়-সাবু! ফিল্ডার ক্যাচ মিস করা মাত্র রান নিতে লেগেছে বেনে। উলটোদিকে সাবু ভাবছিল নির্ঘাত আউট তাই রান নিতে প্রস্তুত ছিল না। তবু, রাঙাদার কথা অমান্য করার সাহস তার নেই। পড়িমরি দৌড়োল সাবু। ওদিকে লোপ্পা ক্যাচ মিস করারর ফলে ফিল্ডারটির কিছুক্ষণের জন্য বিচারবুদ্ধি লোপ পেল, যেমন হয় আর কি। সে বেনেকে দৌড়োতে দেখে সংবিৎ ফিরে পেয়ে বল কুড়িয়েই ছুড়ে দিল বোলারের দিকে। উইকেট তাক করে। এবং তাক ফস্কাল। ওদিকে বোলারও তার নিশ্চিত শিকার এভাবে হাতছাড়া হতে দেখে ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়েছিল। কেন-না, এটা হতে যাচ্ছিল তার পাঁচ উইকেট। এবং এটিই তার জন্য বরাদ্দ ওভারের শেষ ওভার। এবং এই বলটি ছিল সেই ওভারের শেষ বল। সে এমনই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল, আর দু হাঁটুতে হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝাঁকড়া চুল নাড়ছিল যে, ভালো করে দেখার আগেই ফিল্ডারের ছোড়া বল উইকেট মিস করে বাউন্ডারিতে পৌঁছে গেল।

এক বলে পাঁচ রান। বেনের হাবভাব বদলে গেল। সে ঘুরে ঘুরে চারদিকে ফিল্ড প্লেসিং দেখতে লাগল। তারপর আম্পায়ারকে বলল, আম্পায়ারদা, স্রেফ মিড। স্রেফ্ মিড। আম্পায়ার সুধাংশু ঘোষ প্রাক্তন প্লেয়ার। তিনি বললেন, স্রেফ-মিড? মানে? মিডলস্টাম্প চাইছ কি? বেনে আবার বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্রেফ মিড। স্রেফ মিড। দিন, দিন। তাড়াতাড়ি।

বেনের তাড়াহুড়ো দেখে উলটোদিক থেকে এগিয়ে এসে সাবু বলল, রাঙাদা, একটু আস্তে ধীরে দেখে খেলো। পারলে একটা রান নিয়ে আমাকে দাও।

সাবু এবং সাবুদের দলের সবাই তখন ভাবছিল, বেনের উচিত হয়নি লাস্ট বলে রান নেওয়া। সাবু স্ট্রাইক পেল না। সাবু তো সেট হয়েই আছে। এদিকে সাবুর কথার জবাবে বেনে বলল, আমার খেলা নিয়ে মাথা ঘামাস না। নিজেরটা দ্যাখ। দেখলি তো, এক বলে পাঁচ রান করলাম। কী বলছিস, এক রান নিয়ে তোকে দেব। সে তো এখুনি দিতে পারি। কি বোলার! রেডি?

একথা মাঠের বাইরে থেকেও স্পষ্ট শুনল সবাই। ফিল্ডাররাও শুনল। কিন্তু বেনে সেটা বুঝল না।

নতুন ওভারের প্রথম বলটা অফস্টাম্পের বাইরে। বেনে ব্যাট চালাল। আবার উঁচু হয়েছে। মিড উইকেটের দিকে। চো-ও-লে-আ—এই পর্যন্ত বলে এবং ক্রিজ থেকে চার পা ছুটে মত বদলাল বেনে। না-আ-আ। ফিরে যা-আ। কেন-না, মিড উইকেটে একটা ড্রপ খেয়ে বল ফিল্ডারের হাতে। বেনে নিরাপদেই ফিরল। সাবু পারল না। মিড উইকেটের ফিল্ডার বলটা ধরেই বুদ্ধি করে বোলারের দিকে থ্রো করেছে। সাবু ততক্ষণে অর্ধেকের বেশি চলে এসেছিল। সাবু ফেরার জন্য ঘুরেই বুঝতে পারল আর লাভ হবে না। মাথা নিচু ব্যাট বগলে নিয়ে গ্লাভস খুলতে খুলতে বেনের পাশ দিয়েই ফিরে চলল। মাঠ একটা নিস্তব্ধতা। এমনকী, বিপক্ষ দলও বিশেষ হইচই করছে না। শুধু একটা আওয়াজ শোনা গেল। ধুর, তুই কোনও কম্মের নস। এইটুকু ছুটতে পারিস না।

~ www.amarboi.com ~

বেনে আর হাঁদা বোলিং ওপেন করেছিল। এবার হাঁদা আসছে। হাঁদা ক্রিজে যাবার আগে বেনের পাশে দাঁড়াল, নিচু গলায় বলল, বেনেদা ধরে খেলো, আমাকে স্ট্রাইক দাও। যদি দু-একটা ঠিকঠাক লাগাতে পারি।

চিন্তা করিস না। যা। বেনে বলল। পরের বলটা বেনের উইকেট ভেঙে দিল। স্কোর বোর্ডে তখন সাত উইকেটে আটচল্লিশ। বেনে ফিরে আসতে আসতে দেখল, সাবু মাঠে এসে আম্পায়ারকে বলছে তারা ডিক্লেয়ার করছে। কারণ তিনজন ব্যাট করতে পারবে না।

বেনে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল, হুঃ। সব পাখির শরীর। কী এমন লেগেছে যে ব্যাট করতে পারবে না। ডাক তো দেখি ওদেরকে।

সাবু বলল, ওরা কেউ নেই এখানে রাঙাদা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেছে ওদের, ওরা আসতে পারছে না।

সেই বেনেই আজ সরকারবাড়ির মাঠে ম্যাচ খেলতে এসেছে। এবং তার একটা স্পেশাল গা-টিপ করা বলে একজন ব্যাটসম্যান ব্যাটটাকে মুখের সামনে হ্যাং করে ফেলেছে। বলটা ব্যাটের হ্যান্ডেলে টিপ করে লেগে ছোট্টো মাঠের চৌহদ্দি পার করে, সরকারবাড়ির উঁচু রোয়াকে বসা মজুমদার মশাই-এর কপালে ড্রপ খেয়েছে।

ওই বল আচমকা মজুমদার মশাইয়ের কপালে ড্রপ খেয়ে যাওয়ায় মজুমদার মশাই বোস দাদু ও গুপো সরকারবাবুর যাই ঘটে থাকুক না কেন, ছেলেপিলেদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা উত্তেজিত অন্য কোনও কারণে। নিজেদের মধ্যে জটলা করছে প্রবল। খেলা এখন সাময়িকভাবে বন্ধ।

এদের একটু শাসন করা দরকার। সরকারবাবু মাঠের মধ্যে নেমে আসেন। তারপর তাঁর লিকলিকে চেহারায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে বেশ গম্ভীর একটা হাঁক পাড়লেন। অ্যাই ছেলেরা! তোমরা একটু দেখেশুনে খেলতে পারো না! এখানে আমরা বসে কথা বলছি। আমাদের গায়ে এসে বল লাগছে। এটা কীরকম ব্যাপার। আর ছেলেরা কিছু বলবার আগেই বিশাল চেহারা নিয়ে বেনে এগিয়ে এল। এখানে আমরা খেলছি। ইমপরট্যান্ট ম্যাচ। আপনারা ওই রোয়াকে বসছেন কেন? তফাতে থাকবেন তো একটু? অন্যরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। বলে কী। সরকারবাড়ির মাঠে খেলতে খেলতে সরকারবাবুকে তম্বি করা? গেল আজ আমাদের খেলা ভেস্তে। সরকারবাবু একটু ঘাবড়ালেন। অত বড়ো চেহারার পাশে তাঁকে এতটুকু লাগছে। যেটা তিনি নিজেও বেশ বুঝতে পারছিলেন। তবু দমে গেলেও তা প্রকাশ না করে কড়া গলায় বললেন, কে হে তুমি ছোকরা! এটা সরকারবাড়ির মাঠ। আমাদের বাড়ির মাঠে খেলতে এসে আমাকেই চোপা!

ততক্ষণে বেনেকে সবাই আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরেছে। ফিসফিসিয়ে বলে দিয়েছে এটা ওনাদের মাঠ। বেনে সুর নরম করে বলল, তাহলে ভুল হয়ে গেছে মেসোমশাই। আপনি দয়ালু লোক। বাচ্চারা খেলছে তাতে গরম হচ্ছেন কেন? বাচ্চারা খেললে একটা বল তো লাগতে পারে। তাও তো ডিউস বলে বল করিনি।

~ www.amarboi.com ~

সরকারবাবু বেনের বিরাট চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাচ্চারা খেলছে! বাচ্চারা? অ্যাঁ? তুমি কি বাচ্চা?

বেনে আমতা আমতা করে বলে, আমি তো বীরনগরে থাকি। এখানে কিছু চিনি না। আমাকে হায়ার করে এনেছে। এসে দেখি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা। বীর নগরে থাকি বলেই তো জানতাম না এটা আপনাদের মাঠ।

বেনের চেহারা ছেলেবেলা থেকেই খুব বড়োসড়ো। এবং বেনে এই বয়সের ছেলেদের সঙ্গেই খেলতে যায়। এরাও কিছু বাচ্চা নয়।

সরকারবাবু বললেন, তুমি কী করো? পড়াশোনা করো?

মাথা চুলকে বেনে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ক্লাস টেনে পড়ি।

সরকারবাবু হতভম্ব। বলো কী? টেনে পড়ো? এখনও? টেন?

করুণ স্বরে বেনে বলতে থাকে, পড়তাম না, জানেন, পড়তাম না। কলেজে চলে যেতাম। মাস্টাররা পাশ করায় না। এক ক্লাসে দু-বছর করে রাখে। আমার একটু খেলাধুলার ন্যাক আছে তো? তাই সবার রাগ। মাস্টাররা প্রমোশন দেয় না। ডিউসের টিমে নেয় না। আম্পায়াররা আউট দেয় না। চোখে প্রায় জল আসার উপক্রম বেনের।

সরকারবাবু নিঃসন্তান। ছেলেপুলেরা মাঠে হুটোপাটি করে সারা বিকেল সারা দুপুর। তাঁদের বুড়োবুড়ির দেখতে ভালোই লাগে। এতবড়ো ছেলেটার চোখে জল আসছে। সরকারবাবু বললেন, যাক যাক। ওকথা যাক। তোমরা খেলবে না কেন? খেলবে। খেলবে। তা বাবা তুমি কি বোলার?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

শুনে রাখো, কোনও বোলারই কোনোদিন আম্পায়ারের উপর সন্তুষ্ট হতে পারে না। কী বলেন, বোসমশাই?

তা তো বটেই। তা তো বটেই। কোনোদিনই পারে না। ইতিমধ্যে নিজেদের সামলে নিয়ে পানের পিচভরা ফতুয়া ও পাঞ্জাবি হাতে ফেলে বোসদাদু ও মজুমদারমশাইও এসে দাঁড়িয়েছেন মাঠের ভিতরে। তাঁদের ঘিরে ছেলেপুলেরা। বড়ো একটা জটলা।

সরকারবাবু বললেন, তা তোমাকে আউট দিচ্ছে না কে? কী আউট করেছ তুমি যে দেয়নি? নিশ্চয়ই এলবি ডব্লিউ। কোনোদিন কোনও আম্পায়ার ন্যায্য এলবি দেয় না বাবা। আমি ভুক্তভোগী হাড়ে হাড়ে জানি। এই অনিয়ম এই অসাম্য চিরকাল চলছে। ব্যাটসম্যানদের ফেভার করে আম্পায়ার।

যা বলেছেন। তা আপনিও কি বোলার ছিলেন? স্যার—বেনে খুবই উৎসাহিত। গুপো সরকার বলেন, ছিলামই তো। আমি ছিলাম স্পিনার।

বেনের চোখের মধ্যে একটা করুণার ছবি আসে। সে, মেসোমশাই আপনাকে দেখেই বোঝা যায়।

নিজের হাড়পাঁজড়ায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে গুপো সরকারবাবু বললেন, এখন তুমি যে আউট চাইছ এরা দিচ্ছে না কেন? কট বিহাইন্ড চাইছ কি? খোকারা ভালো করে দ্যাখো, ব্যাটের হ্যান্ডেলটা নড়ছে না তো?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খোকাদের একজন এগিয়ে এসে সমস্যাটা জানাল। যে বলটা মজুমদারমশাইয়ের মাথায় ড্রপ খেয়ে লাফিয়ে ওঠে, তারপর বলটার কী হল? কোথায় গেল?

মাঠেই পড়ছিল বলটা। রোয়াকের নিচে দাঁড়িয়ে একজন যেটা লুফেছে। এখানে নিয়ম হচ্ছে মরকার বাড়ির রোয়াকের নিচে লাগলে কোনও রান নেই। কিন্তু রোয়াক ছাড়িয়ে ভিতরে বাড়ির দেওয়ালে লাগলে চার। মজুমদারমশাই তো বসেছিলেন চারের অনেক আগে। মাটিতেও ড্রপ পড়েনি। ড্রপ খেয়েছে মজুমদারমশাইয়ের টাকে। আম্পায়ার ছেলেটি বলল, বল তো ডেড হয়ে গেছে। তারপর ক্যাচ ধরল। আউট হয় নাকি এভাবে?

বেনে হুঙ্কার দেয়, বল কী করে ডেড হল শুনি!

আম্পায়ার বলে, দাদুর টাকে ড্রপ খেল, আর বল ডেড হয়ে গেল। দাদু কি ফিল্ডার?

বেনে একহাত দিয়ে মজুমদার মশাইকে ধরে, আর ঝাঁকুনি দেয়— এই দ্যাখ আহাম্মক। এই দ্যাখ। দাদু কি ডেড? বেনের দলের ছেলেরা সমস্বরে বলে, না না। দাদু ডেড নয়। দাদু ডেড নয়। দাদু জ্যান্ত। বেনে আরও জোরে ঝাঁকুনি দেয় আর বলে, দাদু যদি ডেড না হয়, দাদু যদি জ্যান্ত থাকে, তাহলে দাদুর টাকে ড্রপটা খেলে বল ডেড হয় কী করে?

বেনের দলের ছেলেরা বলতে থাকে, দাদু ডেড নয়, বলও ডেড নয়। এটা আউট। আউট দিতে হবে।

বেনে বলে, পার্শিয়ালিটি হচ্ছে। প্রোটেস্ট কর।

মজুমদারমশাই বেনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, ও সরকারবাবু এখনও ডেড নই। কিন্তু এরপর বল আর-একবার লাগলে ডেড হয়ে যাব। চলুন মশাই।

ছেলেদের ঝগড়া উচ্চগ্রামে ওঠে।

সরকারমশাই বলেন, চলুন, বাড়ির ভিতরে চলুন। এই রোয়াকে বসে আর কাজ নেই।

খেলার দুনিয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রামনগরের গোপাল

গোপ্‌লা অ্যাই গোপ্‌লা।

ছাদের ঘরে তক্তপোশে শুয়ে ছিল গোপাল। তড়াক করে উঠে গায়ে জামা গলিয়ে নিল। আসছি-ই। আধভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড়িয়ে নেমে এসে মায়ের সামনে পড়ল। কোথায় যাচ্ছিস, রুটি করলাম তো! গোপাল বলল, আসছি। বেরিয়ে এল। পটল আর ব্যাঁকা। ব্যাঁকা একটা নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছে। চিক করে থুতু কেটে বলল, কেস আছে।

গোপাল শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, ছাদে যাবি?

পটল বলল, না, ডাকঘরের সিঁড়িতে বসি, চল।

গোপালের বাড়ি যেতে দুটো সরু গলি দিয়ে চার মিনিট হাঁটলেই মন্দির। মন্দিরের সামনে ছোট্টো ডাকঘর সেনদের বাড়ির একতলায়। এত ছোট্ট ডাকঘর যে একজন কর্মী, একজন পোস্টমাস্টার। সেন বাড়ির দুদিকে সিঁড়ি। তারপর দুদিকে রোয়াক। রোয়াকে ওরা বসল।

কী কেস বল!

পটল গম্ভীর মুখে বলল, বল করছিস?

গোপালের ভুরু কুঁচকে গেল, মানে?

পটল বলল, মানে তোর ওই স্পেশাল ডেলিভারিটা যেটা থ্রো ডেলিভারি, সেটার প্র্যাকটিস আছে এখনও?

গোপাল ভাবলেশহীন মুখে বলল, ছেড়ে দিয়েছি।

ব্যাঁকা আবার চিক করে থুতু কাটল। ছেড়ে দিয়েছি মানে?

গোপাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ছুড়ে বল আর করি না। এখন আমি স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান। কেন, তোরা খবর রাখিস না?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাখি। রাখি। খবর রাখি। কিন্তু বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি রে গোপলা।

কবে খেলা! গোপাল জিজ্ঞেস করে।

খেলা তো রোববারে। ফাঁকা আছিস তো!

খেলা নেই। কিন্তু মাকে পিসির বাড়ি নিয়ে যেতে হবে রোববার।

ম্যানেজ কর। ম্যানেজ কর। ব্যাঁকা আবার থুতু কাটে।

দাঁতনটা ফ্যাল তো আগে। ফ্যাল। গোপাল বিরক্ত। কী সেই থেকে কথা বলছিস আর পিচ পিচ করে থুতু কাটছিস। পটলও রাগ করে। হ্যাঁ, ভারি বদভ্যেস তোর ব্যাঁকা। ওটা ফেলে আয়। ব্যাঁকা দাঁতনকাঠিটা ফেলে দিয়ে মন্দিরের সামনে গিয়ে টিউবওয়েল পাম্প করে মুখ কুলকুচো করতে লাগল।

পটল বলল, রোববারটা তোকে থাকতেই হবে। গোপাল উদাসীনভাবে বলে, কাদের সঙ্গে খেলা।

কে ওয়াই সি।

কে ওয়াই সি মানে কামারপাড়া ইয়ুথ ক্লাব। আর এই পটলা ব্যাঁকারা হল নবীন ব্যায়াম। অর্থাৎ নবীন ব্যায়াম সমিতি। কেবল নবীন ব্যায়াম নামেই পরিচিত এই রামনগর এলাকায়। ব্যাঁকা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। চানাচুরের তিনটে ছোটো প্যাকেট। এই চানাচুরের নাম সাড়ে চারভাজা। নে ধর। হাতে হাতে ধরিয়ে দিল প্যাকেট। দাঁত দিয়ে প্যাকেট ছিঁড়তে ছিঁড়তে গোপাল বলল, আগের দিকে নামাস আমাকে। পাঁচটা পড়ে গেল ছটা পড়ে গেল তারপর নামলে খেলতে ইচ্ছে করে না। ওয়ান ডাউন পাঠাবি। বুঝলি ওয়ান ডাউন।

ব্যাঁকা বলল, ওয়ান ডাউন তো পুঁটে আছে। পুঁটে ক্যাপ্টেন। মুখ ভার করবে।

বেশ তাহলে টু ডাউন।

পটল বলল, টু ডাউন ব্যাঙা।

মরুক গে তবে পুঁটে আর ব্যাঙাকে নিয়েই খেল। আমি মাকে পিসির বাড়ি নিয়ে যাই।

পটল বলে, রাগ করিস না, শোন্, তুই ওয়ান ডাউনই যাবি। পুঁটেকে বোঝাব। ও তো ক্যাপ্টেন। টিমের ভালো চায়।

ব্যাঁকা বলে, ক্যাপ্টেন টু ডাউন গেলে ব্যাঙা আর কিছু বলতে পারবে না।

গোপলার ভাই এসে হাজির। অ্যাই দাদা, মা রুটি করেছে। চল্। এখানে বসে কী গুলতানি করছিস।

গোপাল জানে এখুনি কী ঘটবে। সে বলে, তুই যা। তুই যা। আমি যাচ্ছি।

না। মা তোকে ডেকে আনতে বলল।

আমার এখন খিদে পায়নি।

তাই বুঝি চানাচুর খাচ্ছিস।

তুই খাবি, নে।

পটল তার চানাচুরের প্যাকেটটা বাড়ায়। হাতের চেটো পেতে দাঁড়ায় গোপালের ভাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার নাম মন্টু। চানাচুর ঢেলে দেয় পটল। খেতে খেতে গোপালের ভাই বলে, কী রে ব্যাঁকাদা, দাদাকে হায়ার করতে এসেছিস? লাঞ্চ দিবি?

হ্যাঁ। পাউরুটি আলুর দম, ডিম সেদ্ধ।

আমায় হায়ার কর। কর না! ওরম করচিস কেন! আমিও ভালো খেলি।

গোপালের ভাইয়ের খেলা সবাই জানে। গোপালের ভাই মাঝে মাঝে ছয় মারতে পারে। মাঝে মাঝে। এবং সব বলেই ছয় মারার চেষ্টা করে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। রামনগরের সব ক-টা টিম থেকে বাদ হয়ে গেছে।

পটল বলল, আমাদের টিম তো ফিক্সড। আর জায়গা নেই।

তাহলে দাদাকে নিচ্ছিস কী করে!

ব্যাঁকা আর পটল দৃষ্টি বিনিময় করল।

বলে কী!

অ্যাই দাদা, আমায় চানাচুর কিনে দে এক প্যাকেট।

আসছি, বলে সিঁড়ি থেকে নামল গোপাল।

মন্দিরের ধারে ছোটো দোকানটায় গিয়ে দাঁড়াল গোপাল। তার কাছে ভাঙানি পয়সা নেই। একটাকার নোট। ভাইকে দিলে ভাই তা থেকে আট আনার চানাচুর কিনে বাকি আট আনাও মেরে দেবে। তাই নিজে যাওয়া।

ব্যাঁকা পটলকে বলল, গোপালের ভাইটা মহা বদমাইশ। দাদা বড়ো প্লেয়ার বলে খালি পলিটিক্স করে টিমে ঢোকার চেষ্টা করে।

গোপাল ফিরে এসে সিঁড়িতে বসে আবার চানাচুর চিবোতে থাকে। পটল বলে, শোন গোপাল, তোকে তো বললাম ওয়ান ডাউনই নামাব, কিন্তু, তোকে চার-পাঁচ ওভার বল করতে হবে। গোপাল হতবাক, বল করতে হবে। কেন? ব্যাঁকা বলল, তোর বল করা দরকার। শোন না, নরেন আম্পায়ার থাকবে না!

মুখে চানাচুর বিস্বাদ হয়ে গেল গোপালের। সকালে উঠেই নরেন আম্পায়ারের নাম!

পটল ব্যাপারটা আন্দাজ করে ব্যাঁকাকে ধমকায় : বাদ দে তো। নরেন আম্পায়ার এখন আর খেলায় থাকে না। আম্পায়ারিং ছেড়ে দিয়েছে। তুই বল করবি। ভাবিস না।

আমি বল করি না। বল করবও না। যদি ব্যাটসম্যান হিসেবে আমাকে টিমে রাখিস তো রাখবি। কিন্তু বল করতে দিলে আমি নেই।

পটল এবার সুর বদলায়। শোন, এবারের মতো তুই আমাদের হয়ে চার-পাঁচ ওভার করে দে। এটা ফাইনাল! বুঝলি তো ফাইনালটা জিততেই হবে। সবাই মিলে ভালো করে খেললে জিতব না কেন?

তার মধ্যে আমার বল করার [illegible] আসছে কোথা থেকে?

ব্যাঁকা বলে, শোন কেন্দুয়াইসিরাতে একটা ছেলে খেলছে এ বছর। দীপু দাস। পিডবলুডি অফিসের দাস সাহেবের ছেলে।

~ www.amarboi.com ~

গোপাল বলে, জানি, নাম শুনছি ছেলেটার। টাইগার স্পোর্টিং-এর এগেনস্টে ১০৪ রান করেছে শুনলাম।

পটল বলল, হ্যাঁ একশো চার নট আউট। বাকি পুরো কামারপাড়া আর এক্সট্রা মিলিয়ে চল্লিশ রান হয়েছে। একশো চুয়াল্লিশ অল আউট।

গোপাল বলে, তাতে ভয় খাচ্ছিস কেন? গত বছর আমি আরসিসি-র হয়ে একশো নয় করিনি?

আর সিসি হল রামনগর ক্রিকেট ক্লাব। মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবকে ফলো করে নামকরণ হয়।

দূর তোর সঙ্গে কমপেয়ার করবি না। কেসটা শোন।

যাই কেস হোক। আমি বল করব না।

পটল বলে, আমরা কে ওয়াই সি-র এগেনস্টে এবার তিনবার খেলেছি। দুটো ফ্রেন্ডলি আর একটা ভবেন কুণ্ডু কাপ। তিনটেতেই ওই ছেলেটা একা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে।

ব্যাঁকা বলল, এখন তোর বল ছাড়া গতি নেই। গোপাল বলল, বুঝেছি। ব্যাটসম্যান হিসেবে তার মানে আমাকে ডিপেন্ড করিস না।

করি করি! কিন্তু তোর বলটা মারাত্মক রে গোপলা।

না না, আমি আর ওর মধ্যে নেই। বেইজ্জতির একশেষ।

কিচ্ছু হবে না। কথা দিচ্ছি। ছেলেটা তোর বলেই কাত হবে।

কিন্তু আমি তো ছুড়ে বল ছাড়া করতেই পারি না। নর্মাল ডেলিভারি তো হয় না আমার একটাও।

ছুড়বি ছুড়বি। প্রাণভরে ছুড়বি।

গোপাল আধা অবিশ্বাসে তাকিয়ে বলে, ছোড়া অ্যালাউ?

আলবত অ্যালাউ।

পটল বলে, আর তুই একা ছুড়িস নাকি! নেন্টো ছোড়ে না? গদাই ছোড়ে না? গদাই তো ছুড়ে ফুঁড়ে ডিস্ট্রিক্ট লেবেল অবদি খেলে এল।

ব্যাঁকা বলে, ডিস্ট্রিক্ট-এর খেলায় কলকাতার আম্পায়ার ছিল, নো ডাকল, তাই আর বল দিল না ক্যাপ্টেন। সবাই তো ছুড়ে করে। তুই মাঝখান থেকে রাগ করে বসে রইলি। পটলা বলে, নরেন আম্পায়ারের কথাটা ভুলে যা গোপাল।

গোপাল ডাকঘরের সিঁড়ি থেকে উঠে পড়ে। বাদ দে, বাদ দে। আমাকে তোরা তাহলে ব্যাটসম্যান হিসেবে নেবার কথা ভাবছিস না?

ব্যাঁকা হাঁ হাঁ করে ওঠে। কী বলছিস! ব্যাটের জন্যই তো নিচ্ছি তোকে। তবে ওই দীপু দাসের সব কেরামতি বন্ধ হয়ে যেত যদি তোর বলের মুখে পড়ত।

পটল বলে, শোন গোপলা রাগ করিস না। একদিন একটু নেট প্র্যাকটিশে আয়। ব্যাট তো করবিই। দু-তিন ওভার করে বলটাও কর। একটা বাইরের ছেলে এসে এভাবে...

~ www.amarboi.com ~

ব্যাঁকা বলে, তুই বল করাটা নিজে থেকে বন্ধ করে দিলি তাই। নইলে তুই-ই তো ছিলি রামনগরের একমাত্র অলরাউন্ডার। কে ওয়াই সি থেকেই তো তুই উঠলি বল।

এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল গোপলা। এই রামনগরে সাতাশ আটাশ করলেই ভালো ব্যাটসম্যান যেখানে গোপলা একদিন ফুলিয়াপাড়ার সঙ্গে ৯৫ করল। আর বেলেমাঠ-এর সঙ্গে করল ৭৬। আর যায় কোথা! বাড়িতে তিনবেলা ছেলেপুলে ডাকতে আসছে। গোপলা, অ্যায় গোপলা। কী, না হায়ার করবে। এইরকম একটা ম্যাচে একজন কিছুতেই আউট হচ্ছে না। গোপলারা এখন ফিল্ডিং খাটছে। হঠাৎ কী মনে হল, গোপাল তাদের ক্যাপ্টেনকে বলল, আমাকে একটা ওভার দাও তো অভয়দা। কী মনে করে অভয় বলল, তুই? তারপর ঠোঁট কামড়ে একটু এদিক-ওদিক তাকাল। বলল,তোর বল তো কোনোদিন দেখিনি, আচ্ছা, যা।

যে ছেলেটা ব্যাট করছিল সেও একটা অফিসারের ছেলে। তার বাবা ওখানে যে পাওয়ার হাউস আছে তার সুপার। ছেলেটা ন্যাটা। রামনগর এলাকায় একটাই ন্যাটা। ভিড় করে লোকে দ্যাখে। বাদামওয়ালা শবুদাও ও ব্যাট করলে দেখত। বাদাম কিনতে চাইলে বলত, দাঁড়া একটু, এই বলটা দেখে নিই। গা জ্বলে যায় এসব কথা শুনলে। একটা করে অফিসার বদলি হয়ে আসে, সঙ্গে একটা ছেলে আসে। এ সেইরকম ছেলে। ছেলেটা তখন তিরাশি করেছে, বোর্ডে রান একশো সাতাশ ৫ উইকেট। একশো পঁচিশ রানে বোনাস পয়েন্ট, মানে আরও এক পয়েন্ট বেশি। এমনিতে জিতলে দু-পয়েন্ট। জিতলে। যদি হেরে যাও কোনও পয়েন্ট না। তবে যদি বোনাস পয়েন্ট করে হারো তবে ওই একটা পয়েন্ট কেউ কাড়তে পারছে না তোমার। আর বোনাস পয়েন্ট করে জিতলে তিন। অভয়দার কী হল, বলল, দাঁড়া তো, নেংটিকে আর-একটা ওভার দিবি। ওর তো এখনও তিন ওভার আছে। ছেলেটার নাম পীযূষ। অফিসারের ছেলের উপযুক্ত নাম। অনায়াসে দুটো চার নিল একটা স্কোয়্যার লেগ দিয়ে, একটা একস্ট্রা কভারে! একটা দুই করল ফাইন লেগে পাঠিয়ে। পঞ্চম বলে হেঁটে হেঁটে একটা সিঙ্গল নিয়ে ওপারে গেল। শেষ বলটায় আর-একটা সিঙ্গল ছিল। হাত তুলে বারণ করল। পি কে রায় লেখা স্কোর বোর্ডে। পীযূষকান্তি রায়।

গোপলা ভাবল, উঃ। পি কে রায়। শুনলেই মনে হয় জমকালো একটা ব্যাপার। গোপাল যখন অভয়দার হাত থেকে বল নিল তখন পীযূষ চুরানব্বই। প্রথম বলটাই ঠাকুরের নাম নিয়ে ছুড়ল গোপাল। সাঁই করে পিছলানো একটা অফব্রেক। লেফট হ্যান্ডারের লেগ ব্রেক হয়ে এল। ছেলেটা কিছু বুঝতে পারল না। পিছিয়ে খেলতে চেষ্টা করে কোনায় লাগাল। অভয়দা এত ভীতু স্লিপে একটা লোক রাখেনি। চার হল। মাঠ ভর্তি হাততালি। সেঞ্চুরি, সেঞ্চুরি আওয়াজ। ছেলেটা কিন্তু ঘাবড়ে গেছে। এ কী বল রে বাবা! পরের বলটা ব্যাটসম্যান মিস করল। উইকেটকিপার মিস করল। বাই বাউন্ডারি। ছেলেটা এবার লেগ আম্পায়ারের দিকে তাকাল। লেগ আম্পায়ার বিড়ি খাচ্ছে। ভ্রুক্ষেপ নেই। তারপরের বলটাও একই। দু-পা জোড়া করে পিছোল। ব্যাট এড়িয়ে প্যাডে। এল বি চাইল গোপাল। দিল না আম্পায়ার। পরের বলটা অফস্টিকের উপর দিকটায় লেগে স্টাম্পটা বেঁকিয়ে দিল। আম্পায়ার বলল, যাঃ শালা।

~ www.amarboi.com ~

পারল না। পীযূষ একবার তাকাল গোপালের দিকে। তারপর ব্যাটটা একবার ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পরের ব্যাটসম্যান এসে গার্ড নিয়েছে। সহখেলোয়াড়দের অভিনন্দন থেকে মুক্ত হয়ে গোপাল হাল্কা মনে পরের বলটা ছাড়ল। আর-কোনো চাপ নেই। ব্যাটসম্যান পা বাড়াল খেলার জন্য। আরে! ফিরতি একটা লোপ্পা ক্যাচ তো গোপালের দিকেই আসছে! এ তো ভাবা যায় না। খপ করে ধরে ফেলল গোপাল। হ্যাটট্রিক, হ্যাটট্রিক আওয়াজ উঠল মাঠে। কারণ পরপর দু-বলে দু-উইকেট নিয়ে ফেলেছে গোপাল। হ্যাটট্রিক। এ কথা গোপাল কখনও স্বপ্নেও ভেবেছে নাকি, ঠাকুরের নাম করে আবার প্রাণপণ ছুড়ল গোপাল। ব্যাটসম্যান কিছু বোঝার আগে আবার স্টাম্প হেলে গেছে। এবার মিডল স্ট্যাম্প।

হ্যাটট্রিক। নিজের হাতকে বিশ্বাস করতে পারছে না গোপাল।

সেই হ্যাটট্রিক দিয়ে গোপালের জয়যাত্রা শুরু হল। সে ম্যাচ যদিও গোপালরা জেতেনি। কারণ ১৪৫ রান কভার করা যায়নি। কিন্তু গোপাল পরের ওভারে আর একটা উইকেট নিতেই অলআউট হয়ে গিয়েছিল ওরা। গোপাল চার রানে চার উইকেট, হ্যাটট্রিকসহ।

পরের ম্যাচে, গোপাল নিশ্চিন্তে থার্ডম্যানে হাঁটাচলা করছে, মাঝে মাঝে দৌড়ে চার বাঁচাচ্ছে, হঠাৎই দ্যাখে ক্যাপ্টেন হাত তুলে ডাকছে। প্রথমে গোপাল ভাবল নিশ্চয় থার্ডম্যান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও দেবে। না, তা নয়। কাছে যেতেই হাতে বলটা ধরিয়ে দিল। বিপক্ষ তখন ৫ উইকেটে ৫৮। রামনগর আন্দাজে স্কোর ভালোও না, খারাপও না। খেলা ১৫ ওভার হয়েছে। আরও ১০ ওভার আছে। ওই যে হ্যাটট্রিক হয়েছে, গোপাল বুঝেছিল ওটা আন্দাজে হয়েছে। ব্যাটসম্যান হিসাবেই সে দলে আসে। কিন্তু আজ আবার বল করতে হবে।

শুরু তো করল ওভার। প্রথম দুটো বলে দুটো চার। যেহেতু বোলিং করে না নেটে, তাই লেস্থের মা-বাবা নেই। শর্ট পড়েছে। মিডল স্টাম্পে। অফ স্পিন। সাঁ করে লেগ স্ট্যাম্পের পাশ দিয়ে বেরোবে। ছেলেটা ঠাঁই করে চালাল। পরেরটাও শর্ট। উঁচু করে মারল। স্কোয়্যার লেগ বাউন্ডারির আগে ড্রপ পড়ে চার। অভয়দা ছুটে এল, এ কী রে! শর্ট পিচ ফেলছিস কেন? ভারি আনতাবড়ি বোলার তো তুই! মুখে কিছু বলল না গোপাল। ভাবল, হবে না? নেটে একবারও বল করতে ডাকো? শর্ট পিচ তো পড়বেই।

পরের বলটাও শর্ট পড়ল। কিন্তু ঘুরল না। ছোঁড়াটার লোভ হয়ে গেছে। সপাটে পুল করল। পুলটা মিড উইকেটে ব্যাঙার হাত জমে গেল। যাঃ চ্চলে। ছেলেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি বলতে গোপালও বিশ্বাস করতে পারছে না। ক্যাপ্টেন এসে জড়িয়ে ধরল। নতুন ব্যাটসম্যান এসে গার্ড নিয়েছে। এইবার গোপাল প্রাণপণ ছুড়ল। অফে পড়ে দ্রুত ভেতরে এল বলটা। ছেলেটা পিছিয়ে পা জোড়া করতে করতেই প্যাডে খেল।

মুখ থেকে আপিল খসাতে না খসাতে হাত উঠে গেল আম্পায়ারের। আবার মাঠ জুড়ে হ্যাটট্রিক হ্যাটট্রিক ধ্বনি। সব ফিল্ডাররা ছুটে এল। গোপলা, রামনগরের কেউ পরপর দুটো খেলায় হ্যাটট্রিক করেনি। ভালো করে বলটা দে। ভালো করে দিতে গিয়ে উৎসাহের বশে ফুলটস ফেলল গোপাল। চার। গোপাল পাঁচ পা দৌড়ায়। তাই দৌড়াল।

~ www.amarboi.com ~

হে ভগবান। এটাও ফুলটস। ব্যাটসম্যান মিস করে বোল্ড।

হল কী! এক ওভারে তিনটে উইকেট!

পরপর দু-ম্যাচে?

নিয়মিত বোলার হয়ে গেল গোপাল। তিন ওভারের বেশি বল কখনও করে না। তিনটে করে উইকেট বাঁধা। রামনগরের সেরা অলরাউন্ডার হয়ে দাঁড়াল সে।

সব ঠিকঠাক চলছিল। এর মধ্যে টাইগার স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলা। তারা ২ উইকেটে ৫১ করার পর ক্যাপ্টেন গোপালকে ডাকল। গোপাল তার প্রথম ওভারে দু-উইকেট নিয়ে আবার থার্ডম্যানে ফিরে গেল। যাবার সময় দেখল বোলিং আম্পায়ার তার দিকে কেমনভাবে যেন তাকিয়ে আছে। হঠাৎ শোনে আম্পায়ার বলছে, খোকনা, তুই এদিকটা দাঁড়া তো। খোকনা মানে খোকন মজুমদার। নবীন ব্যায়ামের উইকেটকিপার। মাঝে মাঝে দরকার পড়লে আম্পায়ারিং করে দেয়। খোকন মজুমদার একটু অবাক হল। কিন্তু শশব্যস্তে বলল, যাচ্ছি নরেনদা।

এই লোকটি টুপি খুলে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে উলটোদিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ সে আবারও বোলিং ক্রিজের দিকে আম্পায়ার হবে। এবার তার লেগ আম্পায়ার হবার টার্ন। কিন্তু সে জায়গা বদলাবদলি করল। লোকটি চশমা পরা। কাঁচাপাকা চুল। পরের ওভার করছে ভেবুল। ভেবুলের ওভারে একটা চার আর একটা এক রান হল। কিন্তু ফিফথ বলে উইকেটও পড়ল। লাইনের ধারে ক্যাচ।

৫ উইকেটে ৫৭ তে নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে এল গোপাল। এসে সাত উইকেটে সাতান্ন করে দিল। ফিল্ডাররা জানে এমনই হয়। প্রথম বলটা অফস্ট্যাম্পের বাইরে পড়ে ব্যাটসম্যানকে এড়িয়ে সাঁই করে মিডল স্টিকে বেলের উপর দিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয়টা স্টাম্পের মধ্যে ব্যাটসম্যানের জোড়া পায়ে লেগে এলবি করল। তৃতীয়টা বোল্ড।

আবার হ্যাটট্রিক চান্স। বিরাট হইচই। ফিল্ডার ঘিরে ধরল। নতুন ছেলেটা বিরক্ত হয়ে বলল, এত মুখের কাছে আসছিস কেন। এক সিজনে একজন দুটো হ্যাটট্রিক করতে যাচ্ছে। উত্তেজনায় টানটান রামনগর হ্যাপি ক্লাব ময়দান। এই হ্যাপি ক্লাব কোনও টিম নামায় না। কিন্তু তারাই আয়োজন করে। এই যে আজকের নরেন আম্পায়ার। এই হ্যাপি ক্লাবের একজন কর্মকর্তা। ঠাকুরের নাম করে প্রাণপণ বল করল গোপাল।

নো-ও-ও!

সারা মাঠ হতবাক। কে ডাকল?

নরেন আম্পায়ার! লেগ থেকে ডেকেছে। বলটা ইতিমধ্যে ফরোয়ার্ড খেলা ব্যাটসম্যানের গ্লাভসে লেগে উঁচু ক্যাচ হয়ে উঠেছে। পড়ছে গোপালের সামনে। গোপাল হতভম্বভাবে ক্যাচ ধরল। কিন্তু আপিল করার কথা ভুলে গেল।

ক্যাপ্টেন এসে পিঠ চাপড়ে দিল।

গোপাল আবার বোলিং মার্কে। পরের বল।

নো-ও-ও।

~ www.amarboi.com ~

সে কী! এটাও নো!

আর-একটা নো ডাকলে তো আর বল করতে পারবে না!

ক্যাপ্টেন দু-তিন জন ফিল্ডার আর গোপালকে নিয়ে লেগ আম্পায়ারের কাছে গেল। কী হয়েছে নরেনদা!

চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাল নরেন আম্পায়ার। ছুড়ছে।

ক্যাপ্টেন বলল, মানে! আমাদের মেন স্ট্রাইক বোলার! কেউ তো বলেনি ছুড়ছে।

আমি বলছি। ছুড়ছে।

আর নো ডাকবেন না নরেনদা। তাহলে ও আর বল করতে পারবে না।

পারবে না। কিন্তু ছুড়ে বল কী করে অ্যালাউ করি? যা যা! খেলা শুরু কর।

কাঁপতে কাঁপতে তৃতীয় বলটা করল গোপাল।

আবার, নো-ও-ও।

আর ম্যাচে বল করতে পারল না গোপাল। এবং এতই মনে মনে ভেঙে পড়ল যে, ব্যাট হাতেও ৭ রানের বেশি হল না। গোপালরা হেরে গেল। খেলার শেষে মাঠে গোলমাল। প্রোটেস্ট করব! কেন নরেন আম্পায়ার জায়গা বদল করেছে? এটা বেআইনি। করলও প্রোটেস্ট। কিন্তু কোনও ফল হল না। কারণ সকলেই তখন বলাবলি করছে, কথাটা তো ঠিক। গোপাল তো ছোড়ে।

পরের ম্যাচে গোপালদের টিম মাঠে গিয়ে দ্যাখে সাদা টুপি হাতে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উইকেটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে নরেন আম্পায়ার।

আবার।

ক্যাপ্টেন অভয়দা সেদিন কিছুতেই আর গোপালকে দিয়ে বল করাতে পারল না।

কারণ, গোপালের তো রাতের ঘুম চলে গেছে।

চোখ বন্ধ করে ঘুমের চেষ্টা করতেই কানে আসে ওই নো-ও-ও ডাক।

ভোরের দিকে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দ্যাখে নরেন আম্পায়ার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। তখনই ঘুম ভেঙে যায়।

অভয়দা বলল, কিন্তু কিছুতেই বল করতে যেতে রাজি হল না গোপাল। বিপক্ষ দল ৮৭-তে অল আউট হল। গোপালরা জিতল। কিন্তু ব্যাটে গোপাল, তিন। পরের ম্যাচে গোপাল শূন্য। দু-বলে আউট। পরের ম্যাচে এক। তারপরের ম্যাচে আবার এক। সোজা সোজা ক্যাচ ফেলতে লাগল। কারণ কী? নরেন আম্পায়ার। প্রত্যেকটা ম্যাচে আম্পায়ারিং করছে নরেন আম্পায়ার। শোনা গিয়েছে যে তিনি কমিটিকে বলেছেন, এইভাবে ছুড়ে বল করা চলতে দেবে না! নরেনবাবুকে সবাই এত মানে যে সবাই গোপালদের কে ওয়াই সি-র খেলা পড়লেই নরেন আম্পায়ারকে খবর দিয়ে দেয়। কমিটির উপর বিরাট হাত নরেন আম্পায়ারের। গোপাল একদিন সাইকেল থেকে পড়ে গেল। পা কেটে একশা। কেন? না, সাইকেল করে আসার সময় দেখেছে নরেন আম্পায়ার বাজার করে ফিরছে। ম্যাচেও এক-এর বেশি রান করতে পারে না আর গোপাল, যে গোপাল প্রধানত ব্যাটসম্যান হিসেবেই টিমে আসে।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

শেষে, ফাইনালের আগে, অভয়দা আলাদা ডেকে বলল, গোপাল, তুই এই খেলাটায় বস। বিভূতিকে খেলাই।

গোপাল তখন কিছু বলে না। কিন্তু পরের বছর ক্লিয়ারেন্স নিয়ে যুবক সংঘে চলে চায়। এবং শর্ত করে নেয় বল করতে ডাকা হবে না তাকে। প্রথম ম্যাচেই কে ওয়াই সির এগেনস্টে ৭৬ করে। সেবার গোপালের জন্যই যুবক সংঘ ফাইনালে ওঠে। ফাইনালে উলটোদিকে বড়ো ক্লাব— কে ওয়াই সি। কে ওয়াই সি বোনাস পয়েন্ট নিয়ে একশো ছেচল্লিশ। তাও যুবক সংঘ জিতল। কারণ গোপাল ওয়ান ডাউন নেমে রান কভার পর্যন্ত রইল। ৯৪ নট আউট। সেবার যুবক সংঘ চ্যাম্পিয়ন।

ওয়েল প্লেড বলতে আসা অভয়দাকে বলেছিল গোপাল সেদিন— আমি বোলার নই অভয়দা। আমাকে দিয়ে বল করানোটা তোমাদের ঠিক কাজ হয়নি। তার পরের দু-বছর যুবক সংঘ যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন আর রানার্স হওয়ার পর গোপাল যুবক সংঘ ছেড়ে দেয়। নতুন ছেলেদের নিয়ে তৈরি টিম খেলোয়াড়-এ যায়। সেখানে সেই সবচেয়ে সিনিয়ার। কেউ ডাকলে তাদের টিমের হয়ে একদিন খেলে দেয়। তবে নবীন ব্যায়াম থেকে ব্যাঁকা পটলরা কখনও ডাকেনি। এই প্রথম ওরা ডাকল।

দুই

পরের বছরও কয়েকটা ম্যাচে, যুবক সংঘের হয়ে খেলার সময়, নরেন আম্পায়ার আসতে শুরু করেছিল। কিন্তু, তখন, নরেন আম্পায়ারও বুঝেছে অন্য সকলেও বুঝেছে, গোপাল আর বল করবে না। নরেন আম্পায়ারের সামনে গোপাল ৮৬ করেছিল। যখন তারা জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, তখন গোপাল, যুবক সংঘের একটা নতুন ছেলেকে বলল, "আমি লাস্ট বলে রান নেব না। স্কোরিং কোনও শটই নেব না। তুই-ই পরের ওভারে উইনিং স্কোরটা কর বুদো।" দ্যাখে, একথা শুনে, নরেন আম্পায়ার চশমার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখছে। গোপাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে, অন্যদিকে তাকিয়েছিল।

নরেন আম্পায়ার ইদানীং কী সব কারণে যেন আম্পায়ারিং ছেড়ে দিয়েছে বলে শোনা যায়। যদিও হ্যাপি ক্লাবে কর্মকর্তা হিসেবে এখনও আসে। কিন্তু সকালে উঠে নামটা শুনেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে গোপালের। যাই হোক, মনে মনে তৈরি হতে শুরু করল গোপাল।

ম্যাচের সময় দীপু দাস বলে ছেলেটাকে দেখল গোপাল। ২ উইকেটে ২১-এ ক্রিজে এসেছে। হাসতে হাসতে রান করছে। যেন খেলাটা কিছুই না। কিছুক্ষণের মধ্যে ৪০ করল।

উলটোদিকে সব মিলিয়ে ৫টা পড়েছে। রান ৭৫ মতো। ক্যাপ্টেন পুঁটে, বারবার করে ডাকছে গোপালকে বল করতে, গোপাল যাচ্ছে না। না, বল করব না। একসময় পুঁটে ব্যাঙা এরা ঘিরে ধরল গোপালকে। গোপলা, ছোকরা একের পর একরান করে যাবে, তুই দাঁড়িয়ে দেখবি? প্র্যাকটিসেও একদিন এসে বল করলি না। শেষমেশ গোপাল যখন বল করতে গেল তখন দীপু দাস ৫৩। গোপাল বলটা হাতে নিয়ে বোলিং ক্রিজে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

~ www.amarboi.com ~

তারপর সবাই অবাক হয়ে দেখল গোপাল এক পা-ও না ছুটে, ক্রিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানের পাশ দিয়ে হাতটা ঘুরিয়ে এনে অদ্ভুতভাবে একটা ডেলিভারি করল। বলটা ওর হাত থেকে বেরিয়ে খুব আস্তে, প্রায় বাচ্চাদের করা বলের মতো একটা ড্রপ খেয়ে মন্থরভাবে ব্যাটম্যানের সামনে এল। দীপু দাস একেবারেই সেট হয়ে গেছে। কিন্তু, এমন একটা বল দেখে এতটা হকচকিয়ে গেল কী করবে যেন ঠিক করতে পারল না। প্রথমটা একটু দোনামনা করে তারপর জোরে মারতে গেল। ঠিকমতো ব্যাটের মাঝখানে লাগল না। কানায় লেগে উঠে গেল। সহজক্যাচ। সবাই গোপালকে ঘিরে ধরেছে। দীপু দাস ফিরে যাচ্ছে। খুব অদ্ভুতভাবে গোপালদের দিকে তাকাল একবার। পরের ব্যাটসম্যান যে এল সে গোপালের পূর্বখ্যাতির কথা শুনেছে। গোপালের পরের বলটাও ওইরকম মন্থর গতিতে আসতে দেখে সে ঝুঁকি নিল না। ব্লক করল। তার পরই সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। পরের ওইরকম দুটো মন্থর বলে দুটো চার। চারটে বল হয়ে গেছে ওভারের। কিন্তু গোপালকে তার চেনা ভঙ্গিতে বল করতে দেখা যাচ্ছে না। একটা উইকেট এসেছে কপালজোরে, কিন্তু এমন বল করলে যে মার খেতেই হবে সবাই বোঝে। আবার ব্যাঙা পুঁটে এরা ছুটে গেল। কী করছিস গোপাল। ঠিক করে বল কর। যেমন বল করতিস তেমন কর।

গোপাল বলে, ভুলে গেছি।

মানে?

ওইভাবে বল করতে ভুলে গেছি। অনেকদিন করিনি তো।

পুঁটে ফিল্ডিং ছড়িয়ে দিতে লাগল। বাকি দুটো বলে একটায় দু-রান হল। আর একটা ফিল্ডারের হাতে গেল সরাসরি।

একশো পাঁচ রানে নেমে গেল কে ওয়াই সি। সবাই দোষ দিচ্ছে গোপালকে। প্রথমে তো বল করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। তারপর এমন বল করতে লাগল এক ওভারের বেশি বল দেবার সাহসই পাওয়া গেল না। নবীন ব্যায়াম নামল। প্রথম বলেই ওপেনার বুলু কট বিহাইন্ড।

প্যাডে লেগেছে, প্যাডে লেগেছে বলে ক্রিজের দিকে যেতে থাকা ওয়ান ডাউন পুঁটের কাছে অভিযোগ জানাতে জানাতে মাঠ ছাড়ল বুলু। পুঁটে ফিফথ বলে কাট করে থার্ডম্যান দিয়ে একটা চার পেল। সিক্সথ বলে স্লিপের হাতে ক্যাচ দিয়ে বাঁচল। পরের ওভারের সেকেন্ড বলে অপর ওপেনার কানু একইভাবে স্লিপে দিল। কিন্তু বাঁচল না। দু-উইকেটে চার। গোপালের টু ডাউন যাবার কথা। সেরকমই কথা হয়েছিল ব্যাঁকা আর পটলের সঙ্গে। প্যাড পরে বেঞ্চে বসে বসে দেখল গোপাল ব্যাঙা নেমে যাচ্ছে টু ডাউনে। গোপালকে কেউ কিছু বলল না। ব্যাঙা প্রথম বলটা মাথা নিচু করে ব্লক করল। ব্যাঙার ডিফেন্স ভালো সবাই জানে। এই হ্যাপি ক্লাবের মাঠে একটা বড়ো ক্লাব হাউস আছে। সদস্যরা এটাকে ক্লাবহাউস বলেই ডাকে। পাকাবাড়ি একতলা। দুটো ঘর। একটা বড়ো বারান্দা। বারান্দার দেয়ালে একটা ইস্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড ঝোলানো পেরেক দিয়ে। সেখানে চকখড়ি দিয়ে স্কোর লেখা হয়। নীচে ছোটো ছোটো বেঞ্চি দিয়ে মাচা মতো করা। স্কোরার সেখানে বসে। গোপালরা বসেছিল মাঠের

~ www.amarboi.com ~

উলটোদিকে দু-তিনটে ঝাঁকড়া মাথা গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যেখানে একটা ছায়ার ক্লাবহাউস তৈরি করেছে সেখানে। ব্যাঙা দ্বিতীয় বলটাও ব্লক করল নিখুঁতভাবে। গোপাল বেঞ্চি থেকে উঠে একটা জলের বোতলের খোঁজ করতে গেল। একটা আওয়াজ উঠল মাঠে। গোপাল ঘাড় ঘুরিয়ে দ্যাখে ব্যাঙার উইকেট ভাঙা। ব্যাঙা ফিরে আসছে। অ্যাই গোপলা। গোপাল কই; গোপাল? রব উঠল। পটলা ছুটে এল। ব্যাঁকা বলল, কী খুঁজছিস? জল খাওয়ার কথাটা ভুলে গেল গোপলা। মাঠে নেমে পপিং ক্রিজের দিকে যেতে যেতে স্কোরবোর্ড-এর দিকে তাকাল। ৩ উইকেটে ৪। ১০৬ করতে হবে। ওভারের লাস্ট বলে আউট হয়েছে ব্যাঙা। নন-স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে হাতের গ্লাভস দুটো অভ্যাসবশত টানতে টানতে গোপলা দেখল স্লিপে আবার খোঁচা লাগিয়ে কীভাবে একটা চার পেল পুঁটে।

পুঁটের ওই দ্বিতীয় ক্যাচ ছাড়াটাই কাল হয়ে দাঁড়াল কে ওয়াই সির কাছে।

পুঁটে এরপর ঠুকঠাক করে জমে গেল। আর গোপাল দীপু দাসের জন্য খেলতে শুরু করল। থার্ডম্যান থেকে কভার পয়েন্ট পর্যন্ত এলাকাটায়। বোলারদের চুটিয়ে মারতে লাগল গোপাল।

যখন ওয়াটার হল, নবীন ব্যায়াম ৩ উইকেটে ৭১। পুঁটে ১৯, গোপাল ৪৭ একস্ট্রা ৪। এই সময় দেখা গেল দীপু দাসকে ডেকে এনে কে ওয়াই সির ক্যাপ্টেন কী যেন বলছে। আর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় দীপু দাস না না করছে। যা হোক সবাই দেখল দীপু বল হাতে নিয়ে বোলিং ক্রিজে এসে দাঁড়িয়ে পা মাপছে। গোপাল পুঁটেকে জিজ্ঞাসা করল, এ বোলিংও করে নাকি? কী জানি কখনও তো দেখিনি। পুঁটেকেই বল করবে দীপু। করল। পুঁটে মিস করল। উইকেটকিপার মিস করল। ফাইন লেগ দৌড়ে এসে বল ধরে ফেরত দিল। বাই হতে পারত। দুই ব্যাটসম্যানই নিতে ভুলে গেল। তারা এত হতবাক! পুঁটে দ্বিতীয় বলটার জন্য ব্যাট ধরে দাঁড়াল। আবার মিস করল। মিস করে বলল, এ কী রে! এবার অবশ্য উইকেটকিপার ধরেছে। তৃতীয় বলটা ব্যাটে লাগাতে পারল না। বোল্ড। মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছে পুঁটে। শিবু এল। একটা বলের জন্য। এল বি। এবার যে এল তাকে চেনে না গোপাল। কিন্তু হ্যাটট্রিকের সুযোগ। কর্ডন করে ঘিরে দিয়েছে ছেলেটাকে। ছেলেটা ব্যাট পাতল। ফরোয়ার্ড শর্ট লেগের হাতে। হ্যা-ট-ট্রিক। সারা মাঠ হইহইতে ভেসে যাচ্ছে। গোপাল স্তব্ধ। পুঁটে যে কেন 'এ কী রে' বলেছিল এখন বোঝা যাচ্ছে। এ তো হুবহু দ্বিতীয় গোপাল। ওইরকম ছুড়ে বল। দীপু দাস নিজেও যে ভাবতে পারেনি এসব ঘটবে, সেটা দীপু দাসকে দেখেও বেশ ধরা যাচ্ছে।

আর একটা বল বাকি আছে ওভারে। গোপাল ভাবল, এ বলেও না উইকেট যায়। গেল না। দীপু দাসের তো আর বল করা অভ্যাস নেই। গোপালের যেমন ছিল না। বিচ্ছিরি একটা শর্ট ফেলল। নতুন ব্যাটসম্যান মরিয়া হয়ে চালিয়ে দিতেই চার। চার তো হবেই। প্রেশার তৈরি করতে ওদের ক্যাপ্টেন ক্লোজইন ফিল্ডার দিয়েই ঘিরে দিয়েছে তো।

৬ উইকেটে ৭৫।

পরের ওভারে গোপাল একটা চার নিল। কভারে। লেগে ঘুরিয়ে একটা দুই নিল। সিঙ্গলস-এর চেষ্টা করেও পেল না। হাতে বল পড়ল ফিল্ডারের। ইতিমধ্যে গোপালের ৫০ হয়ে গেছে। মাঠে হাততালি পড়েছে। আবার দীপু দাসের ওভার শুরু হয়েছে। দীপু দাস এই

~ www.amarboi.com ~

ওভারে কোনও রান না দিয়ে দুটো উইকেট পেল। যেমন গোপাল পেত। বল প্রাণপণ ছুড়ছে। আর পিছলে ঢুকে পড়ছে বলটা। পিচে পড়ার পর এত ফাস্ট আসছে ব্যাটসম্যান উইকেট জমা দিয়ে দিচ্ছে। একটাই বাঁচোয়া লেনথের ঠিক নেই। এই ওভারেও দুটো লুজ ফেলেছে। কিন্তু এত সিঁটিয়ে ছিল ব্যাটসম্যানরা যে মারতে পারেনি।

গোপাল স্কোর-বোর্ড দিকে তাকাল। ৮ উইকেটে ৮৩। জয়ের গন্ধ পেয়ে গেছে কে ওয়াই সি। একটু আগে যখন ব্যাট করছিল গোপাল আর পুঁটে তখন একটু একটু করে হালছাড়া ভাব দেখা দিচ্ছিল ফিল্ডারদের মধ্যে। এই ভাবটা দেখতে বেশ লাগে গোপালের। গোপাল ক্রিজে দাঁড়িয়ে দু-তিনবার ব্যাটের ডগাটা মাটিতে ছোঁয়ায় আর তুলে নেয়। এখন সেটাই করছে। করতে করতে ভাবছে এবার কী করা দরকার।

বল করছে সাধন। ভালো লেন্থ। জোর আছে। থাকলেই বা। সাধনকে এক ওভারে তিনটে চার নিল গোপাল। ফিফথ বলে একটা সিঙ্গলস। স্কোরবোর্ডে তাকাল। ৯৬। যাক আর ১০ রান। হয়ে যাবে। হাতে এখনও দুটো উইকেট।

দুটো না। একটা। লাস্টবলে সাধন একটা উইকেট তুলে নিয়েছে।

কে আসছে? ব্যাঙার ভাই চম্পে। নবীন ব্যায়ামের ওপেনিং বোলার। দুরকম সুইং আছে হাতে। ডিস্ট্রিক্ট খেলেছে। কিন্তু ব্যাটে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে নাম করতে হয়। যাক চম্পেকে স্ট্রাইক নিতে হবে না। স্ট্রাইক নেবে গোপাল। দীপু দাসের বিরুদ্ধে। দীপু দাস যার হিসেব হল এখন পর্যন্ত ২ ওভার ১টা মেডেন ৪ রান ৫ উইকেট। ভেতরটা শিরশির করে উঠল গোপালের। ছুড়ে বল করে কত ব্যাটসম্যানকে আউট করেছে। ওইরকম ছুড়ে বল কী করে খেলতে হয় তা কি গোপাল জানে?

গোপাল ঠিক করল আনপ্লেয়েবল বলগুলো প্রাণপণ ডিফেন্স করে আটকাবে। আর লুজ তো ফেলবেই কারণ রেগুলোর বোলার নয়। সেগুলো মেরে রান করবে। ওভার তো আছেই হাতে। কিন্তু তাই বা কী করে হবে? উলটোদিকে তো চম্পে। যা আছে ভাগ্যে হবে, ভেবে প্রথম বলটার জন্য রেডি হল গোপাল।

পিছলে পড়ে ঢুকে এল যেন। গোপাল ব্লক করল। ঠক করে যে আওয়াজটা উঠল, তাকে গোপালের ট্রেনার ভৃগুদা বলেন, নিখুঁত আওয়াজ। এই আওয়াজ চিনতে ভৃগুদাই শিখিয়েছিলেন গোপালকে। আওয়াজটা নিজের ব্যাট থেকে দু-চারবার কানে গেলেই মনটা ভালো হয়ে ওঠে। পরের বলটা গোপাল পা বাড়াল। দেখতে পেল না। সারা মাঠে একটা আঃ হা আ আওয়াজ উঠল। গোপাল খুব ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের উইকেটের দিকে তাকাল।

বেল দুটো অক্ষত। উইকেটকিপার বিভূতি বলল, যেতিস। বেলে হাওয়া লাগিয়ে চলে গেল।

গোপাল ভাবল, এখনও চারটে বল। মাথায় চড়ে বসতে শুরু করেছে দীপু দাস। ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। এইরকম ভয় অন্যদের একসময় পাইয়েছে গোপাল।

দীপু পরের বলটা দিতে তৈরি হয়েছে। হাত তুলে তাকে থামাল গোপাল। আম্পায়ারের কাছে নতুন করে গার্ড চাইল। অফ স্টিকটা দিন লেবুদা। আম্পায়ার লেবু মিত্তির অবাক। অফ মিড চাইছ তো?

~ www.amarboi.com ~

না লেবুদা, অফস্টাম্পটাই চাইছি।

গোপাল নামকরা ব্যাটসম্যান এই রামনগর অঞ্চলে সে লেগ মিডের গার্ড নিয়ে ব্যাট করে একথা এখানকার সব আম্পায়ারেরই জানা। সেখানে মাক্সিমাম অফ মিড নিক একদিন। তাই বলে অফ স্টিক-এর উপর গার্ড?

লেবু মিত্তির বললেন, দিচ্ছি, তবে লেগ স্ট্যাম্পটা কিন্তু ছাড়া থাকবে তোমার।

থাক। বলে গার্ড নিয়ে দাঁড়াল গোপাল।

গার্ড নেবার সময় দীপু দাসকে আর-একটু বুদ্ধিমান ভেবেছিল গোপাল। কিন্তু দীপুর বল লেগ মিডে পিচ পড়ে সাঁ করে পিছলে লেগস্টাম্পের বাইরে দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রায় শুয়ে পড়ে সুইপ করল গোপাল। চার। নাঃ, ছেলেটা বোকাই আছে। ফাঁকা লেগস্ট্যাম্প দেখে আর একটা চার খেয়ে আবারও লেগ স্টিকে টিপ করল। গোপাল দেখেশুনে ব্যাটটা শুধু ছোঁয়াল। আবার চার। পিচ না পড়লে দীপু দাস-এর একস্ট্রা গতিটা আসে না। এটা ফুলটস হয়ে গেছে। মাঠ আবার ঝলমল করছে। খেলা যে-কোনো দিকে ঘুরতে পারে।

দীপু দাস কি এবার বুদ্ধি ফিরে পেয়েছে! অফ-এর ওপর ফেলেছে বল। সোজা এল, ঘুরল না। ব্লক করল গোপাল। পরের বলটায় আবার লোভে পড়ল দীপু দাস। লেগ স্ট্যাম্প নিশানা করল কিন্তু লেন্থ ঠিক রইল না। স্কোয়ার লেগ আর মিড উইকেটের মাঝামাঝি জায়গায় ঠেলে দৌড়ল গোপাল। একটা রান শেষ করে বলল ছোট্ট চম্পে, হা-রাম-জা-দা। চম্পে দ্বিতীয় রানটা ভাবেনি। কিন্তু আপ্রাণ দৌড়ে শেষ করে ফেলল রানটা। যেটা ওদের ১০৬তম রান।

সবাই মাঠ ঢুকে গোপালকে কাঁধে তুলে নিল। পুঁটে বলল, কী গার্ডটাই নিলি মাইরি।

সেদিন সন্ধেবেলা, নেতাজি কলোনির মোড়ে সাইকেল থেকে নেমে গোপালকে একটা গলির ভেতরে যেতে দেখা গেল। গলিটার নাম দুর্গা গলি। একটা মুদি দোকানে কিছু জিজ্ঞেস করল গোপাল। দোকানি বলল, হলদে দোতলা বাড়িটা।

বেল টিপতে একজন পাজামা আর গেঞ্জিপরা লোক এসে দরজা খুলল। কী ব্যাপার।

গোপাল বলল, আমার নাম গোপাল।

লোকটি বলল, হ্যাঁ, চিনি তো তোমাকে।

গোপাল বলল, আমি আপনার কাছে এসেছি।

লোকটি বলল, ভেতরে এসো।

না, ভেতরে যাব না। এখানেই বলি।

বলো।

আপনাকে আবার আম্পায়ারিং করতে মাঠে যেতে হবে নরেন দা। আপনি তাড়াতাড়ি আবার আম্পায়ারিং-এ আসুন। নইলে আসল বোলারদের আর দাম থাকবে না।

খেলার দুনিয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

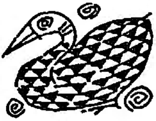

পাখির ডাক

সুজয় চমকে উঠল! আবিব্বাস। কী পাখির ডাক রে এটা? গম্ভীর, হেঁড়ে গলায় ডাকছে 'অ্যায় সুজ্যায়। সু-জ্যায়, সুজ্যায়! অ্যায়! অ্যায়!'

একেবারে নাম ধরে ডাকছে? সুজয় ওপর দিকে তাকাল। লম্বা লম্বা দুটো তিনটে চারটে গাছ। গাছের মাথায় ধোঁয়া ধোঁয়া একরকম আলো— সূর্য পশ্চিমে পুরোটা নেমে যাবার পরেই যেমন আলো হয় আর কি! তার মধ্যে ছায়া ছায়া পাখিরা উড়ছে। গাছেদের ঝাঁকড়া মাথাগুলোর মধ্যে ডুবে যাচ্ছে পাখিরা। আবার মাথা ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ছে কেউ কেউ। নামছে ঠিক পাশের গাছটায়।

গাছের নিচে পিচ বাঁধানো সরু রাস্তা। রাস্তার পাশে ছোট্ট জলাশয়। মধ্যে ফোয়ারা উঠে জল ছুড়ছে। আলো জ্বলে উঠেছে ফোয়ারার পাশে— তাই জল এবার রঙিন হয়ে উঠবে। জলের ধারে ধারে দুটো তিনটে চারটে বেঞ্চ পাতা। তাতে দুজন দুজন করে ছেলে মেয়ে বসে আছে। তাদের পাশ দিয়েসাদা ধবধবে পোশাক পরা তিন-চারজন নার্সের ছোট ছোট দল, পরির মতো খুট খুট চলে আসছে। একটা গাড়ি গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে পিচ রাস্তা ধরে চলে গেল। মাথার ওপর সে-সময় ঝমঝম, একটা গুঞ্জনের মতো পাখিদের আওয়াজ। সুজয় মুখ নামিয়ে আবার ফিরতি পথে হাঁটা শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ডাক। গম্ভীর গলায়, ধমক দিচ্ছে। কাকে? সুজয়কেই নিশ্চয়। অ্যায়, সুজ্যায়! সুজ্যায়! সুজ্যায়! অ্যায়!

ওপরে তাকাল সুজয়। ওপরে তখন অন্ধকারের ঠিক দু এক ধাপ আগের অবস্থা। আর ছায়া ছায়া উড়তে থাকা পাখিদের মধ্যে কে যে সুজয়কে ধমক দেওয়া পাখি, তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাগাতার ধমক শুনতে শুনতে হাসপাতালের বড়গেটের দিকে এগোতে এগোতে ভাবল সুজয়, জিৎকে ব্যাপারটা বলতে হবে। কালকেই।

জিৎ সুজয়ের একটা টেবিল পরে বসে। সকালে, জিৎ অফিসে ঢুকে নিজের জায়গায় বসতে গিয়ে দেখে, টেবিলের সামনে সুজয় দাঁড়িয়ে। কী ব্যাপার সুজয়দা, কিছু বলবে?

জিৎ শ্যামনগর থেকে আসে। ট্রেন বাসের ধকল সামলে।

সুজয় বলে, বলব। এখন একটু বসে নাও। জলটল খাও।

জিৎ বলে, না, বলো না। কোনও সিরিয়াস ব্যাপার নয় তো!

সুজয় বলে, না না। গতকাল আমার এক অসুস্থ রিলেটিভকে দেখতে পি. জি. হসপিটালে গিয়েছিলাম।

জিৎ বলে, অসুস্থ? রক্ত টক্ত দিতে হবে? ব্লাড গ্রুপ কী?

সুজয় হাসে। না না। ওসব কিছু নয়।

জিৎ রক্ত দিতে ভালবাসে। তাছাড়া মরা পোড়াতেও। কারও কোনও প্রয়োজন হলে, হাসপাতালে ঠিক করতে, অ্যাডমিশন করাতে— জিৎকে ধরে সবাই। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করে জিৎ। নিজের ব্লাডগ্রুপ না মিললে, ঠিক লোক ধরে রক্ত জোগাড় করে ফেলবে।

সুজয় বলল, না না, ভাল আছে। আমার রিলেটিভ ভাল আছে। আসলে একটা পাখি, বুঝলে জিৎ। একটা পাখি। ডাকল।

তাই নাকি।

চোখমুখ ঝকঝক করে উঠল জিৎ-এর। পাখি হল জিৎ-এর নেশা। পাখি দেখার জন্য জিৎ অনেক কিছু করতে পারে। জিৎ কষ্ট করে ছুটি জমিয়ে রাখে শীতকালে পাখি দেখতে যাবে বলে। অফিস থেকে ১৫ দিনের ছুটি নিয়ে চলে যায় এ জঙ্গল সে জঙ্গলে। বাইনাকুলার হাতে নিয়ে দূরদূরান্তে এই ঝিল ওই সায়র সেই পুষ্করিণীর ধারে ধারে দৌড়ে বেড়ায়। পিঠের ব্যাগে তাঁবু বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কুণাল বলে এক বন্ধুও জুটিয়েছে। সারা রাত জেগে বসে থাকে দুজনে, বিরল পাখির ডাক শুনবে বলে। টেপে রেকর্ড করে এনে সেই ডাক জমিয়ে জমিয়ে বাড়িতে আর্কাইভ করে ফেলেছে প্রায়। জিৎ-এর বাড়ির লোকের নাকি পাগল হতে বেশি বাকি নেই।

জিৎ বলল, কী বললে, ডাকল? কী পাখি!

সুজয় বলল, সেটাই তো তোমার কাছে জানতে চাই।

জিৎ তার টেবিলের ওপর হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ায়। খুব গোপন কথা জানবার মতো করে বলে, ডাকটা কেমন? ডাকটা? একটু শোনাও তো।

সুজয় হতভম্ব— আরে, এ কি গানের কলি নাকি, যে শোনাব। তাছাড়া শোনাতে পারবই বা কী করে!

জিৎ নাছোড়— আরে করো না। একবার দুবার করো। আমি দেখি কেমন ডাকটা।

সুজয় বলে, গম্ভীর, গম্ভীর ডাক। যেন ধমক দিয়ে।

~ www.amarboi.com ~

জিৎ-এর চোখ চকচক করে ওঠে—তাই নাকি? গম্ভীর গম্ভীর? অ্যাঁ? ধমক দিচ্ছে? বাঃ। করো তো একটু।

সুজয় বলে, আবার বলে করো। একি করা যায় নাকি? তবে এইটুকু তোমাকে বলতে পারি, পাখিটা ডাকছিল, সুজয় বলে।

জিৎ-রে ভুরু কুঁচকে যায়। সু-জ-য় বলে? সে কি?

খুবই সমস্যায় পড়ে যায় অভিজিৎ?— বলে— একবার, একবার একটু করো। করে দেখাও ডাকটা!

এদিক ওদিক তাকায় সুজয়। বলে, এখানে?

বড়বাবু এসে গেছে। অন্য টেবিলেও লোকজন এসে পড়েছে। রাসবিহারী গেলাসে গেলাসে চা নিয়ে আসছে।

সুজয়ের হাত ধরে বলল, এসো, বাইরে এসো। বাইরে। বারান্দায়।

দ্রুত এগোলেন জিৎ। টেবিলের ধার, টেবিলের ফাঁক দিয়ে, মস্ত হলঘর পেরিয়ে, পাশের ডিপার্টমেন্টের ফাঁক গলে করিডোরে পড়ল। আরও জোরে চলছে জিৎ। পিছনে সুজয়। জিৎ-এর অত ব্যস্তসমস্ত প্রায়-দৌড় দেখে সবাই কৌতূহলে তাকাচ্ছে। জিৎ-এর ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছ এত হন্তদন্ত হয়ে। জিৎ বলল, বাইরে। বাইরে।

জিৎ-এর ভ্রূ কুঞ্চিত। আর চিন্তান্বিত মুখে এক কলি গান গেয়ে চলেছে সে : এসো এসো বাইরে এসো, ভয় কোরো না, ভয় কোরো না, ভয়—হ্যাঁ। এই যে। এবার বলো সুজয়দা।

বারান্দাটা পাঁচতলার। নিচে গাড়ি রাস্তা মানুষজন দেখা যায়।

সুজয় বলল, কী বলব!

আরে, পাখিটা কী রকম করে ডাকল, সেটা বলবে তো!

সুজয় কী আর করবে, চাপা গলায়, হাতটা মুখে আড়াল করে যথাসাধ্য ডাকল— অ্যায়, সুজ্যায়। অ্যায়। সু-জ্যায়। সু-জ্যায়। অ্যায়!

জিৎ-এর ভুরু আরও কুঁচকে উঠল। দাঁড়াও, সুজয়দা। এক মিনিটের ভেতর আসছি। তুমি কিন্তু যেও না।

সুজয় বলল, কোথায় যাচ্ছ?

—অ্যাকাউন্টসে। শুভকে ডেকে আনছি। এক মিনিট।

একটু পরে বড় মাথা শুভকে আসতে দেখা গেল করিডোর দিয়ে। ইতিমধ্যেই জিৎ ব্যাপারটা বলে থাকবে। শুভর মুখও খুব সিরিয়াস।

এমনিতে শুভ সাপ পোষে। পেঁচা পোষে। বাড়িতে হরেক রকমের পেঁচা। বেজি। পেঁচাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে শুভর এমন হয়েছে, সুজয়ের মাঝে মাঝে নানারকম মনে হয়। একদিন মনে হয় শুভর দৃষ্টি যেন পেঁচার মতো গোল। এক-একদিন মনে হয়, শুভ যেন টেবিলে বসে কাজ করছে না। বরং ধানের গোলায় বসে আছে। সে-সবসময়ে দ্বিজেন মুখার্জির পুরনো গান গাইতে থাকে সুজয়—হয়তো বসবে ধানের গোলায় লক্ষ্মীপেঁচাটি এসে! শুভ এমন দ্রুত

~ www.amarboi.com ~

পায়ে এগিয়ে এসে বারান্দার এককোণে টেনে নিয়ে গেল সুজয়কে,বলল, করো তো, করো তো! আরেকবার করো!

সুজয় আবার শুরু করল, অ্যায়! সু-জ্যায়! অ্যায়!

করিডোর দিয়ে যাওয়া-আসা করা লোকেরা দেখল, তিনজন লোক গভীর মনোযোগ দিয়ে, চাপা গলায়, কিছু একটা আলোচনা করছে। নিশ্চয়ই খুব সিরিয়াস কিছু। মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুজয়, আর সুজয়ের মুখের দু-পাশে কান লাগিয়ে দুজন— জিৎ আর শুভ্র। সুজয় এক একবার চাপা গলায় ওই ডাক ডাকছে—আর সঙ্গে সঙ্গে জিৎ আর শুভ দুজনের মুখই দ্বিগুণ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, অনুমান করার চেষ্টায়। শুভ চিন্তিত ভাবে বলছে, আর একবার ডাকো তো! আর একবার। সুজয় ডাকছে।

শুভ বলছে, হুঁ-উ। মনে হচ্ছে গুঁই শালিখ।

জিৎ একমত হতে গিয়েও পারছে না গুঁ-ই শালিখ? মনে হচ্ছে না তো! আরও, আর একবার করো!

সুজয় আর একবার করছে। জিৎ বলছে, আচ্-ছা! হাঁড়িচাচা নয়তো!

শুভ বলছে—হাঁড়িচাচা কী করে হবে? অজয় হোমের বইটা দেখতে হবে বাড়ি গিয়ে।

জিৎ বলছে, শোনো শুভ, সালিম আলি কী বলেছেন সেটা শোনো...

এই সময় মুরারী এসে বলল, আপনারা এখানে। অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি সাহেব মিটিং করবেন। বড়বাবু আপনাদের খুঁজছেন।

সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেল। ব্যাপারটার কিছুই মীমাংসা হল না।

দুই

দু দিন পরে, ছুটির বেশ কিছুক্ষণ আগে, খাতাপত্রের মধ্যে ডুবে থাকা জিৎ-এর ঘাড়ের কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল সুজয়—যাবে নাকি আমার সঙ্গে, এন ডি-তে?

জিৎ চমক ভেঙে বলল, অ্যাঁ! কোথায়?

সুজয় বলল, ওই ডাকটা? শুনতে যাবে?

জিৎ বলল, ডাকটা? আচ্ছা। তুমি ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়েছ।

সুজয় বলে, গোছাব।

জিৎ কলম বন্ধ করে খাতাপত্র গোছাতে গোছাতে বলে, আমি আসছি।

শুভ একটা কাঠের পার্টিশনের পাশে বসে কম্পিউটরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সুজয় পার্টিশনের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে পিছন থেকে চমকে দিল শুভকে—যাবে? শুভ?

শুভ বলে, কো-কোথায় যাব আবার?

—সেই ডাকটা শুনতে? যাবে?

শুভ কম্পিউটরের দিকে চোখ দ্রুত ফিরিয়ে বলল, দাঁড়ান, এটাকে শেষ করি আগে। একটা ছোট জিনিস লোড করতে হবে।

—কাল করলে হবে না?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুভ বলে—দেখছি। তুমি ডিপার্টমেন্টে থাকো। আমি যাচ্ছি।

সঞ্জীব নতুন ঢুকেছে। একমাস হয়েছে সবে। ফিল্টার ট্যাপ থেকে জল ভরছিল বোতলে। পিঠে টোকা দিল সুজয়। কী বলছেন সুজয়দা?

পাখির ডাক। শুনতে যাচ্ছে সবাই। তুমি যাবে না?

—পাখির ডাক? একটা ফাইল ছাড়তে হবে আজকে। আচ্ছা। সকালে এসে ছাড়ব।

দলবেঁধে লিফট থেকে বেরোল চারজন, দেখা গেল, দেবুদা আগেই বেরিয়ে পড়েছেন—সিঁড়ির ধার থেকে পান কিনে মুখে পুরতে পুরতে বললেন, কী, সেই পাখির ডাক! এখনও ফয়সালা হয়নি! না। চলো তো! সুজয়টা তোমাদের কী ভোগা দিচ্ছে দেখে আসি।

সদলবলে পাঁচজনে চলেছে অফিসের সামনের রাস্তা ধরে। যেন শোভাযাত্রা। রাস্তার দুপাশের চা সিগারেটের দোকান থেকে তাকিয়ে দেখছে সবাই।

পাঁচজন পাঁচরকম চেহারা। সুজয় রোগা, পাঞ্জাবি আর প্যান্ট। মাথার চুল পাতলা, কাঁচাপাকা দাঁড়ি। জিৎ লম্বাচওড়া। কুচকুচে মোটা গোঁফ। সেনাবহিনীর জওয়ানদের মতো হাঁটাচলা। ব্যাগটা বুকের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে।

শুভ বড় বড় গোল চোখ। বুরুশের মতো খোঁচা খোঁচা ঘন চুল মাথায়। তার ঘন কৃষ্ণবর্ণ ত্বক থেকে এক ধরনের ঝকঝকে বিকিরণ হয় সর্বদা।

দেবুদা ধুতিপাঞ্জাবি পরেন। মাথায় খাটো, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সবই প্রায় সাদা। আর সঞ্জীব জিনস আর টি-শার্ট। চোখে পুরু চশমা। এই মিছিলটা চলেছে এমনই চনমনে স্পিডে, যে, সকলেই ভাবছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। দারুণ একটা কিছু।

দোলের সাতদিন আগের ঝকঝক করছে বিকেলের রাস্তা। রাস্তার পাশের বাড়িঘর। পাঁচজনে হইহই করে বড় রাস্তায় পৌঁছতেই দেখা গেল, অবাক কাণ্ড। একটা দোতলা বাস। দুলে দুলে এদিকেই আসছে।

আরও অবাক কাণ্ড, বাসটা প্রায় ফাঁকা। হুড় হুড় করে সবাই উঠে পড়ল, একদম দোতলায়। সবাই এক-একটা জানলায় বসে পড়ল। ঠিক বাচ্চা বয়সে যেমন করত সবাই। তেমন হুড়োহুড়ি শুরু হল জায়গায় বসা নিয়ে। ওই পাঁচজন ছাড়া দোতলায় আর কেউ নেই। শুধু কন্ডাক্টর। বাস চলতে শুরু করা মাত্র নানা আশ্চর্য দেখা দিতে লাগল দোতলার জানলা দিয়ে।

প্রথম আশ্চর্য, ইউনিয়ন লিডার দীনবন্ধু সেন। বাস একটু এগোতেই দেখা গেল, ডাকসাইটে নেতা দীনবন্ধু রাস্তার ধারে একা একা দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ফুচকা খাচ্ছেন। এই মুহূর্তে তাঁর মুখের সর্বসময়ের সেই 'বন্ধুগণ, বন্ধুগণ' ভাবটি উধাও। ফুচকার তেঁতুল জলে তাঁর দাড়ি ভিজে একশা।

দ্বিতীয় আশ্চর্য, মেট্রো সিনেমার হোর্ডিংয়ের যুবতী। তার শরীর থেকে রোদ ছিটকে একবার সুজয়ের চোখে লাগছে, একবার দেবুদার। দোতলা বাসের জানলায় বসার সুযোগে ওই যুবতী আর দেবুদা মুখোমুখি প্রায়। অন্য সময় ওই হোর্ডিং-এর ঝলসানো শরীর সকলেরই ধরাছোঁয়ার অনেক উর্ধ্বে থাকে। তাছাড়া ওই হোর্ডিং-এর পিছনে একটি হাফ প্যান্ট পরা খালি গায়ের

~ www.amarboi.com ~

কিশোরকে দেখা যায়। সে হাতুড়ি দিয়ে কিছু একটা পিটছে ওই বিজ্ঞাপনের গায়ে। কিশোরের শরীর ঘামে চক্‌চকে। তার সমস্ত শরীরে তীব্র রোদ। অনেক লোকের চোখের সামনে এসে দাঁড়ানো এক একটা বিজ্ঞাপনকে তৈরি করা তাহলে কত ধরনের মেহনত লাগ! কত মাথার ঘাম পড়ে একটি বিজ্ঞাপনের পায়ে।

বাস হু হু করে ঢুকে পড়েছে রেড রোডে। শুভ চেঁচিয়ে ওঠে— ওই যে, ওই যে দ্যাখো সবাই।

সবাই হকচকিয়ে যায়, কী? কী দেখব?

বড় বড় গোল চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে আঙুল তুলে দেখায় শুভ—রাধাচূড়া। রাধাচূড়াগুলো দেখো। মনে হচ্ছে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সত্যিই রাধাচূড়াগুলো হলদে ফুলে জ্বলছে যেন।

এর পরের আশ্চর্য কী! ওই রাধাচূড়ার ফুল। ওগুলো হাওয়ার দমকে উড়ছে। একটা দুটো তিনটে ফুল দোতলা জানলার পাশ দিয়ে উড়ে উড়ে চলল বাসের সঙ্গে।

জানলা দিয়ে নিচে তাকালে ধাবমান গাড়ি দেখা যায়। সুজয় ভাবে, গাড়ির সেই ছাদের উপর পড়ে ছুটোছুটি হুটিপুটি করতে করতে গড়িয়ে যাওয়া ওই হলদে ফুলগুলোকে এই জানলায় না বসলে কি দেখা যেত?

শুভ আবার চেঁচাল। দুর্দান্ত। ফাটাফাটি।

কী হল শুভ?

আরে জারুলটাকে চেনাই যাচ্ছে না— কী লাগছে!

দ্যাখো, দ্যাখো।

সবাই দ্যাখো। ময়দানের ওই জারুল াছটা শুভ-র অনেক দিনের চেনা। কিন্তু ফাল্গুন বিকেলের রোদে তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

গাছের সারির মধ্যে দিয়ে ট্রাম ঢুকে গেল। চারিদিকে জালের খাঁচা দিয়ে একটা কালো সবুজ রঙের ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। নাকের সামনে লাগানো কামানের নল ঈষৎ নিচু। এই রকম রোদ্দুরে স্বাধীন বিকেলে— মনে হয়— ওই ট্যাঙ্কটাও জীবন্ত প্রাণীর মতো, বন্দি থাকবার কষ্ট পাচ্ছে। ওর পাশ দিয়ে প্রতিদিন শত শত যানবাহন ছুটে যায়। অথচ, ওর সে উপায় নেই। ওকে ওই জাল থেকে কেউ বার করে আনতে পারে না? সুজয় ভাবে, ভাবে, ওকে মুক্তি দিয়ে আমি একদিন সারা শহর ঘোরাব। দিনেরবেলা ওকে দেখে লোকে ভয় পাবে। থমকে যাবে। ট্র্যাফিক জ্যাম হবে। সুজয় ভাবে, রাত্রিবেলা। রাত্রে, সমস্ত শহর ঘুমিয়ে পড়লে, ওকে শহরের রাস্তা থেকে রাস্তায় আমি মুক্তি দিতে পারব একদিন।

সঞ্জীব, সুজয়ের সামনেই বসেছে। চেঁচিয়ে বলল, দেখুন সুজয়দা, দেখুন।

জানলা দিয়ে ঝুঁকে সুজয় দেখল, আরও একটি আশ্চর্য। একটা ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। তাতে রয়েছে দু-তিনটি তরুণী। অবাঙালি। ছাদ খোলা কোচে বসে চলেছে তারা— তাদের কপালে ছুঁয়ে যাচ্ছে নুয়ে আসা গাছের লম্বা ডাল। তারা ভেঙে পড়ছে হাসিতে। তাদের ওড়না সেই হাসির দমকায় উড়ছে। গাড়িটা বেঁকে গেল ভিক্টোরিয়ার রাস্তায়।

~ www.amarboi.com ~

ওই ওদের ওই হাসি কি দেখতে পেতাম কখনও। এই যদি, না-বসতাম এই খুশির জানলায়, সুজয় ভাবে।

তিন

হাসপাতালের গেট দিয়ে কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়েছে সবাই। সরু পিচ বাঁধানো রাস্তা দিয়ে, লোকজনের যাওয়া-আসার পাশ দিয়ে, ওরা চলেছে। একপাশে জলাশয়। মধ্যে ফোয়ারা উঠে জল ছুড়ছে। পর পর গাছ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। শুভ বলল, ওই যে, পালতে মাদার। বুঝেছ।

কেউ জিগ্যেস করে, কোনটা!

ওই যে, আঙুলের মতো লম্বা লম্বা, লাল লাল।

ঝুলছে, ওইটা?

জিৎ বলছে—এটা, এটা হল ডেউয়া। একরকম টক্ টক্ ফল হয়।

দেবুদা বলছেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তোমাদের পাখির কী হল? পাখিটা ডাকবে কখন!

সুজয় বলছে, এই তো, এই তো! এসে গেছি।

দেবুদা বলছেন, এসে গেছি! এত সব পাখি ডাকছে। তার মধ্যে তোমার পাখি কোনটা?

সুজয় বলছে, এই যে, এই দুটো বড় গাছ দেখছেন, এর মধ্যে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আমি ডাকটা শুনেছিলাম। ঠিক, এই, এইখানটায়। শুনেছিলাম।

জিৎ বলছে, সুজয়দা, আজকে ডাকবে তো?

সুজয় বলছে—ডাকবে। ডাকবে। একটু দাঁড়াও। তোমরাও শুনতে পাবে। কারণ ও তো বাড়ি ফিরবে। ফেরার সময় ডাকবে। একেবারে আমার নাম ধরেই ডাকবে। দেখো। হয়তো আজ ফিরতে একটু দেরি হচ্ছে। হতেই পারে বলো।

সঞ্জীব বলে, হ্যাঁ সুজয়দা হতেই পারে। আমাদের ফিরতে দেরি হয় না? মাঝে মাঝে?

সুজয় বলছে, তবে? বলো? আমাদের হয় না। দেরি! ফিরতে। একটু অপেক্ষা করো। একটু। ঠিক। শুনতে পাবে। আর একটু দাঁড়াও।

সবাই দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করে রইল। সবাই মাঝে মাঝে ওপর দিকটায় তাকাল। গাছের মাথায় ধোঁয়া ধোঁয়া একরকম আলো হল। সূর্য, পুরোটা পশ্চিমে নেমে যাবার পর সেই আলো অন্ধকারের এক সিঁড়ি দুসিঁড়ি আগে পর্যন্ত চলে গিয়ে থমকে রইল। গাছেদের ঝাঁকড়া মাথায় এসে ঝাঁক ঝাঁক পাখিরা ডুবে গেল। আবার আকাশে উঠে পড়ল কেউ কেউ পাশের গাছে যাবার জন্য। অলো জ্বলে উঠল ফোয়ারার পাশে, জল ছুড়তে ছুড়তে ফোয়ারা রঙিন হয়ে উঠল। জলের ধার ধারে দুটো তিনটে ছুটে বেঞ্চে দুজন দুজন করে ছেলে মেয়ে বসে রইল। তাদের পাশ দিয়ে ধবধবে সাদা পোশাক পরা পরির মতো চলে যেতে লাগল নার্সদের ছোট ছোট দল। ভিজিটাররা বাড়ি ফিরে গেল। মাথার ওপর একটানা ঘুঙুরের মতো ঝমঝম ঝমঝম বেজে চলল পাখিদের আওয়াজ। কিন্তু ওই পাখিটা ডাকল না। একবারও ডাকল না।

দেবুদা বললেন, চলি রে ভাই। বাড়ি যেতে ৯টা বাজবে।

~ www.amarboi.com ~

শুভ বলল, তুমি ঠিক শুনেছিলে তো সুজয়দা? এখানেই?

দেবুদা বললেন, কী শুনতে কী শুনেছে! চললাম সব।

জিৎ বলল, দাঁড়ান দেবুদা আমিও যাই। আসলে পাখির ডাক চেনা তো খুব ডিফিকাল্ট! জঙ্গলে জঙ্গলে সারারাত জেগে থাকতে হয়।

শুভ বলল, আমার মনে হচ্ছে, তুমি অন্য কোথাও শুনেছ। চলো, আর দাঁড়িয়ে কী হবে। পাখিটা এখানে ডাকেনি।

সুজয় দাঁড়িয়ে রইল।

সবাই চলে গেছে। সুজয় বসে রয়েছে একটা বেঞ্চে। রাত নেমে এসেছে। সঞ্জীব কোথা থেকে দুভাঁড় চা নিয়ে এল। চা নিন, সুজয়দা। নিন।

সুজয় চা নেয়।

সঞ্জীব বলে, মন খারাপ করছেন কেন! চলুন চা-টা খেয়ে রওনা দিই আমরা।

বড় রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে ঢুকে জিৎ-এর বাড়ি। পুরনো বসতবাটি তাদের। জিৎ-এর ঠাকুরদার তৈরি জিৎ-দের বাড়ির সামনে একটা মাঠ। মাঠের ধারে ধারে গাছ। গাছের পিছনে একটা বড় পুকুর। পুকুরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিল অভি। আজ অকারণে পি জি হাসপাতালে অতটা সময় গেল। যাক, মজা করে যাওয়া তো হল।

পুকুরের পরেই বড় গাছটা। গাছটার নিচে আসতেই জিৎ দেখতে পেল, তাদের দোতলার বারান্দায় আলো। বাবা পায়চারি করছেন। জিৎ-এর ফিরতে দেরি হলে বাবা এখনও টেনশন করেন। জিৎ দেখল বাবা পরদা সরিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের ওপর একটা পাখির ডাকও শুনতে পেল। জিট্, জিট্ জিট্ জিট্ জিট্ জিট্ জিট্, জি-ট-ট্ জি-ই-ট! জি-ই-ট! জি-ই-ট! স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জিৎ! উপর দিকে তাকাল। পাতায় পাতায় ঘন অন্ধকার, ওপরটা কিছু দেখা যাচ্ছে না।

রাত অনেক হয়েছে। পেঁচাদের দেখাশোনা সারা হয়েছে। পেঁচার ওপর একটা নতুন বই পেয়েছে। সেটা পড়তে পড়তেই হয়তো রাত এতটা বেড়ে গেছে। শুভ বড় একটা হাই তুলল। বেজির ঘরটা নিচে। এই মুহূর্তে তার পোষা সাপ নেই। বেচারি লাস্ট সাপটা মারা গেছে মাসখানেক আগে। পেঁচাতেই এখন কনসেনট্রেট করেছে শুভ। তাদের বাড়ি খুবই পুরনো। জিৎ-এর মতোই। শুভ-র আজকে শুতে যাওয়ার আগের সিগ্রেটটা খাওয়া হয়নি। লুঙ্গি আর স্যান্ডোগেঞ্জি গায়ে শুভ সিগ্রেট ধরাল। তার ঘরের সামনে উঠোন। উঠোনের পারেই একটা নিম গাছ। শুভ-র মা বলেন, নিমের হাওয়ায় শরীর ঠান্ডা হয়। মাথা ঠান্ডা হয়। অথচ কী করে যে তাঁর অমন আধ-পাগলা ছেলে হল। শুভ বলে, মা, পেঁচা কী সুন্দর পাখি। তুমি কেন মানতে চাও না। শুভ যখন বাড়ি থাকে না মা অবশ্য পেঁচাদের দেখাশোনা করেন। শুভ আর পেঁচাদের নিয়েই তো মায়ের সংসার। সিগ্রেটটা শেষ হয়ে এসেছে। শুভ ধীরে ধীরে বারান্দায় এল। পাশের ঘরে মা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে শুভ জানলার বাইরে থেকে। কতদিন মাকে বলেছে, আলো নিভিয়ে ঘুমবে না; মা শুনলে তো?

~ www.amarboi.com ~

শুভ সিগ্রেটটা ছুড়ে ফেলে বারান্দা থেকে ঘরের দিকে যাবার জন্য ঘুরল। আর নিম গাছের ওপর থেকে কে যেন বলল, শু-ভো! শুভো শুভো শুভো শুভো। শু-ভো।

এক মুহূর্ত নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না শুভ। তাকাল নিমগাছের মাথায়। ঘন অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

ভোর হয়ে এসেছে। দেবব্রতবাবুর অ্যালার্ম দরকার হয় না। প্রথম প্রথম হত। এখন তাঁর শরীরই ঘড়ির কাজ করে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে ব্যাঙ্ক চাকুরে। জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়েছেন তিনি। সময় মেপে সারাজীবন সবকাজ করে এসেছেন। বেহিসেবি খেয়ালখুশিতে কখনও ভিড়ে যাননি। তাই না। সামান্য হেড ক্লার্কের চাকরি করেও তিনি সবদিক এমন সামলে রেখেছেন। সল্টলেকের এই বাড়ি, এও তাঁর নিজের চেষ্টায় পরিশ্রমে এবং উপার্জনে তৈরি। সময় এবং অর্থ কখনও অপচয় করেননি তিনি। অর্থের চেয়েও দামি হল সময়।

দেবব্রতবাবু ভোরে ঘুম থেকে উঠে মর্নিং ওয়াকে যাবার সময়, প্রায় রোজই এই কথাগুলো ভাবেন। আজকের ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে এসব ধ্যান ধারণা নেই। হুট করে একটা পাখির ডাক না কি শুনতে, ছুটল সবাই! তারপর সব ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ। কোথাও কিছু নেই। আরে বাবা বাড়ির পোষা পাখিকে কথা বলা শেখালে সে নাম ধরে ডাকবে। একশোবার ডাকবে। কিন্তু, ছাড়া পাখি, গাছের স্বাধীন পাখি কেন ডাকবে! তার বয়ে গেছে।

অবশ্য ওই হুজুকে কাল তিনিও মেতে গিয়েছিলেন। যাকগে, আজ অফিসে গিয়ে সুজয় ছোঁড়াটাকে একটু খ্যাপানো যাবে।

কেডস পরে, দেবব্রতবাবু যখন সল্টলেকে বেরিয়ে এলেন তখন অন্ধকার আলোর দিকে একসিঁড়ি, দুসিঁড়ি এগোচ্ছে। দেবব্রতবাবু ভাবলেন, তাঁর দুটো এফ ডি ম্যাচিওর করবে সামনের মাসে। একসঙ্গে দুটো। যা রেখেছিলেন, তার দ্বিগুণ টাকা পাবেন তিনি। দ্বিগুণ। টাকা নিয়ে, কীভাবে খাটাতে হবে, সেটা ঠিক করেননি এখনও। সল্টলেকের এই একটা সুবিধে। অনেক গাছ। অনেক পাখি অনেক হাওয়া। দেবব্রতবাবুর মনে হল, আজ যেন একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। একটা গাছের তলা দিয়ে একটা মোড় ঘুরলেন দেবব্রতবাবু, আর শুনলেন কেউ তাঁকে ডাকছে দেবুউউউ! দেবুউউউ। দে-বু-উউউ! অ্যাই দেবু! চমক উঠলেন দেবব্রতবাবু। পিছনে ঘুরে তাকালেন,লম্বা রাস্তাটা অনেক দূর চলে গেছে তাঁর পিছনে। একজন লোকও নেই। রাস্তাটা মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে!

চার

পরদিন সকালে, অফিসে ঢুকে নিজের জায়গায় বসতে গিয়ে সুজয় দেখে, টেবিলের সামনে সঞ্জীব দাঁড়িয়ে। কী ব্যাপার সঞ্জীব? কী হয়েছে, কিছু বলবে?

সঞ্জীব বলে, বলব, একটু বসে নিন, জলটল খান।

সুজয় বলে, অরে বলো না। ওসব ঠিক আছে। তুমি বলো আগে।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

সঞ্জীব চারদিকটা দেখে নেয়। তারপর চাপা গলায় বলে, গতকাল একটা ব্যাপার হয়েছে।

কী হয়েছে!

সঞ্জীব বলে, রাতে, ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। বাথরুমে এলাম। আমাদের তো চারতলায় ফ্ল্যাট। আশেপাশে গাছটাছ নেই। হঠাৎ—

বলে সঞ্জীব থেমে যায়। চারদিকে তাকিয়ে নেয় আবার। জিৎ ঢুকছে। শুভকে দেখা গেল করিডোরে। দেবুদা নিজের টেবিল থেকে উঠে বড় আলমারিটার কাছে যাচ্ছেন। সঞ্জীব বলে, আমাদের বাথরুমে দাঁড়ালে পিছনের বাড়িটার ছাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কটা দেখা যায়। হঠাৎ একটা পাখি—

পাখি? সুজয় সচকিত!

হ্যাঁ, সুজয়দা একটা পাখি। চেরা গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। খুব কর্কশ ডাক। কিন্তু অবিকল মনে হল— স-ন-জী-ব স-ন-জী-ব বলে ডাকছে পাখিটা এমন লাগল না।! সঙ্গে সঙ্গে জানলায় উঁকি দিলাম কিছু দেখতে পেলাম না...

সুজয় কিছু বলল না। সুজয় ওদের বাঁদিকটায় তাকায়। বড় একটা জানলা। অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুজয়ের মনে হল, ওই পাখি আমাদের সকলেরই মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে। দেখা দেয় না কখনও। কেবল,আমরা একলা হলে, কখনও কখনও, আমাদের নাম ধরে তীব্র ডাকে। তারপর, আড়াল থেকে, আরও কোনও আড়ালে, উড়ে যায়।

শারদীয় আনন্দবাজার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধুলোচশমা

ঝেন্টিকে আজকে আবার দেখতে আসছে, শুনেছিস তো। এই নিয়ে তিনবার। এক বাড়ি থেকেই। অনিমেষ মায়ের দিকে তাকাল চোখে একটা 'তা-ই না কি' নিয়ে। মুখে বলল, দু'টো রুটি তুলে নাও।

সে কি রে। চারটে রুটি, জলখাবারে খাবি না? জোয়ান ছেলে? ঝেন্টি বলছিল, অনুদাকে ক'দিন কেমন শুকনো শুকনো লাগছে।

অনিমেষ দু-আঙুলে দু'টো রুটি একসঙ্গে উঁচু করে মায়ের দিকে তুলে আছে। ধরো। বেলা বাধ্য হয়ে ধরলেন। একটা কাঁচা লঙ্কা হবে? বেলা গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে ফিরে যান কাঁচা লঙ্কা আনতে। অনিমেষ তার টেবিলে জমা একরাশ খাতা সরিয়ে জলখাবারের ছোট থালাটা রাখতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষে চেয়ারের হাতলে থালা রেখে রুটি ছিঁড়তে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের খাতা। অনিমেষের কাছে পড়তে আসে যারা। বেলা, কাঁচা লঙ্কা নিয়ে আসেন।

দু'বেলা ছাত্র ঠ্যাঙানো। তার মধ্যে ভাল করে খাবি না! চাকরি-বাকরি পেয়ে গেলে তো আরও খাটনি পড়বে।

চাকরির দরকার কী মা! স্টুডেন্টরা থাকলেই চলবে।

মুখে রুটি নিয়ে কথা বলিস না। খেয়ে নে আগে। কেন রে? নতুন সরকার এল। এবার তো শুনছি চাকরি পাবে সবাই।

এমন কথা শোনা যাচ্ছে ঠিকই। রাজ্যে জ্যোতি বসু আর দিল্লিতে মোরারজি দেশাই-এর গভর্নমেন্ট এসেছে, এক বছরও পুরো হয়নি। এবার আর বেকার থাকবে না এসব কথা বলাবলি হচ্ছে বটে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনিমেষ শোনে। বিশেষ মাথা ঘামায় না। চলে তো যাচ্ছে। পাশ করে বসে আছিস আজ কতদিন... বলতে বলতে, বেলা আবার রান্নাঘরে ফিরে যান।

ঝেন্টি এসে জানলায় দাঁড়ায়। কী করছ, অনুদা।

অনিমেষ তাকায়। এ-ই তো! কী-রে! বল! বলছি, কী করছ। আমি একটু আসব? অনিমেষের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, খালি থালা হাতে রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, এসেই তো গেছিস। আবার, আসবি জিজ্ঞেস করছিস কেন! দাঁড়া, মায়ের কাছে এটা দিয়ে আসি।

অনিমেষের পড়ার বা পড়ানোর ঘর থেকে মাঝের একটা ঘর পার হলেই একটু বারান্দা -মতো জায়গায় বেলা রান্না করছেন। সেখানে থালা নামিয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অনিমেষ যখন ফিরল, তখন, অনিমেষের বইয়ের আলমারি সামনে দাঁড়িয়ে ঝেন্টি। স্বভাবমতো বইয়ের তাক থেকে এক-একটা বই নামাচ্ছে। অনিমেষ ঢুকতেই বলল, ঠিক জায়গায় রেখে দেব আবার, বকুনি দিও না। অনিমেষ হাসল, না না, দ্যাখ দ্যাখ। বলেই, অনিমেষ ওর টেবিলে বসে স্টুডেন্টদের খাতাস্তূপ থেকে সেই খাতাটা টেনে নিল, যেটা দেখার সময় বেলা জলখাবার এনেছিলেন। অনিমেষ খাতা দেখছে, আর ঝেন্টি দু'টো তিনটে চারটে বই নামিয়ে দেখে, আবার তুলে রাখছে আলমারিতে। তোমার বইপত্র বড্ড অগোছালো হয়ে থাকে অনুদা। একটু গুছিয়ে রাখতে পারো না।

অনিমেষ খাতা দেখতে দেখতে বলে, ঠিক বলেছিস। গুছিয়ে রাখা দরকার।

ঝেন্টি এদিকে ঘোরে, শোনো না!

অনিমেষ খাতার পাতায় একটা দাগ দিয়ে পাশের মার্জিনে কিছু লিখতে লিখতে বলে, বল।

ঝেন্টি বলে, না, এদিকে তাকাও। ভাল করে শোনো।

অনিমেষ আঙুল দিয়ে চশমাটা ঠিক করে। চোখ তুলে বলে, হ্যাঁ বল।

বলছি, আমাকে ওই নোট দু'টো লিখে দিলে না তো এখনও। কবে থেকে বলে যাচ্ছি।

অনিমেষের মনে পড়ে। সত্যিই তো, মাস দুয়েক হতে চলল, মেয়েটা বলেছে। দেব রে, দেব! স্টুডেন্টদের বলে বলে লিখিয়ে দিতে হয় সব। সময় পাই না।

না, আমি তোমার ওই স্টুডেন্টদের মধ্যে বসে বসে ডিকটেশন নিতে পারব না। তুমি আমাকে লিখে দেবে নিজে হাতে। আমি মুখস্থ করব।

অনিমেষ বলে, মুখস্থ করতে নেই রে বোকা। শুনে ভাল করে বুঝে নিতে হয়। আসিস একটা রোববার দেখে। রোববার শুধু সকালে দু'জন আসে। দুপুরটা ফাঁকা রেখেছি। আসিস।

ঝেন্টি খুব রেগে যায়। না-আ! তুমি, আমাকে নিজে হাতে লিখে দেবে। নি-ই-জে। ছোট হোক। কিন্তু দেবে। বলেছিলে দেবে। দেবে না?

অনিমেষ বলে, আচ্ছা দেব। দেব।

ঝেন্টি অনিমেষের ছোট খাটটায় বসে খাটের ওপর স্তূপ করা বইপত্রগুলো যথাসম্ভব গুছিয়ে রাখছিল। হঠাৎ অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, এ কি, অনুদা, ছি ছি। দাও দাও।

~ www.amarboi.com ~

অনিমেষ অবাক, কী হল!

চশমাটা দাও। বলে, অনিমেষের দেওয়ার অপেক্ষা না-করে, ঝেন্টি উঠে নিজেই অনিমেষের চোখ থেকে খুলে নিল চশমাটা। ইস্‌স। কী ধুলো জমেছে। মেছো-ও না। টেবিলে জলের গেলাস রাখা ছিল। বারান্দায় গিয়ে চশমার কাচে জলের ছিটে লাগানোর পর নিজের আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, এইরকম ধুলো-চশমা দিয়ে লেখাপড়া করলে, ক'দিন পরে তো আর চোখে কিছুই দেখতে পাবে না। জেঠিমা বলছিলেন, তোমার পাওয়ার আবার নাকি বেড়েছে।

মা তোকে বলেছে বুঝি?

কেন, ডাক্তারও তো তোমাকে বলেছে, জেঠিমা বললেন।

অনিমেষের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। সেটাই তো! এর আগের চশমাটা তো চলল না। পাওয়ার বাড়ল। নতুন এটা, এক বছর হল। ঝেন্টি চশমা ফেরত দেয় অনিমেষকে— দ্যাখো, এবার কেমন ঝকঝক করছে। আর পুরোনোটা। ওটাও ওইরকম ধুলো-পড়া হয়ে থাকত। ওটা কোথায় এখন?

আছে কোথাও। বইয়ের আলমারিতে বোধহয়। বাঃ। সত্যিই ভাল কাজ করলি! এবার অনেক পরিষ্কার লাগছে সব।

বেলা একটা গামলায় কাচার জন্য কাপড়জামা নিয়ে বাড়ির পিছন দিকের কলের কাছে যাচ্ছিলেন। বারন্দায় দরজাটার সামনে থেমে বললেন, ঝেন্টি তোদের ছাদ থেকে তোর মা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তুই আছিস কি না। আমি তো দেখিনি, তাই আসিসনি বলেছি। বেলা চলে যান। মুখ হাঁড়ি করে ঝেন্টি বলে, মার সবসময় খবরদারি। আমি যাচ্ছি। নোট দু'টো লিখে দিও কিন্তু।

অনিমেষ বলে, দেব। কিন্তু হ্যাঁ রে, তোর তো বিয়ের সব ঠিকঠাক। বিয়ের পরে পরীক্ষাটা দিতে পারবি তো। কোনও অসুবিধে হবে না?

ঝেন্টির মুখটা কেমন হয়ে যায়। কে বলেছে ঠিকঠাক! মোটেই ঠিকঠাক নয়। আমি তো পরীক্ষাটাই দিতে চাই। তুমি একটু বলো না আমার বাড়িতে।

অনিমেষ অবাক। আরে। আমি কী বলব। আমি বললেই কি আর হবে?

হবে হবে। তুমি বললেই হবে। একটু বলো, আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক। রেজাল্ট আসুক। তারপর বিয়েটিয়ে নিয়ে...

অনিমেষ হাসে। পাগল! তোর বাবা-মা ঠিক করে ফেলেছেন। সেখানে আমি কখনও বলতে পারি! আমি কে!

কেন, তুমি কেউ নও? তুমি চাও না আমি আরও পড়াশোনা করি? আগে যে বলতে?

সে তো এখনও বলছি রে! কিন্তু, তোর বাবা-মাই তোর গার্জেন। তোর কথা ওঁরা কত ভাবেন।

অনিমেষের টেবিলের সামনে একটা ছোট বেতের মোড়া। ঝেন্টি এসে তার ওপর বসে, সোজা চোখ তুলে তাকায় অনিমেষের দিকে। একদৃষ্টে চেয়ে বলে, আর, তুমি ভাবো না? আমার কথা? ভাবো?

~ www.amarboi.com ~

অনিমেষ কেমন একটা অসুবিধে বোধ করে! কোনওমতে বলে ভাবি তো।

ঝেন্টি একদৃষ্টে চেয়ে বলে, সত্যি ভাবো?

অনিমেষ দুর্বলভাবে ঘাড় হেলায়, ভাবি। ঝেন্টির চোখের পাতা বড় বড়। টানা চোখ। সেই চোখের মণি এখন স্থির রাখা আছে অনিমেষের চশমার কাচে। কাচে ধুলো জমা নেই। ঝেন্টি বলে, কী ভাবো? কী কী ভাবো? আমার কথা?

অনিমেষ এই মুহূর্তেই সবচেয়ে পরিষ্কার চশমাটা আবার খোলে, তার বুশ শার্টের কোনা দিয়ে আবার মুছতে থাকে ও বলে, এই ভাবি, তোর ভাল বিয়ে হবে, ভাল থাকবি, পরীক্ষাটাও দিবি...

ঝেন্টি উঠে দাঁড়ায়। বুঝেছি। নোট তোমাকে লিখে দিতে হবে না। পরীক্ষায় আমি বসব না। ঝেন্টি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

অনিমেষদের সদর দরজা একটু দূরে। অনিমেষের ঘর থেকে দেখা যায় ওদের উঠোনের আমগাছ, শিউলি গাছ, পেঁপে গাছ, গন্ধলেবু গাছ। এখন তুলসীমঞ্চ আর কাঁঠাল গাছের পাশ দিয়ে ঝেন্টি চলে যাচ্ছে। ওর হলদে শাড়ির রং মার্চের রোদ্দুরে আগুনের মতো লাগে।

ঝেন্টি চলে যাওয়ার পর, ঝেন্টিকে যেন ভাল করে দেখতে পায় অনিমেষ। অনিমেষ নিজের ঘরে। মনে মনে দেখতে পায়। ঝেন্টির ভাল নাম রিক্তা। সে দীর্ঘাঙ্গী, বইয়ের আলমারির ওপরের তাকে হাত দিতে তার অসুবিধে হয়নি কখনও। চিবুক সরু হয়ে নেমেছে। সাধারণত সকালে স্নান করে নেয়। আজও স্নান করেই এসেছিল। পিঠ ভরা খোলা চুল। ওর গলার নিচের দিকে একটা বড় তিল আছে। নাকের ওপরও একটা। এইগুলো মনে পড়তে আবার একটা অসুবিধে বোধ করল অনিমেষ। তৎক্ষণাৎ মন বন্ধ করে দিল। যেভাবে মানুষ ঝপ করে হাতের বই বন্ধ করে, সেইভাবে অনিমেষ বন্ধ করল নিজের মন। পরিবর্তে ছাত্রদের কারও নতুন একটা খাতা খুলে শুরু করল দেখতে।

দিন দশেকের মধ্যেই নোট দু'টো নিজের হাতে একটা লম্বা খাতায় লিখে, দুপুরবেলা, ঝেন্টিদের বাড়ি কড়া নাড়ল অনিমেষ। ঝেন্টির মা দরজা খুলতে অনিমেষ খাতাটা হাতে দিয়ে বলল ঝেন্টি নিশ্চয়ই কলেজে গেছে কাকিমা। খাতাটা ওকে দেবেন। দু'টো নোট আছে, পরীক্ষায় দরকার হতে পারে।

ঝেন্টির মা বললেন, সে তো বাবা, তুমি এত ভাল লেখাপড়ায়, তুমি তো দিচ্ছ। কিন্তু এ দিয়ে আর কী হবে। ঠাকুরের ইচ্ছেয় ওর বিয়ে তো দোসরা বৈশাখেই।

অনিমেষ বলে, জানি তো। কিন্তু পরীক্ষাটা তো দেবে বলেছে, তাই দিয়ে গেলাম।

পরীক্ষা? সে সব দিয়ে আর কী লাভ? ভাল করে সংসার করুক, এই আশীর্বাদ করো তোমরা পাঁচজনে।

অনিমেষদের পিছনের বাড়িটাই ঝেন্টিদের বাড়ি। সেদিন ঝেন্টি চলে যাওয়ার পর আর একবারও আসেনি। নোট পেয়েছি, বলতেও না। অনিমেষ একটু অবাক হয়েছে। কিন্তু, ভেবে দেখেছে বিয়ে বলে কথা। কত কাজকর্ম কত ব্যস্ততা থাকে। তাছাড়া সেদিন ঝেন্টির মা তো

~ www.amarboi.com ~

বলছিলেন, এত রোদে কলেজে গেল, কী দরকার বেরনোর। বিয়ের আগে আগে যদি জ্বরজারি হয়? সাবধানে থাকতে হয় এসময়টা।

যেদিন ঝেন্টির বিয়ে, সেদিন সকাল থেকেই অনিমেষ ঝেন্টিদের ওপর বিরক্ত। ঝেন্টির ছোটভাইটা, ইলেভেন-এ পড়ে, একজন মাইকওলা ডেকে লাগাতার জগঝম্প হিন্দি গান বাজিয়ে যাচ্ছে। পড়শি-বাড়ি। কিছু বলা যাচ্ছে না। ওদিকে স্টুডেন্টদের প্রায় না-পড়িয়েই ছেড়ে দিতে হল সেদিন। সপ্তাহে আরেকটা দিন সময় করে ডাকবে বলে দিল। দুপুরবেলাটাও একটু জিরেন নেই। তখনও গান বাজছে। রাতে মা-ছেলেতে নেমন্তন্ন রাখতে যাবে। মাকে টাকা দিয়েছিল, একটা শাড়ি এনে রাখা অছে। দুপুরে পড়াশোনা ছেলেদের খাতা দেখা কিছুই করতে পারল না। বিকেলের দিকে মাইক বাজনা থামল।

সারাক্ষণ কানের কাছে ওই তাণ্ডব কখন যে ক্লান্ত করে দিয়েছিল তা বোঝেনি অনিমেষ। একটু স্তব্ধতা পেয়ে তক্তপোষের বইপত্রের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ আলো জ্বলতে চমকে ঘুম ভাঙল। বাইরে সন্ধে। সামনে ঝেন্টি। যেভাবে নতুন বউ সাজে সেইভাবে সেজে এসেছে। কী-ই-রে! তুই! ঝেন্টির হাতে সেই খাতাটা, যেটাতে অনিমেষ দু'টো প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়েছিল। এটাতে তোমার নাম লিখে দাও। অনিমেষ কিছুই বুঝতে পারছে না। অবিশ্বাস্য সুন্দর দেখাচ্ছে ঝেন্টিকে। জীবনে কখনও, কোনওদিনও এত সুন্দর কোনও মেয়েকে দ্যাখেনি, এত কাছ থেকেও দ্যাখেনি, অনিমেষ। হতবুদ্ধি হয়ে বলল, নাম? লিখে দেব? আমার? খাতাটা অনিমেষের হাতে ধরিয়ে ঝেন্টি বলে, কখনও কোনও কিছুই তো দাওনি আমাকে। এই নোট দু'টো ছাড়া। শেষে তোমার নামটা লিখে দাও। বলতে বলতে গলা কাঁপে। চোখ থেকে ঝরঝর করে জল নামে তার। হাতের উলটোপিঠে চোখ মোছে ঝেন্টি কান্না আটকাবে বলে। আর কাজল ধেবড়ে যায় চোখের তলায়। অনিমেষ ব্যস্ত হয় দাঁড়া, দাঁড়া দিচ্ছি। নাম লিখে দিচ্ছি। কাঁদতে নেই। কাজলটা নষ্ট হয়ে গেল।

—আর আমার পড়াশোনাটা যে নষ্ট হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে থাকলে আমার পড়াশোনাটাও থাকত।

আবার হতবুদ্ধি অনিমেষ। আমার সঙ্গে থাকলে! মানে?

জানি না। নামটা লিখে দাও।

অনিমেষ নিজের হাতে লেখা নোটের পাতা উলটে দ্যাখে অনেক কথা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। জল পড়ে মুছে গেছে। নাম লিখতে লিখতে বলে, এগুলোর ওপর কি জল পড়েছিল? পড়বে না! কেউ যদি রাতের পর রাত এই লেখাগুলোর ওপর মুখ চেপে ঠোঁট চেপে কাঁদে—তা হলে জল পড়বে না, ঝাপসা হবে না? এইরকম এইরকম করে যদি কেউ মুখ ঘষে খাতাটার ওপর, এইরকম...

অনিমেষের স্যান্ডো গেঞ্জির দু'টো দিক মুঠো করে ঝেন্টি মুখ ঘষতে থাকে অনিমেষের বুকের ওপর। অনিমেষ, সেইরকম হতবুদ্ধি অবস্থাতেই হাত রাখে তার পিঠে।

দরজায় এসে দাঁড়ান ঝেন্টির মা। সব সাজ নষ্ট হয়ে যাবে রে মা। বাড়ি যা। সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে।

~ www.amarboi.com ~

ঝেন্টি সোজা হয়। তার সাজ ভেঙেচুরে গেছে। বেলার দিকে তাকায় না। অনিমেষকে বলে, তোমার চশমাটা দাও। আগের চশমাটা।

কী করবি?

জানি না। দেবে না তো?

বেলা বলেন, আমি দিচ্ছি। আলমারি খুলে চশমাটা দিয়ে দেন হাতে। খাতা আর চশমা নিয়ে ঝেন্টি বেরিয়ে যায়।

অনিমেষ চুপ করে বসে থাকে মায়ের পাশে। বেলা ছেলের মাথার ঝাঁকড়া চুলে হাত রাখেন। বলেন— কোনওদিন কিচ্ছু বুঝতে পারিসনি? আমাকে তো বলতে পারতিস!

অনিমেষ বাইরে অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, কোনওদিন কিচ্ছু বুঝিনি মা। একদিনের জন্যও বুঝতে পারিনি। আমার চশমাটায়, দ্যাখো, সারাক্ষণ ধুলো জমে থাকে তো! তাই!

সংবাদ প্রতিদিন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোপাল ও তার মাদুলি

সাতষট্টি সাল। রানাঘাট টাউনের রেল বাজারের মোড়ের পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে। খর্বকায়, মাথায় খোঁচা চুল। ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরা। আর লম্বা ঝুল বাংলা শার্ট, কলার দেওয়া। লোকটির ডান-পাশে, বাঁ-পাশে দুটো বড়ো বাজারের ঝোলা নামিয়ে রাখা—কিন্তু ঝোলার ফাঁক দিয়ে আনাজপাতি উঁকি মারছে না। অবশ্য, একবারে অত কী লক্ষ করেছি খুঁটিয়ে? করিনি। করেছি, পরের বার ফেরার সময়ে। কোথা থেকে ফেরার সময়? বাজার থেকে। এইটে পড়ি তখন। বাজারে যাই ডিম কিনতে, কলা কিনতে, খবরকাগজ কিনতে, আর তখন স্কুল বন্ধ। বড়োদিন উপলক্ষ্যে ২৫ তারিখ থেকে ছুটি। ২ তারিখ খুলবে। ততদিন ছাড়া গোরু। খোঁটা পোঁতা নেই।

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, ডান হাতটি সামনে ছড়ানো। করতল পেতে রাখা। আর করতলে একটি দেশলাই বাক্স শায়িত। লোকটি একদৃষ্টিতে করতলের দেশলাইয়ের দিকে তাকিয়ে। মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে, 'ওঠ্, ওঠ্ বলছি! কী হল? শুনতে পাচ্ছিস না?' জগতে কেউ তার দিকে ফিরেও দেখছে না। জগৎ অবশ্য তখন ফাঁকাই থাকত। লোকের ভিড় খুব সকালে স্টেশনবাজারের দিকে দেখা গেলেও রাস্তা একটু ফাঁকা-ফাঁকাই। পাশেই মেথরপট্টি। সেখান থেকে দুটো বাচ্চা এসে সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল মুখে দিয়ে তাকিয়ে। দুজনের মধ্যে একজনের আবার, শরৎচন্দ্রের কথা ধার করলে, 'পরনে ঘুনসি ব্যতীত কিছুই নাই।'

চলে গেলাম ভোগলাদার দোকানে, এদিক-ওদিক ঘুরে, শাট্‌লকক কিনে যখন ফিরছি, মিউনিসিপ্যালিটির সামনে গোল একটা ভিড়। আর মাঝে মাঝে তা থেকে একটা গর্জন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কী হচ্ছে ওখানে! ভিড় ঘেঁষে উঁকি মারলাম। সেই লোকটি। কথা বলছে। তার গম্ভীর গলায়। আর কী আশ্চর্য সেইসব কথা : 'মাটি ফেটে রক্তো উঠছে। মা-আ-টি-ই ফেটে রক্তো। মা কামিকখ্যা ঋতুমতী হইসেন। ধরিত্রীর রক্তো। বোসুনধরা-আ। কেউ দেখতে পায় না, শুধু সাধক দেখতে পায়। সা-আ-ধ-অ-ক! কে দেখতে পায়! কে দেখতে পায়? বলো সব।' ভিড় গুঞ্জরণ করল, 'সা-ধ-ক।'

'হ্যাঁ-অ্যাঁ অ্যাঁ! সাধক। সেই রক্তোমিত্তিকা তিলমাত্তর তিলমাত্তর করে নিয়ে মাদুলিতে পোরা হয়েসে। মান্ষের উবগারের জন্য। কে পুরেছে মিত্তিকা! মাদুলিতে কে পুরেসে! বল-অ-অঃ!' ভিড় বলল, 'আপনি, আপনি!' 'মারব এক থাবড়া! অমনি আমি? আ-মিই! সা-ধ-অ-ক পুরেসেন। আমি মায়ের সেবাইত। মা কামিকখ্যার সেবাইত। মা কামিকখ্যা ঋতুমতী হলি, তকন, আমার ডাক পড়ে। সা-আধক আমারে রক্তোমিত্তিকা পোরা মাদুলি দেন। মান্ষের উবগার করতে। 'কী উবগার? কী উবগার? বল-অঃ!' ভিড় বলল, 'কী উবগার?'

'মান্ষের কতরকম বিপদ। রাতে বাড়ি ফিরলেন, পিছনে সপসপ সপসপ। ঘুরে তাকালেন। কেউ নেই। রোজই হচ্ছে। কে পিছু ধরেসে। তারে দেখতে পান না। বিপদ নম্বর এক। দুই, যা খান হজম হয় না। ঢেক্ ওঠে। ঢেউ, ঢেউউ। জোয়ান খান, হজমি খান, বিফল। বি-ই-ফ্-অ-ল। রাতে বউয়ের বুকে ওঠেন আর নেমে পড়েন। কাজের কাজ হয় না। এই উঠলেন তো? বলতে বলতেই ব্যাস। বিফ-অ-ল। বি-ই-ফ-অ-ল। বিপদ নম্বর তিন, নেবার। নে-এ-এবার। ইংরেজি কথা। পাড়াপড়শি। পাশের বাড়ি। তিন ফুট ছেড়ে ডেরেন কেটেছে কী কাটেনি। নরদোমা। মামলা। সাত বচ্ছর। মিটছে না। ছেলের বয়স পাঁচ হয়ে গেল এখনও বিছানায় মুতছে। যত বকো শোনে না। মুত হয়ে যায়। কী করা যায়। বিপদ নম্বর চার। বউ রাতবিরেতে ছাদে ঘুরে বেড়ায়। উঠোনে দাঁড়ায়। খুব ভোরে দেখলেন নেই। কী হল গো, কোথায় গেলে গো? এই তো। কই? না, বিষ্টি দেখছি। ঘোর উঠোনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে ভরা বউ? হ্যাঁ, ভরা বউ। বিপদ নম্বর পাঁচ। পুকুরে চান করতে নামলেন, ধাতু বেরিয়ে গেল। জল লাগলেই ব্যাস। সকালে পাতোক্কিত্তে বসলেন, কোঁত পেড়েছেন কী, ধাতু বেরিয়ে গেল। শরীল শুকিয়ে যাচ্ছে। লিকলিকে হ্যাংলা হয়ে যাচ্ছেন গিয়ে। অত ধাতুক্ষয় হলে হবে না! কত বিপদ মানুষের। কত বিপদ। উদ্ধার কীসে? কীসে উদ্ধার? ব-ল-অ-অঃ?' আবার হুঙ্কার, 'ব-অ-ল-অঃ!' ভিড় বলল, 'কীসে উদ্ধার?'

'বলছি। বলছি। এই মা কামিকখ্যার মাদুলি, হাতে বাঁধবেন। নিজের ডাঁয়ে বাঁধবেন, বউয়ের বাঁয়ে। বাচ্চাদের কোমরে ঝুলিয়ে দিন। মা কামিকখ্যা। তাঁর দয়া। উদ্ধার। উ-দ্-ধা-আ-র!'

এবার ঝোলার ভেতর থেকে একমুঠো মাদুলি বার করল লোকটি। 'মান্ষের উবগারের জন্য মাদুলি। কোনো পয়সা নেব্ব না। পয়সা পাপ। পাপ। বিনামূইল্যে দোব। তাহলে ছড়িয়ে দিই? দি-ই?' হরির লুট দেওয়ার মতো লোকটি দু'আঁজলা ভরা মাদুলি নিয়ে

~ www.amarboi.com ~

ভিড়ের মধ্যে ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে 'এ-ই-ই নেঃ' বলে। কিন্তু ছোড়ে না, হাত মুঠো করেই রাখে। ফলে মাদুলি হাতেই থাকে, ভিড়ে শুধু তোলপাড় ওঠে একবার। অপূর্ব একটি হাসি এবার। 'উঁ হুঁ হুঁঃ। ভিড়ে দিলাম হরির লুট, যে পেল সে আমার সম্পর্কে বলবে, লোকটা এম. এ. পাশ। বিরাট বিদ্ধান। আর যে পেল না? সে বলবে ব্যাটা শুয়োরের বাচ্চা! ওতে আমি নেই। আর মা কামিকখ্যার সেবাইত আমি। তাঁর সেবা চালাতে হয়। সাধককে কিছু দিতে হয়। তাই চারানা করে দাম ধাজ্জ করলাম। চারানা, চারানা, চারানা, চারানা!' হুটোপাটি লেগে গেল চারানা দিয়ে মাদুলি কিনতে। মুঠো ভরতি মাদুলি পলকে শেষ। ভিড়ের মধ্যে এখনও 'আমার একটা' 'আমার একটা' চলছে! লোকটি ঝোলা থেকে বার করল আর এক মুঠো। এবার আটানা, আটানা। লোকে তাই কিনছে। মুহূর্তে সেটা এক টাকা হল। শেষ পনের মিনিট দুটাকা করে বিক্রি করে লোকটি। তখন ভিড় এত যে রিকশা যেতে পারছে না। লোকটি নিজেই এবার, 'ফাঁকা করো, ফাঁকা করো। যাও, মাদুলি আবার পরে, শনিবার। শনি-মঙ্গলবার আমি আসি। ফাঁকা করো।' এই মাদুলি পাঁচ টাকায় বিক্রি করতেও দেখেছি, শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে আসা একটি লোককে। ডিম্যান্ড বাড়লে, চড়চড় করে দাম বাড়বে। সিধে কথা।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু লোকটিকে ছাড়তে পারলাম না। রেলবাজার, কোর্টের সামনে, চাকদা স্টেশনে, গাঙনাপুর, তাহেরপুর, ফুলিয়া, কত জায়গায় তাকে দেখেছি আমি। এর নাম গোপাল। জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। খাড়া বাঁকানো নাক। খোঁচাখোঁচা চুলের বড়ো মাথা। বলিষ্ঠ গড়ন। ওইটুকু চেহারা নিয়ে, কেবল গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গি দিয়ে, একেবারে ফাঁকা জায়গায়, পঞ্চাশ-ষাটটা লোক জড়ো করে ফেলত। সম্মোহিতের মতো লোকে কিনত ওর মাদুলি। কিন্তু, সেই সাধককে গোপাল কখনও প্রকাশ্যে আনেনি। সত্যি কোনো সাধকের অস্তিত্ব ছিল কি না, জানা যায়নি কখনও। শনি-মঙ্গলবার হলেই আমি, ওই গোপালের খোঁজে রেলবাজার, কোর্টমোড় যেতাম। পরে, যখন আমার বয়স ২৭-২৮, তখন ট্রেনে চেপে দুটো-পাঁচটা স্টেশন চলে গিয়ে নেমে পড়তাম। গোপালকে আবিষ্কার করতাম সেখানে। বলা হয়নি, গোপালের লম্বা চুল, ময়লা শার্টের বুক পকেটে একটা টাইম টেবিল থাকত। তার মধ্যে মুখ উঁচিয়ে আছে একটা হাড়। একবার ভিড়ের মধ্যে একজন গোপালের ওই অপূর্ব সম্মোহিনী বক্তৃতার সময় অবিশ্বাসের হাসি হাসল। গোপাল থেমে গেল। পকেট থেকে হাড়টা বের করে অবিশ্বাসীর দিকে উঁচিয়ে বলল, 'গেল মঙ্গলবার আমার কাছে এসেছিলেন না আপনি?' অবিশ্বাসী অবাক, 'কই না তো।' 'এসেছিলেন। শুনুন উনি কী বললেন। কী মশাই, বলব সবার সামনে?' ভিড় বলল, 'বলুন, বলুন।' অবিশ্বাসী কিছু বুঝতে পারছে না—'হ্যাঁ, কিন্তু, আমি তো আসিনি।' গোপাল চালিয়ে যায়, 'এলেন, এসে বললেন, আমার বাড়ির সামনের বাড়িতে দুটো মেয়ে থাকে। আমি বললাম তো কী? উনি বললেন, না, মানে, আমার পানে তাকায়!' এইটি বলার সময় ওই তীক্ষ্ণ চোখ আর দানবীয় মুখে গোপাল এমন একটি লাস্য ও কটাক্ষ তৈরি করল, এমনভাবে একটা আঙুল তুলে রাখল চিবুকে এবং হাসিতে এমন ব্রীড়াবনত

~ www.amarboi.com ~

হল—আজও ভাবলে তাজ্জব মানি! কী করে পারল! ভিড় হইহই হাসছে। লুটিয়ে পড়ছে ওই ভঙ্গিতে। 'আমি তো বললাম, মেয়েসেলে করবেন, তার জন্য মাদুলি? হবে না। দিতে পারব না।' অবিশ্বাসীর ক্ষীণ প্রতিবাদ হইহই-এর চোটে অদৃশ্য। সেইসঙ্গে অবিশ্বাসী নিজেও।

আমাদের বন্ধু চাচা ওকে বলত মাজমাওয়ালা গোপাল। মাজমাওয়ালা মানে কী? চাচার একটা নির্বিকার ভঙ্গি ছিল। বলল, 'যারা ভিড় জমিয়ে মাদুলিটাদুলি বেচে তাদের বলে মাজমাওয়ালা। গোপালদাকে আমি চিনি। খুব ভালো গাঁজা বানায়।'

ক্লাস এইটে পড়ার সময় গোপালের শো দেখতে প্রথম ঢুকি। শো-ই তো! তারপর, আমার ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত যখনই পেরেছি, গোপালের ভিড়ে ঢুকে দাঁড়িয়েছি। গোপালের তখন চুল সাদা, ভুরু নুন-গোলমরিচ। কিন্তু কথা বলতে বলতে দুদিকে দুটো হাতের ডানা ভাসানো, চকিতে ঘুরে যাওয়া, চোখের দৃষ্টির মুহুর্মুহু বদল—জীবনে ভুলব না।

ওই যে বলত না, রাতে বাড়ি ফিরছেন, পিছনে ছপছপ ছপছপ—কে আসছে? ঘুরে তাকালেন—কেউ নেই! বলত তো? বলবার সময়টা ভিড়ের মাঝখানের ওইটুকু জায়গায় মাথা ঝুঁকিয়ে দুটো হাত পিছনে নিয়ে ঠিক তিন থেকে চার পা হাঁটত। সন্দেহগ্রস্থের মতো ওই চার পদক্ষেপ চলার মধ্যেই শেষদিকে চলার গতি কিন্তু আস্তে করে দেবে। যেন ভয় পেল! তারপর সোঁ করে ঘুরে তাকাবে এবং কেউ নেই দেখার পরেকার বিস্ময় ও অধিকতর ভয় ফুটিয়ে তুলবে মুখে। সবটাই দ্রুত। এবং নিখুঁত।

'৮৯ সালে, রানাঘাট থেকেই বনগাঁ যাওয়ার ট্রেনরাস্তা। মাঠের মাঝে গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দেখলাম, গোপাল আমার জানলার তলা দিয়ে লাইন পার হল, মাথা নিচু করে আলপথ ধরে চলে যাচ্ছে, শীতের বিকেল নামছে মাঠে। খুবই আশ্চর্য, গোপালের হাতে কোনো ঝোলা নেই।

ওই শেষ গোপালকে দেখেছি। মাজমাওয়ালা গোপাল। মাজমাওয়ালা মানে জানি না। গোপালকেও কি জানি? কিন্তু আমার দেখা সে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। মুখের বিভঙ্গ, ভুরুর বাঁক, চোখ, কপালের খেলা এবং কতরকমের নিঃশব্দ হাসি যে তার আয়ত্তে ছিল! কখনও মুখটা সরু করে অঃ অঃ একটা অসম্ভব হাসত। কখনও বিদ্যুতের মতো, একটা ই-হি-হি-হি। অট্টহাসি কখনও না। বেশিটাই নিঃশব্দ। ওই পথের ভিড়ের চক্রের মধ্যে ঘুরত যেন খোলা তলোয়ার। না, মেকআপ, না আলো, না মঞ্চ, না আবহ। সংলাপ, সেও তো তারই বানানো নিশ্চয়। কিন্তু দেখতাম, একই কথা, রোজ একরকম করে বলত না। নানা রকমফের করত। নানানভাবে বার করত একই কথার নানা সুর।

সে হয়ত একজন বুজরুক-ই ছিল। কিন্তু 'মা-টি ফেটে রক্ত উটছে। মা কামিকখ্যা ঋতুমতী হয়েসেন'—এই স্বর এখনও স্বপ্নে কানে আসে। মনে হয় সব সত্যি। দেবীও রজস্বলা হন। গোপাল জানত। সেই গোপাল সেবাইত।

রোববার

~ www.amarboi.com ~

ঘোড়াবাবু

ঘোড়াবাবুর সঙ্গে ঘোড়ার কোনো সম্পর্কই ছিল না। ঘোড়াবাবুর দিক্‌দিগন্তে কোথাও ঘোড়ার কোনো চিহ্ন নেই। ছোটো টাউনে একটা দুটো ঘোড়ার গাড়ি ছিল বটে, সে কেবল বর নিয়ে পাশের গ্রামে রওনা হওয়ার জন্য। সামনে ব্যান্ডপার্টি পিছনে রিকশার সারি, দু'জন করে একটা রিকশায়। এই শোভাযাত্রায় ঘোড়ার গাড়ি থাকত মাঝখানে। কিন্তু ঘোড়াবাবুর বিয়ের বরযাত্রীতে এসব হয়েছিল কি না কেউ জানে না। অন্তত আমি জানি না। ঘোড়াবাবু রেস খেলতেন না। ধুতি আর কলার দেওয়া শার্ট পরতেন। আর বসে থাকতেন একটা দোকানে। দোকানটা ঘোড়াবাবুরই নিজের। সেখানে বোয়ামে লজেন্স, বিস্কুট, চকোলেট, ইরেজার, পেনসিল, কলম, রং, পেনসিল, পাঁউরুটি, জেলি, জ্যাম, পলসন, মাখন, 'জ্ঞানের আলো' নামক শিক্ষামূলক খেলনা পর্যন্ত সব পাওয়া যেত। দোকানের নাম শোভা স্টোর্স। অন্য সব মনোহারী দোকানের সঙ্গে শোভা স্টোর্সের একটাই তফাত। শোভা স্টোর্সে থাকত বড়ো একটা টেলিরাড রেডিয়ো। অন্য দোকানে তা থাকত না। টেলিরাড রেডিয়ো এখন উঠে গিয়েছে নিশ্চয়। বড়ো বড়ো পিয়ানো বাটন সামনে। আর রেডিয়োর মাথা-বুক জুড়ে যেখানে স্পিকার থাকে, সে জায়গাটা কাপড়মোড়া। ফলে গমগম একটা আওয়াজ বেরোয়। সকাল সাড়ে ছ'টায় স্কুলে ঢুকছি। এখনই শোভা স্টোর্স খোলা। টেলিরাড রেডিয়ো-ও। ঝড়ের বেগে গানের আওয়াজ বেরিয়ে এসে, প্রথম সকালের রোদ্দুর বিছানো সরু রাস্তায় পড়ছে। ঠিক গান নয়। আ-আ-আ...এইভাবে কাটা কাটা আওয়াজ। কিন্তু সুর ভরা আওয়াজ। কোনো কথা নেই তাতে, বা থাকলেও বোঝা যাচ্ছে না। জড়ানো। পৌনে সাতটায় ক্লাস শুরু। পেনসিল-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লজেন্স কিনছি। নীরব মুখে বোয়াম খুলে লজেন্স বার করছেন ঘোড়াবাবু। একটা গান শেষ হল। পয়সা দিচ্ছি লজেন্সের। দ্বিতীয় গানের অ্যানাউন্সমেন্ট হল। সুবদ্ধ সংগীত অনুষ্ঠানে আপনারা খেয়াল শুনছেন বড়ে গোলাম আলির কণ্ঠে। এরপরের রাগ দেশি টোড়ি। স্কুলে চলে এলাম। সাড়ে আটটায় টিফিন। বেরিয়ে আবার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে শোভা স্টোর্স। এবার আমি এদিকে কিনছি একপিস্ প্লাম কেক। ওদিকে রেডিয়ো থেকে গমগমে আওয়াজ কোনো তারের যন্ত্রের। ডঁা-আ-আ-ও! ডঁা-আউঁউঁউঁ! একটা ধাক্কা দিয়ে, চলে গেল অনেকটা। যেন ভেসে যাচ্ছে আওয়াজটা। আমি কৌতূহল চাপতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী বাজছে? উনি বললেন, ভেঁরো। মানে ভৈরব। ভাবলাম, ভৈরব তবে একটা বাজনার নাম। থ্রি-তে পড়ি তখন আর কী বুঝব। কিন্তু বাজনাই হোক্ আর যাই হোক, ভেঁরো কথাটা প্রথম শুনলাম ঘোড়াবাবুর মুখে।

ঘোড়াবাবুর মুখ ছিল অসম্ভব নির্বিকার ও গম্ভীর। তিনি রেগে না থাকলেও মনে হত সারাক্ষণ রেগে আছেন। তাঁকে রাগ করতে কোনোদিন দেখিনি। তাঁকে হাসতে কোনোদিন দেখিনি। মুখটা খুব ভারী। দাড়িগোঁফ কামানো। একেবারে কপাল থেকে শুরু হয়েছে চুল। সবসময় পিছনের দিকে চাপ চাপ করে আঁচড়ানো। চিবুক ছোটো। নাক ভোঁতার দিকে। দোকানের সামনে দাঁড়ালে চোখে একটা 'কী চাই' ফুটে ওঠে। কোনো জিনিস আছে কি না জিজ্ঞেস করলে দুটো ব্যাপার বলেন। এক, আছে। দুই, আট আনা। বা দশ আনা। বড়োজোর পাঁচ সিকে। এছাড়া একটাও বাড়তি কথা বলেন না। শুধু আমাদের মতো ছোটোদের সঙ্গে বলে নয়। ওঁরই মতন বড়োদের কারও সঙ্গেও কখনও খুব গল্প করছেন ঘোড়াবাবু, এমন দেখা যায় না।

ফাইভে উঠেছি। দুপুর একটা কুড়িতে টিফিন ঘণ্টা বাজল। রাস্তায় আসতে ওইরকম পাঁচ-সাত মিনিট। এবার লক্ষ, শোভা স্টোর্স নয়। তার ঠিক পাশের শিঙাড়া-কচুরির দোকান। শোভা স্টোর্সে দুজন কর্মচারী হাতে করে পাল্লা লাগিয়ে বন্ধ করছে দোকান। ঘোড়াবাবু রাস্তার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে। ওইরকম কথাহারা আ-আ-আ আওয়াজ দ্রুত বেগে আসছে ভিতর থেকে—সঙ্গে খুব তবলা বাজছে। তখনই থামল। শোনা গেল, এতক্ষণ আপনাদের কুকভ বিলাবল রাগে খেয়াল গেয়ে শোনালেন এম আর গৌতম। টকাস করে বন্ধ হয়ে গেল টেলিরাড রেডিয়ো। শোভা স্টোর্সের পাশে দাঁড়িয়ে যখন সদ্য কেনা শিঙাড়ায় কামড় বসাচ্ছি, তখন হাতে একটা ছাতা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন ঘোড়াবাবু। গানটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন বোঝাই যায়। হাঁটা লাগালেন বাড়ির দিকে। ছ'টা থেকে দেড়টা দোকানে বসেছেন। এবার দুপুরে বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করবেন। আসবেন আবার বিকেলে।

পানের দোকানে যেমন অষ্টপ্রহর রেডিয়ো বাজে ঘোড়াবাবুর দোকানে তেমন বাজত না। এমন ধরনের গানই বাজত, যার কথা বোঝা যায় না। এছাড়া বাজনাও বাজত। ঘোড়াবাবু চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন। মৃদুগম্ভীর গলায় কর্মচারীদের এটা-ওটা বলতেন হাসিহীন মুখে। একদিন মায়ের সঙ্গে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি, রাত

~ www.amarboi.com ~

সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। সকালের জন্য পাঁউরুটি নিতে মা রিকশা ঘুরিয়ে আনল শোভা স্টোর্সের সামনে। কিন্তু রিকশাওয়ালা বলে, দোকান তো বন্ধ দিদিমণি। দোকান বন্ধ? হ্যাঁ, দোকান বন্ধই, কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, দোকানের ভেতর থেকে টুংটাং বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। মা নামল রিকশা থেকে। বলল, দরজায় নক কর তো। ভাই প্রতিবাদ করে। সে ধাক্কা দেবে দরজায়। মা বুঝল, ভাই দুমদাম কিল মেরে অনর্থ করবে। বলল, তুমি না। বাবু ডাকো। আমি দরজার সামনে গিয়ে ঘোড়াকাকা, ঘোড়াকাকা করতে লাগলাম। আর বন্ধ দরজায় যথাসাধ্য আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলাম।

ঘড়াৎ করে আওয়াজ। ভ্রু কুঁচকানো মুখ বেরোল। পিছনে মাকে দেখে সমান হল ভুরু-কপাল। আপনি, দিদিমণি? কী দেব বলুন। দুটো গ্রেট ইস্টার্ন দিন। এনে দিলেন। কিন্তু হাসি নেই মুখে। মা কুণ্ঠিতভাবে বলল, আপনাকে বিরক্ত করলাম হয়ত, আসলে শীতের রাত, আর কোথাও খোলা পাব না এখন। সেই স্টেশনে যেতে হবে। ঘোড়াবাবু বললেন, আমিও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে, তাই ওদের বললাম বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে যাও। বাজনা শেষ হলে বাড়ি যাব।

মা দ্রুত লজ্জিত পায়ে আমাকে নিয়ে ফিরে রিকশায় উঠল। পাল্লাটা আর আটকালেন না ঘোড়াবাবু। রিকশা তিনজনকে নিয়ে চলছে, তাই আস্তে। পিছনে তাকিয়ে দেখি অন্ধকার রাস্তায় সরু একফালি আলো আর বাজনা বেরিয়ে আসছে।

তখন সিক্স-এ পড়ি। একটু সাহস হয়েছে। পরদিন টিফিনবেলায় শোভা স্টোর্সে গিয়ে কেক চাইতে ঘোড়াবাবু যখন বোয়ামে হাত ঢোকাচ্ছেন—জিজ্ঞেস করলাম, কাল রেডিয়োতে বাজনাটা কে বাজাচ্ছিল? বাজাচ্ছিল না। বাজাচ্ছিলেন। ঘোড়াবাবুর মুখটা প্রসন্নও নয়। আমি থতমত খেয়ে বললাম, উনি কে? একজন সেতারি! মস্ত বড়। আমার পয়সা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, কেক হাতে চলে আসছি, শুনলাম, দাঁড়াও। ঘুরলাম। বকবে নিশ্চয়। মা তো কতবার বলেছে বড়দের করছিল, যাচ্ছিল বলতে নেই। করছিলেন, যাচ্ছিলেন বলতে হয়। ঘোড়াবাবুর হাতে একটা বই। বাড়িতে যে 'শুকতারা' আসে, তারচেয়ে বড়ো আর চকচকে মতো। ওপরে লেখা বেতার জগৎ। এই যে, ইনি। প্রথম পাতাটা খুলতেই ভিতরের মলাটে একটা বড়ো ছবি। চশমা চোখে এক ভদ্রলোক। পাঞ্জাবি পরেছেন। হাতে একটা বড়ো যন্ত্র। যন্ত্রটার নিচের দিকটা গোল একটা কলসির মতো। মাঝখান দিয়ে কাটা কলসি। আবার যন্ত্রটার মাথার দিকেও অনেকটা ছোটো একটা গোলাকার জিনিস লাগানো। অনেকটা আমার ছোটো মামিমার বড়ো খোঁপার মতো। তারচেয়ে একটু বড়োই হবে। ছোটোমামিমার মাথায় অনেক চুল। তার খোঁপাও বিখ্যাত। সবাই আলোচনা করে। ওই অর্ধেক কলসি মতো জায়গাটা ভদ্রলোকের হাঁটু পার হয়ে নেমেছে। মধ্যে একটা চওড়া পালিশ করা কাঠ—সেখানে বহু তার লাগানো। এটাকে কী বলে? ঘোড়াবাবু বললেন, এই হল সেতার। আর যিনি বাজাচ্ছেন, ওই যে কাল বলেছি, মুস্তাক আলি খাঁ সাহেব। সেতারি। যাও, ঘণ্টা পড়ে যাবে।

~ www.amarboi.com ~

ফিরছি। সে-তার? এ জিনিস তো আগে আমি দেখেছি। তবে বন্ধুরা ফিল্ডিং করতে ডাকতে এল বলে ভালোভাবে লক্ষ করতে পারিনি। এ জিনিসটা দেখেছি বরার বাবার হাতে। বরা আমাদের সঙ্গে পড়ে। আমাদের সঙ্গে খেলে। বরাদের বাড়ি অনেক গাছপালা আর মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গায় আমরা ম্যাচ খেলি। পাঁচিলে গড়িয়ে লাগলে দুই। এক ড্রপে চার। গাছপালার ভেতরে বরাদের বাড়িটা ঢাকা থাকে। উঠোনে গিয়ে জল খাই টিউকল থেকে। সাতজনে-সাতজনে ম্যাচ। বরাদের মাঠে যখন ম্যাচ খেলছি ক্যাম্বিস বলে, তখন টুংটাং কিসের যেন আওয়াজ আসছে একদিন। তার আগেই ব্যাঁকাদার ভাইপো বুড়ো আমায় ওভারের চার নম্বর বলে আউট করে দিয়েছে এক রানে। সেটা প্রথম ওভার। আমি প্রথম ব্যাটসমান। এক রান করলাম কী করে? বরাদের মাঠে নিয়ম ছিল, কোনো বোলার নো বল করলে, যে ব্যাট করছে সে-ই রানটা পাবে। বুড়োকে একটা নো ডেকেছিল আম্পায়ার। সেই এক রানে আউট হয়ে আমি আনমনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বাজনার সোর্সটা খুঁজতে লাগলাম। দেখি, একটা ঢাকনামতো বারান্দায় বসে বরার বাবা কী একটা যন্ত্র বাজাচ্ছেন। যন্ত্রটা ঠিক ওই ঘোড়াবাবুর দেখানো ছবিরই মতো। আর বাজাতে বাজাতে একা একাই হাসছেন। হাসতে হাসতেই আমাকে দেখলেন বরার বাবা। একটুও চামকালেন না। বললেন শুনবে? বোসো। শোনো। মালগুঞ্জি। আমি ভাবলাম উনি যে যন্ত্রটা বাজাচ্ছেন তার নাম মালগুঞ্জি। শুনব কী! বরার ছোটো ভাই এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। নালিশ করল বরাকে, ফিল্ডিং খাটবে না বলে বাবার ঘরে লুকিয়ে বসেছিল। আমি প্রতিবাদ করি। না না, মোটেই লুকোইনি। উনি মালগুঞ্জি বাজাচ্ছিলেন, আমি শুনছিলাম। বরার বড়দি একটা মোড়া পেতে মাঠের ধারে বসে চুল খুলে রোদ পোয়াচ্ছিল। দু মাস আগে সে সংগীত প্রভাকর পাস দিয়েছে। সে চোখ কপালে তুলে মোড়া ছেড়ে ছুটে এল। বলিস কী! তুই এত জানিস! সে কী রে! এত বুঝিস! অ্যাই তোরা ওকে কিচ্ছু বলবি না। ঠ্যাং ভেঙে দেব ওকে কিছু বললে। আমি পার পেয়ে গেলাম।

তাহলে ওটার নাম মালগুঞ্জি নয়। ওটার নাম সেতার? তা হলে মালগুঞ্জি কী?

এর চল্লিশ বছর পর, কলকাতায় গড়িয়ার একটা বাড়ির একতলায় থাকি। জানলার নিচেই সরু রাস্তা আর রাস্তার পরে মাঠ। ভোর ঘুমে একদিন অর্ধেক জেগেছি। কানে এল : উজল কাজল দু'টি...নয়ন তারা...উ-জ-অ-ল, কা-জ-ল দু'টি...পাগলের মতো বিছানা ছেড়ে রাস্তার দিকের জানলা খুললাম। দূরে কয়েকজন মর্নিং ওয়াক করে রোজ। আজ কেউ নেই। শুধু মাফলার জড়ানো শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ এই গানটা গাইতে গাইতে আমার দৃষ্টি এইমাত্র পার হলেন। গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে, ছুটে ঘুরে পিছনের রাস্তায় পৌঁছে দেখি শুধু হালকা কুয়াশামাখা সকালের রোদ। সেই শুভ্রকেশ বৃদ্ধের মুখ কোনোদিনই দেখা হয়নি। কানে শোনা ওই সুরটুকুই তাঁর মুখ।

ঘোড়াবাবুর বাড়ি এক মন্দিরের সামনে। বাড়ির দোতলাটা পুরোটাই ছাদ। সেই ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে ঘোড়াবাবুর মেয়ে। সকলকে দেখেই হাসে। চেনা-অচেনা সকলকে। বয়স ২৫ থেকে ৩৫। স্কুলে যায়নি কখনও। অনেকদিন পরে, অপর্ণা সেনের 'পারমিতার

~ www.amarboi.com ~

একদিন' সিনেমাটি দেখবার সময় সোহিনী হালদার অভিনীত চরিত্রটি দেখে আমার ওই মেয়েটির কথা মনে পড়েছিল। অবিকল ও-ই। বাবার দোকানে সে আসে মাঝে মাঝে। ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে বাড়ি যায়। দোকানের কাছেই বাড়ি। এছাড়া সে আর-একটা সময় বেরোয়। বাড়ির সামনে মন্দিরে মাঝেমাঝেই সদ্যবিবাহিত দম্পতি রিকশা করে প্রণাম করতে আসে। চারপাশের বাড়ি থেকে নানা বয়সের মেয়ে-মহিলারা ছুটে আসে। তখন আলুথালু শাড়িজামায় দৌড়ে আসে সেই মেয়ে। মা এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যান।

বয়স বাড়ল আমার। তিরিশ-বত্রিশে পৌঁছোলাম। তখন ঘোড়াবাবু আর দোকানে বসেন না। বিকেলে প্ল্যাটফর্মে বা নদীর ধারে একটু পায়চারি করেন। অন্য বৃদ্ধদের সঙ্গে গল্পও করেন না। একা তো একাই। বড়োছেলে দোকান চালায়। তবে এর মধ্যে আমি ঘোড়াবাবুর অন্য একটি পরিচয় আবিষ্কার করেছি। আমি তখন রাত দশটা-এগারোটায় রাস্তায় বেরিয়ে ছোট্ট টাউনের নির্জন গলিতে গলিতে সারা রাত ঘুরে বেড়াই। একদিন সরু রাস্তা থেকে তাকালাম। সামনেই কোলাপসিব্‌ল গেট, তারপর বারান্দা। সেখানে ঘোড়াবাবু চোখ বন্ধ করে গাইছেন : ক্যায়সে-এ সু-উ-খ সোওওয়ে। বেহাগ। বিলম্বিত।

পাশে ওই অল্পবুদ্ধি প্রায়-হাবা মেয়েই হারমোনিয়াম ধরে বসে আছে। না, মেয়েটির হাত খেলছে না হারমোনিয়ামের রিডের ওপর। সে দুটি আঙুল দিয়ে সা পা সা চিপে রেখেছে আর বেলো করে যাচ্ছে। বিরাট একটা ম্যাক্সি পরে আছে। তার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে কবেই। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে অন্যমনস্কের মতো। মাঝে মাঝে একটা হাত তুলে অন্য হাতের মশা মারছে। মাঝে মাঝে আপনমনে হাসছে। সে বাবার গান শুনছে না একটুও। তার বাবা মাদুরে বসে একটি হাতে মেঝেতে ভর রেখেছেন, অন্য হাতে সুরটাকে ধরে ধরে যেন খেলাচ্ছেন। মেয়েকে শোনাচ্ছেন না তো বটেই। একদিন বেহাগ শুনেছিলাম। আর একদিন শুনি মোরি পিয়া না পুছে কুছ বাত...এইটা নিয়েই খেলছেন। তারপর মুখে এলেন কউনা গথ ভৈ! বাগেশ্রী। আর একদিন শুনেছিলাম ইয়ে করিম নাম তেরো। মিয়ামল্লার। সবই ওই বিলম্বিত। গাইছেন। কাউকে শোনাচ্ছেন না। আর যে সংগত করছে—সেও শুনছে না। কিন্তু গান চলছে। দুজনে দুরকম মন নিয়ে বসে আছে, বাবা আর মেয়ে। আর নিঝুম রাত্রির গলিতে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি, আর দেখছি সুর নিয়ে খেলতে খেলতে ঘোড়াবাবুর ওই সম্পূর্ণ ভাবচিহ্নহারা মুখে কত সকালরোদ, কত বিকেলআলো, কত ফাগুনজ্যোৎস্না, কত বর্ষারাত্রির আভাস! কত রং!

আজ কেমন মনে হয় ঘোড়াবাবু কখনও হাসতেন না, কারণ তাঁর ওই হাবা মেয়ে সারাক্ষণ হাসত যে!

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরেশ মাস্টার ও তাঁর থিয়েটার

পরেশ মাস্টারের কথা আগে কোথাও বলে থাকব। কোনো লেখায়। আবারও বলছি। কারণ পরেশ মাস্টারের মুখ ছাড়া ফেসবুক হয় না। ঘসঘস করে দ্রুত ওপরদিকে পেনসিল টানলে স্কেচে যেমন চুলের টান আসবে, অবিকল সেইরকমের খোঁচা চুল, কিন্তু সব সাদা। কবেকার পুরোনো একটা কালো ফ্রেমের চশমা, ফ্যাকাশে সাদা ধরনের ফরসা মুখে যার কালো আরও বেশি ফুটে ওঠে। চশমার কাচের পিছনে চোখ দুটো চুপ করেই থাকে সর্বদা—কখনো-সখনো আলো জ্বালিয়ে উলটোদিকের মুখটা 'পড়ে' দেখল একবার। তারপর আবার চুপ করে গেল চশমার নিচে। একদিনের দাড়ি, তাদের সাদা ডগাগুলো বার করেছে সারা মুখে। গায়ের বুশ শার্টটাও সাদা। বুকের দুটো বোতাম দেওয়ার সময় পাননি তখনও, কেন তা পরে বলছি—এখন এটুকু বলি জামার ফাঁকে বুকের সাদা লোমের গুচ্ছ বেরিয়ে আসছে।

এতরকম সাদা সত্ত্বেও লোকটি কিছুতেই শ্বেতশুভ্র নয়। বরং ম্লান। আমরা দুজন বসে আছি চায়ের দোকানের বাঁশ-কঞ্চি কেটে লাগানো বেঞ্চিতে—যে-বেঞ্চি বসা মাত্র ক্যাঁচকোঁচ করেছে। আমরা চায়ের গেলাস হাতে নিয়েছি এক্ষুনি। উনি দাঁড়িয়ে।

আমার সঙ্গী, তার নাম ধরা যাক স্পন্দন—কলেজে পড়ে। নাটক করে বেড়ায়। সঙ্গে কবিতাও লেখে। তাই আমার সঙ্গে চেনা।

আমাদের ছোট্ট ওই টাউনে, পুজোর ঠিক আগে, এ ক্লাবে, ও-ক্লাবে শুরু হয়ে যায় নাটকের তোড়জোড়। নবীন সংঘ কী বই ধরেছে? 'বিনয় বাদল দীনেশ'? তাহলে সারথি সংঘ ধরবে 'গোর্কির মা'। মা যে গোর্কি বলে কারও লেখা একটা বই এবং নাটকের বই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয়, সেটা জানা যাবে পরে, অর্থাৎ ব্যাপারটা সাধারণের কাছে দাঁড়াবে গোর্কি নামে কারও মা। কালিদাস ব্যায়াম সমিতি এবার করাচ্ছে 'দুই মহল'। তাহলে স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন করবে 'চন্দ্রগুপ্ত'। আর এইসব ক্লাব মূলত খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বছরে বারদুয়েক নাটক করাতই। এবং সেসব কিছু হেলাফেলার ব্যাপারও নয়। ফিমেল আনা হত। ফিমেল বললেই সবাই বুঝত যে, স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যাদের টাকা দিয়ে বায়না করা হচ্ছে। তিনটি বা চারটি রিহার্সালের জন্য কিছু রাহা-খরচ। শো-এর দিন মূল টাকাটা। সেটা রিহার্সালের চেয়ে অনেকটা বেশি-ই। কত শুনি! অত কী আর মনে থাকে! তবু, কত? একটা শো-এ যাঁকে একশো টাকা দেওয়া হত, তিনি দামি ফিমেল। কেউ দেড়শো টাকা কিংবা দু'শো এক টাকা দিয়ে ফিমেল আনাচ্ছে শুনলে, লোকে ভাবত কী কাণ্ডটাই না হবে। এইসব অভিনেত্রীরা, নানা যাত্রা ও ক্লাবের নাটকে অভিনয় করে সংসার চালাতেন। কোনো কোনো মেয়ে ছিলেন তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল সদস্য।

এই ছেলেই, যার নাম ধরা গেল স্পন্দন, সে-ই আমাকে এদের কথা বলত। বিভিন্ন ক্লাবে ডাক পড়ত তার। নাটকে কেবল তার উৎসাহ ছিল বলা ভুল। তার ছিল অভিনয়ের সহজাত ক্ষমতা। সাধারণত এসব প্লে হত ক্লাবের বিজয়া সম্মিলনীর আগে-পরে। অমুক ক্লাবের বই পড়েছে একাদশীতে কিংবা লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন, তো অমুক ক্লাবের প্লে হবে তেরোদশীর দিন। কারও বা পড়ল লক্ষ্মীপুজোর পর। কালীপুজোর আগে অবধি চলবে এমন। আর এইসব প্লে যে হত, সব নাটকেই একজন মাস্টার থাকতেন। যিনি শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন। এই মাস্টাররা কেউ ব্যবসা করেন। কেউ চাকরি। কেউ রিটায়ার্ড। কিন্তু নাটক তাঁদের নেশা।

শোনা গেল এবার পুজোর পর বর্মা পাড়া 'সাজাহান' করবে। আমার চেনা ছেলেটি তাতে দারা করছে। প্রায়ই সন্ধেবেলা তার রিহার্সাল থাকে। দেখা কমই হয়। সে অন্য কাদের একটা নাটকেও করছে। ফলে ব্যস্ত। একদিন দেখা হতে বলল, 'আমাদের সাজাহানে যা একজন মাস্টার পেয়েছি না! কবিতা-টবিতা সব মাথায় উঠেছে।' বললাম, কেন, খুব খাটাচ্ছেন তোমাকে, ছেলেটি চুপ করে থেকে বলল, 'এরকম লোক কখনও দেখিনি। আওরঙ্গজেবটা যদি পেতাম! ইস!' আমি বলি, তাহলে তো তোমাকে আরও খাটাবেন!' খুব বকাবকি করেন বুঝি? 'না না। মোটে বাড়তি কথা বলেন না। মেঘা-দা আওরঙ্গজেব পারবে না। পারবেই না। কিন্তু, ওকে ওই বোঝানোটা আমি শুনছি। শুনে রাখছি। পরে যদি কাজে লাগে। চললাম আজ, কেমন। আপনি ওদিকে যাবেন?' চলো। এক রিকশায় দুজনে। 'বোধহয় আজ একটু দেরি-ই হয়ে যাবে আমার। উনি এসে যাবেন। আমি চলি।' দেরি হলে কি রিহার্সালে ঢুকতে দেবেন না? 'না না, সবাই তো দেরি-ই করে। উনি কাউকে কিছু বলেন না।' তবে আমার দিকে একবার তাকান শুধু। কিছু বলেন না। বলতে বলতে এসে পড়ে হেমনলিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। স্পন্দন তার লম্বা শরীরটা নিয়ে ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়ে লাফ দিয়ে নামে রিকশা থেকে। আমার দিকে একবার হাত

~ www.amarboi.com ~

নাড়িয়ে স্কুলবাড়ির গেট গিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। এই স্কুলেরই একটা বড়ো ঘর নিয়ে রিহার্সাল। রিকশা ঘুরিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবি, পরদিন স্পন্দনকে বলব, আমাকে একটু রিহার্সাল দেখাতে নিয়ে যাবে?

কয়েকদিন পর স্পন্দনকে দেখি, রাত আটটায় রাখালদার চায়ের দোকানে বসে আছে, একা। কী ব্যাপার। তোমাদের প্লে কবে? রিহার্সাল যাওনি? 'চা খাবেন?' না। সে উঠে পড়ে, 'চলুন বলছি।' পুকুরধার আর হাই ড্রেন-এর মাঝখান দিয়ে জংলা গাছ ভরতি রাস্তা দিয়ে ফিরছি দুজনে। সে জানায়, প্লে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে কী? কেন?

দুজনে এসে বসলাম আমাদের বারান্দায় রাখা তক্তপোশে। গাছপালার মাথার ওপর চাঁদ। বিমর্ষ গলায় সে যা বলল, শুনে আমি তাজ্জব। সেটা '৭৬ সাল। এমার্জেন্সি চলছে। পরেশ মাস্টার সাজাহান নাটকটা কেটেকুটে, অন্য নাটকের সংলাপ ঢুকিয়ে, নিজে অ্যাড করে, নাটকটার এমন চেহারা দিয়েছেন যে, পুরো জিনিসটা জরুরি অবস্থাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আওরঙ্গজেবকে অনেক স্বাভাবিক আর শান্ত করে দিয়েছেন—কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা ও ডিক্টেটরশিপটা তাতে অনেক জোরালো হয়ে ফুটছে। মেঘা-দা পারছিল না, তাতে কী! অনেকগুলো ক্যারেক্টারকে এদিক-ওদিক করেছেন। ফাইনাল চেহারাটা আসার পরেই ক্লাবের লোকজন বুঝতে পেরে নাটক বন্ধ করে দিয়েছে। সে কী কথা! হ্যাঁ। ওরা অন্য বই করবে। কালীপুজোর পর। সব কংগ্রেসের লোকজন, বোঝেনই তো! ওরা মনিবাবুকে ডেকেছে। উনি 'এ আমি চাইনি' করাবেন। আমাকে যেতে বলেছিল। দূর। আমি আর যাব না।

আমার তখনও বিস্ময় কাটছে না—বলো কী! এসবও হয় না কি! এজন্য নাটক বন্ধ করে দিতে পারে?

'তাই-ই তো দেখলাম। পরেশ মাস্টারকে মেঘা-দা বলল, এর মধ্যে পার্টিবাজি ঢোকাচ্ছেন? বিপ্লবী পার্টিবাজি? ওসব এখানে চলবে না।' উনি কী বললেন? 'উনি কিচ্ছু বললেন না। সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমিও বেরিয়ে এলাম।' তোমায় কিছু বললেন, বেরিয়ে? 'ভেবেছিলাম বলবেন। বললেন শুধু একটা কথা, সাইকেলটা পাম্প করাতে হবে। দোকান কি খোলা পাব?' আর কিচ্ছু না? 'না।'

আপনি ভাবুন, আমাকে দারা থেকে চেঞ্জ করে উনি দিলদার করাচ্ছিলেন। সবাই আপত্তি করল। মানাবে না। কলেজের ছোকরা। উনি বললেন, হাইটটা আছে, মেক-আপটা আমি করিয়ে দেব! ভবানী রেডিয়োকে বাদ দিয়ে আমাকে দিলদার? ভাবুন?

বলো কী? ভবানী রেডিয়ো তো এর আগে দুটো ক্লাবে তিনবার দিলদার করেছে।

তা-ই তো! করেছে-ই তো। মিন্টু ঘোষাল খুব রেগে গিয়েছে। মিন্টু ঘোষালের রেডিয়োর দোকান আছে। ভবানী রেডিয়ো। সেই ভবানী রেডিয়ো নামেই আড়ালে আবডালে মিন্টু ঘোষালকে মেনশন করে সবাই। মিন্টু ঘোষাল সেটা জানেও। একবার তারক মাস্টারের কী একটা বই হচ্ছে, মিন্টু ঘোষালের তাতে পার্ট আছে। তারক মাস্টার সবেতেই টেনশন করতেন। স্টেজে ঢোকার সময় এসে গিয়েছে, কিন্তু ভবানী রেডিয়োকে

~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যাচ্ছে না। তারক মাস্টার চাপা গলায় চ্যাঁচাচ্ছেন, ভবানী রেডিয়ো-র ঢোকা তো এবার। 'ভবানী রেডিও কই? ভবানী রেডিয়ো ঢুকবে তো! অ্যাই ভবানী।' মিন্টু ঘোষাল পাশ থেকে বলতে বাধ্য হল, এই তো আমি, এই তো। 'এই যে ভবানী। কোথায় ছিলে! যাও, তোমার এন্ট্রেন্স। ঢুকে উদ্ধার করো।'

ভবানী আসলে মিন্টু ঘোষালের ঠাকুরদার নাম। সেই নামেই রেডিয়োর দোকান দেওয়া হয়। ভবানী রেডিয়ো শুধু পার্ট-ই করে না। বড়ো একজন পেট্রনও। মোটা টাকা দেয়। তাকে পুরো বাদ? স্পন্দন নিচু আর বিমর্ষ গলায় বলে, 'রিহার্সালে ওঁকে যত দেখতাম, অবাক হয়ে যেতাম। একদিন বাড়ি ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলাম, বদলগুলো কেন করছেন? উনি বললেন, সময়টাকে ধরতে হবে।'

আমি বলি! সময়? উনি বললেন কথাটা?

স্পন্দন বলে, 'হ্যাঁ, সময় কথাটা আর কারও মুখে অমন করে শুনিনি। উনি বলতেন, সময়ের সঙ্গে একটা কানেকশন যদি না বার করতে পারো, তাহলে থিয়েটার করবে কেন বলো? নাটকটা যদি পুরোটাই তেমন না হয়, তবে একটু এদিক-ওদিক করে কানেকশনটা বার করে নিতে হবে। মানে ডিসকভার করতে হবে। একটা নাটকের প্রোডাকশন মানে কী? মানে তো একটা ডিসকভারি! একটা কিছু আবিষ্কার করা, তাই না?'

স্পন্দন, তুমি আমায় একদিন লোকটির কাছে নিয়ে চলো! এরকম কথা আমি শুনিনি। স্পন্দন বলে, 'আমিও শুনিনি, জয়দা। খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন। কিন্তু কথাগুলো এমন না! উনি বললেন, সায়েনটিস্ট যেমন একটা কিছু আবিষ্কার করার জন্য কাজ করে, থিয়েটারও তাই। থিয়েটারও কিছু একটা আবিষ্কার করার জন্য কাজ করে। কী আবিষ্কার করে থিয়েটার? আমি জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, সময়টাকে নতুন করে আবিষ্কার করে।' বলতে বলতে স্পন্দন চুপ করে যায়। তারপর আবার বলে, 'রিহার্সাল থেকে ফেরার সময় ওর পাশে পাশে হাঁটতাম। উনি থেমে থেমে বলতেন এগুলো।' আমি জিজ্ঞেস করি, উনি কী করেন!

কোনো একজন বড়ো কন্ট্রাক্টারের কাছে কাজ করেন শুনেছি। বোধহয় মহেশ সাধুখাঁর কাছে। বলতে চান না বিশেষ।

কী কাজ!

ওই রাস্তা-টাস্তা তৈরির সময় খানিকটা দেখাশোনার কাজ। সুপারভাইজারি আর কী!

একদিন সকাল ন'টার পর একটু আগে এসে পড়েছি দুজনে, পরেশ মাস্টারের বাড়ি। টাউনের একটু বাইরে জায়গাটা। হাইওয়ে থেকে খানিকটা নেমে এসে, বড়ো একটা একতলা বাড়ি, যার সদর দরজা খোলা। স্পন্দন ঢুকে গেল, পিছনে আমি। বড়ো একটা সিমেন্ট বাঁধানো ভিজে উঠোন। উঠোনে কুয়ো। তাতে জল তুলে একটা লোক মাথায় ঢালছে। নিচে এককাঁড়ি বাসন নিয়ে বসে একজন মহিলা। উঠোন ঘিরে সরু বারান্দা ঘুরে বেঁকে এসেছে। বারান্দার ধারে ধারে ঘর। স্পন্দন একটু গম্ভীর গলায় বলল, এখানে পরেশবাবু কোন ঘরটায় থাকেন? সঙ্গে সঙ্গে 'আসছি' বলে একটা আওয়াজ পাওয়া গেল

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কোন ঘর থেকে জানি না। জানলাম—যখন দুটি কিশোরী মেয়ে, একজন আধময়লা ফ্রক পরে, উঠোন থেকে উঠল, একজন একটা ঘর থেকে একটু বেরিয়েই ঢুকে গেল। ময়লা হয়ে যাওয়া সাদা বুশ শার্ট গায়ে গলাতে গলাতে পরেশ মাস্টার বেরিয়ে এলেন। 'চলো।' হাঁটছেন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমরা পিছনে। তারপর দ্রুত পাঁচ মিনিট হেঁটে এই পথের পাশের চায়ের দোকান। আমাদের বসিয়েছেন। নিজে বসেননি। ফর্মাল আলাপও করলেন না আমার সঙ্গে। স্পন্দনকে বললেন, 'আমাকে পেতে না। সাতটায় বেরিয়ে সাইটে চলে যাই। আজ বাড়ির কাছে কাজ হচ্ছে, তাই আছি। ওই দ্যাখো।' একটু দূরে বড় রাস্তা। নোকারি, ধানতলা হয়ে এই রাস্তা চলে যাচ্ছে দত্তফুলিয়ার দিকে। সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একটা স্টিম রোলার। গরম পিচের ওপর পায়ে চট জড়িয়ে হাঁটছে মজুর। রাস্তার ধারে খোয়ার স্তূপে উঠে বসে পাথর ভাঙছে দেহাতি মেয়েরা। আমি বলি, আপনি এগুলো দেখাশোনা করেন বুঝি। 'হ্যাঁ। দুজন সুপারভাইজার আছে। আমার ওপরে একজন। আমি নিচে। চা নাও।' স্পন্দন বলে, খারাপ লাগছে, নাটকটা হল না। উনি বললেন 'কমই হয়। কমই।'

আমি বললাম, মানে!

—মানে তুমি যা চাইবে, তার কমই ঘটবে। বেশিটাই ঘটবে না।

স্পন্দন বলে, আপনি কবে থেকে নাটক করছেন?

কলেজে পড়ার সময় থেকে। তোমার বয়স থেকে। তখন হাওড়ায় থাকতাম।

কলকাতায় কোন গ্রুপে করলেন না কেন?

করেছি। 'এলটিজি।' এখানে যেটা 'পিএলটি' হয়েছে।

আমরা দুজনেই অবাক। স্পন্দন বলে, কী কী নাটক করেছেন। 'অঙ্গার'-এ ছিলাম। 'কল্লোল', 'মানুষের অধিকার'-এ।

স্পন্দন উৎসাহিত। আপনি তার মানে উৎপল দত্তকে চেনেন? উনি তেমনই নির্লিপ্ত। তখন চিনতাম। 'লোয়ার ডেপথ্‌স'-এর সময়ও ছিলাম।

স্পন্দন বলে, 'নীচের মহল'?

হুঁ।

উনি আমাদের পিছন দিকে, চায়ের দোকান পার করে ধু ধু মাঠের দিকে তাকিয়ে। নোকারির মাঠ।

আমি অতি উৎসাহে বলি, কী কী পার্ট করেছেন?

ছোটো ছোটো পার্ট। অনেক সময়ই ডায়লগ থাকত না। ক্রাউড সিনে ঢুকতাম। তবে ওটাই আমার জীবনের বেস্ট পিরিয়ড। রিহার্সালগুলো দেখতে পেতাম তো।

আমি বলি, রিহার্সাল?

হ্যাঁ। রিহার্সাল। থিয়েটারটা যেখানে জন্মায়। সেই আঁতুড়ঘরটা। কী করে হয়ে উঠছে সবটা। সে ছিল বটে একটা সময়।

চশমার নিচে চোখ আবার কিছু দেখল। তবে সামনের কিছু নয়। পিছনের কিছু।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতীতের? 'আমি প্রফেসর ম্যামলক-এর রিহার্সাল দেখেছি। আমি আর উনি তো একই বয়সি দেখতে গেলে। আমি বরং বছর দু'য়েকের বড়।'

উনি মানে!

উৎপল দত্ত। ফাই-ফরমাশ খাটতাম। তার বেশি নয়। কিন্তু যৌবন বোঝো তো? যৌবন?

আমরা ঘাড় হেলাই।

আমার যৌবন বলতে ওটাই ছিল। ওই দিনগুলো। অত বড় একটা লোককে কাজ করতে দেখেছি...অত কাছ থেকে...ওই মাপের কাজ...একেবারে চোখের সামনে...

স্পন্দন বলে, ছেড়ে দিলেন কেন?

ছেড়ে দিলাম। পারলাম না যে! চাকরিও ছিল না। নিজের সংসার করলাম। তখনই দাদা মারা গেলেন। দাদার ছেলেমেয়ে...এই আর কী।

—দাদার বাড়ি কোথায়?

ওই তো, পিছনে নিজের বাসার দিকে আঙুল দেখান তিনি। একটা ঘরে আমরা। আর পাশের ঘরটায় বউদি আর ভাইপো, ভাইঝিরা। দেখলে না!

মুখে কিছু বললাম না। দেখিনি ঠিকই, কিন্তু বুঝেছি পরেশ মাস্টার এমনভাবে থাকেন যে, বাড়িতে অতিথি এলে বসতে দেওয়ার জায়গা নেই। রাস্তার চায়ের দোকানে এনে বসাতে হয়।

আচ্ছা, এবার আমায় যেতে হবে।

এগিয়ে গিয়ে দোকানের পিছনে একটা হেলানো সাইকেল হাঁটিয়ে এদিকে নিয়ে এলেন, 'বুড়ো, সাইকেলটা নিলাম।' বুড়ো নামের দোকানি নিজের চা ছাঁকার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে ঘাড় হেলিয়ে দিল।

আমি থাকতে পারলাম না। বললাম, থিয়েটার না করে থাকেন কী করে?

সাইকেল হাতে থমকে দাঁড়ালেন পরেশ মাস্টার। 'কে বলে আমি থিয়েটারের বাইরে থাকি! ওই দ্যাখো!'

আঙুল দেখালেন সামনের বড় রাস্তার দিকে।

কী দেখছ!

রাস্তা সারাই হচ্ছে।

না। ভালো করে দ্যাখো। একদিকে একটা স্টিম রোলারের শুধু মুখটা বেরিয়ে। পুরো রোলারটা দেখ না কিন্তু, বাকিটা কেটে দাও। শুধু মুখটা বেরিয়ে আছে—ওইটা দ্যাখো। ওই ঢালু থেকে খোয়ার ঝুড়ি মাথায় মেয়েরা উঠে আসছে। এইদিক থেকে পিচের ঝারি হাতে একজন রাস্তা ভেজাতে ভেজাতে সরে এল। এই তিনটে মিলিয়ে দ্যাখো—একটা কম্পোজিশন হচ্ছে না? ওই যে ব্যাকস্টেজ, ওই খোয়ার স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে, ওভারসিয়ারবাবু। এলিভেশন হল! ওই যে আঙুল নেড়ে কী বলছে! দেখছ! দ্যাখো পুরো একটা থিয়েটারের টুকরো না? ওই যে দূর লেভেল ক্রসিং দিয়ে গেদে প্যাসেঞ্জারের চলে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাওয়ার ঘট ঘটাং আওয়াজ আসছে—ওইটাই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। আর ডায়লগ? ডায়লগ তুমি মনে মনে তৈরি করে লাগিয়ে যাও। আমি তো লাগাই। সারাদিন পরপর ডায়লগ লাগাই। ওরা ভাবে আমি সুপারভাইজারি করছি। আসলে তো আমি থিয়েটারের মধ্যেই আছি। থিয়েটারের বাইরে আমি কে বলল! সারাদিন পরপর কম্পোজিশন তৈরি হচ্ছে, আর ভেঙে যাচ্ছে, আবার নতুন কম্পোজিশন তৈরি হচ্ছে আসছে...নতুন নতুন সিন এসে যাচ্ছে...দ্যাখো দ্যাখো...জোন ভাগ করে অভিনয় হচ্ছে...মনে মনে ডায়লগ আসছে। কখনও বা ডায়লগ দরকার হচ্ছে না...আচ্ছা, তোমরা এগোও পরে দেখা হবে।

আর দেখা হয়নি কখনও। আমাদের ওই ছোটো টাউন ছেড়ে ওঁরা সেসময় কোথায় যেন চলে যান। পরে উৎপল দত্তর 'অঙ্গার', 'কল্লোল' এবং এই সময়ের আরও কিছু নাটকের বইয়ের ছাপা ভূমিকালিপিতে পরেশবাবুর নাম নিচের দিকে ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। পরেশ মাস্টারকে আর খুঁজে পাইনি। খুঁজে পাইনি, কিন্তু আমার এখনও মনে আছে, সেদিন দিগন্তজোড়া এক বিস্তৃত স্টেজ যখন দেখছিলেন পরেশ মাস্টার—পুরো ওই রাস্তা, রাস্তার পিছনে মাঠ, রেললাইন, রাস্তা সারানোর মজুর কামিন স্টিম রোলার নিয়ে যখন মনে মনে তৈরি করছিলেন ওঁর ওই বিরাট থিয়েটার—তখন ওঁর মুখটা জ্বলছিল। খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ির মুখ। পেনসিল স্কেচের মতো কদমছাঁট পাকা চুল আর পুরনো কালো ফ্রেমের চশমার নিচে উল্কার মতো হয়ে যাওয়া দুটি চোখকে ধরে রাখা সেই অকালবৃদ্ধ মুখ। হ্যাঁ, সে-মুখ জ্বলছিলই, তাতে ভুল নেই।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

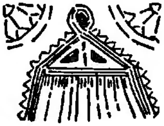

অনুকূল পবন উদয় হয়েছে

হিমাংশুবাবু আসতেন। আমাদের সদর দরজা ভোর ছ'টায় খোলা হত, মা'র স্কুলে বেরোবার সময়। সারাদিন খোলাই থাকত তারপর। দরজাটা দিয়ে ঢুকলে বেশ খানিকটা উঠোনবাগান। একটা বারান্দা। দুটো ঘর। একটা রান্নার জায়গা। একটা কুয়ো। এসব ঘিরে-ঘিরে উঠোন। হিমাংশুবাবু এসে দাঁড়াতেন উঠোনের মাঝখানটায়। পেয়ারাগাছের নিচে। বা শিউলিগাছের ধারে। দুটো জিনিস দু-ভাবে বাঁধা থাকত হিমাংশুবাবুর শরীরের সঙ্গে। মাথার ওপর একটা খোলা ছাতা, বড় গোল ফ্যাকাশে রঙের কাপড় তার। কিন্তু কোমরের কাছে একটা দড়ি দিয়ে ছাতার লম্বা বাঁশের দণ্ডটি বাঁধা। ফলে, হাত দিয়ে ছাতাটা ধরতে হচ্ছে না। হাত দুটোর জন্য আছে অন্য কাজ। সাদা ধুতি দিয়ে গলায় ঝোলানো থাকত একটা হারমোনিয়ম। হাত দুটো ব্যস্ত থাকত সেই হারমোনিয়ম বাজানোর কাজে।

দরজার বাইরে হারমোনিয়মের আওয়াজ যেদিন সকালে পাওয়া যেত, আমরা বুঝতাম হিমাংশুবাবু এসে পড়েছেন। দরজা দিয়ে ঢুকে, উনি সাধারণত যে গানটি গাইতেন, সেটির কথাগুলো হল : চল চল চল, মোর সাথে চল, বেলা গেল বলে কান্ডারি ডেকেছে। উনি উচ্চারণ করতেন এইভাবে উমম্ সলো স-অ-লো, স-অ-লো। মো ও-ওর সাথি সলো-ও-ও-ও. বেলা গেল বলি, কানডারি-ই ডেকিসে-এ-এ-এ। ডি-এল রায়ের 'এ' জীবনে পুরিল না সাধ, ভালোবাসি' এই গানটি যাঁদের যাঁদের মনে পড়ছে, 'সলো সলো'-র ওপর সেই সুরটি বসিয়ে নিন। তাহলেই হবে। উচ্চারণে যতই পুববাংলার টান থাক, সুরে একেবারে ভরা হিমাংশুবাবুর গলা।

ছেড়ে ছেড়ে, থেমে থেমে, সুর খেলিয়ে গাইতেন। সকালবেলার ভিজে ভৈরবী ছেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেত আমাদের উঠোনে। এই গানটি গাইবার সময় হিমাংশুবাবু প্রতিটি লাইনের শেষের শব্দটি টেনে রাখতেন। আগেকার কালের উপযোগী একধরনের খোলা কিন্তু ঈষৎ নাকি স্বর ছিল তাঁর। ফলে, একটি দন্ত্য 'ন', আর তা খুব অস্ফুটও নয়—গানের লাইনের শেষ শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ত। অর্থাৎ 'বেলা গেল বলি কান্ডারি ডেকিসে-এ-এ-এ-ন।' কান্ডারি ডেকেছেনই হল মোদ্দা ব্যাপারটা। এই গানের দ্বিতীয় লাইনটিও মনে আছে : 'স লো স লো স লো-ও-ও-ও. বিলম্বে কী-ই-ই ফলো-ও (বিলম্বে কী ফল) অনুকূলো পবোনো উদয়ো হইয়েসে-এ-ন'। অনুকূলে পবন উদয় হয়েছে কথাটি শোনাত অনুকূল পবন উদয় হয়েছেন।

তখন আমার ১৬/১৭ বছর বয়স। সবে লুকিয়ে-লুকিয়ে লিখতে শুরু করেছি কবিতা। পবন উদয় হয়েছেন, এই কথাটা শুনে শিহরন হয়েছিল। হিমাংশুবাবু তাঁর পিঠের ছাতার বাঁধন কোমর থেকে খুলে, হারমোনিয়ম গলা থেকে নামিয়ে বারান্দায় বসতেন। আর আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ভাই তার বন্ধুদের সঙ্গে ক্যারম খেলত ঘরে। মা রান্নাঘরে থাকত। আমিই হিমাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলতাম। হিমাংশুবাবু সাধারণত দু-সপ্তাহ অন্তর একটা রবিবারে আসতেন। ছাতা আর হারমোনিয়মের সঙ্গে তাঁর কাঁধে থাকত বড় একটা ঝোলা। ছাতা, হারমোনিয়ম সব আবার পূর্বের মতো বেঁধে নেওয়ার আয়োজন করে যখন উঠছেন, মা বলত, হিমাংশুবাবু যেন চলে না যান, আমি আসছি। মা আসত, দুটো আলু, দুটো কাঁচকলা, গাছের পেঁপে দুটো, আর একটা বাটিতে করে আতপ চাল নিয়ে। হিমাংশুবাবুর ঝোলায় ঢেলে দেওয়া হত। হিমাংশুবাবু কোনো কোনো দিন বলতেন, এট্টু ডাল আছি নাহি। জেকুনো ডাল! তবে দ্যান। মা এনে দিত। হিমাংশুবাবু দিদিমণিকে প্রণাম করে বেরিয়ে যেতেন। পাড়ার সব বাড়িতে যেতেন, তা নয়। দুটো-চারটে বাড়িতে যেতেন। হিমাংশুবাবুর মুখে গর্ত-গর্ত বসন্তর দাগ। চুল প্রায় উঠে কপাল অনেক বড়। তাতে একটা চন্দনের ফোঁটা। রং ফরসার দিকে ছিল। পুড়ে কালচে ধরনের এখন। গাইবার সময় মাঝে মাঝে হাসতেন। আর কী সুন্দর যে দেখাত তখন! গাইতে গাইতে পূর্বদিকে তাকিয়ে, যেখানে সূর্যের আলো সকালে তেরছাভাবে এসে পড়ছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে গেয়ে উঠতেন দ্যাখো অনুকূল পবন উদয় হয়েছেন। অনেক শ্যামল গাছপাতার ভিতরে, রোদ-কুয়াশার দিকে চেয়ে মনে হত, যেন ওই আসছেন অনুকূল পবন। কেমন রোমাঞ্চ হত! তাঁকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হিমাংশুবাবু দেখতে পাচ্ছেন যেন সেই অনুকূল পবনের আগমন। মাঝে মাঝেই গানের মধ্যে তিনি, দ্যাখো, ওগো, ওরে, যোগ করতেন। তাতে গানটা যেন আর সবাইকে ছেড়ে সোজা আমার দিকে ধেয়ে আসত। আমাকেই বলত সেই গান আর কথাগুলো। গান তখন যেন গান নয়, বরং গান একটা মানুষ। অন্য মানুষকে কিছু বলছে। মা জলখাবার দিয়েছে। হাতে গড়া রুটি, আর সাদা আলুর তরকারি। হিমাংশুবাবু খুব তৃপ্তি করে খেতে খেতে যা জানাতেন, তার সারমর্ম হল, আগে জলখাবার ওঁদের বাড়িতেও হত। এখানে আসার পর আর হয় না ও-সব। আমাদের বাড়ির পেঁপে

~ www.amarboi.com ~

গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে জানিয়ে দিতেন ওঁদের ঘরেও পেঁপে গাছ ছিল। লঙ্কা গাছ। লেবুগাছ। তবে পেয়ারাগাছটা ছিল না।

হিমাংশুবাবু ছিলেন পেশায় একজন ভিক্ষুক। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে হিমাংশুবাবু বলতাম কেন? সেটা একাত্তর সাল। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলছে। সীমান্ত পার হয়ে কাতারে কাতারে মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে রেলস্টেশনে, রাস্তার ধারে। সমস্ত মফস্‌সল শহরের রেলস্টেশনগুলোতে, পথ কিনারে ঝুপড়ি বানিয়ে কোনোমতে বাস করছে মানুষজন। সেই উদ্বাস্তুদের দলের সঙ্গে হিমাংশুবাবুও চলে এসেছেন। প্রথম যেদিন এলেন, চেহারা দেখেই বোঝা যায়, ভিক্ষে চাওয়াটা আয়ত্ত করতে পারেননি। দরজায় দাঁড়িয়ে গান গেয়ে চুপচাপ ফিরে যাচ্ছিলেন। মা, গান। ওমা, গান—বলে মাকে পীড়াপীড়ি করে তাঁকে ডেকে আনি ভিতরে। আরও খানিক গান শোনার পর জানা যায়, হিমাংশুবাবু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি গ্রামে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের গান শেখানোও ছিল তাঁর জীবিকা। বেতারেও তিনি দুবার গান গেয়েছেন। কিন্তু ২৫ মার্চের গণহত্যার পর, রাজাকার আর খানসেনাদের ভয়ে স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে চলে এসেছেন এপারে। আসতে গিয়ে দালালদের হাতে যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থ সব খুইয়েছেন। তাঁর পদবি ভট্টাচার্য, অর্থাৎ কিনা দেবশর্মণঃ।

মা যেহেতু স্কুলটিচার, তাই বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা আমাদের বাড়ি আসতেন, বা তাঁদের বাড়ির অনুষ্ঠানাদিতে আমরা যেতাম। সেইসব শিক্ষককে মা বলত, বসন্তবাবু, শ্যামবাবু, হরিগোপালবাবু, শঙ্করবাবু, তাপসবাবু, নবচন্দ্রবাবু। সেই সূত্রেই হিমাংশুবাবুকে হিমাংশুবাবু বলা শুরু হল আমাদের বাড়িতে, যেহেতু তিনি শিক্ষক।

গান সম্পর্কে আমার আকুল আগ্রহ। হিমাংশুবাবু রোববারে আসেন, পড়া থাকে না। বারান্দায় হারমোনিয়াম রেখে হিমাংশুবাবু গান গাইতে থাকেন। মা জলখাবার আনে। হঠাৎ একদিন একটা গান গাইছেন, কিছুতেই শেষ করছেন না, গেয়েই যাচ্ছেন, গেয়েই যাচ্ছেন। সে গানের প্রথম দুটো লাইনই মনে আছে এখন। কারণ, ওই দুটো লাইনই উনি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, এদিক-ওদিক করে গাইছিলেন : তুমি কোথা এলে হা-আ-য়!/আমারে-এ সে-এ-এ শুধায়/আমি কী-ই-ই যে বুঝাব তারে-এ/মোরে বুঝায়নি তো বিধাতায়/তুমি কোথা এলে হায়।

গানটা যে কী সুন্দর! আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার গান? এটা কি নজরুলগীতি? হিমাংশুবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে, জিভ কাটলেন। কাজীসাহেব এত খারাপ গান বাঁধবেন? সে কভু হয়! আমি বারবার জিজ্ঞেস করি, তবে এটা কার গান হিমাংশুবাবু জানালেন, এটা কুনো গান-ই না। একখান নকল গান। নকল গান? কার নকল? একখান ওস্তাদি গানের নকল! কী গান সেটা, একটু বলবেন? সে পেল্লায় ওস্তাদি গান, বাবা, সে কি আমার হয়! তবু সে-গান ক্যান-ধারা শোনবা (কেমন ধারা)? দ্যাখো, এ্যান-ধারা গানখানা (এমনধারা)—কিসুটা এ্যান-ধারা—বলে হারমোনিয়ম বাজিয়ে আবার শুরু করলেন। ওঁর দুর্বল অশুদ্ধ হিন্দি উচ্চারণে সে গান প্রথম শুনলাম। পরে যা কতবার রেকর্ড বাজিয়ে

~ www.amarboi.com ~

শুনব। 'ফুল বন কি-ই, গেঁদনঅ মাইকা-আ, না মা-আ-রো-রে। আরে মোরিমি-ই-ত পিহরওয়া। ফুল বন কি-ই ই গেঁদন-অ- মাই-কা...।'

হিমাংশুবাবুকে নাকি কেবলই বলা হয় : তুমি কোথায় এলে? এ তুমি কোথায় এলে, নিজের দেশ ছেড়ে এ কোথায় এলে? সন্ধেবেলা বাতাস ঠান্ডা হয়ে যায়। গায়ে-মুখে শান্তি লাগে, মনে হয় একটা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ। সেই সময় হিমাংশুবাবুকে কেবলই শুনতে হয়, তুমি কোথায় এলে, এ তুমি কোথায় এলে? আমি জিজ্ঞেস করি। কে বলে আপনাকে এ-কথা! পরিবার। আমার পরিবার বলে। রু-জ-ই বলে। পেত্যেকদিন। আমার পরিবার। ইতিমধ্যে মা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। মা বলল, সে তো ঠিকই। আপনার স্ত্রীর তো কষ্ট হবেই। নিজের দেশ ছেড়ে এত দূরে। তারে ঠোঙা বানাতে হয় সারাদিন। কষ্ট অনেক। কাইল রাতে ঘুমাইতে পারলাম না। ঝোপড়ার বাইরে বইসা রইলাম। তারপর আজই এই গানখান বাঁধসি। আমি চোখ কপালে তুলি। এটা আপনি বেঁধেছেন? এই গানটা! হেইডা কি আর আমার গান। নকল একখান। মনে লাগসে তুমার? লাগসে, না! তবে আর একবার শুনো! গাই! হ্যাঁ হ্যাঁ করুন করুন।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের রেকর্ডের সেই চিরস্মরণীয় জৌনপুরি আমি প্রথম শুনি এইভাবে। নিশ্চয়ই কোনো তুলনাই হয় না। কিন্তু সেইসময়ের সকালের রোদটা একেবারে জৌনপুরির রোদ্দুর। হিমাংশুবাবু এমনভাবে বারবার তুমি কোথা এলে হায়, ওগো বলো তুমি কোথা এলে হায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল, মানুষটার বুকটা যেন ভেঙে যাবে। আরে মো-রি মি-ইত পিহরওয়া-র জায়গাটায় উনি কথাটা বসিয়েছিলেন আমি কী-ই-যে বুঝাব তারে, মোরে বুঝায়নি তো বিধাতায়। 'কী-ই-যে বুঝাব তারে' বলার সময়টা একটা হাহাকার ফুটে বেরচ্ছিল। সেই শেষ-ষাট প্রথম সত্তরে রেডিয়ো প্রোগ্রামে একটা জৌনপুরি খুব চেনা ছিল আমার : পায়েলকি ঝনকার বরনিয়া! ঝ-ন-ন-ন বাজে য্যায়সে মোদি পিয়া কে মিলন কে...এই ধরনের। কী জানি কথাগুলো ভুল লিখলাম হয়তো। চল্লিশ বছর তো শুনিনি। গানটা গাইতেন শচীনদাশ মতিলাল। তিনি 'ঝনঝন বাজে য্যায়সে মেরি' এই কথাটায় অনেকক্ষণ থাকতেন, ঘুরে-ঘুরে আসতেন ছোটো মাঝারি তান দিয়ে দিয়ে—আর তাতে কী যে আনন্দ, কী যে আনন্দ! ফলে জৌনপুরি আমার কাছে খুব আনন্দের সুর হিসেবেই ছিল। হয়তো ভুলভাবেই ছিল। হঠাৎ হিমাংশুবাবুর সেদিনের গানে আনন্দটা ছারখার হতে লাগল। পেত্রুস বরেল নামে একজন কবি, যাঁর নাম আর পৌঁছাতে পারেনি পরবর্তী যুগে, সেইরকম একজন কবি, নাকি উৎসাহ-প্রেরণা-ইন্ধন ছিলেন শার্ল বোদলেয়রে-র। সেই কথা জানিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন একটি অমোঘ বাক্য : অনেক সময় মহৎ কাব্য হীনজন্মা হয়। ফৈয়াজ খাঁ বা শচীনদাশ মতিলাল, এঁদের পাশে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু ভিক্ষুক হিমাংশুবাবুর নাম করা যায় না। তবে এক-একটা রাগ, একজন মানুষের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো তো! রাগের আয়ুষ্কাল মানুষের আয়ুর চেয়ে বেশি। শতাব্দী পর শতাব্দী এরা ট্র্যাভেল করে আসছে। টাইম-ট্র্যাভেল করছে। ফলে, এক-একটা রাগের শক্তি অনেকটা বেশি। সে কোনো মানুষের মধ্যে ঢুকে তার ভিতরের অনুভূতির সারাৎসারকে

~ www.amarboi.com ~

বার করে এনে অনেক বড়োভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। সবসময় নয়, ক্বচিৎ কখনও। যদি সেই মানুষটার আঁকড়ে ধরবার জন্য গান ছাড়া অন্য কিছু না থাকে—তবে পারে। হিমাংশুবাবুর গাওয়া ওই গান সেদিন একটা কান্নার মতো ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যেতে লাগল।

এদিকে হিমাংশুবাবু এলেই আমি নানারকম গানের ফরমাশ করতাম। পিকাসো-র ব্লু পিরিয়ডের মতো তখন আমার নজরুলপর্ব চলছে। মধুর নূপুর ঝুমঝুম করুন না। কিংবা হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে। ওইটা করুন ওইটা! ওই যে, কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে। হিমাংশুবাবু আঁতকে উঠতেন। কিছুতেই করবেন না। ওগুনা সব রাতের। এখন করতে নাই। ওঁরা এখন বিশ্রাম করত্যাছেন। মানে কী? গান আবার বিশ্রাম করে না কি? ওইসব সুর, দরবারি কানাড়া, বাগেশ্রী, ওঁদের এখন বিশ্রামের সময়। এখন যাঁরা জাগ্রত আছেন, তাঁদের গাওয়া দরকার। রাতের রাগগুলো দিনে ঘুমায়ে থাকেন। সকালের সুরগুলান রাতে ঘুমান। বুঝলা!

ধীরে ধীরে হিমাংশুবাবুর আসা বন্ধ হয়ে গেল। স্বাধীন বাংলাদেশ হল। আমরা ভাবলাম, উনি হয়তো সপরিবার দেশে ফিরে গিয়েছেন। দিন যায় দিন যায়। সরকারি হাসপাতাল ছিল স্টেশন-সংলগ্ন রেলবাজারের কাছে। একদিন একটা খবরকাগজ কিনে ফিরছি। দেখি সরকারি হাসপাতালের সামনে একজন লোক। খালি গা। ধুতিটা কোনোমতে কোমরের নিচে। একজন রোগা স্ত্রীলোক তার ধুতিটা ধরে রেখেছে। কারণ লোকটির উদর একটা অস্বাভাবিক বিরাট আকার ধারণ করেছে। বাকি শরীর শুকনো। হাসপাতালের সামনে সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চি-মতো জায়গায় লোকটি অর্ধশায়িত। তার মাথা ধরে আছে একটি কিশোর। ওই অতিকায় ও বিকট পেট দেখে রাস্তার লোকে তাকাচ্ছে ও ইস ইস করতে করতে সরে যাচ্ছে। আমি দ্বিতীয়বার তাকিয়েই বুঝতে পারলাম। কাছে গিয়েছি। পেটের চামড়াটা আশ্চর্যজনকভাবে চকচক করছে। হিমাংশুবাবু। চোখ খুললেন। চিনলেন। দাদাভাই, আমি তো কুনোদিন সকালের সুর রাতে গাই নাই, রাতের সুর সকালে গাই নাই। তবে আমার এমন হইল কেন! ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেন জানলাম, উদরী হয়েছে। ডাক্তার বলছে পেটে জল হয়ে গিয়েছে। এখনও বেড পাওয়া যায়নি। তবে পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে একটি তরুণী ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। খুব রোগা, যেমন-তেমন শাড়ি পরা, মলিন-মুখ তরুণী। তার সঙ্গে স্ট্রেচার নিয়ে দুজন। তারা পাঁচ টাকা চায়। ভদ্রমহিলা আঁচলের খুঁট খুলে পাঁচ টাকা বার করে দিলেন। হিমাংশুবাবুকে খুব কষ্ট করে স্ট্রেচারে তোলা হল। উনি আবার বললেন আমার কেন এমন হইল। আমি বললাম, ভালো হয়ে যাবেন। আপনার গান শুনব আবার। হিমাংশুবাবুর চোখ দুটি উজ্জ্বল হল। ধপধপে উজ্জ্বল। এর পাঁচ বছর পর বুদ্ধদেব বসুর লেখায় আমি পড়ব মৃত্যুশয্যায় ভাগনার-এর সংগীত শুনে চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলা বোদলেয়ারের। হিমাংশুবাবু বললেন, আমি পরিবারেরে বলি, অনুকূল পবন উদয় হইতে আছেন...উদয় হইতে আছেন...একটু সবুর করো, একটু সবুর।

স্ট্রেচার নিয়ে চলে গেল। হিমাংশুবাবুর গান গাইবার প্রসন্ন হাসিভরা মুখ ভুল গিয়েছি।

~ www.amarboi.com ~

শুধু মনে আছে, স্ট্রেচার যখন চলে যাচ্ছে তাঁকে নিয়ে, তখনও হিমাংশুবাবু অনুকূল পবনকে উদয় হতে দেখছেন! ওই পুরোনো জরাজীর্ণ ময়লা হাসপাতাল বাড়ির পিছন থেকে যেন স্বয়ং উঠে আসছেন অনুকূল পবন। মনে আছে অনুকূল পবনকে দেখার জন্য সেই আশান্বিত ভাঙাচোরা মুখ, না কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি, সেই কালিমালিপ্ত চক্ষুকোটর। শোওয়ানোমাত্র যে মুখ তার জ্বলজ্বলে দৃষ্টি নিয়ে বিরাট উদরের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল! আর দেখা গেল না।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎবাণী

মথুরাবিলাস আচার্য। পুরোহিতের কাজ করেন। করেন মানে করতেন। কোথায় করতেন? কেন, ফেসবুক-এর সব চরিত্রই যেখান থেকে আসে! সেই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের নদিয়া থেকে এই মথুরাবিলাসও আসছেন। কপালে একটা লম্বা রক্তচন্দনের তিলক। খোলা বাহুতেও রক্তচন্দন। চোখ দুটো বড়। শীত-গ্রীষ্ম ভোরে স্নান। গলায় ঝোলানো উড়নি। যাগযজ্ঞ করেন। কালীপুজোয় খুব নাম মথুরাবিলাস আচার্য-র। কিন্তু তিনি সব বাড়িতে যান না। বেছে বেছে যান। আচার্য বয়সকালে পাঁঠাবলিও দিতেন। বয়সকালে! এখন বয়স কত? আচার্য ঠিক বয়সেই আছেন। পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে যে কোনো একটা হতে পারে। চওড়া বক্ষপট, বলিষ্ঠ কাঁধ। মথুরাবিলাসকে ডাকাতরাও ভয় পায়। বাড়িতে দুটো খাঁড়া আছে। পুরোনো বাড়ি। টাউন ছাড়িয়ে অনেক ভিতরে। নদীর ওপারে যে পরপর গ্রাম, তারই একটায় থাকতেন মথুরাবিলাস।

ডাকাতরা ভয় পায় চেহারার জন্য, না কি কালীপুজোর পুরোহিত বলে? কে জানে! লোকে আড়ালে বলে, মথুরা কাপালিক। কিন্তু গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা ছাড়া কিছু নেই। মথুরা কাপালিক একমাত্র পুজো করতে যাওয়ার সময় রিকশায় উঠতেন। অন্য সময় হাঁটা।

লম্বা, সিধে পিঠ। সারা বছর গায়ে জামা দেন না। ফতুয়া টতুয়া কিচ্ছু না। শীতে একটা চাদর। ডাক্তার-বদ্যির কাছে জীবনে যাননি। টাউনের কোনো ডাক্তারকে রিকশা করে যেতে দেখলে চোখ কঠোর হত। এইসব লোক গরিব ঠকিয়ে পয়সা নেয়। ওষুধের কী দরকার? দুবেলা চান দিক নদীতে। ভোরবেলা উঠুক। ডান নাসা দিয়ে শ্বাস নিয়ে বাম নাসা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়ে ছেড়ে দিক। না কি উলটোটা! রোগ কোথায়! তা না, ডাক্তারের কাছে! মথুরা কাপালিক সংসার করেননি। একজন লোক ছিল। তাকে পাড়ায় বলত, ছুতোরদা। মথুরা কাপালিকও তাকে 'অ্যাই ছুতোর, এদিকে শোন' বলে ডাকতেন। বড়ো কোনো পুজো-আচ্চা থাকলে ছুতোরদা যেত সঙ্গে। সেই ছুতোরদার অসুখ করল। মথুরা কাপালিক ডাক্তার ডাকলেন না। ছুতোরদা মরে গেল একদিন সকালে। মথুরা কাপালিক বললেন, 'ওর আয়ু ছিল না আর। ছকে পেয়েছিলাম।'

মথুরা কাপালিক ডাক্তার মানতেন না। জ্যোতিষ মানতেন। আর লোকেও তাঁকে মানত মস্ত গণৎকার বলে। যা বলতেন তাই নাকি ফলে যেত। দূর-দূর গ্রাম থেকে লোক আসত। শহর থেকেও আসত। পশার খুব। কিন্তু জ্যোতিষী বলে সাইনবোর্ড লাগাননি মথুরা কাপালিক। পিন্টুদা একদিন নিয়ে গেল আমাকে। মথুরা কাপালিক বারান্দায় বসেছিলেন। মাদুরে। পিন্টুদাকে দেখে হাসলেন না। আমাকে তো দেখলেনই না। মথুরা কাপালিক অনেক চেনা লোককেও দেখতে পেতেন না, বিশেষ বিশেষ সময়। ওটাই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। ওই জন্যই লোকে তাঁকে মানত। পৈতৃক পয়সা। কালীসাধনা। যাগযজ্ঞ। ওই চেহারা। বাড়িতে দুটো খাঁড়া, দেওয়ালে ঝোলানো। সব মিলিয়ে নিজের চারিদিকে এই আবহাওয়াটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন মথুরা কাপালিক। কেউ কেউ মিনমিন করে আড়ালে বলত : আচায্যি আবার কাপালিক হয় কী করে? বোষ্টম হওয়ার কথা! কেউ কেউ একধাপ এগিয়ে বলত, আচায্যি কোথায়! উনি তো একজন কুণ্ডু। গাঁয়ের লোক যেমন বলে আর কী। কিন্তু কেউই উপযুক্ত তথ্য বা উৎস-নির্দেশ দিতে পারত না। কেন কুণ্ডু? কুণ্ডু হলেই বা কাপালিক হবে না কেন? আচায্যি কি তান্ত্রিক হয় না?—এসব প্রশ্ন উঠত না।

পিন্টুদা প্রথমেই ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল আমায়। বলল আমাকে দেখিয়ে : এ কিন্তু ও-সব বিশ্বাস করে না। বলে বুজরুকি! মথুরাবিলাস এই প্রথম তাকালেন আমার দিকে। এবং নিমেষে ভস্ম করে দিলেন। চোখ সরাচ্ছেন না। আমি ভস্ম হচ্ছি। তারপর সেই ছাই উড়িয়ে দিলেন ফুঁ দেওয়ার মতো একটি তাচ্ছিল্যময় হাসিতে। দাওয়া থেকে নেমে দাঁড়ালেন। হাতে এক ঘটি জল। ঘটি উঁচু করে গলায় ঢাললেন। আমি বললাম, 'না, বিশ্বাস করি না, তা নয়! মানে আগে থেকে কি এসব বলা যায়?' 'কী বলা যায়!' জল খেতে খেতে থামলেন। থেমে, উঠোনের ওপারে একটা বড় নিমগাছের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলে উঠলেন, একটা গাছের জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত বলে দেওয়া যায়। পিন্টুদা বলল, বলেন কী, গাছের? কী করে?

কষে বলে দেওয়া যায়। কষতে হবে। আঁক কষতে হবে। গণিত-ই সব। জগৎ চলছে গণিতে।

আবার মথুরা কাপালিক এসে বসলেন দাওয়ায়। এই যে সাহেবরা বলে, চন্দ্র, সূর্য কবে জন্মাল। সূর্য কবে মরবে। মানে আগুন নিভে যাবে। মানে সূর্যদেবের মৃত্যুও তারা বলে দিচ্ছে। কী করে বলছে? অঙ্ক কষে দেখে বলছে। বলছে না? পিন্টুদা বলল, কিন্তু ওরা তো সায়েন্টিস্ট। ওরা তো বলবেই। এটা তো বিজ্ঞান।

~ www.amarboi.com ~

বেরোও!

পিন্টুদা অবাক! মানে?

বেরোও, বেরিয়ে যাও।

তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই দাড়ি গজানো রামকেষ্টকে নিয়ে বেরোও!

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। রামকেষ্ট ঠাকুর সাজা হয়েছে। বিজ্ঞান! ওরা অঙ্ক কষবে সাহেব বলে? আমি পারি না? এখুনি বেরোও। দেওয়ালে খাঁড়া আছে। আনব?

পিন্টুদা আর আমি পালিয়ে বাঁচলাম। নদীর ধারে খেয়াঘাটের ধারে একটা চা-দোকানে বসে পিন্টুদা গজরাচ্ছে। দাঁড়া। মথুরা কাপালিককে এমন ধাঁধা দেব না! প্যাঁচে পড়বে।

তুমি আমায় ফাঁসালে কেন পিন্টুদা।

ধুস। কিছু বুঝিস না তুই। ওরকম একটু দিতে হয়। নইলে জমে না।

পিন্টুদা আবার গেল। এবার একা। রাশিচক্র লেখা একটা কাগজ, যাকে জ্যোতিষী-মহলে ছক বলে। তাই দিয়ে এল। ছকে দেখতে হবে ছেলেটির বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে। চাকরিও করে কিন্তু কিছুতেই বিয়ে হচ্ছে না। কবে হবে, তাই জানতেই আসা। মথুরাবিলাস নাকি বলেছেন, ছেলের বিয়ের জন্য এত মাথা ফাটাচ্ছ কেন? ছেলের বিয়ে হয় হবে, নয়তো হবে না। বয়স্কা মেয়ে হলে অরক্ষণীয়া হয়! কেন যে সময় নষ্ট করতে আসো!

পিন্টুদাকে বললাম, কার বিয়ে হচ্ছে না? পিন্টুদা চোখ টিপল। দেখ না। কলকাতায় থাকে। আমার বড় মাসির মেয়ে। টুবলু। তুই তো দেখেছিস। একটাও সম্বন্ধ টিকছে না। ঘটক আনছে। আর সম্বন্ধ কেটে যাচ্ছে।

তাহলে...ছেলের বিয়ে হচ্ছে না বললে কেন?

ও তো মথুরা কাপালিককে বললাম। দেখি কেমন এলেম! ছেলের ছক ভেবে মেয়ের ছক দেখুক! কী কলে পড়েছে জানে না তো, এর নাম অবিনাশ জোয়ারদার। পিন্টুদার ভালো নাম যে অবিনাশ জোয়ারদার সে-কথা সবার মতো আমিও ভুলে গিয়েছি। পিন্টুদা মাঝে মাঝে খেয়াল করিয়ে দেয়। বলল, যেদিন যাব তুইও যাবি। মেয়ের জন্মকুণ্ডলী দিয়ে বলে এলাম, ছেলের ছক। এবার শালা মথুরা কাপালিক একটা মেয়ের ছক দেখে একটা ছেলের ভূত-ভবিষ্যৎ বলবে! হে হে। মজা হবে। চল।

গেলাম। বিকেলে। মথুরাবিলাস বসেছিলেন দাওয়ায়। গাঁয়ের বাড়ি যেমন হয়। সামনে খানিকটা জমি। ঘাস নিড়ানো হয়নি। কলাগাছ। নিমগাছ। সদর দরজা পার হয়ে আমরা এগোচ্ছি, আমাদের দেখেই মথুরাবিলাস বললেন, ভুল আছে।

পিন্টুদা মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল।

আবার বললেন, ভু-উ-ল। ভুল আছে। জন্মসময় ঠিকমতো গ্রহণ করা হয়নি।

পিন্টুদা যেন একটা হোঁচট খেয়েছে। তবু সামনে বলল, আমরা একটু আসব। একটু কথা বলতাম, আচায্যিমশাই।

~ www.amarboi.com ~

আসবে তো বটেই! মথুরা কাপালিক ঘরে উঠে গেলেন। তৎক্ষণাৎ পিন্টুদার দেওয়া সেই টুকরো কাগজটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন। আসবে, কিন্তু কথা বলবে না। বসবেও না! আমার সময় নষ্ট। পিন্টুদার তখন গলা শুকিয়ে গিয়েছে। কেন পণ্ডিতমশাই?

মথুরাবিলাস বসলেন। ভুল জন্মসময় এনেছ। ছেলে? অ্যাঁ, ছেলে? জাতকের নাম নেই। কারণ ও তো জাতক নয়। জাতিকা। অন্তত আমার যেটুকু বিদ্যা তাতে আমি জাতিকা পাচ্ছি। কন্যা।

পিন্টুদা ঝাঁপ দিয়ে বসে পড়ল মথুরা কাপালিকের পায়ের কাছে। আচায্যিমশাই আমি সেইটা তো বলতে এসেছিলাম। সেইটাই কথা। আমায় ভুল বলেছে। দুটো ছক বাড়িতে মায়ের কাছে দিয়ে গিয়েছে। আমি জাতকেরটা আনতে জাতিকা এনেছি, ভুল করে। আপনার তুলনা নেই পণ্ডিত স্যার।

মথুরা কাপালিক ধমকালেন, আবার স্যার কী জন্য! স্যার? যত ম্লেচ্ছ-ভাষা!

বসো। বলো, কিছু জানতে চাও?

পিন্টুদার ঘোর কাটছে না! হ্যাঁ চাই। বলুন কী দেখছেন। আমাদের পিন্টুদা দু-তিন বছর হল এখানে ওখানে সব জ্যোতিষীদের বাড়ি বিরাট শ্রদ্ধাবনত ভাবে মিনমিন করে ঢুকে বাজিয়ে দেখে। যাকে বলে মৃদু প্রশ্ন উত্থাপন করে—যাতে বিশ্বাসের বদলে সন্দেহই বেশি। সেই জ্যোতিষী ভাবে আমার বিরাট ভক্ত। তারপর আবার অন্য আর-এক তাবড় জ্যোতিষীর বাড়ি গিয়ে গুজগুজ করে, উনি তো এটা বললেন, এটা কি ঠিক? তারপর দুজনের মধ্যে লাগিয়ে দেয়। অন্যদিকে সন্দেহ ব্যাপারটা মনের মধ্যে থাকলে জ্যোতিষীর চলবে কী করে। বিশ্বাসটাই বড় সেখানে। এ-সব কথা আমাদের পিন্টুদাই বলে থাকে। কিন্তু শিখতে গেলে তো সন্দেহ লাগবেই। মথুরাবিলাস হাতের কাগজের লেখা রাশিচক্রের দিকে তাকিয়ে বললেন : প্রথমে জাতিকার বর্ণনা। মথুরাবিলাস বলছেন, আমি ও পিন্টুদা শুনছি। টুবলুকে আমি দু-তিনবার দেখেছি। বলছেন, জাতিকার কেশ দীর্ঘ। উচ্চতা মধ্যম। অর্থাৎ পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির এদিকে-ওদিকে। শরীর কিছু ভারী। নৃত্যগীতে পারংগমা। বিদ্যাচর্চায় সাধারণ মানের। শ্যামবর্ণা। চোখ দুটি আয়তাকার। পক্ষ্ম দীর্ঘ। মানে চোখের পাতা লম্বা।

এবার পরিবার। পিতা, মধ্যম উচ্চতা। শীর্ণকায়। মাথা কেশহীন। জাতিকার অগ্রজ কোনো ভ্রাতা সাগরপারে কর্মরত। অন্য ভ্রাতার জীবিত থাকার সম্ভাবনা কম। দুর্ঘটনায় অপঘাত যোগ দ্বিতীয় ভ্রাতার।

মরে গিয়েছে, পণ্ডিতঠাকুর। মরে গিয়েছে, ১৭ বছর বয়সে, মাথায় ক্রিকেট বল লেগে। পা জড়িয়ে পিন্টুদা বলছে। আমায় মাপ করে দিন। ভুল হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। পা ছাড়ো। সবটা বলতে দাও।

কলকাতা-নিবাসী জাতিকার কলকাতা-নিবাসী পাত্রের সঙ্গেই বিবাহ। এখন থেকে এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই। বিবাহের পর জটিল স্ত্রীরোগ ধরা পড়বে জাতিকার। পাত্র

~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘকায় হবে। বিবাহ স্থায়ী হবে না। তথাপি জাতিকা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতিকার বিদেশযাত্রার যোগ প্রবল। স্বামীর বিদেশযাত্রা দেখতে পাচ্ছি না।

পিন্টুদা হাহাকার করে, এগুলো কী করে বলছেন? একটু অ্যানালিসিস করে দিন। সপ্তমে তো শনি। মানে বৈধব্যযোগ! কী হবে, জাতিকা বিধবা হবে?

না। বৈধব্য ঘটবে না। সপ্তমে শনি থাকলেও রক্ষা পাবে।

কীভাবে পাবে, কীভাবে? একটু বুঝিয়ে দিন আমাকে ঠাকুরমশাই।

না। জাতকের ছক বলে জাতিকার জন্মকুণ্ডলী দিয়েছিলে। এখনও আমার বাকি ভবিষ্যৎবাণী মেলেনি। যদি মেলে। মিলে যায়, এস। শেখাব। যাচাই করতে এসেছিলে। পুরোটা পরীক্ষা আমার দেওয়া হল না তোমাকে। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে জাতিকা প্রতিষ্ঠিত হবে। অগ্রজ ভ্রাতার সাহায্যে। জাতিকা যেখানে থাকবে, তার কাছে বড় জলাশয় থাকবে। বিরাট সরোবর। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ঘটবে। তখন এসো? যা জানি শেখাব।

পায়ে পড়ল বারংবার। কিন্তু একবার পায়ে ধরলে যে এফেক্ট, বারবার পা ধরলে সেই এফেক্ট না। পিন্টুদা তো প্রথম থেকেই পায়ে পড়ছে।

একটা জন্মকুণ্ডলী দেখে শুধু জাতিকা নয়, তার মা-বাবা পুরো পরিবারের শারীরিক বর্ণনা অবধি দিয়ে দিচ্ছে! এ তো ভাবা যায় না। এ-জিনিস আমি জীবনে একবারই দেখেছি স্বচক্ষে।

আমি টুবলুকে চিনতাম। টুবলুর বাবাকে চিনতাম। দেখেছি। মাকেও। মায়ের ভারীর দিকে চেহারা। টুবলু নাচত। দাদাকে দেখিনি। কিন্তু মথুরাবিলাস বললেন, অগ্রজের স্কন্ধদ্বয় প্রশস্ত—মাথা শরীরের তুলনায় বড় এবং পশুপাখি ও গণিতের প্রতি আকর্ষণ। টুবলুর দাদা অঙ্কের অধ্যাপক। দেখিনি। শুনেছি। কুকুর-বেড়ালের ওয়েলফেয়ার নিয়ে একটা সংস্থায় জড়িত ওদেশে। এদেশেও পশুপাখির এনজিও-কে চাঁদা পাঠায়। পিন্টুদা বলল, সমস্ত অভাবনীয়ভাবে মিলে গিয়েছে। সে তো আমিও দেখলাম। পরদিন সকালে উদ্ভ্রান্তের মতো পিন্টুদা আবার হাজির হল। আমার গুরু আমি পেয়ে গিয়েছি, রাজি করাবই।

গেলাম আবার। কুয়ো থেকে জল তুলে গায়ে ঢালছেন মথুরা কাপালিক। কেন, চূর্ণি-স্নান কি হয়নি? হয়েছে তো। কিন্তু অতটা পথ গরমে হেঁটে এসে রোজই কুয়োর জলে স্নান করেন পুনরায়। উনি গায়ে জল ঢালছেন। আর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে একটি তরুণী। সুশ্রী বললে কম বলা হয়।

পিন্টুদাকে দেখে প্রথমেই বললেন, শেখাব না। অকারণ প্রাণপাত করছ। তোমারও, আমারও। চলে যাও।

সুশ্রী মেয়েটি মাদুর এনে বারান্দায় পাতছিল—মথুরা কাপালিক বারণ করলেন। না। ওরা বসবে না। মাদুর নিয়ে যাও। ওরা বাড়িতেও ঢুকবে না।

কাতর হল পিন্টুদা। ঠাকুরমশাই মাপ করে দিন। পিন্টুদা দেখি কাঁদছে।

মথুরা কাপালিক গললেন না। আগে বাকিগুলো মিলুক।

~ www.amarboi.com ~

মিলতে দাও। না-ও তো মিলতে পারে। মিলুক। তারপর বলব কী করে মেলাই। একটা ছক আর-একটা ছকের মতো নয়। একটা ঘরে একই গ্রহ দুজন লোকের থাকলেই যে একই ফল দেবে, তা নয়। তোমারও নাক-কান-মুখ-চোখ আছে। হাত-পা আছে। আমারও আছে। আমরা দুজন কি এক লোক?

না ঠাকুরমশাই এক লোক নই। আমরা এক লোক নই।

তবে বেরোও। তিন থেকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মিলবে। তখন এসে বোলো মিলেছে। শেখাব। ঘরে উঠে চলে গেলেন। মেয়েটি গামছা এগিয়ে দিল হাতে। আবার ঘুরে তাকালেন। না, বাড়িতে ঢুকো না। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এ-বাড়িতে ঢুকো না। তারপর মিলেছে কি না, বলার জন্য এসো।

অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। এক বছরের মধ্যে বিয়ে হল টুবলুর। বর, যা বলেছিলেন মথুরা কাপালিক, তারই মতো অবিকল। তার এক বছরের মধ্যে বিরাট অসুখে পড়ল টুবলু। অপারেশন হল। দুবছরের মধ্যে বাপের বাড়ি ফিরে এল। তিন বছরের মাথায় দাদা নিয়ে গেল বিদেশে। তারপর টুবলু যে জায়গাটায় থাকতে শুরু করল, তার খুব কাছে একটা বড় হ্রদ। 'লেক টাহো' তার নাম। পড়াশোনা শুরু করল দাদার তত্ত্বাবধানে। ছোটোখাটো কাজও পেয়ে গেল একটা। ততদিনে চার বছর হয়ে গিয়েছে।

এখন পিন্টুদা কী করল? পিন্টুদা কি মথুরাবিলাসের কাছে এসব খবর নিয়ে গেল? গিয়ে বলল, সব মিলে গিয়েছে ঠাকুরমশাই। এবার শেখান?

পিন্টুদা যেতে পারল না। কারণ মথুরা কাপালিকের কাছে তখন আর কেউ যায় না।

ওই যে সুশ্রী তরুণীকে আমরা দেখেছিলাম, আমি আর পিন্টুদা, সে ছিল প্রতিবেশী এক গৃহবধূ। ছুতোরদা মারা যাওয়ার পর প্রায়ই সে মথুরা কাপালিকের কাছে যেত। বাড়িতে যাগযজ্ঞ হলে সাহায্য করত। মেয়েটি সাধিকা হতে চায়। তার ডাকনাম পারুল। সে চুল আঁচড়ায় না। বাঁধে না। তার মাথায় জটা হল। সে 'বাবা' ডাকে মথুরা কাপালিককে। রাত্রে হোম হয় ঘরের মধ্যে। মথুরাবিলাসের উদাত্তকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে নারীকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণও মেশে। মেয়েটির বাবা-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, বর—কেউ তাকে কিছুতেই কিছু করেই আটকাতে পারল না।

একরাতে আবিষ্কার করা হল, শায়িত মথুরা কাপালিকের শরীরের মধ্যভাগে উপবিষ্টা জটাধারিণী পারুলকে। পাশে হু-হু কবে যজ্ঞের আগুন জ্বলছে।

বস্ত্রহীন ও বস্ত্রীহীনাকে ওই অবস্থায় গ্রামবাসীরা পেটাতে লাগল। মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে কোনমতে গায়ে শাড়ি জড়াল, ও তারপরেই সবাই তীব্র কেরোসিনের গন্ধ পেল। শপশপে কেরোসিন ভেজা শাড়ি নিয়ে যজ্ঞের আগুনে গিয়ে বসে পড়ল সে। দাউদাউ করে ধরে গেল তার কাপড়। হাসপাতালে নিয়ে গেল সবাই। নব্বই ভাগ পুড়ে গিয়েছিল। বাঁচল না। জেলে ধরে নিয়ে গেল মথুরাবিলাসকে। তার আগে মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

বাড়ির নিমগাছটার নিচে তারপর বসে থাকতেন তিনি। কাউকে চিনতে পারতেন না

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মথুরা কাপালিক। লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে ঘরে যেতেন। ঘর ভেঙে দিয়েছে। আগাছা। সম্পত্তিটার দখল নেবে বলে পাশের গ্রামের এক ভাইপো এসে খেতে টেতে দেয়। কবে মরবে কাকা তার জন্য ওত পেতে বসে থাকে। যা-তা বলে সবার সামনে।

পিন্টুদার সঙ্গে তাও গিয়েছিলাম একবার। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। নিমগাছের নিচ বসা। পিন্টুদা ডাকল, পণ্ডিতমশাই। ঠাকুরমশাই। মথুরা কাপালিক তাকালেন। বললেন, হুঁ। মাথাটা ন্যাড়া। হাত-পা লিকলিকে পাশে দুটো লাঠি।

ভাইপো বেরিয়ে এল। কী চাই? কেন এসেছেন? যান, চলে যান! কাকা, ভিতরে চলো। চলোও-ও! কাঁধের কাছটা ধরে নির্দয়ভাবে ওঠাল ভাইপো। ককিয়ে উঠলেন মথুরা কাপালিক।

তারপর দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে, খুব ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন আগাছা ভরা উঠোন দিয়ে, জরাজীর্ণ বাড়ির দিকে।

এরপর আর মথুরা কাপালিককে কখনও দেখিনি। কিছুদিনের মধ্যে শোনা গেল ওই বাড়ির উঠোনে যে বড় ইঁদারা ছিল, তার মধ্যে মথুরা কাপালিককে ঝুলতে দেখা গিয়েছে। গলায় দড়ি দিয়েছেন মথুরাবিলাস।

যে লোকটা দুটো লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না, সে কী করে গলায় দড়ি দেবে, দিতে সক্ষম হবে—এ প্রশ্ন করল না কেউ! সবাই চুপ করে রইল। ভাইপো শ্রাদ্ধশান্তি করলে নমো নমো করে। আর বাড়িটা সারিয়ে সুরিয়ে বাস করতে শুরু করল।

মথুরাবিলাসকে শেষ যে-বার দেখেছি, সেই ভাঙা পোড়ো বাড়ির মতো মথুরাবিলাসের ছবিটা মনে হানা দিত ঠিকই। সেটাই বেশি মনে পড়ে। কিন্তু সব ছাপিয়ে মাঝে মাঝে উল্কার মতো জ্বলে জ্বলে ওঠে একটা দৃশ্য। কপালে রক্ততিলক, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কুঞ্চিত কেশদাম, খোলা উর্ধ্বাঙ্গ, রুদ্রাক্ষ গলায়—সমর্থ বাহু তুলে ওই নিমগাছটির দিকে তর্জনি-নির্দেশ করছেন এক প্রবল পুরুষ। ধকধকে আগুন চোখে নিয়ে বলছেন, একটা গাছের পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু বলা যায়, যদি ঠিকমতো গণনা করতে পারে কেউ। গণিত! গণিত-ই সব! জগৎ চলছে গণিতে।

নিজের অবিশ্বাস্য গণনাশক্তি দ্বারা অন্যের ভূত-ভবিষ্যৎ মিলিয়ে দিতে পারলেও মথুরা কাপালিকের নিজের জীবন গণনা করে রেখেছিলেন কোন অদৃশ্য গণৎকার তা কেউ জানে না!

কিন্তু, এখনও, গ্রামের দিকে, যে কোনো নিমগাছ দেখলেই আমার মথুরা কাপালিকের সেই চোখ আর তর্জনি-নির্দেশ মনে পড়ে যায়। মনে হয়, এই গাছটাও যেন অপেক্ষা করে আছে মথুরা কাপালিক এসে তার জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ জানিয়ে দেবেন বলে।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্যাঁচা মোক্তারের ছেলে

পাখির নামে নাম—বাবা, ছেলে দুজনেরই। বাবার নাম প্যাঁচা মোক্তার। প্যাঁচা মোক্তারকে সত্যিই একটা বড়সড় হুতোম প্যাঁচার মতো দেখতে। কানে গোছা গোছা চুল। মাথাতেও। মোটা ভুরু যেন মাড়ি ছড়ে-দেওয়া টুথব্রাশ। শক্ত, খাড়া। মুখটা গোল। প্যাঁচা মোক্তারও গোল। বুক-পেট প্রায় সমান। পেটটা একটু উঁচু। চোখ দুটো চশমার ওপরের ফাঁকটা দিয়ে তাকায়। এ হল তাঁর নামের সঙ্গে দেখনদারির মিল। দ্বিতীয় মিল হল তিনি দুঁদে উকিল। যদিও তিনি আইন পাশ করেন বেশি বয়সে, তবু তাঁকে কেউ উকিল বলে না। বলে মোক্তার। তবে লোকে এও বলে প্যাঁচা মোক্তার উকিলের বাবা। অর্থাৎ পেশায় বিরাট নাম ডাক। তিনতলা বাড়ি। চারতলার ছাদ। প্যাঁচা মোক্তার অতি অল্প বয়সে বিপত্নীক।

তবে অন্যদিক দিয়েও প্যাঁচা মোক্তার উকিলের বাবা। তাঁর ছেলেকে তিনি আইন পাশ দিইয়েছেন। অল্প বয়সেই। সেও উকিল। এবং প্যাঁচা মোক্তারের ছেলেকে সবাই কাঠঠোকরা উকিল বলে ডাকে। অবশ্যই আড়ালে ডাকে। কাঠঠোকরা উকিল কেন! কারণ সে একটা কাঠঠোকরা পোষে। দোতলার বারান্দায় বিশাল খাঁচা তৈরি করা। তাতে দুটো পুরোনো গাছের গুঁড়ি এনে রাখা। সেখানে কাঠঠোকরা থাকে। স্কুলের ছেলেপুলে বিকেলের দিকে প্রায়ই প্যাঁচা মোক্তারের বাড়ির সামনে এসে ভিড় করত। প্যাঁচা মোক্তারের ছেলের সঙ্গে মোটেই প্যাঁচা মোক্তারের চেহারার কোনো মিল ছিল না। প্যাঁচা মোক্তারের ছেলের নাক তীক্ষ্ণ, চোখ টানা, পাতলা চুল হাওয়ার টানে এসে পড়ছে কপালে। হাইট ছ'ফুটের কাছাকাছি। ছিপছিপে।

সকাল সাড়ে দশটা-এগারোটায় যখন কাছারিতে যেত কাঠঠোকরা উকিল, তখন স্কুলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাওয়া উঁচু ক্লাসের মেয়েরা তো বটেই, ছাদে বারান্দায় কাপড় মেলতে আসা বউ-ঝি'রাও ফিরে দেখতে বাধ্য হত তাকে।

পিছনের রিকশাতেই প্যাঁচা মোক্তার। প্যাঁচা মোক্তার একটা রিকশায় একা। আর সামনের রিকশায় তাঁর ছেলে। এটা প্যাঁচা মোক্তারেরই ঠিক করে দেওয়া নিয়ম। বাড়ি থেকে কোর্ট রিকশায় মিনিট পনেরো। মাসমাইনের রিকশা। ভাড়া দেওয়ার ব্যাপার নেই। প্যাঁচা মোক্তার রিকশা থেকে নেমেই তিন-চার পা এগিয়ে যেতেন।

খাটু, ষষ্ঠীতলার মোড় ঘোরার সময় বাঁ দিকের বাড়িটায় দোতলার দিকে তাকালে কেন?

কাঠঠোকরা উকিল আমতা আমতা করে, কই বাবা, আপনি কী বলছেন! কোন বাড়ি!

অমূল্য কর্মকারের বাড়ি। ওর নাতনিটা দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়।

কাঠঠোকরা উকিল কাঁচুমাচু বলে, কই আমি দেখিনি তো!

প্যাঁচা মোক্তার আশ্বস্ত হন একটু। ছেলে তাঁর মিছে কথা বলে না। দ্যাখোনি তো? ঠিক বলছ?

বাপ-ছেলের এই কথাবার্তা কিন্তু সবার সামনেই হচ্ছে। কোর্টের সবাই এটা জানে। পাড়ার লোকেও জানে।

কোর্ট থেকে ফিরে উলটোদিকে হাঁদু মোদকের দোকান থেকে প্যাঁচা মোক্তারের মুহুরি শিবু শিঙাড়া কিনছে, বাবা ছেলে দুজনে নামছে রিকশা থেকে—দরবেশ খাবে খাটু? আপনি খাবেন বাবা? খেতাম, তুমি যদি খাও। তবে খাব। দরবেশ নাও শিবু, তোমার জন্য নিও। বাড়ির ওদের জন্যও। ২৫টা নাও শিঙাড়া। দরবেশও ২৫টা। বাড়ির ওদের মানে, চারজন কাজের লোক প্যাঁচা মোক্তারের বাড়িতে। তার মধ্যে একজন রান্নার ঠাকুর। ভদ্রক থেকে আনানো। প্যাঁচা মোক্তার বিশাল ভোজনরসিক।

ফেরার পথটাও কিন্তু প্যাঁচা মোক্তারকে বিশেষ খুশি করেননি। খাটু, কলেজের রাস্তাটায় যখন রিকশাটা বেঁকছে তখন তুমি ডান ধারটায় দেখছিলে কেন? কলেজের মেয়েরা, তিনজন। রাস্তা পার হবে বলে দাঁড়িয়েছিল ওখানে।

কই বাবা, আমি তো কলেজের রাস্তার ডাকবাক্সটা দেখছিলাম। নতুন করে লাল রং করেছে মনে হল।

তা হলে ভালো। হ্যাঁ, ডাকবাক্সগুলো সব রং করছে। কদিন দেখছি। এ-কথাও হচ্ছে সবার সামনেই।

এইট-নাইনে পড়ার সময় খাটুদা ভালো ক্রিকেট খেলতে শুরু করে। ইস্কুলের একটা টিম ছিল, যেটা টাউনের একমাত্র লিগ ক্রিকেটে অংশ নিত। সেখানে খাটুদা ভালো খেলে প্রশংসা পাওয়ায় প্যাঁচা মোক্তার খুশিটুশি হয়ে খানতিনেক ভালো ব্যাট কিনে দিলেন। টেন-ইলেভেন-এ পড়ার সময় খাটুদার খেলার হাত আরও খুলল। কিন্তু প্যাঁচা মোক্তার বললেন, ছেলের পা হয়ে যাচ্ছে। রবিবার দুপুরে কোত্থেকে কতকগুলো ছেলেপুলে এসে ডাকবে, খাটু-উ এ খাটু-উ। আর ছেলে বেরিয়ে প্র্যাকটিস করতে চলে যাবে। চোখের

~ www.amarboi.com ~

আড়াল হয়ে গেল তো! এ কী কথা! পড়াশোনা কর বাড়ি বসে। ইস্কুল তো খেলার জন্য নয়। পড়ার জন্য।

প্র্যাকটিসে যাওয়া বন্ধ হল। প্র্যাকটিসে না-গেলে খেলাতেই বা নেবে কেন? খেলাও বন্ধ। যা হোক, ভালোভাবে পাশ-টাশ করে কলেজে ঢুকল খাটুদা। টাউনে একটাই কলেজ যেখানে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। প্যাঁচা মোক্তার তাকে অন্য টাউনে পাঠালেন, সেখানে শুধু ছেলেরাই পড়বে। মেয়েরা নয়। একজনকে সঙ্গে দিলেন। এ বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো কর্মচারী। ছেলে যখন ট্রেনে যাবে, লোকটিও থাকবে। যখন ছেলে কলেজ করবে, তখন সারাদিন সে লোকটিও বাইরে বাইরে ঘুরবে। ক্লাস অফ থাকলে কিছু কিনে খাওয়াবে খাটুদাকে—যা খেতে চাইবে। বিকেলের ট্রেনে খাটুদার সঙ্গে ফিরবে।

ফিরে আসার পর প্যাঁচা মোক্তার জিজ্ঞেস করতেন, ত্রিপুরা, ট্রেনে সব ঠিক ছিল?

ছিল, বাবু।

কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলেনি তো!

না বাবু।

তুমি সবসময় লক্ষ রেখেছিলে? না কি চায়ের দোকানদারের সঙ্গে গপ্পো করতে গিয়ে খেয়াল করনি। আমি সবসময় খেয়াল রেখেছিলাম বাবু। তাছাড়া দাদা আমাদের সেরকম ছেলে নয়। খাটুদাকে কোনো সিনেমা হলের সামনে কেউ দেখেনি। খাটুদা সিনেমা দেখতে যেত না। একবার বা দুবার দেখা গিয়েছে খাটুদাকে—প্যাঁচা মোক্তারের সঙ্গে শ্রীমা টকিজে। একটা বাংলা, একটা হিন্দি ছবি চলার সময় দেখা গিয়েছে। বাংলা ছবিটা হল সাধক বামাখ্যাপা। আর হিন্দি ছবিটা কী? হিন্দি ছবিটার নাম সম্পূর্ণ রামায়ণ।

ফলে, স্কুলে বা কলেজে খাটুদার কোনো বন্ধু হল না। বা বন্ধুত্ব হলেও টিকল না। কলেজে তো সবাই ঠাট্টা-তামাশা করত। সে কিনা একটা লোকের সঙ্গে কলেজে আসে, সে-ই আবার তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। একটা যুবক-ছেলে সম্পর্কে এরকম কথা কেউ কখনও শুনেছে? কলেজে পড়ে অথচ সিনেমা দেখে না? দেখলেও বাবার সঙ্গে? এ কি হয়? ফলে কোনো বন্ধু নেই।

এই সময়ে কাঠঠোকরা পুষতে শুরু করে খাটুদা। আইন পড়তে কলকাতা যেতে হবে। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে সেই ত্রিপুরা। আইন পাশ করে কোর্টেও একা বেরবে না। সঙ্গে বাবা। সন্ধেবেলা বাবার মক্কেলরা আসবে। পাশে বসে আছে খাটুদা।

আমরা মাঝে মাঝে কাঠঠোকরা দেখতে যেতাম। খাটুদা আপত্তি করত না। কোনো বাড়তি উৎসাহও দেখাত না। আয়, চুপচাপ থাকবি, বলে নিয়ে যেত সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায়। যে বারান্দাটা আমরা রাস্তা থেকে দেখতে পেতাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় পৌঁছোতে গেলে একটা ঘর পার হতে হয়। সেই ঘরে ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন প্যাঁচা মোক্তার। ফতুয়া আর ধুতি পরে। চশমার ওপর দিয়ে তাকাতেন আমাদের তিন-চারজনের দিকে। খাটুদাকে বলতেন, পাখি দেখছে তো? গলাটা কেমন ঝড়ঝড়ে মতো। খাটুদা সভয়ে বলত, হ্যাঁ বাবা। দেখ, যেন হুল্লোড় না হয়। পাখি ভয় পাবে। হুল্লোড় কেউই করত না।

~ www.amarboi.com ~

কাঠঠোকরাটাকে দেখার সূত্রে খাটুদার বাড়ি মাঝে মাঝে যাওয়া হত। ছোলা কিনে নিয়ে যেতাম। কাঁচালঙ্কা। খাটুদা খুশি হত কি না বোঝা যেত না। মাছের মতো চোখ দুটো। মুখটায় কোনো ভাব ফুটত না। পাখিটা হয়ত একটু উড়ে বসল। বলল, চল, আর না। ভয় পাচ্ছে। চলে আসতাম আমরা।

একদিন খবর পেলাম খাটুদার কাঠঠোকরা মরে গিয়েছে। দল বেঁধে গিয়েছি সব। দুটো রিকশা করে প্যাঁচা মোক্তার আর খাটুদা গেল শ্মশানে। খাটুদার কোলে কাঠঠোকরা। সাইকেল করে আমরাও গেলাম পিছন পিছন। ত্রিপুরা বলে লোকটি একজন ডোমকে ডেকে নিয়ে এল। তাকে কিছু টাকা দিলেন প্যাঁচা মোক্তার। খাটুদা কোল থেকে দিয়ে দিল কাঠঠোকরাটাকে। মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হল। ফেরার সময় রিকশায় উঠছেন প্যাঁচা মোক্তার। ত্রিপুরা আর খাটুদা আর একটা রিকশায় উঠতে যাচ্ছে—প্যাঁচা মোক্তার বললেন, ছেলেদের বল ওরা সব যেন চলে না যায়। আমাদের সঙ্গে আসুক। আমরা সাইকেলে চললাম পিছন পিছন। হাঁদু মোদকের দোকানের সামনে এসে প্যাঁচা মোক্তার আমাদের জন্য বোঁদে আর গরম জিলিপি বলে দিয়ে বাড়ি ঢুকে গেলেন, ত্রিপুরাকে নিয়ে। বোঁদে আর জিলিপি এল। খাটুদা একটাও নিল না। কাবলু জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার দেখাওনি খাটুদা।

খাটুদার মুখে এবারও কোনো ভাব ফুটল না। চোখ আগের মতোই। মাছের বাজারে বড় মাছ নিথর হয়ে শুয়ে থাকলে বাল্বের আলোতেও যেমন তার চোখে কোনো ভাব ফোটে না—তেমনই চোখে তাকিয়ে বলল, এনেছিলাম। মরার আগে এনেছিলাম। পশুর ডাক্তার। বলল, বাঁচবে না। বলল, কোনো সঙ্গী নেই তাই মরে যাচ্ছে। সঙ্গী থাকলে মরত না! বেঁটে হারু বলল, সঙ্গী মানে! আর-একটা কাঠঠোকরা? থাকলে বেঁচে যেত?

হ্যাঁ আর-একটা কাঠঠোকরা। থাকলেই...

সেটা ছিল শীতকাল। দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। মুখে রোদ্দুর পড়েছে খাটুদার। কিন্তু রোদ্দুর পড়লেও খাটুদার মুখে এক ফোঁটা আলো নেই যেন। আলো অবশ্য কখনোই থাকত না খাটুদার মুখে। কাবলু জিজ্ঞেস করল, ওর কী নাম ছিল? কী বলে ডাকতে ওকে।

একইরকম নিষ্প্রভ চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে খাটুদা বলল, কোনো নাম দিইনি। অ্যাই, অ্যাই বলে ডাকতাম। যে সময়টার কথা বলছি, খাটুদার বয়স বছর চল্লিশ হবে। প্যাঁচা মোক্তারের সত্তর। হাতে মোটা লাঠি নিয়ে চলাফেরা করেন। কোর্টে যান। এবার খাটুদা টিয়া পুষল। কিন্তু একজোড়া পুষেছে। আমরা গিয়েছি। কাঁচা বাদাম, ছোলা, কাঁচালঙ্কা সব নিয়ে। দোতলার ঘরটা পেরবার সময় দেখি ঘরে সভা বসেছে। ত্রিপুরাকাকা আর রান্নার ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তাদের পাশে ঘোমটা দেওয়া একটি বউ। প্যাঁচা মোক্তার বিরক্ত ঝড়ঝড়ে গলায় বলছেন—এ পারবে তো? ত্রিপুরা বলছে, পারবে। যজ্ঞিবাড়ির রান্না করে। পারবে। রান্নার সব ব্যাপার দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিয়েছে এই কথা বারংবার বলছে রান্নার ঠাকুর, আর সে-কথা আমরা বারান্দায় টিয়া দুটোকে খেতে দিতে দিতে শুনতে পাচ্ছি। খাটুদার কোনো হেলদোল নেই। মরা মাছের চোখে টিয়া দুটোকে নির্বিকার দেখছে। আপন মনে বলল, এবার আর মরবে না। জোড়া এনেছি। একটা ছেলে একটা মেয়ে। দুবার কথাটা বলে থেমে

~ www.amarboi.com ~

গেল। ভিতর থেকে আবার প্যাঁচা মোক্তারের খড়খড়ে আওয়াজ হল : দেখো, একমাস বলে ছমাস কোরো না।

বেঁটে হারু বলল, কী হয়েছে খাটুদা? খাটুদা একইরকম মরা গলায় বলল, ঠাকুরকাকা দেশে যাবে। ত্রিপুরাকাকা রান্নার লোক এনেছে। আমি আরও দুটো আনব। কাবলু অবাক, তোমাদের দুজনের জন্য তিনটে রান্নার লোক? একটা বাড়িতে? বলো কী!

খাটুদা বলে, টিয়া আনব। আরও দুটো টিয়া।

আমরা দারুণ খুশি। খুব ভালো! খুব ভালো। নিয়ে এসো। কবে আনবে?

বীরনগরের হাট বসবে এই বুধবার। যাব।

আমরা যখন বেরোচ্ছি খাটুদার বাড়ি থেকে, সকাল এগারো'টা নাগাদ, রান্নার ঠাকুরটি তখন বেরিয়ে যাচ্ছে হাতে টিনের সুটকেস নিয়ে। ত্রিপুরাকাকাকে আশ্বস্ত করছে, একমাসের বেশি একদিনও দেরি করবে না সে। ত্রিপুরাকাকা তাকে রিকশায় তুলে দিচ্ছে এবং নিশ্চিত করছে এই বলে : গয়লাদের মেয়ে হলেও রান্নার কাজ খুব ভালো জানে এ বউটি।

কয়েকদিনের মধ্যে আবার গিয়ে দেখি অত বড় খাঁচাটার মধ্যে ঝটপট করে উড়ে উড়ে বসছে চারটে টিয়া পাখি। আমরা বাদাম ছোলা দিতেই তাদের চাঞ্চল্য আর ডাকাডাকি বেড়ে গেল। এই প্রথম যেন বিরাট খাঁচাটাকে খালি খালি লাগল না। যেন একটা উৎসব চলছে মনে হল।

প্যাঁচা মোক্তারের ঘর পার হয়ে বেরবার সময় দেখলাম ঘোমটা টানা বউটি চা আর কাঁসার বাটিতে মুড়ি-বেগুনি দিচ্ছে প্যাঁচা মোক্তারকে। প্যাঁচা মোক্তার বললেন, খোকাদেরও কয়েকখানা বেগুনি ভেজে দাও। মুড়ি দিয়ে। বউটি ঘাড় হেলিয়ে নিচে নামার সিঁড়ি ধরল। আগে আগে নামছে। আমরা পিছনে। ভারী ধরনের চেহারা। ফলে নামার গতি ধীর। তাছাড়া তার একটা পা একটু ছোটো, খুঁড়িয়ে চলে। আমাদের নামার জন্য সিঁড়ির গায়ে ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। আমার আগে খাটুদা নামছে। এক মুহূর্তেরও কম সময়ের জন্য ঘোমটা একটু টেনে পাশ-চোখে তাকাল খাটুদার দিকে। প্যাঁচা মোক্তারের বাড়ির বড় চাতালটায় আমরা দাঁড়িয়ে বেগুনি আর মুড়ি খাচ্ছি যখন, খাটুদা বলল, তোরা তো ক্রিকেট ম্যাচ খেলিস, খেলিস না? আমরা সমস্বরে হ্যাঁ বললাম। খাটুদা বলল, ব্যাট নিবি? ক্রিকেট ব্যাট? একটু পুরোনো হয়ে গিয়েছে। নিবি? আমরা তো এক পায়ে খাড়া। কখন দেবে? খাটুদা ডাকে, হরুয়া, নিচে গোডাউন ঘরের চাবিটা নিয়ে আয় তো।

একমাথা কাঁচাপাকা চুল, অথচ বালকের মতো সরল ছেলেমানুষ মুখ, এমন একজন আছে খাটুদার বাড়িতে, তার নাম যে হরুয়া তা এতদিন জানতাম না। কিন্তু, যে কোনো লোকের দিকে তার তাকিয়ে থাকাটা কেমন যেন। গা শিরশির করে। সেই হরুয়া চাবি এনে দিতে সিঁড়ির তলায় একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গেল খাটুদা। তাতে খানতিনেক ক্রিকেট ব্যাট। দুটো ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট। পুরোনো একটা ড্রেসিং টেবিল, ফাট ধরে যাওয়া বিরাট আয়না, পারা বেরিয়ে এসেছে, তুলো বার করা একটা বড় সোফা। একটা ময়লা সাদা

~ www.amarboi.com ~

বেসিন মাটিতে রাখা। আরও কত কিছু। মেঝেতে একটা মাদুর কতদিন ধরে পাতা তার ঠিক নেই। কাবলু বলল, চাট্টি হাবিজাবি জিনিস ডাঁই করে রেখেছ? এ ঘরে আবার তালা দাও কেন? খাটুদা জানায়, এই দরজাটার খিল ছিটকিনি দুটোই ভাঙা। তালা দেওয়া ছাড়া বন্ধ করা যায় না। দুখানা ব্যাট নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। আরও একটা ব্যাট, দাঁড় করানো রইল ঘরে। খাটুদা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। হরুয়া সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। আমাদের হাতে ব্যাট দেখে জিজ্ঞেস করল, দাদাবাবু দিয়ে দিল? সেই কেমন একটা তাকিয়ে থাকা। আমরা হ্যাঁ বলতে কেমন একটা হাসল তারপর বলল, আবার পাখি দেখতে কবে আসবে তোমরা? আমরা বললাম, আবার আসব। এসো এসো। পাখি দেখতে এলেই আলুর চপ, বেগুনি, খেলার ব্যাট। এসো এসো। বালকের মতো হাসল আবার।

আমাদের অবশ্য আর টিয়াপাখি দেখতে যাওয়া হয়নি। রান্নার ঠাকুরও একমাসের আগেই ফিরে আসে, কিন্তু ওই বাড়িতে রান্নার কাজও আর ফিরে পায়নি সে। কারণ রান্না করে খাওয়ানোর মতো সেখানে আর কেউ ছিল না।

একদিন হরুয়া রাত দুটোর সময় প্যাঁচা মোক্তারকে ডেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোডাউন ঘরের দিকে আঙুল দেখায়। গোডাউন ঘরে আলো জ্বলছিল। প্যাঁচা মোক্তার ঠেলা দিতেই দরজা খুলে যায়। প্যাঁচা মোক্তার, মেঝের মাদুরের ওপর, খাটুদা আর রান্নার বউটিকে সংযুক্ত অবস্থায় পান। প্যাঁচা মোক্তার রাগে উন্মাদ হয়ে ছেলেকে ওই অবস্থায় লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকেন। ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণ থেকে বহুদিন ব্যবহার না হওয়া একটি ক্রিকেট ব্যাট তুলে নেয়। তারপর ব্যাটমিন্টনের চাপ মারার ঢঙে ব্যাটটি নামে। বলকে ফুল ব্লেডে পাওয়ার বদলে সেই ব্যাট পেয়ে যায় প্যাঁচা মোক্তারের ব্রহ্মতালু। প্যাঁচা মোক্তারের নাক দিয়ে সর্দির মতো গড়িয়ে নামে ঘিলু।

সেই রক্তমাখা ব্যাট হাতে দীর্ঘদেহী, সম্পূর্ণ নগ্ন ও নিস্তব্ধ পুরুষটিকে মৃতদেহের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পায় প্রতিবেশীরা।

যাবজ্জীবন হয়। দুটো টিয়াপাখি কাবলুকে, আর দুটো বেঁটে হারুকে দিয়ে দেয় ত্রিপুরাকাকা। ত্রিপুরাকাকাই বলে, খাটুদা প্যাঁচা মোক্তারের নিজের সন্তান ছিল না। সাত বছর বয়স থেকে মানুষ করেছিল। খাটুদাও সেটা জানত। খাটুদাকে আর আমরা দেখিনি। ওই বাড়িটা পরে কীভাবে কার হাত দিয়ে বিক্রি হয়ে এখন একটা তলায় ব্যাংক, একটা তলায় ওজন বাটখারার অফিস। আর একটা তলায় কোচিং সেন্টার আর জেরক্স হয়েছে। আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে, খাটুদার মুখ। যে মুখে রোদ্দুর পড়ার সময়েও এক ফোঁটা আলো পড়ত না। চোখ দুটো মাছের মতো চেয়ে থাকত, দেখত না কিচ্ছু। মনে পড়ে, কাঠঠোকরাটাকে কবর দিয়ে আসার পর, শীতকালের পড়ন্ত বেলার দিকে তাকিয়ে খাটুদা বলছে, হ্যাঁ আর একটা কাঠঠোকরা। আর একটা কাঠঠোকরা থাকলেই...।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

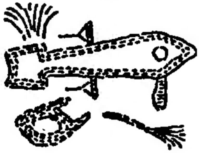

রঙিন মাছের দোকানদার

গলিতে ঢুকে চার নম্বর বাড়িটা, ডানদিকে। পিচরাস্তার গলি, মেনরাস্তা থেকে ঢুকে এসেছে। চলে গিয়েছে একটা বড় পুকুরধারে। ডানদিকে বেঁকে, আবার 'Y' আকারের বড় রাস্তার এক্সটেনশনে মিশবে। মানে হল, ছোটো টাউনের দু-ধারে দুই বড় রাস্তার মাঝখানে ছিপছিপে এক গলিরাস্তা, একটু নিরিবিলি মতো, পরিষ্কার। তার মধ্যে একটা বাড়ি। বাড়িটা রাস্তা থেকেই শুরু। প্রথম ঘরটার দরজা সকাল থেকে খোলা। সকাল থেকেই আলো জ্বলছে ঘরটায়। চৌকো। বেশ বড়, দেড়খানা ঘর মিলে একটা ঘর। ঘরের চারদিকে রঙিন মাছের বাক্স। একটা বেশ বড়। গোটা পাঁচেক ছোটো ছোটো। মাঝখানে একটা টেবিলে সবচেয়ে বড়টা। ঘরের কোনার দিকে টুলে বসে একজন লোক। 'শুকতারা' পড়ছেন। টুকটুকে ফরসা। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই। ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসে বইটা পড়ছিলেন, এই সময় দোকানে দুজন খরিদ্দার ঢুকল। ভদ্রলোক তাদের দেখে ফিক করে হাসলেন। হাসিটা কেমন? স্কুলের নিচু ক্লাসের বালকরা, কোনো গম্ভীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ মাস্টারমশাই ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে গেলে, পরস্পরকে দেখে যেমন হাসে...তেমনি। মাথায় পরিষ্কার ঝকঝকে টাক। তাতে কপালটা অনেক বড় দেখায়। মুখটা অনেক ফরসা। কানের ধার ঘেঁষে সামান্য কালো চুল। আর চোখ? যেন কাজলটানা, গভীর। ঠোঁট দুটো লাল। পান খাচ্ছেন। টুলের পাশের টুলে পানের ডিবে রাখা। যার পাশে হাতের 'শুকতারা'টা রেখে উঠে এসে বললেন, কেঁচো কিনবি, কেঁচো? আর তুই কী সঙ্গে এস্‌চিস?

খরিদ্দারদের তুই বলার কারণ, তাঁর এই দোকানে সব খরিদ্দার বালক। এমনকী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টেন-ইলেভেনের ছেলেও নয়। তার চেয়েও ছোটো। পাঁচ-ছ ক্লাসে পড়ে। বড়োজোর সাত ক্লাস কী আট। যে সময়টার কথা বলা হচ্ছে, তখন বালকরা একাই স্কুলে যেত ও একাই ফিরত। একা-একাই ছেলেপুলেদের সঙ্গে। সারাক্ষণ সঙ্গে বাবা-মা থাকত না। কলকাতা থেকে দূরের ছোটো টাউনে এমনই ছিল দস্তুর। আজ রাস্তায় একজনও স্কুলবালককে কি দেখতে পাওয়া যাবে, যে পথে পড়ে থাকা একটা ভাঙা চায়ের ভাঁড় অথবা ঢিলকে কিক মারছে! কোনো বাচ্চা করবেই না অমন! বাবা-মা বকবে। ওগুলো অসভ্যতা।

এই মুহূর্তে দোকানে যে সম্ভাব্য খরিদ্দারটি ঢুকল তার সহপাঠীকে নিয়ে, তারা সযত্নে একটা ভাঁড়-ভাঙা, দরজার কাছে রেখে ঢুকল। লোকটি তা লক্ষ করে হাসলেন। বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবি? খরিদ্দারের হাফপ্যান্ট একটু ঝুলে পড়ছিল, বগলে বইখাতা চেপে এক হাত দিয়ে প্যান্ট তুলে নিয়ে বলল, নিশ্চয়ই পারব। রোজ যাই। তোর বাড়ি কোথায়? এই জামরুল পুকুরের ওপাশে। আমাকে কেঁচো দিন। লোকটি উঠে ঘরের কোনায় গিয়ে, আবার ফিরে এলেন, হাতে একটা প্লাস্টিকের ছোট্ট প্যাকেট। মুখ বন্ধ। তাতে গুঁড়িগুঁড়ি কেঁচো জট পাকিয়ে আছে। বাচ্চা খরিদ্দারটি আবার বগলে বই সামলে, হাফপ্যান্টের পকেট থেকে পয়সা বার করে দিল। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, মলিটা কেমন আছে? ঘুরছে?—খুব ঘুরছে মলিটা। একটু বড় হয়েছে। দূর, বড় হবে কী করে! আবার বাচ্চাদের মতো হাসলেন লোকটি। খরিদ্দারের সঙ্গে আসা বালকটিও খরিদ্দার হতে চায়। বলে, আমিও মলি মাছ পুষব। পুষিস। কিন্তু কিসে রাখবি? তোর তো অ্যাকোরিয়াম নেই। কিসে রাখব? বালকটি অসহায়ভাবে বলল। লোকটি অভয় দেন—অ্যালুমিনিয়ামের গামলা আছে? ডেকচি? বাড়িতে? আছে, আছে। তাতে রাখিস। নিচে একটু মাটি আর ঘাস দিয়ে দিস'খন।

অন্য খরিদ্দারটি তার সঙ্গীকে হেনস্তা করে। হে হে। ওর মা ডেকচি-গামলায় হাত দিতে দেবে না। লোকটি ব্যাকুল—কেন? কেন? কী করে বুঝলি? সেয়ানা বালকটি আবার বলে, চড়ুইভাতির সময় একটা গামলা এনেছিল খিচুড়ি রাখবে বলে, তাতে ওর মা মেরেছিল। কী পিটুনি! হে হে। আমাদের সামনে। এর মার খাওয়া দেখে ওর যে খুব ফুর্তি হয়েছিল, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। দাঁড়া। দাঁড়া। আসছি। চলে যাসনি। ভদ্রলোক পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, বালক দুটি ভিতরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দরজা দিয়ে বেরোনোর পরই একটা বড় ঘাসজমি। তাতে নানা ফুলগাছ। মাঝখানে রাখা একটা বিরাট সিমেন্টের তৈরি গামলা। তাতে জল ভরা। ওই ঘাসজমি পার হয়ে ভদ্রলোক চলে যাচ্ছেন হনহন করে। জমিটা পার হয়ে একটা সিঁড়ি। ছোটো বারান্দা। তারপর দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেন। ওই ভিতরবাড়িটা তিনতলা। এই ঘাসজমির বাগানটা বাড়িটাকে আলাদা করে রেখেছে রাস্তার কোলাহল থেকে। ওপরে মুখ তুলে তারা দেখল একজন মহিলা। ছাদে একা দাঁড়িয়ে। কী যে সুন্দর তাঁকে দেখতে। কিন্তু তিনি দূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক বেরোলেন ভিতরবাড়ির দরজা দিয়ে। এই যে এনেছি। প্রায় দৌড়ে পার হচ্ছেন

~ www.amarboi.com ~

ছোট্ট বাগান। হাতে একটা মাঝারি সাইজের অ্যালুমিনিয়ামের গামলা। এই যে, এটা নিয়ে যা। এতে পুষিস।

বালকটি এত বোঝেনি। কী করবে ভাবতে পারছে না।

তুই একটা মলি নিয়ে যা। প্লাস্টিকে দিচ্ছি। ছোটো প্লাস্টিকে জল ভরে, সেটা হাতে নিয়ে ভদ্রলোক একটা অ্যাকোয়ারিয়াম খুললেন। ছোটো একটা কাঠের হাতা দিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন একটা মলি মাছকে। যখন চেষ্টা করছেন, কৌতূহলে একটা অন্য মাছ এসে কাঠের হাতটা কী জিনিস, তার মুখ ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল। ফলে মলিটা বারবার ফসকাল। ভদ্রলোক বললেন, এই গাপ্পিটা বদমাইশ। ওর সব জানা চাই। অ্যা-হ-হ-অ্যাই যে, হ্যাঁঃ! মলি মাছটা কাঠের হাতায় এখন ধরা পড়েছে। সাবধানে তুলে প্লাস্টিকে ভরে দিলেন। এই নে নিয়ে যা। আট আনা! সেয়ানা বালকের বন্ধু বালকটি আবার অসহায়, আজ পয়সা নেই। দিসখুনি, দিসখুনি! যে মূল খরিদ্দার সে ততক্ষণে হিংসেয় জ্বলছে। আমি গাপ্পি পুষব।

ভদ্রলোকের কাজলটানা-মতো চোখ আর ফরসা টুকটুকে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—'গাপ্পি নিবি? গাপ্পি? দিচ্ছি দিচ্ছি।' এবার একটা হাতার মাথায় জাল লাগানো বস্তু আনলেন। তাই দিয়ে কষ্টে ধরলেন গাপ্পি মাছটাকে। প্লাস্টিকের প্যাকেটে দিয়ে বললেন, বারো আনা। সেয়ানা বালকটি ইতিমধ্যেই খুশি যে, সে সঙ্গীর চেয়ে বেশি পেয়েছে। সে বলল, ওকে ধারে দিলেন, আমাকেও ধারে দিতে হবে। ধারে দিন। আচ্ছা দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি। সেয়ানা বলে, পয়সা পরে দেব। ভদ্রলোক পয়সার প্রসঙ্গটা যেন পার হতে পারলে বেঁচে যান। আবার বললেন, দিসখুনি, দিসখুনি। দ্বিতীয় বালকটি এক হাতে গামলা, অন্য হাতে মলি মাছ সযত্ন সাবধানতায় ঝুলিয়ে তার স্কুলের বইগুলো নিতে পারছে না। জায়গা নেই তো! বলল, আমি এখন এগুলো নিয়ে যাই। বইখাতা রেখে যাব এখানে? বাড়িতে এগুলো রেখেই এক ছুটে এসে বইটা নিয়ে যাচ্ছি। দে, দে। আমাকে দে। বলে ভদ্রলোক বইখাতা নিয়ে ঘরের একটা কোণে রেখে দিলেন। তাড়াতাড়ি আসিস। বালক দুটি যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন বললেন, আর, ওই কী নাম-বলে-মানে, তোমার-গিয়ে, কী বলছিলাম? একটা কথা—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পাঁচ সিকে। তোদের দুজনের হল গিয়ে পাঁচ সিকে। তোর আট আনা, তোর বারো আনা। কেমন?

বালক দুটি ঘাড় নাড়ল। ভদ্রলোক বললেন, রেখে দে। ওই ভাঁড়-ভাঙাটা আর নিস না। হাতে অত জিনিস তো তোদের!

বইখাতা নিতে দ্বিতীয় বালকটি ফিরে এল আধ ঘণ্টা পর। সে দোকানঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু কথা বলার আওয়াজ আসছে। কেউ কি কাঁদছে? বালকটি ধীরে ধীরে দোকানঘরের ভিতর দিকের জানলা দিয়ে উঁকি দিল বাগানটায়। উঁচু তিনতলা বাড়ি পিছনে থাকায় বাগানটায় তাড়াতাড়ি সন্ধে নামছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সেই মহিলা, যাকে বিকেলবেলা ছাদে দেখা গিয়েছিল। মহিলা তীব্র ধমক দিচ্ছেন লোকটিকে। যাও। গিয়ে ডেকে আনো। আর ও যখন থাকবে, আর কখনও বাড়িতে ঢুকবে না। দোকানঘরে বসে

~ www.amarboi.com ~

থাকবে। বুঝেছ? লোকটি ঘাড় হেলায়। তারপর হাতের চেটো দিয়ে চোখ মোছে। অ্যাঁ...আবার মেয়েছেলের মতো কান্না হচ্ছে! ড্যামনা। নিজের মুরোদ নেই। নিজে একটা হিজড়ে। অন্যকেও আসতে দেবে না।

লোকটি কান্না-ভাঙা গলায় বলে, আমি আসতে দিইনি। এ-কথা বলছ? আমি তো রোজ গিয়ে ডেকে আনি দীপককে। তোমার চিঠি তো আমিই দীপককে পৌঁছে দিয়ে আসি। দীপক বাড়ি না থাকলে কী করব? অন্য কারও হাতে তো দেওয়া যায় না!

ন্যাকা! তখন তো দীপকদা আমার কাছে। কতদিন বলেছি না, দীপকদা যখন আসবে ভিতরবাড়িতে ঢুকবে না। সেই মিনমিন করতে করতে ঢুকেছ। আবার দরজা ধাক্কা দিয়েছ। দেখছ ঘর বন্ধ। তুমি ধাক্কা দেবে কেন শুনি! কেন?

নিচু গলায় লোকটি বলে, আমার খিদে পেয়েছিল বিকেল থেকে। মিটসেফ-এ কোনো খাবার ছিল না। তাই! আবার বাজে কথা! দোকানে বসে সারাদিন কী করলে? পয়সা ছিল না? নগদ পয়সা। কিছু কিনে খেতে পারোনি! দরজায় ধাক্কা দিতে হবে?

না, মানে, সেদিন বিক্রি হয়নি। আর বাড়ি ভাড়ার টাকা তো সব তোমার কাছে রাখো। আমার কাছে পয়সা ছিল না। তা-ই। তাই, কচিখোকার মতো খিদে পেয়েছে, খিদে পেয়েছে করে দরজাটা খুলে দিলে।

আমি বুঝতে পারিনি, বিশ্বাস করো...দরজাটা ঠেলা দিলেই খুলে যাবে!

বোঝোনি! ড্যামনা। বাচ্চা ছেলের হদ্দ। বোঝোনি, তা-ই হাঁ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলে! কী দেখছিলে? অ্যাঁ! দীপকদাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লে!

আমি কিছু দেখিনি। কিচ্ছু দেখিনি! সপাটে এক থাপ্পড় পড়ল গালে। আবার মিছে কথা! হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলে কেন? কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে? আমাদের হুঁশ ছিল না। তাই খেয়াল করিনি। হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠলেন ভদ্রলোক। আমি কোনোদিন অমন দেখিনি। কখনও দেখিনি, শুধু শুনেছি লোকের মুখে ছেলেতে-মেয়েতে অমন নাকি হয়! তাই দেখছিলাম। আবার এক থাপ্পড়। ওইসময় দেখতে হয়! বেরোও। মেরো না। আর মেরো না। আর মেরো না। আর কখনও করব না। যাও। দীপকদার কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে এসো। হাতে-পায়ে ধরে ডেকে আনো। যাও। এখানে বসে ন্যাকার মতো কাঁদবে না। ঝড়াস করে চাবির গোছাসহ আঁচল পিঠে ফেলে ভিতরবাড়ির দিকে রওনা হলেন মহিলা।

ভদ্রলোক বাগানে রাখা জল-ভরা বিরাট সিমেন্টের গামলাটার ধারে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কাঁদতে লাগলেন। বালকটি ইতিমধ্যেই খুব ভয় পেয়ে গেছে। অতবড় একজন মহিলা, একজন ভদ্রলোককে বারবার থাপ্পড় মারছেন, আর লোকটি কাঁদছেন—এমন সে দেখেনি কখনও তার ছোট্ট জীবনে। বালকটি।

এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর দেখতে পেল ঘরের কোনায় তার বইখাতা রাখা। পা টিপে টিপে, যেন কোনো শব্দ না হয়, এইভাবে এগিয়ে, বইখাতা তুলে নিয়ে, সে দরজা দিয়ে কোনোমতে বেরিয়ে গেল। সে যে মলি মাছের দাম দেবে বলে আট আনা পয়সা

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে এনেছিল, সেই আট আনা রয়ে গেল তার পকেটেই। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বালকটি ভাবে, লোকটিকে 'হিজড়ে' বললেন কেন মহিলা? হিজড়েদের তো দেখেছে সে। তারা খুব নাচগান করে, আনন্দ করে। বগলে ছোটো ছোটো ঢোলক নিয়ে আসে, বাজায়। তার বন্ধুর কাকিমার মেয়ে হল যখন, তারা দল বেঁধে এল। তাদের তো একটু অন্যরকম দেখতে হয়। তারা তো শাড়ি পরে সবাই। ইনি তো তেমন নন। তাহলে?

পরের দিন দুপুরে, টিফিন হয়েছে যখন, স্কুলের গেটের সামনে ছেলেদের গাদাগাদি ভিড় ঠেলে সে স্কুলে ঢুকতে দেখল ভদ্রলোককে। উনি এখানে? ভদ্রলোকের একেবারে মুখোমুখি হল বালকটি। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে একেবারেই চিনতে পারলেন না। ভদ্রলোক হাত দিয়ে সামনে এসে পড়া ছেলেমেয়েদের যথাসাধ্য সরিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢুকছেন। মুখটা যেন কালিঢালা। চোখের তাকানোটা একদম অন্যরকম। কী জন্য আমাদের স্কুলে এসেছেন উনি? বালকটি ভাবল। তারপর স্কুলের সামনে দাঁড়ানো আচারওয়ালার কাছ থেকে চালতার আচার কিনে খেতে লাগল। আচার শেষ করে, বাক্স নিয়ে বসা নকুদার কাছ থেকে চার আনার তিলের খাজা নিয়ে যখন কামড় দিতে দিতে ক্লাসের দিকে যাচ্ছে, সে দেখল তাদের বাংলার দীপক স্যারকে। দীপক স্যারকে নিয়ে ঐ ভদ্রলোক, আবারও ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছেন স্কুল থেকে। বালকটি থমকাল। দীপকদা? মানে আমাদের দীপক স্যার?

টিফিনের পরের পিরিয়ড ইতিহাস। ক্লাস চলছে। বালকটি ভাবল, আজই বাড়ি ফেরার সময় আট আনা পয়সা দিয়ে, তবে বাড়ি ফিরবে সে।

বিকেলে ছুটির পর, সিঁড়ি দিয়ে স্কুল-কম্পাউন্ডের সামনে বড় মাঠটায় নেমেই সে দেখল, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর কি জ্বর হয়েছে? এরকম দেখাচ্ছে কেন ওঁকে? বালকটি দেখেছে, জ্বর হলে মানুষকে অন্যরকম দেখতে হয়ে যায়। সে এগিয়ে গেল ভদ্রলোকের কাছে। আপনি আট আনা পান আমার কাছে। মলি মাছ দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক কিছু মনে করতে পারলেন না। কী জানি, আমার মনে নেই, বালকটি বলে, আমি নিয়েছিলাম। কালকে।

কালকে? ভদ্রলোকের মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বালকটিকে ছেড়ে এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে, কিছু একটা দেখতে পেয়েছেন! বালকটি ঘুরে দেখল দীপক স্যার গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক ডাকলেন, দীপক, এই যে ভাই দীপক। দীপক স্যার ঘুরে তাকালেন, কিন্তু হাঁটা থামালেন না। ভদ্রলোক বলছেন, দীপক, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, একটু শোনো। একটু কথা আছে। নিতান্ত অনিচ্ছায় দীপক স্যার দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে দীপক স্যারের হাতদুটো চেপে ধরলেন। একবার চলো, ভাইটি আমার। একবার চলো। আমার অন্যায় হয়েছে সেদিন।

আমার এখন সময় নেই। কীরকম রুক্ষভাবে বলছেন দীপক স্যার। দীপক স্যারের ব্যবহারটিও কেমন যেন অন্যরকম। দীপক স্যারের মুখচোখেও এখন ফুটে বেরুচ্ছে বালকটির অচেনা এক দীপক স্যার। বালকটি কী যেন অজ্ঞাত এক আকর্ষণে ওই দুজনের

~ www.amarboi.com ~

পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। দীপক স্যার বেশ রাগ রাগ করে কথা বলছেন। না না, আমি এখন যেতে পারব না। বলে দেবেন, আমার টিউশনি আছে। ভদ্রলোক আকুলিবিকুলি করতে থাকেন, তোমার বউদি বারবার করে বলেছে। এই যে, চিঠিও দিয়েছে একটা। তুমি একবারটি চলো ভাই। তোমার পায়ে ধরছি।

রাস্তার মধ্যে এসব ড্রামা করবেন না। বললাম তো, আমার টিউশনি আছে। কই কী চিঠি, দেখি? ভদ্রলোক জামার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করছেন। দীপক স্যার হাত তুলে একটা রিকশা থামালেন, ভদ্রলোকের হাত থেকে চিঠিটা প্রায় টেনে নিয়ে উঠে পড়লেন রিকশায়। তারপর ভদ্রলোককে ফেলে চলে গেলেন। ডাকাডাকিতে ফিরে তাকালেন না। কিন্তু, রাস্তার লোকজন ফিরে তাকাতে লাগল ভদ্রলোকের দিকে। তাকিয়ে চলেও যাচ্ছে। বালকটিও চলে আসতে লাগল তার বাড়ির পথে। কিন্তু ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন, রাস্তার একপাশে। বালকটি দেখল, তিনি কিছুই লক্ষ করছেন না। তাঁর নিচের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। আর কাজলটানা-মতো গভীর সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠছে আবার। জল গড়িয়ে নামছে তাঁর গাল বেয়ে। তিনি স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই যে তাঁকে দেখছে, তিনি বুঝতে পারছেন না।

পরের দিন স্কুল যাওয়ার পথে বালকটি দেখল দোকান বন্ধ। ফেরার সময়ও বন্ধ। দোকান তখন থেকে বন্ধই। বালকটি তার সহপাঠীকে জিজ্ঞেস করল, গাপ্পি মাছের দাম দিয়েছিস কি? সেও বলেছে, দোকান বন্ধ, কী করে দেব?

দোকান আর খুলল না কখনও। ভদ্রলোককেও আর কখনও দেখতে পেল না বালকটি। বালকটি ধীরে ধীরে বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে, মধ্যবয়স পার হয়ে প্রৌঢ়তায় পৌঁছেছে। ভদ্রলোক সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসা নির্বাপিত হয়নি বলে, সে দিনে দিনে, লোকমুখে একটু একটু করে জানতে পেরেছে যে, সেইসময়ই একদিন ভদ্রলোক বারাকপুরের ফেরিঘাট থেকে লঞ্চে করে রওনা হয়েছিলেন শ্রীরামপুর যাবেন বলে। শ্রীরামপুরে নাকি তাঁর শ্বশুরবাড়ি। লঞ্চ মাঝগঙ্গায় পৌঁছোতে হাতের ব্যাগটা লঞ্চের ডেকে নামিয়ে রেখে সোজা ঝাঁপ দেন। ওই ব্যাগ থেকে ভদ্রলোকের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা পাওয়া যেতে, খবরটা সবাই জানতে পারে। বডি পাওয়া যায় তিনদিন পর, অনেক দূরে। আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছিল না। ওই মহিলা নাকি শনাক্ত করতে যেতে বা বডি বাড়িতে আনতে চাননি। ওখানেই দাহ হয়।

ওই মহিলাকেও সে পরে আর কখনও দেখেনি। বাড়ি বিক্রি করে তিনি অন্য কোথাও চলে যান। দীপক স্যারও সেই বছরই স্কুলের কাজ ছেড়ে দেন। মলি মাছটাও মরে ভেসে উঠেছিল ক'দিন পরেই। তাদের বাড়িতে থেকে গিয়েছিল শুধু ভদ্রলোকের দেওয়া অ্যালুমিনিয়ামের গামলাটা। পরে, তারা যখন কুকুর পোষে, সেই গামলায় কুকুরকে খেতে দেওয়া হত।

আজ এই প্রৌঢ় বয়সে দাঁড়িয়ে, সেদিনের সেই বালকবেলা যখন মনে পড়ে, তখন অল্প আলোয় ভরা রঙিন মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামে সাজানো সেই মায়াময় ঘরটিও তার মনে পড়ে যায়। যে-ঘরে বসে ফুটফুটে ফরসা এক ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক 'শুকতারা' পড়ছেন।

~ www.amarboi.com ~

যাঁর হাসি বাচ্চা ছেলেদের মতো। মনে পড়ে। মনে পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তার মনে পড়ে, স্কুল ছুটির পরের সেই বিকেল। দীপক স্যারের রিকশার পিছনে ডাকতে ডাকতে সেই কিছু দূর ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া। মনে পড়ে, হেলানো রোদ নিজের মুখে ও শরীরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। ফরসা মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। নিচের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। কাজলটানা-মতো গভীর সুন্দর চোখ এইমাত্র ধীরে ধীরে জলে ভরে উঠল। এইবার জল, চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে নামবে কোনোদিন দাড়ি না-ওঠা গাল বেয়ে। গড়িয়ে নামবে। ওই, ওই যে নামল! নামছে, নামছে...৪৫ বছর আগে এক বিকেলবেলায়।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অমূল্য মুখুজ্যের অভিনয়

এমনিতে কেমন আছেন? খবরটবর? ভালো? পড়েচেন, লেখাটা? দেশেতে বেরুচ্চে? সেই সময়? পড়েচেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই লেখাটা সবাই পড়ছে। আসলে কী জানেন, ওই লেখাটায় না আমার একটা পার্ট আছে। বুয়েছেন। একটা পার্ট। আমার।

পার্ট আছে? মানে?

ওই দেখবেন, ওখানে একজন নাচিয়ে আছে না? মানে গানটায় গায়, বাইজি মহিলা আর কী! হীরাবুলবুল?

হ্যাঁ আছে।

ওই মহিলার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক থাকে। রাইচরণ। ওই পার্টটা আমার। আমি কেটে-কেটে রাখছি পাতাগুলো। প্র্যাকটিস করছি, মানে পার্টটা। আসবে একদিন। দেখাব করে। আজই, চলুন না? আজ?

অমূল্য মুখুজ্যে। তোমার থেকে চল্লিশ বছরের বড়ো। তখন তোমার চব্বিশ। ওঁর চৌযট্টি। কিন্তু 'আপনি' করে বলবেনই। তালঢ্যাঙা বলতে যা বোঝায় তাই। লম্বাটে মুখ। চোখ দুটো যেন কোটর থেকে তাকায়। নাকটা খাড়া। অত লম্বা কিন্তু ঝুঁকে দাঁড়ান না। বসেন পিঠ সিধে রেখে। দু-পাঁচ মিনিট কথা বললেই চোখে পড়বে হাত দুটো। আজানুলম্বিত বাহু কথাটা পড়েছ বইতে কিন্তু দেখেছি কি? এই অমূল্য মুখুজ্যেরই দেখলে। হাত দুটো কেন চোখে পড়বে? কথা বলতে বলতে হাতের লম্বা আঙুল এমন বাঁকাবেন—এত মুদ্রা আসবে তাতে—যে হাত দুটো না দেখে পারা যাবে না। দুটো হাত কাঁধের দুধারে ছড়িয়ে কিছু একটা বোঝাবেন হয়তো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কী বোঝাবেন? নিশ্চিত কোনো অভিনয়।

হো চি মিন-টা কি দেখলেন? ফুলিয়ায় হল যে?

হ্যাঁ, গেছিলাম।

কই আপনাকে দেখলাম না তো? কীসে ফিরলেন? লাস্ট শান্তিপুর লোকালে?

না না লরি ধরে ফিরেছি। স্পন্দন একটা লরি থামাল। আমি আর স্পন্দন গেছিলাম তো।

ও, তাই বলুন। আপনার সঙ্গে দেখা হল না। সমীর লাহিড়ী ওটা ভালোই করেছেন। ভালো মানে এক্সেলেন্টেও বলতে পারি। তবে আমি হলে সমীরবাবুর মতো করতাম না। অ্যা-অ্যাকেবারে অন্য ভাবে করতাম বুয়েছেন? পালা ভাঙতে পেছনে গেলাম। তখন গাড়িতে ওঠার তোড়জোড় চলছে। ভদ্রলোককে দু-এক কথা বলতেই আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। অ্যাপ্রিশিয়েট করলে তো আর্টিস্ট খুশি হবেই, তাই না? চলুন একটু বাড়ি গিয়ে দেখাই কীভাবে করব?

আর-একদিন যাব অমূল্যদা, আজ হবে না।

ঠিক আছে তাই হবে। এখন কী করবেন? বাড়ি গিয়ে পদ্য লিখবেন? ও অবশ্য আমি ঠিক বুঝি না। আসবেন কিন্তু?

আসব অমূল্যদা।

অমূল্য মুখুজ্যের বাড়িতে ঢুকতে হলে খুব সাবধানে ঢুকো। সে বাড়ি হল নানা শরিকের বাড়ি। ভেঙে ভেঙে পড়ছে বাড়িটা চারদিক থেকে। কেউ সরাচ্ছে না। শরিকদের মধ্যেকার ঝগড়ায় বিক্রিও হচ্ছে না। দু-ঘর ভাড়াটে ছিল। একজনরা উঠে গেছে। ভূতের বাড়িতে আছেন শুধু অমূল্য মুখুজ্যে। বাড়িটায় গা ফাটা। ফাটল দিয়ে গাছ বেরিয়েছে।

অমূল্য মুখুজ্যে বাড়িতে ছাত্র পড়ান। তাতেই তাঁর চলে যায়। তেহট্ট না মাঝদিয়া কোথায় যেন তাঁর দেশের বাড়ি? মাঝে মাঝেই বলেন চলে যাবেন সেখানে। কিন্তু এখানে এতদিন কেন আছেন ঈশ্বরই জানেন।

তুমি ঢুকলে তো? ঢুকেই দেখবে উনি বই ঝাড়ছেন। অনেক অনেক বই তাঁর। ঘুমোন যে তক্তপোশে তারও একধারে ডাঁই করা বই। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পাজামা। মানুষটা ক্ষিপ্র। বিদ্যুতের মতো সাঁ করে ঘুরলেন, আসুন। পরশুদিন মুড়াগাছা গেলাম। শিবরাত্রির জন্য সারারাত তিনটে সিনেমা দেখাল। আমি অবশ্য সবগুলো দেখিনি। 'কুহেলি'-টা দেখলাম। ওটা সেকেন্ড বই ছিল। যার জন্য লাস্ট ট্রেনটা পেলাম না। ভোরের দিকে লালগোলা এল, তাতে ফিরলাম।

অতক্ষণ কী করলেন?

কেন, স্টেশনে বসে রইলাম! আপনি 'কুহেলি' দেখেছেন?

হ্যাঁ, দেখেছি।

বুঝলেন তো, ওখানেও আমার একটা পার্ট আছে।

ও তাই নাকি! জানতাম না তো? খেয়াল করিনি দেখার সময়।

~ www.amarboi.com ~

অমূল্য মুখুজ্যে পাঁচ-ছয়ের দশকে বাংলা সিনেমায় ছোটো ছোটো রোল করেছেন। ধরা যাক কেউ মারা যাচ্ছে, একজন পাদ্রি এলেন। একটা সংলাপ। কিংবা ছেলের অসুখ, ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করছেন, প্রেসক্রিপশনের কাগজকলম হাতে তাকালেন। দুটো সংলাপ। নায়িকা ক্ল্যাসিকাল গান গাইছেন, পাকাদাড়ি-পাকাচুল ওস্তাদ তান দিচ্ছেন। একটা সংলাপও না। তাছাড়া, বোর্ডে—মানে আগে প্রফেশনাল থিয়েটার বলে যে জিনিসটা ছিল, তাতেও—ছোটো ছোটো পার্ট করেছেন। কিন্তু কেউ মনে রাখেনি বা বড় পার্ট করতে ডাকেনি। তোমাদের এইসব ছোটো-ছোটো টাউনগুলোতেও যাত্রা-থিয়েটার হয়েই চলেছে, তারা ডেকেওছিল অমূল্য মুখুজ্যেকে। কিন্তু কোনোখানেই খাপ খাওয়াতে পারেন না অমূল্য মুখুজ্যে, দুদিন রিহার্সালের পরেই যাওয়া ছেড়ে দেন। ফলে, তুমি, কোনোদিনই অমূল্য মুখুজ্যের কোনো অভিনয় দেখনি।

কিন্তু এখন তুমি খুব উত্তেজিত। সেকি, কুহেলি-তে আপনি পার্ট করেছেন? আর আমারই চোখে পড়ল না? ছি ছি!

কোনখানটায় ছিলেন বলুন তো?

অমূল্য মুখুজ্যে হাসেন। তিনি এখন উবু হয়ে প্রাইমাস স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানাচ্ছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না, না, আমি পার্ট করিনি। আমি বলছি, ওখানে আমার একটা পার্ট আছে। পার্টটা করেছে অজিতেশ ব্যানার্জি। ঠিকমতো পারেনি।

তোমার চোখ কপালে উঠল। বলেন কী! পারেনি? ওই অজিতেশের জন্যই তো আমি কুহেলি সিনেমাটা পাঁচবার দেখেছি।

কী জানেন, ওটা অজিতেশবাবুর পার্ট না। ওটা আমার পার্ট। আমিও পরশুদিনটা ধরলে বারতিনেক দেখলাম। এই নিন চা ধরুন।

কাচের গ্লাসে চা বাড়িয়ে দিলেন অমূল্য মুখুজ্যে। তারপর তক্তপোশটায় বসলেন। জানলার গরাদে মরচে ধরা। গরাদ জড়িয়ে লতাগাছ উঠেছে।

আমি হলে, বুয়েছেন, অন্যভাবে করতাম। অন্তত ওই জায়গাটা। যখন সন্ধ্যা রায়কে বলছে 'এতদিন ধরে অনেক খুঁজেছি তোমায়'। আসলে হয়েছে কী...কী-ই হয়েছে বলুন দেখি।

তুমি হতবুদ্ধি। তাকিয়ে আছ। কিছুই বুঝতে পারছ না। কোনোমতে বললে, কী হয়েছে?

ওই সত্যভূষণ বলে লোকটি চম্পা নামে এক মহিলার কাছে যেত। বা-আ, মহিলাকে রেখেছিল। মানে যেমন হয় আর কী! রক্ষিতা। সে বাইজির নাম ছিল চম্পা। আর সেই বাইজির ছিল এক যমজ বোন। সে হল অপর্ণা। নায়কের বিয়ে করা বউ। কেমন?

তুমি মাথা নাড়লে। কুহেলি সিনেমার গল্পটা মোটামুটি ঠিকই বলছেন অমূল্য মুখুজ্যে।

এইবার হল কী, সেই চম্পা কোথাও একটা চলে যায় বা পালিয়ে যায়। তাকে এই সত্যভূষণ মানে অজিতেশবাবু, অনেক খুঁজেছে। মানে অ-নে-ক। হঠাৎ এই রায়কুঠিতে বিরাট বড়োলোকের বউ হিসেবে তাকে দেখল। মানে আবিষ্কার করল আর কী। কেমন তো?

তুমি আবার ঘাড় নাড়লে।

~ www.amarboi.com ~

এ-ইটা আসল। ওই যে খুঁজেছে, সেইটা। অত হাঁকাহাঁকি করলে, ওইরকম ভয় পাইয়ে দিলে অত হা-হা করে হাসলে সেটা ফোটানো যায় না কি! একটা কষ্ট আছে না লোকটার? মানে ওই সত্যভূষণের? ভালোবাসার কষ্ট? ওই পার্টটা আমার পার্ট। ওই যে চম্পা বলে মেয়েটা, সন্ধ্যা রায়, যে হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজেছে তো! অত হা-হা করে হাসলে হয়? তবে আবার এটাও দেখুন, সন্ধ্যা রায় ও-বইতে ডবল সন্ধ্যা রায়, এ বউটা মানে রায়কুঠিতে নায়ক বিশ্বজিৎ-এর বউ হয়ে আছে যে সন্ধ্যা রায়—সেই সন্ধ্যা রায় তো কিছু বুঝছে না! কিন্তু সত্যভূষণ তো ওই রায়কুঠির বউটাকেই ওর সেই চম্পা মনে করছে—তাই না? ডবল পার্টের মজাটা তো ওইখানে। তবে ওর চম্পা মনে করাটা কিন্তু মিথ্যে নয়, একেবারে জেনুইন। মানে সত্যভূষণের—তাই, ওটা, হেঃ, আমার পার্ট। কিছু মনে করবেন না, ওটা অজিতেশ ব্যানার্জির পার্টই নয়।

তুমি হাঁ করে তাকিয়ে আছ। লোকটা কি পাগল?

অমূল্য মুখুজ্যে উঠে দাঁড়ান। সিনেমায় থিয়েটারে পার্ট দেখে মন ভরে না। বুয়েছেন। সারা-অ-খ-খ-অ-ন আমার পার্টটা অন্য কেউ করে চলেছে আর সেইটেকেই বসে বসে দেখছি, বুয়েছেন সহ্য করা যায় না, হাত-পা একেবারে নিশপিশ করে। ওই জন্যই সিনেমা-থিয়েটার দেখা বাদ দিয়ে শুধু বই পড়ি। বই। বই পড়লে অনেক কিছু ইম্যাজিন করা যায়। বই আপনার ইচ্ছের অনেক কাছাকাছি। মানে, বই জিনিসটাই আর কী!

তুমি জানো অমূল্য মুখুজ্যের কাছে ইংরেজি বাংলা বহু নাটকের বই আছে। গল্প-উপন্যাসও আছে। তোমাকে ধার দেন। সাতদিনের জন্য। আটদিন হয়ে গেলেই সকালে তোমার বাড়িতে কড়া নড়ে। জানলা দিয়ে দেখলে, অমূল্য মুখুজ্যে। এ কী অমূল্যদা আপনি! ভেতরে আসুন বসুন। না ভেতরে আসব না। ছাত্তরদের লিখতে দিয়ে এসেছি। বইটা কি আপনার পড়া হয়ে গেছে? লজ্জার একশেষ!

তাই তুমি বললে, বই পড়েন মানে নাটকের বই?

না না, বলতে বলতে অমূল্য মুখুজ্যে উঠে দাঁড়ালেন। চুনবালি খসা ঘরে তিনি একটা রোগা দৈত্য। না না, নাটকের বই নয়। নবেল। গপ্পোর বই। এইসব। যেমন ধরুন, 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি!' পড়েছেন? উঁ? ওখানে একটা পার্ট আছে আমার। ওই ওল্ড ম্যান, ওইটা আমি। বলে, অমূল্য মুখুজ্যে হাসলেন।

কিন্তু অমূল্যদা ওটা থিয়েটার হবে কী করে?

না মানে ধরুন যদি সিনেমাটা হয়। তাহলে! কী করব আমি?

কী করবেন?

অমূল্য মুখুজ্যে হাসলেন। তা-কা-ব! শু-দ্-দু তাকাব! বুয়েছেন না? তাকিয়ে সব বলব। নো ডায়লগ। দেখবেন? অমূল্য মুখুজ্যে একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন যার হাতটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে কবে। অন্য হাতটা নড়বড়ে। সেই চেয়ারে বসে অমূল্য মুখুজ্যে দরজার দিকে একবার তাকালেন। বাইরে অপরাহ্ণের আলো, মূলতান আর ভীমপলাশের মাঝামাঝি একটা সময়ের আলো তখন। আবার অমূল্য মুখুজ্যে জানলার দিকে তাকালেন।

~ www.amarboi.com ~

মুখটা ঘুরিয়ে। হঠাৎ ঘরটা নিস্তব্ধ লাগল। দুটো তাকানো মিলিয়ে তিন মিনিট মতো। হয়ত পাঁচ মিনিটও হতে পারে। যেন তুমি ওই ঘরে নেই। শুধু প্রচণ্ড একজন লোক। এইভাবে তিনবার তিনরকম মুখে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন। আবার মিনিট পাঁচেক কাটল। অস্বস্তি হচ্ছে তোমার। দমবন্ধ ভাব হচ্ছে। তারপর হঠাৎ উঠে দরজার সামনে চলে গেলেন। দরজা দিয়ে যে আলো আসছিল, লম্বা চেহারাটা সেই আলো আড়াল করে দিল। এবার ঘুরলেন ধীরে ধীরে। দরজার সামনে থেকে ঘুরে যেতেই মুখে ছায়া পড়ে গেল। ঘরের উলটো দিকে ভাঙা ভাঙা দেওয়ালটা দেখছেন একদৃষ্টে। ছায়াটা তোমার চোখে সয়ে যেতে দেখতে পেলে ভুরুতে সামান্য 'কুঞ্চন'। চোখটা এবার খানিকটা দেখতে পাচ্ছ। বুঝতে পারছ তুমি, ওই চোখ দুটো ঘরের মাত্র হাত ছয়েক দূরের দেওয়ালটা মোটেই দেখছে না। অনেক অনেক বেশি কোনো দূরত্বকে দেখছে। যে দূরত্বের শেষে হয়তো জলের ওপর দিগন্তরেখা। বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে চোখের ওপর তুলে আনলেন। আবার নামিয়ে দিলেন। তারপর আবার নিজের ভাঙা চেয়ারটার দিকে ফিরতে ফিরতে বললেন সোমুদ্র। বুঝলেন না, সোমুদ্রো—ও—ও! মা—আ—নে বি—ই—রা—ট একটা দূর। সেটা দেখছেন তো! মানে, ইম্যাজিন করতে পারছেন। আশ্চর্য তো, পদ্য লেখেন, আর ইম্যাজিন করতে পারছেন না! সোমুদ্র, ব্যাপারটাই তো মানে কী বলে? কী করে বলব? সোমুদ্র ব্যাপারটা তো সোমুদ্রো! তাই না! আর বুড়োটা? মানে ওই সান্তিয়াগো? দাঁড়ান আর-একবার চা বানাই। সোমুদ্রো আর ওই ওল্ড ম্যান। ওই সান্তিয়াগো। ওই বুড়োর পার্ট তো আমার পার্ট। প্র্যাকটিস...করি। কোনোদিন করতে চান্স পাব না, কিন্তু প্র্যাকটিস...করি। এই তাকানোটা। বিস্কুট খাবেন? থিন আছে। খাবেন?

একটা হরলিকসের শিশি খুলে দুটো বিস্কুট আমাকে দিলেন। দিয়ে বললেন, ওই ওল্ড ম্যানটাও একলা—সোমুদ্রোটাও একলা! অ্যাক-লা-আ! এইখানেই মজাটা। এখানেই ওই পার্টটা আমার। আর কারও নয়। ধরুন। বুড়োটা যেমন সোমুদ্রোটাকে দেখছে। ওই সোমুদ্রোটাও তো বুড়োটাকে দেখছে। আমি তো সোমুদ্রোর দেখাটাও আমার তাকানো দিয়ে বার করব। তাই না? সোমুদ্রোর পার্টটাও তো করতে হবে আপনাকে, যদি বুড়োর পার্টটা করতেই চান! আমি প্র্যাকটিস করি। মেনলি রাত্তির বেলাটা। প্র্যাকটিস করি। এই নিন, গেলাসটা ধরুন।

পাগল যে তাতে কোনো সন্দেহ করো না তুমি। যাত্রা বা নাটক করে এমন অনেকের সঙ্গে চেনা আছে তোমার, যারা এই টাউনে বা আশেপাশের গ্রামে থাকে। কিন্তু তাদের কারও সঙ্গেই মেলামেশা নেই অমূল্য মুখুজ্যের। তিনি সকালে ছাত্র পড়ান বাড়ির বারান্দায়। নয়তো বই ঝাড়পোঁছ করেন, নয়তো বই পড়েন। আর পাবলিক লাইব্রেরিতে রাত আটটার দিকে যান। হোটেলেই খাওয়া-দাওয়া করেন। অমূল্য মুখুজ্যের কাছে অনেক বই। তাই সম্পর্ক রাখো তুমি। যে উপন্যাসই অমূল্য মুখুজ্যে পড়ুন, সেই বইতেই তিনি তাঁর একটা পার্ট খুঁজে পান। সিনেমা-থিয়েটার দেখা ছেড়ে দিয়েছেন প্রায়। একদিন বললেন, 'নিশাচর' সিনেমাটা দেখেছেন? পুরোনো বই। দেখেছেন?

~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছেন। দেখেছি।

ওই বইতে আমার একটা পার্ট ছিল।

তুমি এবার খোঁচাও। কী পার্ট, শম্ভু মিত্রের পার্টটা কী?

খোঁচাটা বুঝতে পারলেন না অমূল্য মুখুজ্যে। বললেন, না না, শম্ভু মিত্তির বা বিকাশ রায়ের পার্টগুলো তো মেন পার্ট, ওগুলো না। জ্ঞানেশবাবুর একটা পার্ট আছে। একজন চাকর। সম্পূর্ণ বোবা। জ্ঞানেশবাবু শুধু তাকাচ্ছিল। বুয়েছেন। জ্ঞানেশবাবুর ওই ভয়েস। কিন্তু ব্যবহার করতে হয়নি। তাকানোটা কেবল। ভা-লো। ভা-আ-লো। তবে আমি হলে...খুউব মার খেয়েছে জ্ঞানেশবাবু, মানে চাকরটা, এখেনে সেখেনে রক্ত...তার মধ্যে...তাকাচ্ছে। বেশ। বেশ। তবে আমি, আ-আ-মি করলে-এ!...

একদিন তুমি দাঁড়িয়ে আছ রাখালদার চায়ের দোকানের সামনে, অমূল্য মুখুজ্যে আর তুমি। রাখালদার চায়ের দোকানটা হচ্ছে একটা ১৩/১৪ ফুট চওড়া গলিরাস্তার পাশে। দোকানের বাইরে কোনো বেঞ্চি রাখার জায়গা নেই, রাস্তা ব্লক হবে। রিকশা, সাইকেল, সাইকেল ভ্যান যেতে পারবে না। দোকানটার ভেতরে দুটো বেঞ্চি, ইংরেজি 'এল' আকারে রাখা। সে-দোকান সবসময়ই ভর্তি থাকে। রাখালদা তোমাদের দিকে চা বাড়িয়ে দিলেন। রাস্তা থেকে হাত ঝুঁকিয়ে চায়ের গেলাস নিয়ে রাস্তাটার উলটোদিকে চলে এলে তোমরা, যেখানে দাঁড়িয়ে, নিরিবিলিতে চা-টা খাওয়া যাবে। তোমাদের পাশে একটা ছোট্ট পথমন্দির। পিছনে বন্ধ হয়ে যাওয়া পুরোনো সরকারি হাসপাতাল। এখানে দাঁড়িয়ে দোকানটা স্পষ্ট দেখা যায়। চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন অমূল্য মুখুজ্যে—জানেন, এই দোকানটার মধ্যেও আমার একটা পার্ট আছে।

তুমি চমকে উঠলে। আরে! কী বলছে লোকটা? মানে! অমূল্যদা! কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বলছি, এই দোকানটার মধ্যেও আমার একটা পার্ট আছে। ওই দেখুন, বেঞ্চগুলো তো 'এল' আকারে সাজানো। ওই কোনায় একটা লোক বসে আছে দেখছেন? দেখুন, বাঁদিক থেকে দেখুন, ও-ই লোকটা, ফোর্থ। দেখছেন?

হ্যাঁ, বলুন।

লোকটাকে তুমি দেখতে পেলে। অমূল্য মুখুজ্যে বলছেন, গেলাসটা ধরেছে দেখেছেন? বাঁ হাতে? ডান হাতে হাফ পাউরুটি। খেতে কিন্তু ওর মন নেই। দেখুন, মানুষ তো যা-ই খাক, খাওয়ার আগে খাদ্যটাকে একবার দ্যাকে! দ্যাকে তো! লোকটা দেখছে না। নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কোনো দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। জামাটা ঘেমো, আধময়লা। বুঝেছেন? কেমন তাকিয়ে আছে। দেখুন! ও আসলে ওই দোকান, চায়ের গেলাস, হাফরুটি, চারপাশের লোক—কিচ্ছু দেখছে না। দেখছে ওর সমস্যাটা। ওর জীবনটা। যার কিছুই আমি জানি না। কিন্তু ওই তাকানোটা তো জানি। ঘাড়টা খানিক নামিয়ে ওই বসা। মানুষ ভেঙে পড়তে পড়তে বা ভেঙে পড়ার ঠিক আগে এমন করে বসে থাকে। ওই লোকটার পার্টটা আমার পার্ট। তার মানে ওই দোকানটা একটা বই বুঝেছেন তো? ওই

~ www.amarboi.com ~

দোকানটাও আপনি পড়তে পারেন। পড়লে নিজের পার্ট পেয়ে যাবেন। দেখুন দেখুন, লোকটা কীভাবে পয়সা পকেট থেকে বার করছে ওটা দেখুন। এখুনি করে দেখাতে ইচ্ছে করছে। বাড়ি চলুন। দেখাচ্ছি।

অমূল্য মুখুজ্যের সঙ্গে চলেছ। তাঁতকলের ছুটি হয়েছে। ঘাট পেরিয়ে উঠে আসা তাঁতকলের অজস্র মেয়ে-পুরুষ হাতে টিফিন কেরিয়ার আর চটের থলে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটছে। নদীর ঘাট থেকে রেলস্টেশন একটাই লম্বা রাস্তা। প্রায় দৌড়ে পৌঁছোবে ওরা। ট্রেন ধরে আরও ছোটো ছোটো স্টেশনে নামবে। বিকেলের ট্রেন এসেছে। যাত্রীরা নেমে বেরিয়ে আসছে। একটা ছোটো মিছিল যাচ্ছে। বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল। সামনে তাদের নেতা বিষ্টু অধিকারী। দীর্ঘকায় অমূল্য মুখুজ্যে মাথাটা তোমার কানের কাছে নামিয়ে বললেন, বিষ্টু অধিকারীর পার্টটাও আপনাকে করে দেখাব একদিন। বিষ্টুর বক্তৃতা শুনেছেন কখনও? এ কী বলছেন। এ-টাউনে সবাই শুনেছে। রাস্তার একধারে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ দুজনে। ভিড়ে ভর্তি হয়ে আছে পথ। ভিড় একটু হাল্কা হলে তোমরা রাস্তা পার হবে। অমূল্য মুখুজ্যে বললেন, এই যে ক্রাউড দেখছেন, এই ক্রাউডের মধ্যেও আমার পার্ট আছে! দেখুন, এক একটা লোক, এক-একরকম ভাবে হাঁটছে। এক-একজনের মুখ এক-একরকম। কেউ এক নয়। সবাই আলাদা। সবাই একা। সেই একাটাকে ধরতে হবে বুঝলেন। সেই 'আলাদা'-টাকে। 'আলাদা' বোঝেন তো, 'আলাদা'?

সেদিন তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যেবেলায় অমূল্য মুখুজ্যে কত কী যে বললেন! তোমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। হঠাৎ তাক থেকে একটা বাঁধানো বই দেখালেন। এই বইটা পড়েছেন? এ বইতে আমার একটা পার্ট আছে! এ কী, এ তো কবিতার বই! কবিতার বইতে আপনার পার্ট থাকবে কী করে? বোদলেয়রের কবিতা। হ্যাঁ। ট্রান্সলেশন! বুদ্ধদেব বোসের ট্রান্সলেশন। লাইব্রেরির বাচ্চু আমাকে দিলে বইখানা। কবিতায় আপনার পার্ট কী করে থাকবে অমূল্যদা? না, না, বইখানা পড়ে দেখুন। ওই বোদলেয়র বলে লোকটার লাইফ-হিস্ট্রি দিয়েছে বুদ্ধদেব বোস। পেছুনে। পদ্যটদ্যগুলো মাঝখানের দিকটায় আছে তো! লাইফ-হিস্ট্রিটা বইটার পেছুনে। পড়েছেন। হ্যাঁ পড়েছি তো। দেখবেন। ওই বোদলেয়র বলে লোকটা, একজন মহিলার সঙ্গে...কিছুদিন...। মানে ওই যাকে বলে রেখেছিল আর কী। জান দুভাল নাকি কী একটা নাম মহিলার। মানে ভালবাসত আর কী। বিয়েটিয়ে নয়। এমনিই থাকত। হোটেলে রেখেছিল। লোকটা সারাদিন পর বাড়ি এসে দেখত ওই মহিলার এক আত্মীয় এসে বসে আছে। দাদা না কীরকম-কিছু হয়টয়। থাকতে থাকতে একদিন জানা গেল, বুদ্ধদেব বোস লিখে দিয়েছে, লোকটা ছিল ওই মহিলার পুরোনো...মানে, পুরোনো...ওর সঙ্গে আশনাই-টাশনাই...আর কী..ছিল-টিল। ভদ্রভাবে লিখেছে—'প্রাক্তন' প্রেমিক। বোদলেয়র বলে লোকটা, নিজের আর ওই মহিলার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছিল, তার মধ্যে আবার ওই মহিলার পুরোনো নাগর। বুঝেছেন তো কী বিপদ!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা তো বুঝলাম, আপনি তাহলে বোদলেয়রের পার্টটাও করতে চান? কিন্তু, অমূল্যদা, আপনি তো কবিতাগুলো পড়েননি। পড়েছেন?

না না, পড়িনি। ওই পদ্যটদ্যগুলো আমি একেবারে বুঝতে পারি না জানেন।

তাহলে, বোদলেয়রের কবিতা না-পড়ে, বোদলেয়রের পার্ট আপনি করবেন কী করে?

বোদলেয়রের পার্টটা তো আমার পার্ট নয়। আমার পার্ট হচ্ছে ওই লোকটার পার্টটা। ওই যে, খুঁজে খুঁজে পুরোনো মেয়েছেলেটাকে বার করেছে। তারপর তার নাগরের পয়সায় বসে বসে খাচ্ছে! আর দাদার অভিনয় চালাচ্ছে। ওই পার্টটা। আমার পার্ট।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাইরে। লোডশেডিং। অমূল্য মুখুজ্যে লণ্ঠন জ্বালালেন। দুটো। ঘরের দু'দিকে টাঙালেন। সেটা শীতকাল। গায়ে একটা খয়েরি চাদর। এখন চাদরের রংটা কালো দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় লণ্ঠনটা দেওয়ালের গায়ে আংটায় ঝুলিয়ে দিয়ে ফিরে তাকালেন। সবাই মনে করে আমি একা। আমার কেউ নেই। আপনারা সবাই তাই ভাবেন। পচা সান্ডেল কী বলেছে জানেন! বলেছে, অমূল্য মুখুজ্যেকে 'চিত্রগ্রীব' বইটা পড়তে দে বাচ্চু, পায়রার পার্ট করবে অমূল্যদা! জানেন। বলেছে একা থেকে থেকে আমার মাথার গন্ডগোল হয়ে গিয়েছে।

কে বলেছে আমি একা! লাইব্রেরিতে কত বই আছে, সব বইতে আমার কোনো না কোনো পার্ট আছে। রাস্তার দুধারে দোকান দেখছেন, সমস্ত দোকানে একটা না একটা পার্ট আছে আমার। রাস্তায় কত লোক চলছে, সবার মধ্যে আমার পার্ট আছে। এই যে চূর্ণিতে খেয়া পারাপার হয়, নৌকো ভরতি করে যত লোক যাচ্ছে, বাসগুলোর গায়ে-মাথায় চেপে-ঝুলে যত প্যাসেঞ্জার চলে যাচ্ছে তাহেরপুর ফুলিয়া শান্তিপুর ভাতজাংলা—তাদের সবার মধ্যে আমার পার্ট আছে। আমি একা নই। পচা সান্ডেলকে কী বলেচি জানেন, মিউনিসিপ্যালিটির মোড়ে?

কী বলেছেন অমূল্যদা! বলেছি, পচা, এখনও সি-ক্লাস অ্যাক্টর-ই আছিস। ইম্যাজিনেশন নেই তোর। নইলে একটা পাখির মধ্যেও আমার পার্ট আছে। করতে জানলে করা যায়। তবে আপনাকে বলছি, করলে আমি পায়রার পার্ট করব না। আমি শকুনের পার্ট করব, বুঝেছেন শকুন! শো-ও-কু-উ-ন! বলে, অমূল্য মুখুজ্যে তাঁর দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিলেন, যেন দুটো বিশাল ডানা উড়াল দিল লণ্ঠনের আলোতে। হাত থেকে কালো চাদর ঝুলছে। যেন সত্যিই বিশাল একটা দানবীয় পাখি তিনি। এইমাত্র ডানা ঝাপটে উড়ে যাবেন রাত্রির আকাশে।

এরপর, অমূল্য মুখুজ্যের হারিয়ে যাওয়ার পালা। কীভাবে হারিয়ে গেলেন তিনি? শরিকরা একমত হয়ে সেই বাড়ি বিক্রি করে দিল। বাড়ি ভাঙা পড়ল। তখন সদ্য প্রোমোটাররা এসে পৌঁছচ্ছে ছোটো ছোটো টাউনে। একটা লরিতে সব বই, তক্তপোশ ভাঙা চেয়ার চাপিয়ে [illegible] কোথায় সেই তাঁর দেশের বাড়িতে থাকতে চলে গেলেন অমূল্য মুখুজ্যে।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

লরিতে উঠবার আগে চমৎকার হাসলেন। ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই। ওর পার্টটাও তো থাকার কথা আমার মধ্যে। দেখি প্র্যাকটিস করা যায় কি না। তাছাড়া সব বই নিয়ে যাচ্ছি তো। প্র্যাকটিস করব। আসবেন। একটা পোস্টকার্ড ফেলে দেবেন। স্টেশনে থাকব।

যাওয়া আর হয়নি তোমার। তবে পচা সান্যাল আর দেবু কুণ্ডু নামের দুই সিনিয়রের কাছে তুমি শুনতে পেয়েছিলে অমূল্য মুখুজ্যের পূর্বজীবন-কথা। সিনেমা-থিয়েটারের পার্ট করার সময়, কলকাতায় ছোটো একটা চাকরি করতেন অমূল্য মুখুজ্যে। অফিস-ক্লাবের এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি, ঘরভাড়া নিয়ে রাজাবাজার এলাকায় থাকতেন। আর তাঁদের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকত সেই অভিনেত্রীর নিজের দাদা। তুই-তুই করে কথা বলতেন দাদা আর বোন। পচা সান্যাল-রা সে-বাড়িতে গিয়ে নিজে চোখে দেখে এসেছিলেন তাঁদের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু, একদিন একটি চিঠি লিখে, সেই দাদা আর বোন একত্রে গৃহত্যাগ করেন। চিঠিতে জানা যায় তারা কস্মিনকালেও দাদা-বোন ছিলেন না। পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন বলে তুই-তোকারি চালু ছিল। এই ঘটনার পর চাকরি ছেড়ে অমূল্য মুখুজ্যে এই টাউনে চলে আসেন। এবং পচা সান্যালদের মতে, তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়।

এর বেশ কিছুকাল পরে তুমি কলকাতায় চলে এসেছ। সেও কুড়ি বছর হয়ে গেল। অমূল্য মুখুজ্যের বয়স এখন নব্বই পার হয়েছে। দেশের বাড়িতে স্বপাক রান্না করে খান। সকাল-বিকাল হেঁটে বেড়ান। এতদিনেও কোনো বড় অসুখ করেনি তাঁর। এই পর্যন্ত খবর পেয়েছ তুমি। এই লোকটি রোগব্যাধির চিহ্নহীন দীর্ঘজীবন পাবে না তো কে পাবে? যে মানুষ রাস্তার প্রত্যেকটি চলমান লোকের মধ্যে নিজের পার্ট দেখতে পায়, যে সমুদ্রের পার্ট করতে পারে, শকুনের পার্টও। তোমার অনেকবার মনে হয়েছে, যিনি অভিনেতা তিনি কোথাও ঈশ্বর। তোমার মনে পড়ে লণ্ঠনের আলোয় দু-হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই সিক্সফিটার রোগা দৈত্য, দু-হাত থেকে ঝুলছে কালো চাদর, তীক্ষ্ণ চোখ, খাড়া নাক, দাগে ভরা মুখ, বলছেন ওই বইটা পড়েছেন? ওই দোকানটা পড়েছেন? ওই রাস্তাটা পড়েছেন? ওই সমুদ্রটা পড়েছেন? ওই মরুভূমিটা পড়েছেন? ওই পর্বতমালা? বলছেন, ওর সবগুলোর মধ্যে আমার পার্ট আছে...প্র্যাকটিস করি, জানেন, আমি প্র্যাকটিস করি...একদিন সারারাত তুমি অমূল্য মুখুজ্যের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছিলে। উনি বলছিলেন পর্বতের পার্টও করা যায়। স্থির হয়ে। স্থির। বলে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর শরীর ও মুখের একটা পেশিও কাঁপছে না। স্বয়ং স্তব্ধতা এসে অধিষ্ঠান করছে এই অভিনেতার প্রস্তরীভূত মুখে। পুরো চরাচর নিস্তব্ধ, পাঁচ মিনিট, সাত মিনিট। অনন্তকাল। কী স্থির! হঠাৎ আশেপাশের গাছ থেকে ভোরের পাখি ডাকতে শুরু করল! তোমার মনে হয়েছিল সত্যিই তুমি একটি পাহাড়ের পায়ের কাছে বসে আছ...এখুনি সূর্য উঠে আসবেন, এসে নমস্কার জানাবেন এই নগাধিরাজকে...।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রোববার

~ www.amarboi.com ~

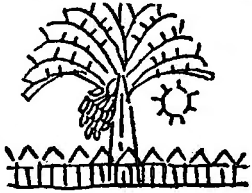

গীতিকারের স্ত্রী-কন্যারা

সকালে, এই ধরো আটটা থেকে দশটা তাঁকে বাজার অঞ্চলে দেখা যাবে। তিনি দ্রুত। সারাক্ষণ দ্রুত। এই মিউনিসিপ্যালিটির গলি দিয়ে ঢুকলেন তো ওই ধাঙড়পাড়ার মুখ দিয়ে বেরলেন। এইমাত্র যদি জলের ট্যাঙ্কের নিচে একজনকে থামিয়ে কথা বলছেন, আর সে উশখুশ করছে—অমনি দশ মিনিট পরেই তারকনাথ গ্রন্থালয়ের সামনে একজনকে ধরে তার সঙ্গে কয়েক পা হাঁটছেন। কথা বলতে বলতেই।

সকালে ওই সময়টাতেই সবার অফিস যাওয়ার তাড়া। সেই তাড়ার মুখটাতেই তিনি ঠিক ধরে ফেলবেন পথচলতি অবস্থায় সবাইকেই। আর সকলেই পালাই-পালাই করবে। একজন যেই তাঁর হাত ছাড়িয়ে ছুটল, অমনি তাঁরও মনে পড়ল তিনি তো বাজারে বেরিয়েছেন। অথবা কয়লার দোকানে যাবেন। কিংবা অক্ষয়ের গম ভাঙানোর কলে পৌঁছবেন, নয়তো ভোম্বলের রেশন দোকানে। এর কোনো একটা-দুটো-তিনটে কাজ নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি বাড়ি থেকে। কিন্তু পুলিনকে দেখে, বা বোকা বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হতে, অথবা ভোলা মজুমদার তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়গুলোতে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তারপর তারা যে যার কাজে চলে যেতে, তিনি পড়িমরি ব্যস্ততায় নিজের ফেলে রাখা কাজগুলোর কোনো একটার দিতে যেতে শুরু করেছেন। সেইসব কাজের জন্য ততক্ষণে যথেষ্টই দেরি হয়ে গিয়েছে—সেই সংবিৎ ফিরতেই তিনি দ্রুত।

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? যেই তিনি পথচলতি চেনা লোক দেখছেন, অমনি থেমে যাচ্ছেন। আর লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুরে লোকটিরই গন্তব্যের দিকে কিছুক্ষণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাঁটছেন, তারপর নিজের কাজের দিকে ফিরছেন। ফলে, তাঁকে সারাক্ষণই ট্রেনের মতো লেট মেক-আপ করতে হচ্ছে। তাই তিনি দ্রুত। সারাক্ষণ দ্রুত।

তিনি মানুষটা ছোটোখাটো। ধুতি আর ফতুয়া গায়ে। হাতে বাজারের ব্যাগ। নয়তো রেশনের থলি। নইলে গম-ভর্তি ঝোলা—কখনও দু-হাতে দুটো ফ্যান্সি জুতো। মুচি যেখানে বসে, সে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছেন—কখন তার হাত-অবসর হয়। হঠাৎ কাউকে দেখে, এগিয়ে এলেন রাস্তার অন্য পাশে। থামিয়ে কথা বলতে লাগলেন। কথার মাঝখানে তাঁকে জুতো সারাইওয়ালা ডাকল। তবু তিনি যেতে চান না। যে লোকটিকে থামিয়ে কথা বলছেন তখন, সে চলে যেতে চাইছে প্রাণপণে। বলছে, দেখুন ওর হয়ে গিয়েছে। ডাকছে আপনাকে। তাও তিনি যাবেন না। কথা শেষ করে যখন মুচির কাছে পৌঁছোলেন তখন সে অন্য কাজ ধরে ফেলেছে। ফলে আবার তাঁর দেরি। ফলে, ফেরার সময় আবার তিনি দ্রুত।

এই হলেন তিনি। দুগ্গা মেসোমশাই। মাথার সামনের দিকে চুল নেই, পিছন দিকের চুল কী এক অজ্ঞাত কারণে হাওয়া লাগলে খাড়া। দুপুরে যদি ঘুমোন বিকেলে খাড়া। সকালে বাজারের পথেও খাড়া। মুখটা গোল। গৌরবর্ণ, রোদে পুড়ে-পুড়ে কালচে। ষাট পার হয়েছেন চার-পাঁচ বছর তো হবেই। রিটায়ার করেছেন। কিন্তু অমন ছটফটে মানুষ সারা টাউনে নেই।

দুগ্গা মেসোমশাই কিন্তু নামকরা লোক। দুগ্গা মেসোমশাই রেডিয়োর গীতিকার। চাকরি একটা করতেন, কিন্তু কোনোদিক দিয়েই সেটা তাঁর পরিচয় নয়। রেডিয়ো-য় কত গান লিখেছি, বলতেন প্রায় সব কথাতেই। তখন রেডিয়ো বলত সবাই। আকাশবাণী বলত না। মানে ওইরকম মহানগর থেকে দূরের এলাকার লোকেদের কথা বলছি। কলকাতায় লোকে তখন কী বলত, কী জানি! কিন্তু 'আকাশবাণী করি', 'শ্রুতি করি'—এসব কথা তারও অন্তত কুড়ি বছর পর মফস্‌সলগুলোতে চালু হবে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। যারা বহু কষ্ট করে ভিড় ভর্তি ট্রেনে জার্নি করার পর, কলকাতায় মঞ্চে বা রেডিও স্টেশনে এবং দূরদর্শনে অনুষ্ঠান পায়। দূরদর্শন বা টিভি-র চল তখন ঘরে-ঘরে নেই। '৭৭ সালে, ফুটবলার পেলে কলকাতায় আসার কারণে একটি বাড়িতে টিভি এসেছিল। পুরো টাউনের লোক ভেঙে পড়ল সে-বাড়িতে। ছাদে টিভি তুলে, গৃহকর্তাকে মাথায় ম্যারাপ খাটিয়ে দিতে হল, পাছে বৃষ্টি হয়? মোহনবাগানের সঙ্গে কসমস-এর খেলা ছিল।

আমি যা বলছি, তা সাতাত্তরের আগের কথা। টিভি জিনিসটা দুগ্গা মেসোমশাইয়ের জীবনে নেই। আছে রেডিও। ট্রানজিস্টর। বলাবাহুল্য তখন এফ এম আসেনি। রেডিও দুগ্গা মেসোমশাই শুধু তখনই শোনেন যখন তাঁর লেখা গান কোনো শিল্পী পরিবেশন করেন রেডিওতে। সাইকেল চালান না। হেঁটে হেঁটে সবার বাড়ি গিয়ে বলে আসেন অমুক দিন অমুক সময় আমার গান আছে। রেডিওতে বাংলা আধুনিক গানের যে অনুষ্ঠানগুলো তখন হত, তাতে দুগ্গা মেসোমশাইয়ের লেখা গান বাজত প্রায়ই। এবং নামটি ঘোষণা করা হত গীতিকার হিসেবে। দুগ্গা মেসোমশাই অবশ্য দুর্গাপদ ভট্টাচার্য নামে লিখতেন না। ছদ্মনাম

~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলেন। জপমালা ঘোষ, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরাও দুগ্গা মেসোমশাইয়ের লেখা গান রেডিও সিটিং-এ গেয়েছেন।

এবং এজন্য দুগ্গা মেসোমশাইকে নিয়মিত কলকাতা যেতে হত। দুগ্গা মেশোমশাই বলতেন, পড়ে থাকতে হয় বুঝলে? গিয়ে পড়ে থাকতে হয়। রেডিও অফিসে যাবেন বলে যখন বেরোতেন দুগ্গা মেশোমশাই, তখন কিন্তু ফতুয়া নয়। পাটভাঙা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি। কাঁধে একটি চাদর। যদিও মাথার পিছনে চুল তেমনই খাড়া।

স্বপন ঠিক করল, সেও রেডিওয়র গীতিকার হবে। যাতায়াত শুরু করল দুগ্গা মেশোমশাইয়ের বাড়ি। দুগ্গা মেসোমশাইও বেশ পছন্দ করেন স্বপনকে। কারণ, রাস্তায় দাঁড় করালে স্বপন, স্বপনই একমাত্র, পালাই পালাই করে না।

অন্যরা অমন করে কেন? দুগ্গা মেসোমশাই কেবলই তাঁর অতীত দিনের গল্প করেন যে! তারাশঙ্করের বাড়িতে একবার গিয়ে গান পড়ে শুনিয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে তিনবার চিঠি লিখেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে তো প্রায়ই যেতেন। আজ পর্যন্ত যে একটিমাত্র বাংলা সিনেমায় তাঁর লেখা দুটি গান নেওয়া হয়েছিল, সেটা তো প্রেমেনদা বলে দিয়েছিলেন বলেই! ছায়াছবির গানে সে-গান দুটো বাজানোর জন্য তিনি কতবার রেডিও স্টেশনে গিয়ে বলে এসেছেন—কিন্তু এরা কেন যে বাজায় না কে জানে। এমনিতে পুলক তো দুগ্গাদা দুগ্গাদা করে। রেডিয়ো-র ক্যান্টিনে চা খাওয়ায়। মানে তোমাদের পুলক ব্যানার্জি আর কী। ভারি ভালো ছেলেটি। গৌরীবাবুর বাড়িতেও গিয়েছি। গৌরীপ্রসন্ন। চা, শিঙাড়া, রসগোল্লা খাওয়ালেন। দুপুরে খেয়ে যেতেও বলেছিলেন। কিন্তু আমার তো তাড়া থাকে বোঝোই!

তাড়া যে দুগ্গা মেসোমশাইয়ের আছে, সেটা তো বোঝা যায়! তিনি সবসময় প্রায় ছুটছেন। সবচেয়ে ভালো সেটা বোঝে স্বপন। কারণ স্বপন দুগ্গা মেসোমশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পথই হাঁটে রোজ। কারণ স্বপন রেডিওর গীতিকার হবে। তবে দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়ি যাওয়ার সময় স্বপন আমাকে সঙ্গে নেবেই। কারণ? স্বপনের নাকি লজ্জা করে। কেন? দুগ্গা মেসোমশাইয়ের মেয়েরা আছে যে!

দুগ্গা মেসোমশাইয়ের পাঁচ মেয়ে। তার মধ্যে প্রথম তিনজন জুয়েল। দেবীদি, বেবিদি আর মশা। দেবীদি, বেবিদি রাস্তায় বেরোলে দোকানঘরগুলো অবধি কাঁপে। পানের দোকানের আয়না তার ফিক্সড জায়গা থেকে ঘুরে যেতে চায়। আয়না বলতে চায়, আমিও দেখব যতক্ষণ দেখা যায়। দরকার হলে মাটিতে পড়ে ভেঙে যাব, তবুও দেখব। সেখানে পাড়ার ছেলেদের আর দোষ কী! দেবীদি ইউনিভার্সিটি পাস করে ডব্লিউবিসিএস পাশ হয়েছে। এই বিডিও-এসডিও হল বলে। বেবিদি এমএসসি পাশ করেছে সোনার রেজাল্ট করে। এখন নৈহাটি, শ্যামনগর, কল্যাণী—এমনকী কলকাতারও একটা কোচিং সেন্টারে পড়ায়। সপ্তাহে চারদিন-পাঁচদিন কলকাতা যায় দেবীদি, বেবিদি। আর মশা? মশা আমাদের চেয়ে একটু ছোটো। কিন্তু ঝলকানিতে বড় দুই দিদিকে হারিয়ে ফিরেছে। সে বছর লাস্ট হায়ার-সেকেন্ডারি, তিনটে লেটার নিয়ে বেরিয়ে কলেজে ঢুকেছে মশা। মশার ভালো নাম

~ www.amarboi.com ~

কণিকা। দেবীদি, বেবিদির ভালো নাম জানতাম না। পরের দুটো ছোটো। স্কুলে পড়ে। দুগ্গা মেসোমশাইয়ের একটা পৈতৃক বাড়ি ছিল। তিনি চাকরি করার সময়ে অফিসের কাছে, সহকর্মীদের কাছে এবং কাবুলিওয়ালাদের কাছেও এত পরিমাণ ধার করে গিয়েছেন সারা জীবন যে প্রায় নিঃস্ব হাতেই তাঁকে রিটায়ার করতে হয়। মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করল কী করে? কেন, প্রেমিকরা ছিল! দেবীদি, বেবিদি-র প্রেমিকরা। তখন বয়ফ্রেন্ড বলার চল হয়নি। তিন-চারজন করে প্রেমিক রাখা, সে যুগে চাট্টিখানি কথা নয়! একজন হয়ত দেবীদি-র সঙ্গে কলকাতা যায়, কোনও কাজে যাচ্ছে দেবীদি, তাই। একজন হয়ত দেবীদি নৈহাটি থেকে ফেরার সময় স্টেশনে, অপেক্ষা করছে। বাড়ি পৌঁছে দেবে। পৌঁছানোর আগে বলবে, দেবী আমার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খিদে পেয়ে গিয়েছে। চলো, বাপিদা'র দোকানে একটু মাংসের ঘুগনি আর পরোটা খেয়ে যাই। দেবীদি না-না করবে। তারপর রাজি হবে। তারা বাবার কাছ থেকে একটা জিনিসই শিখেছে, 'তাড়া থাকা' ব্যাপারটা। বেবিদি-র জন্য একজন আসে ব্যারাকপুর থেকে। সে নাকি ইউনিভার্সিটি-র প্রফেসর। মাঝে মাঝে আসে। আর একজন আসে খোদ কলকাতা থেকেই। সে যে কী, কেউ বলতে পারে না। সেই সঙ্গে এই টাউনের ছেলেরা তো আছেই। কেউ কন্ট্রাক্টরিতে নতুন উঠেছে। কারওর তিনটে লরি। একটা লাক্সারি বাস। বিয়ে, দিঘা-ভ্রমণ, তারাপীঠ যাওয়া এইসব পারপাসে ভাড়া দেয়। এরা সকলেই আছে। দেবীদি, বেবিদি এদের সকলকেই সামলায়। প্রশ্ন উঠতে পারে কলকাতা থেকে একজন ট্রেনে সঙ্গে করে নিয়ে এল, ছোটো টাউন, সে কি জানবে না, আর একজন ছেলে পরদিনই ওই মেয়ের সঙ্গে বাপিদার দোকানে গিয়ে বসছে? জানবে! কিন্তু ম্যারাথন দৌড়ে যখন পঁচিশজন দৌড় শুরু করে, তারা কি জানে না আরও চব্বিশ জন দৌড়াচ্ছে? জানে। জেনেও দৌড়োয়। এরাও তাই। কে পাবে কাপ।

দেবীদি, বেবিদি-র এই প্রসেস, মশাও নিয়েছে। এবং সফলভাবে। এইবার আসছে আসল কথা। এই সকল-সমস্ত-সর্ববিধ ঘোরাঘুরিই কিন্তু প্লেটোনিক ঘোরাঘুরি। জনসমক্ষে। দিনের বেলা স্টেশনে তুলতে আসছে, বা তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ছে ট্রেনে, মানে প্রেমিকরা। একজন প্রেমিক পৌঁছে দিল নৈহাটি অবধি সকালে। তারপর তাকে টা-টা বাই-বাই। অনন্তদা বলে একজন ছিল। বেলা সাড়ে বারোটায় তাকে ঘর্মাক্ত মুখে রিকশা ধরতে দেখা যাচ্ছে স্টেশনের সামনে। সে হা-ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে, কেন-না নৈহাটি পৌঁছে দিতে গিয়েছিল সে-ই। এইবার নৈহাটি থেকে ফেরার সময় কিন্তু দেখা যাবে নৈহাটি স্টেশনে সন্ধের সময় লাল্টু স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। লাল্টু স্যার একজন যুবক-স্যার! স্কুলে পড়ান। কিন্তু অর্ডিনারি স্কুলটিচার হয়েও দেবীদি বা বেবিদি'কে লাভ করার উচ্চাশা রাখেন। স্বপ্নের পোলাওতে তো ঘি ঢালতে খরচা নেই! লাল্টু স্যারের সঙ্গে ফিরছে দেবীদি বা বেবিদি। অনেক সময় দেখা যেত দু'মাস আগে দেবীদি-র সঙ্গে ঘুরত যে, সে আজ বেবিদিকে নিয়ে ট্রেনে উঠছে। এইখানেই প্লেটোনিক কৌশলটা কাজ করত। সবার সামনে ঘোরাঘুরি, খোলা দোকানে বা রেস্তোরাঁয় বসা। ট্রেনে যাতায়াত, সবটাই দিনেরবেলা, জনাকীর্ণ সন্ধেবেলা। বাড়ি ফেরার সময় একটু আধো-অন্ধকার গলি, সেটুকুতে দেবীদি,

~ www.amarboi.com ~

বেবিদি দুঃখের কথাটুকু আর-একবার বলে নিত। নিজের বা বোনেদের অমুক পরীক্ষার ফি হিসেবে কত টাকা জমা করা যাচ্ছে না। আর তারা আশ্বাস দিত : আহা, আমি তো আছি। বাড়িতে ঢোকার আগে—যেন সাহস দিচ্ছে—এইভাবে হয়ত একটু কাঁধে হাত দিয়ে নিল। আর তৎক্ষণাৎ মুচড়ে দূরে গিয়ে দেবীদি বা বেবিদি বলল, বাড়িতে দেখতে পাবে! ধ্যাৎ। এসব কী। কিন্তু স্ট্রিট লাইটের আলোয় তাদের চোখ অন্য কথা বলল। ছেলেটি পরের দিনই সকালে বা সন্ধ্যায়—পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে যে-পরীক্ষার ফি দেওয়া দরকার—তা এনে জমা করে দিল।

প্রশ্ন করো, এসব আমি জানলাম কী করে? এত নিভৃত মুহূর্তের কথা!

হ্যাঁ, কী করে জানলে? জানলাম, এরা যখন দেবী-আকাশ বেবি-আকাশ থেকে টুপটাপ খসে পড়তে লাগল, তখন আমার ঝুড়ি পেতে রাখলাম। তারা সব আমার ঝুড়ির মধ্যে পড়তে লাগল। অর্থাৎ দাগা খাওয়ার পর তো প্রাণের ইয়ার একজনকে লাগেই। যারা হাফসোল খেয়েছে তারাই বুঝবে। আমি তখন হতাম তাদের প্রাণের ইয়ার। ইয়ে, আমি আর স্বপন। কারণ আমাদের দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত ছিল তো। যে যখন বাতিল হত প্রেমিক হিসেবে, তার মনের যত দুঃখ, জ্বালাযন্ত্রণা সব আমাদের কাছে ওগরাত।

দেবীদি যখন দেখত লোকসংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বেবিদি-র কাছে ট্রান্সফার করত। বেবিদি তখন এমনও বলত, দি'ভাইয়ের এমন করা উচিত হয়নি আপনার সঙ্গে অনন্তদা। অনন্তদা বা লাল্টু স্যার হাতে চাঁদ পেত। ভুল বলছি। চাঁদ কিন্তু তারা কেউ হাতে পায়নি। সে আশায় বাঁধি খেলাঘর। সবই ওই প্লেটোনিক চাঁদ। মাংস-রুটি, বা কাটলেট ইত্যাদি খাওয়া, এবং সিনেমা দেখা। সিনেমা হলেও কেউ হাত ধরার বেশি এগোতে পারেনি। কারণ এক কথা দুই মেয়েরই মুখে। ছিঃ। বাবার একটা সম্মান আছে না। আমার বাবাকে রেডিও-য় সবাই চেনে। আবার চোখে ঝলক নয়তো গলায় আগুনে-ফিশফিশ ঢেলে : ওসব পরে হবে। এখন না।

ঐ 'পরে'-টা আর কখনও আসত না। এ-ব্যাপারে মশা-র মাথা ছিল তার দিদিদের থেকেও পরিষ্কার। মশা এমনিতে ভালো। মশাকে মশা বললে মশা কিছু মনে করত না। এদিকে টাউনের সবচেয়ে বড় হোলসেল ডিলারের ছোটোছেলে হয়ে পড়ল মশার অনুরক্ত। সে মশার সব খরচ বহন করত বলাই বাহুল্য। কিন্তু মশা এমন সেয়ানা, তার সঙ্গে কলকাতা যাবে, ফিরবে, ঠিকই। কিন্তু কখনও কোনো একা ঘরে বসবে না। ছেলেটির বিশাল তিনতলা বাড়ি। ফাঁকা-ফাঁকা ঘরগুলো হু-হু করে দুপুরবেলা। মশা ছেলেটির সঙ্গে শিয়ালদায় নেমে কলেজ পর্যন্ত হাঁটবে। কলেজ থেকে বেরিয়ে খাবে। আবার হাঁটবে। আর শিয়ালদা স্টেশন থেকে মশাদের কলেজ কতটুকুই বা। তাই মশা বলবে, চলো আমরা একটু গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাই। এইটুকু তো পথ। ফুরিয়ে যাবে এক্ষুনি। ছেলেটি আহ্লাদে আটখানা। মনের খুশিতে চলল। যেই ট্রেন এল, মশা বলল—আমি কিন্তু লেডিসে উঠব। নৈহাটিতে ট্রেন একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াবে। তুমি জানলায় এসো কিন্তু। বেচারি যাকে প্রেমিকা মনে করছে সে লেডিসে বসে যাচ্ছে। এ যাচ্ছে ভিড়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে।

~ www.amarboi.com ~

প্রথম যেদিন স্বপনের সঙ্গে দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকছি, সন্ধে হয়-হয়। ভাঙা ছাদের ওপর কোথা থেকে একটা গলা বলল : কে? ওখেনে কী!

তাকালাম ন্যাড়া ছাদ। বিরাট বড়োসড়ো চেহারার একজন মহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে। কাপড় আলুথালু। মাথার চুল রুক্ষ এবং খোলা। স্বপন বলল, আমরা। দুগ্গা মেসোমশাইয়ের কাছে এসেছি।

পুরোনো বাড়ি, সামনে উঠোন। বেশ বড় একটা ইঁদারা। তার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে। স্বপন আবার বলল, দুগ্গা মেসোমশাই বাড়ি আছেন? মহিলা তাঁর ভাঙা-ভাঙা গম্ভীর গলায় বললেন, কুয়োর জলে ভেসে উঠেছে, মরা মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি আর স্বপন স্তম্ভিত। কী-ই বলছেন মহিলা? তিনি আবার বলছেন, স্নান করে এসে দ্যাখো। পুজো দিয়ে এসে দ্যাখো। ঘুম ভেঙে উঠে দ্যাখো। দেখবে মরা মুখ ভেসে উঠেছে। আমি ঘুম ভেঙে রোজই দেখি।

ঠিক এই সময় মশা এসে দাঁড়াল মহিলার পিছনে। মা-আ, ঘরে চলো। আপনারা দাঁড়ান। মহিলাকে ছাদ থেকে নিয়ে চলে গেল মশা। তারপর নিচে এসে বলল, আপনারা একটু বসুন। বাবা ওষুধের দোকানে গিয়েছে।

একটু পরেই দুগ্গা মেসোমশাই ফিরলেন। হাতে ওষুধপত্র। মশা এসে দাঁড়াল। মশার হাতে সব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, এই তোর মায়ের ওষুধ। আর শোন, তোর জুতোজোড়া সারিয়ে পালিশ করে এনে দিয়েছি, দেখেছিস তো? মশা বলে, হ্যাঁ দেখেছি তো। তুমি জুতো নিয়ে গেলে কেন। আমি স্বরূপদাকে বললেই কাল মুচি ডেকে আনত বাড়িতে।

আমাদের গানের আসর বসল। দুগ্গা মেসোমশাই প্রথমে স্বপনের লেখা শুনলেন। সুখ্যাতি করলেন। তারপর নিজের একটা নতুন লেখা গান পড়ে শোনাবেন বলে খাতাটা সবে খুলেছেন। বেবিদি, দেবীদি একসঙ্গে ফিরল। মেয়েরা ফিরছে। আজ থাক। উঠে পড়লেন দুগ্গা মেসোমশাই। স্বপনকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, একদিন রেডিও স্টেশনে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। আলাপ-পরিচয় না থাকলে হয়? এত মিষ্টি হাত তোমার! তবে রেগুলার যেতে হবে বাবা। কেমন! গিয়ে পড়ে না থাকলে কিছু হবে না। আমি বলি, তাহলে কবে নিয়ে যাবেন ওকে?

আমি ফি হপ্তায় যাই। এবার তো ঘুরে এসেছি। পরের হপ্তায় যাব'খন। তুমি যোগাযোগ রেখো। সন্ধের দিকে এসো। আমি ওই সময় বাড়ি থাকি। পরের সপ্তাহে সন্ধ্যায় যখন গেলাম, তখন দুগ্গা মেসোমশাইয়ের স্ত্রীকে সামনে থেকে দেখলাম। যা বলেছি, খুবই বড়সড় চেহারা। সামনের জংলা মতো বাগানটায় ঘুরছেন। বেড়ার গেট। ঠেলে আমরা ঢুকতেই বললেন, তোমাদের কাছে টর্চ আছে? স্বপনের কাছে ছিল। গরমকাল। ঝোপজঙ্গলের মাঠ পেরিয়ে দুগ্গা মেসোমশাইদের বাড়ি। উনি বললেন, হাতের কাছে টর্চ একটা রাখে না এরা। জ্বালাও তো দেখি টর্চটা। দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়ির সামনে একটা স্ট্রিট লাইট। তার আলোটা পড়েছে। সমস্ত চুল সাদা। খড়ের মতো। চোখে যে দৃষ্টি, তা

~ www.amarboi.com ~

আমাকে বা স্বপনকে দেখছে না। ছুটন্ত গাড়ির হেডলাইট রাস্তার পাশের ঝোপজংলায় যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলো বুলিয়ে যায়—সেইভাবে মহিলার দৃষ্টি আমাদের ওপর ঘুরে গেল। টর্চ আছে শুনে সেই চোখ দপদপ করল। মহিলা বললেন, ধরো দিকিনি। এই, এই ইঁদারাটার মধ্যে ফ্যালো দিকিনি। ফ্যালো। স্বপন হতবুদ্ধির মতো ওর টর্চ জ্বালিয়ে ফোকাস ধরল ইঁদারার গহ্বরে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ রাখতে হয় সঙ্গে। সাপখোপের ভয় আছে ওদিকটায়। টর্চের আলো নিচে পড়ল। চিকচিক করে নড়ছে কালো জল। মহিলা বলছেন, দ্যাখো তো কিছু দেখা যাচ্ছে? ভাসছে কিছু? তুমি দ্যাখো তো। আমিও দেখলাম। কী! কী মাসিমা। একটা মুখ দেখতে পাচ্ছ কি না বল তো! মুখটা ভাসছে। মহিলা কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে পড়লেন।

মা-আ, ও-মা-আ! কী করছ। বেবিদি বেরিয়ে এসেছে। কোমর থেকে জাপটে ধরল ওই ভারী মহিলাকে। স্বপনকে বলল, ধরো তো একটু। সুবু আর বিট্টু ছোটো দুই বোন দৌড়ে এল। মহিলাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে যেতে বেবিদি বলল, তোমরা বাবার কাছে এসেছ তো? বাবা আজ আমাদের মামার বাড়ি গিয়েছে। রবিবার ফিরবে। তখন এসো।

আমরা হতভম্ব হয়ে ফিরে গেটের দিকে যাচ্ছি, বোনদের কাছে মা'কে দিয়ে আমাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল বেবিদি। তোমরা কিছু মনে কোরো না। মায়ের মাথাটা তো জানো। অ্যাসাইলামে ছিল কিছুদিন।

অ্যাসাইলাম? তাই নাকি?

হ্যাঁ, দমদমে ট্রেনে ঢোকার আগে, যে জায়গায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে যায়—ওখানে একটা উন্মাদ আশ্রম আছে দেখেছ তো—

ওইখানেই ছিল। বড় ডাক্তাররা বলে দিয়েছে। ঠিক হবে না আর। তোমরা কিছু মনে করোনি তো।

আমরা কাঁচুমাচু। কী যে বলেন! বেবিদি বলল, বাবার কাছে শুনেছি তোমরা ভালো গান লেখো।

আমি বললাম, আমি না, ও লেখে। খুব ভালো। বেবিদি বলল, বাবা নিয়ে যাবে রেডিওয়, বলছিল। আমারও রেডিওয় অনেক চেনাজানা। অজিত মুখার্জি বলে একজন আছেন। খুব হেল্পফুল। উনি অবশ্য ড্রামা-র। কিন্তু তাতে কিছু অসুবিধে হবে না। এসো তোমরা। কেমন!

পরের সপ্তাহেই স্বপনের পিতৃবিয়োগ হল। স্বপন পড়ে গেল অগাধ জলে। ওর বাবার ছিল ছোটো মনোহারী দোকান। সন্ন্যাসীবাগান থেকে কিছু দূরে চক কেষ্টপুর বলে একটা গ্রামে। স্বপন বাধ্য হয়ে বসতে শুরু করল সেই দোকানে সকাল থেকে রাত। দুদিন গেলাম সে দোকানে। হিমশিম খাচ্ছে। ব্যবসা কিছু বোঝে না। দু-ভাই, দু-বোন ছোটো ছোটো। গান লিখেছে কিনা কিছু বলল না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ কমে যেতে লাগল দিনে দিনে।

কালক্রমে দেবীদি, বেবিদি বিয়ে করে নিল। দেবীদি-র বর ডাক্তার। দেবীদি সরকারি অফিসার হয়ে গেল, পুরুলিয়া না দিনাজপুর কোথায় যেন পোস্টিং। বেবিদির চাকরি-বর

~ www.amarboi.com ~

দুই-ই কলকাতায়। মশা উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লি চলে গেল। দেবীদি, বেবিদি-র দুজনেরই একটা করে মেয়ে হল। ছোটো দুটো বোন বড় হয়ে উঠল। তাদের বিয়ে দিল দেবীদি, বেবিদি পাত্র দেখে। মশা স্বাধীন। সে বিয়ে করবে না। কিন্তু ওদের বাড়ির সব খবর আমাকে বলে বড় দুবোনের প্রাক্তনরা। দুগ্গা মেসোমশাইকেও রাস্তায় কম দেখা যায়। রেডিয়োতে গান বাজে কি না জানতে পারি না, কারণ খবর দিতে আসেন না। এদিকে দেখতে দেখতে, অন্তত বারো বছর তো পার হয়েইছে এর মধ্যে।

একদিন, আমাদের বাড়ির পিছনের বড় কুলগাছটার নিচে দেখি হাঁটতে হাঁটতে আসছেন। হাতে অনেকগুলো হলুদ ফুলে ভরা ডাল। বাঁদরলাঠি ফুল। কী যে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছেন। এত আস্তে হাঁটতে আমি দুগ্গা মেসোমশাইকে কখনও দেখিনি। একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, হয়ত সেই জন্য।

কেমন আছেন মেসোমশাই? হাসলেন, ভালো। তোমার মাসিমার খবর জানো তো!

না তো, মেসোমশাই।

ওঁর সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। মেয়েরা চলে যাওয়ার পর প্রেসার-ট্রেসার চেক করানো হত না। এখন শুয়ে থাকেন। সামনের ঘরে। একটা অঙ্গ পড়ে গিয়েছে। আমাকেও চিনতে পারেন না।

আমি এত সব জানতাম না। ওঁর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছি ওঁর বাড়ির দিকে। বললেন, মেয়েরা টাকা পাঠায়। আয়া আর রান্নার লোক রেখেছি। সংসারও ওদের টাকাতেই চিরকাল চলেছে। টিউশন করত। কোচিং-এ পড়াত। আরও কত কী করত—কে জানে! বলে চুপ করে রইলেন দুগ্গা মেসোমশাই। আমরা পুকুরধারের সরু গলি পার হয়ে আরও সরুগলি ধরেছি মেসোমশাইয়ের বাড়ি পৌঁছানোর জন্য। আবার বললেন, ওরাই চালাত, নিজেদের পড়ার খরচ। যা কিছু। আমি কিছু দিতে পারিনি। বোনেদের পড়ার খরচ। মায়ের ওষুধপত্র। সব। ওই বড় দুই বোন। আর সেজো, এখন পাঠায়।

গান লেখেন এখন, মেসোমশাই?

লিখি। মাঝে-মাঝে। রেডিওয় আর যাওয়া হয় না। লিখে খাতায় রেখে দিই। নিয়ে আর যাই না। কী হবে বলো নিয়ে গিয়ে। গানটা দিয়ে এলাম। কেউ গাইতে রাজি হল না। অফিস থেকে আমাকে বলে আবার পঁচিশটা গান জমা দিন। ওরা দেখতে চায় আমার গান এখন চলবে কি না। এ বয়সে আর গান লেখার কী পরীক্ষা দেব বল ছেলেছোকরাদের কাছে? আহা, একটু আস্তে হাঁটো। আস্তে।

অজান্তেই আমার হাঁটার গতি বেড়ে গিয়েছিল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। দুগ্গা মেশোমশাই বলিরেখাঙ্কিত মুখ নিয়ে মধুর হাসলেন। বললেন, এই ফুলগুলো নিয়ে যাচ্ছি। চূর্ণির ধারে ফুটেছিল। এক মাঝিকে একটা টাকা দিতে পেড়ে দিল। আস্তে আস্তে হাঁটছি। জোরে হাঁটলে পাছে ঝরে যায় পাপড়িগুলো! তোমার মাসিমার ঘরে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখব। ডালগুলো পুঁতব উঠোনে। যদি হয়। তোমার মাসিমা তো খুব ফুল ভালোবাসতেন। মানে মাথাটা যখন ঠিক ছিল। তারপর তো ছেলেটা মারা যাওয়ার পর থেকে মাথাটা নষ্ট হল।

~ www.amarboi.com ~

ছেলে? ছেলে কোথা থেকে এল? আমি অবাক। ওঁর তো সব মেয়েই? তা হলে? আজ আবার অনেকদিন পর দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছি। বেড়া-গেটের ওপর হাত রেখে কথা বলছেন দুগ্গা মেসোমশাই। গেটের ওপর দিয়ে দেখি উঠোনে যে জায়গাটা ঝোপ হয়ে থাকত সেখানে বেশ একটা বাগান মতো হয়েছে।

ভারী সুন্দর বাগানটা করেছেন তো মেসোমশাই! আবার হাসলেন। বাগান তো অনেকদিন হত এ বাড়িতে। তোমার মাসিমাই করতেন। খুব ফুল ফুটত। গাঁদায় গাঁদা, ডালিয়ায় ডালিয়া হয়ে থাকত একেবারে সারা বাগান! বেলকুঁড়ি হত। গন্ধরাজের গাছ ছিল। বাচ্চারা তার মধ্যে খেলে বেড়াত। দেবী, বেবি আর ওদের ভাই।

আমি এবার আর থাকতে পারলাম না। ভাই? দেবীদি, বেবিদি-র ভাই? কখনও দেখিনি তো!

হ্যাঁ, আমার ছেলে। বেবির পরেই। মশার আগে। ওই তিনটেই বাচ্চা আমাদের ছিল তখন। তোমার মাসিমা পুজো দিতে মন্দিরে গেল নীলষষ্ঠীর দিন, লম্বা লাইন ছিল মন্দিরে। ছেলে তখন চার বছরের। বাড়িতে রান্নার মেয়েটার কাছে রেখে গিয়েছিল। সে ওকে একা রেখে চান করতে ঢুকে যায়। আর ছেলেটা কুয়োয় পড়ে গেল, ইঁদারার ধারে উঠে হাঁটছিল। ওই খেলাটা খুব পছন্দ করত কিনা।

আমার শ্বাস আটকে এল। সে কী!

দুগ্গা মেসোমশাই বললেন, তোমার মাসিমা এলেন যখন পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে। উনি ঝুঁকে দেখলেন মুখটা ভাসছে। যখন তোলা হল হাত দুটো মুঠো করা ছিল। সেই থেকেই তো! চলো ভিতরে চলো।

ভিতরে বারান্দায় বসে রইলাম। পাপড়িগুলো সব ফুল থেকে আলাদা করে এক-একটা কাচের প্লেটে রাখতে লাগলেন দুগ্গা মেসোমশাই। জল দিলেন একটু একটু করে আর বলতে লাগলেন, তারপর থেকে রোজ রাত্তিরে তোমার মাসিমা আমার কাছে আসতেন। আর বলতেন, এবার আর একটা ছেলে দাও। গুলু ফিরে আসবে। জোর করতেন। উনি বলতেন। আমিও চেষ্টা করে যেতাম। পরপর তিনবার, মেয়ে হল। মাথাটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। ও রাত্তিরবেলা জেগে থাকত। টর্চ জ্বেলে দেখত কুয়োর মধ্যে মুখটা ভাসছে কি না। তখনই মা'র রোগটা প্রথম বুঝতে পারে বড়োমেয়ে।

উঠে পড়লেন দুগ্গা মেসোমশাই। যাই, এই প্লেটগুলো ওর ঘরে রেখে আসিগে।

এর কিছুদিন পরে শুনি বাথরুমে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে শয্যা নিয়েছেন দুগ্গা মেসোমশাই। উঠতে পারেন না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এ বয়সে অপারেশন করানো যাবে না। তিন মেয়ে নিয়মিত আসছে প্রতি সপ্তায়। নার্স রাখা হয়েছে। আমি আর যাইনি। শুনলাম বেডসোর দেখা দিয়েছে।

দুগ্গা মেসোমশাই আর তাঁর স্ত্রী চার-পাঁচদিনের ব্যবধানে মারা যান। পরপর তিনটে ঘর পাশাপাশি। তৃতীয় ঘরটায় রাখা ছিল মাসিমাকে। আর প্রথম ঘরটিতে ছিলেন দুগ্গা মেসোমশাই। মাসিমাকে নিয়ে যমে-মানুষে চলছে তখন। উত্থানশক্তিরহিত দুগ্গা

~ www.amarboi.com ~

মেসোমশাই মাঝে মাঝে সাড়া দিতেন—কী হল। বীণা! ও বীণা! মরে যাওনি তো! ও বীণা! এত লোক কেন বাড়িতে?

যখন মাসিমার মৃতদেহ উঠোন পার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মেয়েরা চোখের জল লুকিয়ে বাবার কাছে এসে বলছে, তুমি মিথ্যে ভাবছ। মা তো ঠিকই আছে। শবযাত্রীদের বেবিদি নিষেধ করে দিয়েছে, হরিধ্বনি এখানে দেবেন না। বড় রাস্তায় ওঠার পর দেবেন। বাহকরা যখন বডি কাঁধে তুলছে উঠোনে, বেরিয়ে যাচ্ছে, তখনও তারা দুগ্গা মেসোমশাইয়ের ডাক শুনতে পাচ্ছিল : ও বীণা! বীণা! তুমি মরে যাওনি তো! মরে যেও না যেন। আমি তো আছি বীণা। আমি তো আছি। তোমাকে আবার ছেলে দেব বীণা। তোমাকে আবার একটা ছেলে দেব। তোমাকে আবার একটা ছেলে দেব। একটু সুস্থ হই।

সেই সপ্তাহেই যে দুগ্গা মেসোমশাই মারা যান সে-কথা তো বলেইছি। আমার শুধু এখনও মাঝে মাঝে মনে হয় অনেক অনেক হলুদরঙা ফুলভরতি গাছের ডাল হাতে বিকেলের রোদ্দুরে দাঁড়ানো দুগ্গা মেসোমশাইয়ের রেখাকুঞ্চিত মুখের হাসি। তোমার মাসিমার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। ভালো না ফুলগুলো?

সেই সঙ্গে মনে পড়ে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে আলিশাহীন বিরাট ছাদের প্রান্তে দাঁড়ানো সেই উন্মাদিনীর স্বর : কুয়োর জলে ভেসে উঠেছে...মরা মুখ দেখা যাচ্ছে...

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মরা ডাক্তারের বউ

ছুঁচোলো করে তাকায়। 'মরা ডাক্তার'। চশমা খোলা অবস্থায় বা চশমা পরে থাকলেও তাকানোটা ছুঁচোলো। ওই ছুঁচোলো তাকানোটা যে দেখেছে, সে-ই শুধু বুঝবে। বাহ্যি হয়? প্রশ্ন। হয়, ডাক্তারবাবু—উত্তর। কিরমি পড়ে? প্রশ্ন। পড়ে ডাক্তারা বাবু—উত্তর। গুঁড়িগুঁড়ি, না বড়ো? বড়ো ডাক্তারবাবু—প্রশ্ন ও উত্তর। তেতো তেতো লাগে, জিব্বায় (মানে জিহ্বায়)? না ডাক্তারবাবু। বাহ্যি ভসকা ভসকা, না পাতলা পাতলা? এবার প্রশ্ন সত্ত্বেও উত্তর নেই।

থাকবে কী করে? যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, সে একজন তরুণী, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। কটা-বুড়োর দিদি, মিতুনি। কটা-বুড়োর যেমন ফরসা গা আর কটা চোখ, ওর দিদিরও তেমনি। সুন্দরী বলে নাম আছে। একঘর রুগির মাঝখানে সেই মিতুনিকে ওইরকম সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। কতক্ষণ দেবে বেচারি মিতুনি? প্রতিবার প্রশ্নের পর রুগির উত্তর পেলেই, 'মরা ডাক্তার' একটা আওয়াজ করেন। কী আওয়াজ? ও-ও-ও! মানে হল, 'আচ্ছা বেশ বুঝেছি।' 'ও-ও-ও'টা দিয়ে এইটাই বোঝান মরা ডাক্তার। মুখে টকগন্ধ হয়? শাড়ির খুঁট আঙুলে জড়িয়ে মুখ নিচু উত্তর এল, হয় ডাক্তারবাবু। ও-ও-ও-ও! এই আওয়াজটি যেই বেরল 'মরা ডাক্তার'-এর মুখ থেকে, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হাতের পেন্সিল সাদা কাগজে কী সব লিখল।

এইবার 'মরা ডাক্তার' নীরব হলেন। তিনি একটি বড় বাক্স খুললেন। একটা শিশি থেকে কয়েকটা গুলি ফেললেন ছোট চৌকো কাগজের ওপর। কখনও বা আর-একটা শিশি থেকে সাদা ময়দা-ময়দা দেখতে পুরিয়া কাগজে ঢেলে হাত দিয়ে একটু পাকাতে লাগলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাকাচ্ছেন তো পাকাচ্ছেন। ছ'টা পাকানো হল। রোজ দুটো কেমন? একটা এখুনি খেয়ে নিতে হবে আমাদের। বলেই বললেন, হ্যাঁ, দেখি-ই। হাঁ-আ-আ-আ। সামনের পেশেন্টটি হাঁ করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে কটা-বুড়োর দিদি মিতুনি হাঁ করল। সাবধানে আঙুলের দু'তিনটে টোকায় রুগির জিভের ওপর ঝরে পড়ল ওষুধের গুঁড়ো।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। রুগি ছেলে-বুড়ো-বাচ্চা অথবা কামিনী-হস্তিনী-পদ্মিনী যেই হোক না কেন—'মরা ডাক্তার' কী করবেন? রুগি তো নিঃশব্দে মুখ বন্ধ করে মুখের ভিতর একটু জিভটা নাড়িয়ে নেবে। সেই সময়টা 'মরা ডাক্তারে'-র মুখে একটা আওয়াজ শুনবে সারা ঘরের লোক : 'ইয়া-য়া-য়া-ম, অ্যাঁ-ই-য়া-ম্-হ্যাঁ, এ-ই-ভাবে? কেমন?'

পসার খুব। সকাল সন্ধে ভিড় হয়ে থাকে। টাউনে ইনিই সবচেয়ে নামকরা হোমিয়োপ্যাথ। বাইরে সাইনবোর্ড : ড. জীবিতকুমার দাস (D. M. S) ব্র্যাকেটে ক্যাল। মানে কলকাতার কলেজ থেকে পাওয়া ডিগ্রি। ওইটুকু টাউনে কলকাতার ডিগ্রি বিরাট ডিগ্রি। বাপ-মা ওইরকম নাম দিয়েছিলেন বলে তিনি 'মরা ডাক্তার'ন নামে পরিচিত এখানে। তাছাড়া স্বভাবের দোষও আছে 'মরা ডাক্তার'-এর। ছুঁচোলো তাকানো তো বললামই। ঘষঘষে গলা। ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে কালো ব্যাগ। নাকে নেমে আসা চশমা। তার ওপর সারাক্ষণ ওইরকম সব প্রশ্ন। চুল মাথার অর্ধেকটাতেই পাকা। চলাফেরা, কথা বলা কোনোটাতেই জীবনের কোনো চিহ্ন নেই যেন। মা বেঁচে। বাড়ি ঠাকুরদার আমলের। বাড়ির সামনেই চেম্বার করেন সকাল-বিকেল। মায়ের সঙ্গে চেম্বারের পরে জগদম্বার মন্দিরে যান। মা মাঝেমাঝেই এসে ডাক পাড়েন : খু-উ-ক-অ-ন। খাইয়া যাও দুটো। ওষুধ খাইবা না?

বুড়ি খুব টরটরে। সারাক্ষণ মুখে পান। পেশেন্টদের সামনেই এসে বলেন, প্যাসেন্ট তো ভালোই হইসে দেখতাসি। সুদ্দু বইসা বইসা রুগি মারলেই কি চলব? খাইতে হইব না? পেটে দুটা দাও। জলখাবারও তো খাওনাই খুকন। বুড়ির কানে অবশ্য পৌঁছয়নি তাঁর খুকনকে টাউনের বজ্জাত লোকজনেরা 'মরা ডাক্তার' বলে। শুনলে টাউনের লোকের বাপের নাম ভুলিয়ে দিতেন বুড়ি।

এসব ক্ষেত্রে যা হয়, বাড়িতে একজন বউ থাকে। 'মরা ডাক্তার'-এরও আছে। বুড়ি বলেন, খুকনের বয়স ছয়-চল্লিশ। বউটি তাঁর ছেচল্লিশ বছরের খুকনের থেকে কিছু না হলেও পনেরো-ষোলো বছরের ছোট। 'মরা ডাক্তার' আর 'মরা ডাক্তার'-এর বউকে, জোড়ে, কেউ কোনোদিন বেরোতে দেখনি টাউনে। বুড়ি তাঁর ছেলেকে নিয়ে বেরোন সন্ধের পর মন্দিরে। আর ছেলের বউয়ের সঙ্গে মাঝে-মাঝে যান স্টেশনবাজারের দিকে, রিকশায়। বুড়ি রিকশায় বসে থাকেন। বউ গিয়ে শাশুড়ির পান কেনে, জর্দা কেনে। বউকে তিনি বউমা বলেন না। ডাকেন : ও, পোভাতি! অর্থাৎ প্রভাতী। টাউনের লোক খুবই বদমাইশ। তারা বলে, বউ তো কোনোদিন পোয়াতি হবে না, তাই বুড়ির ডেকেই সুখ। কে জানে হবে কি না। তবে [illegible] বউটা ভালো। বাড়ির পিছনে বিরাট ফুটবল মাঠ। ছেলেপুলে খেলে। বউটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে ছাদ থেকে। দুপুরে বারান্দায়

~ www.amarboi.com ~

বসে মস্ত জাঁতি হাতে সুপুরি কাটে শাশুড়ির জন্য। বাড়ির একদিকে বাগান। কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, নিমগাছ। বউয়ের ঘরটি তিনতলায়। নিমগাছটি বউয়ের ঘরের একধারে। সারাদিন নিমের হাওয়া।

উলটোদিকে গুলটিদের বাড়ি। গুলটি, ছেলে হিসেবে, প্রচণ্ড পাজি। কালকেই মাথা ফাটিয়ে বাড়ি ফিরল। আজ ফেট্টি বেঁধে ঘুরছে। মারপিট করেছে কোথায়। পরশু কার গাছ থেকে ডাব চুরি করে পাঁচিল টপকাচ্ছিল—তার ঠাকুরদা ধরতে গিয়েছেন, ঠাকুরদাকে কিনা ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ঠাকুরদা ভাগ্যিস কাঁঠালগাছের গায়ে ঠেক খেয়েছিলেন। নইলে পড়ে গিয়ে এই বয়সে হাত-পা ভাঙলে কী হত? বউটি ছাদ থেকে দেখে গুলটিদের উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীরা নালিশ করছে। আর গুলটি গোঁজ মুখে দাঁড়িয়ে। গুলটির বাবা এক থাবড়া মারতেই গুলটি নিজের বাড়ির পাঁচিলে গিয়ে উঠল। বলল, বেশ করব ডাব চুরি করব। আবার করব। বুড়ো বয়সে ধরতে এল কেন দাদু? আমি তো মারিনি। পালাতে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে। পাঁচিলে উঠে এইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে করতে উলটোদিকে লাফ দিল গুলটি।

উলটোদিকে এ-বাড়ি। কাকিমা গুলটিকে দরজা খুলে দিল। গুলটি পিছনের ফুটবল মাঠ ধরে হাওয়া। উঠোনে তখন গুলটির বাবা হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছে। আর লোকে বলছে, অমন ভাইয়ের এমন দাদা হয় কী করে?

অমন ভাই মানে পান্টা। গুলটি বদমাইশ। পান্টা ভালো। ক্লাসে ফার্স্ট হয়, নয়তো সেকেন্ড। সেকেন্ডের নিচে কিছু হয়নি কোনোদিন পান্টা। পান্টা এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। মানে এগারো ক্লাস। এটা '৭৫ সাল। একবছর পরেই নাকি এই এগারো ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা উঠে যাবে শোনা যাচ্ছে। দশ ক্লাসের ম্যাট্রিক দেওয়া নাকি ফিরে আসবে আবার। গুলটিও দেবে। কারণ দুজনেই এক ক্লাসে পড়ে। ওরা তিন মিনিটের ছোটোবড়ো।

পান্টা হায়ার সেকেন্ডারির আগে টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। এখন রাত জেগে পড়ছে। পান্টার পড়ার ঘরও তিনতলায়। কাকিমার উলটোদিকের ঘর। কাকিমার জানালার পরদা সরালে দেখা যায় পান্টার পড়ার টেবিল। পান্টার ঘরের জানলাটায় তিনটের বদলে দুটো গরাদ। মাঝেরটা নেই। মধ্যে বড় ফাঁক। কবে নাকি চোর এসে খুলে ফেলেছিল, আর লাগানো হয়নি। কাকিমা হাত-ইশারায় জানায়, পান্টা রাত হয়ে গিয়েছে, এবার শুয়ে পড়ো, তিনটে তো বাজে। আঙুল দিয়ে দেখায়, তিনটে। পান্টা হাসে। একবার ছাদে এল। ছাদে একটা জোনাকি! জোনাকি না। পান্টা সিগারেট ধরিয়েছে। কাকিমার ঘরে আলো জ্বলছে, তাই অন্ধকার ছাদে জোনাকি। কাকিমা বুঝবে না এ কি হয়? আলো জ্বালা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাকিমা চোখ বড় করে। বকুনির চোখ। মানে, কী-ই! সিগারেট খাওয়া? ক্লাস ইলেভেনের ছেলে হয়ে? পান্টা ভেবেছে কাকিমা দেখেনি। কাকিমা ঘরের আলো নিভিয়ে ছুটল ছাদে। কার্নিশে ঝুঁকে, আঙুল দেখাচ্ছে—আঙুল দেখানোর মানে কী? ফ্যালো শিগগির। ফ্যালো। অনেক রাতে হাওয়া দিচ্ছে। কাকিমা নিচু গলায় বলে, ছিঃ ছিঃ! ফেলে দাও। ভোর হয়ে আসছে। শুয়ে পড়ো। পান্টা অন্ধকারে হাসে। চাঁদ ম্লান। নারকেল গাছ,

~ www.amarboi.com ~

নিমগাছ পাতা নাড়াচ্ছে। হিসহিস করে ধমকায় কাকিমা। কবে শিখলে? শিগগির যাও, শুয়ে পড়ো। দুটো টান দিয়ে সিগারেট ফেলে দেয়। ছাদেই ফেলে। আহ্! আবার কাকিমার ফিশফিশ ধমক। পান্টা ঝুঁকে পড়ে কার্নিশে। দুটো বাড়িই বড়। ছড়ানো। ছাদ এঁকেবেঁকে গিয়েছে। ওদিকটায়, ওই পশ্চিমের দিকটায় গেলে, দুটো ছাদ লাগোয়া হয়ে যায়। কাকিমা আবার হাত-ইশারায় ডাকে : এদিকটায় এসো। পান্টা যায়। সিগারেট তুলে আনো। পান্টা ছুটে ছাদের ফেলে আসা দিকটায় যায়। মুখ নিচু করে সিগারেটটা খোঁজে। তারপর পান্টার মাথা ঝুঁকে পড়ে। কাকিমা হাত-ইশারা করে বলে, আনো, এদিকে আনো। পান্টা ছাদের ওদিকটায় আসে। এখানে কাকিমাদের ছাদটা একটা ধাপ নেমে গিয়েছে। নিচের দিকে আবার খানিকটা ছাদ ছড়ানো। সেখান থেকে লোহার বাঁকানো একটা সিঁড়ি চলে গিয়েছে একতলায়। কাকিমা আঙুল দেখায় নিচু ছাদের দিকে। শাড়িটা গুটিয়ে সাবধানে নিচু ছাদে নামে, অন্ধকার তো, যদি পড়ে যায়! পান্টাদের ছাদ তখন লাগোয়া হয়ে গেল। পান্টা ফিশফিশে গলায় বলে, কী-ই? কাকিমাও ফিশফিশে গলায় বলে, ‘ছাদে ফেলেছ সিগারেটটা, সকালে যদি কেউ দেখে ফ্যালে!’ পান্টা জিভ কাটে। কাছাকাছি থাকায় কাকিমা দেখতে পায়। তুমি সিগারেটটা এদিকে ছুড়ে দিতে পারবে? আমি ফুটবল মাঠের ওদিকটায় ফেলে দিচ্ছি। পান্টা শরীরটা সামান্য ঝুঁকিয়ে ছোড়ে। টপকে সিগারেটটা এ ছাদে পড়ল। কাকিমা তুলেছে। কাকিমার ফিশফিশ : এখনও জ্বলছে, দেখেছ! তা ছাড়া সবটাই আছে! সিগারেটটা ধরে জোরে জোরে টান দেয় কাকিমা। পান্টা আকাশ থেকে পড়ছে। এ কি, আপনি সিগারেট খান? ফিশফিশে উত্তর। খাই তো। কিন্তু তুমিই তো সিগারেট খেতে জানো না। একদম ভিজিয়ে ফেলেছ লালায়। কিচ্ছু শেখোনি। কী করে টানতে হয় সিগারেট, জানোই না। পরে একদিন দেখিয়ে দেব। পান্টা অধৈর্য। না, এখন দেখান। কাকিমা ধমক দেয়। যাও, শুয়ে পড়ো। তিনটে বেজে গিয়েছে। বুড়ি উঠে পড়বে এবার।

পাড়ায় সকলেই জানে, বুড়ি তার ছেলেকে নিয়ে ঘুমোয়।

পান্টা বলে, কাল! তা হলে আগে-আগে, কেমন?

পরের দিন রাত দুটো। পান্টা লাগোয়া ছাদ থেকে হাত বাড়িয়ে বাঁকানো রেলিং ধরল। এদিকের ওই একধাপ নিচু ছাদে এল। হাতে নতুন সিগারেট-দেশলাই। কাকিমা একবার টানে, পান্টা একবার। আবার কাকিমা ফিশফিশে, ছিঃ আবার ভিজিয়ে ফেলছ। জিভটা লাগাতে নেই। জিভটা, এরকম রাখতে হয়। এরম...এর-ম। কই, কর দেখি! ইস্, তোমার লালা আমার মুখে লেগে যাচ্ছে।

এর একমাস পর, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সাতদিন দেরি। সবাই ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ ধুপ করে একটা আওয়াজ। তখন শেষরাত। কী হয়েছে? পান্টা ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে। প্রথমেই ‘মরা ডাক্তার’-কে ডাকা হল। ‘মরা ডাক্তার’ কী করবে? জ্ঞান নেই। রক্তও নেই কোথাও। কেটে-ছিঁড়ে যায়নি তেমন। ভোরে হাসপাতাল। হাসপাতাল থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল বড়ো হাসপাতালে। মেরুদণ্ডে মারাত্মক চোট। ঘাড়ের একটু নিচের দিকে। মাথায় বড় আঘাত। মস্তিষ্কেও।

~ www.amarboi.com ~

বাক্‌শক্তি হারিয়ে, চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফিরে এল পান্টা। শুধু শুয়ে থাকে। একতলায়। নার্স রাখা হল। খাইয়ে দিতে হয়। গোঁ গোঁ আওয়াজ করে মাঝে মাঝে। চোখ ভাষাহীন। সবাই বুঝল সারারাত পড়ত আর ছাদে পায়চারি করত, আলশে নেই তো! অন্যমনস্কভাবে পড়ার কথা ভাবতে ভাবতে অন্ধকার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে। কী প্যাথেটিক! সবাই বলল। এত ভালো ছেলেটা। জড়পদার্থ হয়ে গেল এখনই। ১৭ পূর্ণ হত পরের মাসে। বোধশক্তি ও চলচ্ছক্তি হারিয়ে নিচের একতলায় শুয়ে থাকে পান্টা। গুলটি নিল ওপরের ঘরটা। তার আগে গুলটি হায়ার সেকেন্ডারি ফেল করেছে। সবাই জানে গুলটি তো এমনি বড়ো জোর থার্ড ডিভিশন পেত। সেখানে বাড়িতে অত বড় দুর্ঘটনা! ও বেচারি পাশ করবে কী করে!

তাকে পারিবারিক ব্যবসায় বসিয়ে দেওয়া হল। গ্রিল তৈরির কারখানা আছে। চালের দোকান আছে বাজারে। একটা মনোহারী দোকানও আছে। বাবা এটায় বসলে, গুলটি ওটায় গেল। গুলটি ওটায় গেলে, বাবা বসল সেটায়। তিনটে ব্যবসা ঘুরে ঘুরে দ্যাখে গুলটি। আপনিই বদমায়েশি কমে গেল।

পান্টা রাতে আলো জ্বালিয়ে পড়ত। গুলটিও আলো জ্বালিয়ে রাখে। কেন? গুলটিও ওই পান্টার টেবিলটায় বসে বসে পড়ে। কী পড়ে? খবর কাগজের মলাট দেওয়া বই। সব কটাতেই খবর কাগজের মলাট। গুলটি শুধু পান্টার খাটটা সরিয়ে জানলার ধারে করে নিয়েছে। ঘরে একটা আলমারি ছিল আয়না দেওয়া। খাট সরানোর জন্য, সেই আলমারিটাও সরাতে হয়েছে, জায়গা অনুযায়ী। গুলটি খুবই সিগারেট টানে। আলো জ্বালিয়েই টানে। মোটেই পান্টার মতো শুতে যাওয়ার আগে একখানা সিগারেট গুলটির বরাদ্দ নয়। পান্টা-গুলটি দুজনেই লম্বা-চওড়া। পান্টার শরীরটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। সবাই জানে পান্টা বেশিদিন বাঁচবে না। গুলটি সকালে বেরোয়। দুপুরে কোনোদিন খেতে আসে। কোনোদিন আসে না। আঠারো পেরিয়ে উনিশে পৌঁছেছে গুলটি। রাতে এসে আলো জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ জাগে। একটা পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ঘরের মধ্যে ঘোরে গুলটি। জানলার পরদাটা তুলে দেয়। তার আগে সতর্ক চোখে দেখে নেয় ওদিকটা। ওই ঘরটা কাকিমার ঘর। মারামারি করে যখন পালাত ওই ঘর বা ছাদ থেকে দেখে কাকিমাই হেল্প করত। নিশ্চিন্ত হয়, কারণ প্রত্যেকদিনই আলো নেভানো। প্রত্যেকদিনই পর্দা ফেলা। অন্ধকার ঘর। গুলটির রাত শুরু হয় বারোটার পরপরই। ওর ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। সিগারেট টানে। টেপ রেকর্ডে গান বাজায়। জোরে নয় অবশ্য। কাকিমা জেগে যায় যদি! আর কী সব পড়ে। টেবিলটায় বসে বসে পড়ে। খাটটায় লম্বা হয়ে শুয়ে শুয়ে পড়ে। খাটটা জানলার কিনারা পর্যন্ত উঁচু, বৃষ্টি এলে পাল্লা বন্ধ করতে হয়। বৃষ্টি না এলে আলমারির লাগানো আয়নায় গুলটির শায়িত শরীরও দেখা যায়। পড়ার পর বই যে তোশকের নিচে ঢুকিয়ে দিচ্ছে গুলটি, দেখা যায় তাও।

কোথা থেকে দেখা যায়?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যদি কেউ এদিকের ছাদের পরে যে-জানালা, সেই জানালায় দাঁড়ায়। দেখা যায়। কিন্তু কেউ তো দাঁড়ায় না। পরদা তো ফেলা। ঘর তো অন্ধকার।

ধরো, যদি-ই বা কেউ পরদা সরায় বা ফাঁক করে, তবে দেখা যাবে। কিন্তু গুলটি তো নিশ্চিন্ত, ওদিকে সবাই ঘুমোচ্ছে। রোজই যখন গুলটি ঘরে আসছে, পাশের অত বড়ো বাড়ি নিঝুম অন্ধকার। এক একদিন গুলটি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন রাত কত? ওইরকম দুটো-টুটো। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে। বড় আয়নাটায় গুলটির ফুলসাইজ ছবি দেখা যায়। গুলটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছে, দেখা যায়। গুলটি জানে গুলটি কী করছে তা দেখার কেউ নেই। গুলটির মুখ থেকে বেরোনো আর্তনাদ শোনার কেউ নেই। গুলটি জানে। তাই গুলটি নিজেকেই দ্যাখে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

একদিন গুলটি ওইরকমই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সেদিন কিছুতেই আর হচ্ছে না। কিছুতেই আর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতে পারছে না গুলটি। গুলটির আর্তনাদ বাড়ছে। আর একবার করে খাটের ওপর থেকে বই তুলে দেখছে। আবার চেষ্টা করছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কেবলই যেন যার আসার কথা সে আসতে গিয়েও পিছিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল গুলটি। টেবিলটার ওপর ঠক করে কী একটা পড়ল। গুলটি তখন যে-অবস্থায় আছে, ওইরকম অবস্থায় একটা তুচ্ছ আওয়াজও ব্রহ্মাণ্ড চমকে দিতে পারে। যে-জিনিসটা পড়ল, সেটা টেবিলে ধাক্কা খেয়ে আলমারিতে লেগে মেঝেতে পড়ে গেল। গুলটি নিচু হয়ে তুলল। একটা গোল্লা পাকানো কাগজ। ভিতরটা শক্ত। মার্বেলের মতো। খুলতেই একটা বড় সুপুরি বেরল ভিতর থেকে। কাগজটা সুপুরিতে জড়ানো ছিল। অবাক হয়ে গুলটি তাকাল জানলার দিকে। সব অন্ধকার? এটা কী? দোমড়ানো কাগজটা হাত দিয়ে সমান করল গুলটি। কুঁচকে যাওয়া স্পষ্ট গোল রেখা : 'অত কষ্ট করছ কেন? ফোসকা পড়ে যাবে যে!'

গুলটির মাথার ওপর নিঃশব্দে একটা বাজ শান্তভাবে পতিত হল এবং ওর সারা শরীর শিউরে দিয়ে পা বেয়ে নিচে মেঝেতে নেমে গেল। একবার। দুবার।

সংবিৎ ফিরে পেয়েই এক লাফে খাটে উঠে জানলা বন্ধ করল গুলটি।

তিন মিনিটও গেল না। আবার জানালা খুলল গুলটি। আবারও কিছু দেখা যায় না।

গুলটির অবিশ্বাস আর রোমাঞ্চ বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ হয়ে সারা ঘরে চলাচল করছে। গুলটির গলা শুকিয়ে কাঠ। গুলটি নিচু হয়ে কুঁজো থেকে জল গড়াতে গেল। আবার খট্। গরাদ-ভাঙা জানলা দিয়ে আর-একটা সুপুরি। 'বোকা। আমি আছি তো! দেরি করছ কেন?' সুপুরি সমেত কাগজটা মুঠো করে বুকপকেটে রাখতে গিয়ে গুলটি টের পেল, সে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আছে! যা তার পেটের ওপর অনেকটা তোলা। গেঞ্জির কোঁচড়ে সুপুরিটা রাখল গুলটি। আবার জানলায় তাকাল। ওদিকটা অন্ধকার। গুলটি ছাদে এল। উলটোদিকের ছাদেও একটি ছায়ামূর্তি। গুলটিকে কিছু শেখাতে হল না। ওদিকে, লাগোয়া ছাদটায় চলে গেল। ঘোরানো সিঁড়ির রেলিং ধরল একবার। তারপর ছেড়ে দিল। রেলিং

~ www.amarboi.com ~

ধরতে হবে কেন? ছোটো লাফে ছাদ পার হয়ে পরের ওই একধাপ নিচু ছাদটায় এসে পড়া গুলটির কাছে কী? নস্যি!

চলে এল গুলটি। ঘণ্টাখানেক বাদে ফেরার সময় উলটো লাফ দিল না। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নর্মালি নেমে গেল।

দিন কাটছে দিনের মতো। বুড়ি মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে পাঁচিলের ধারে কাদায় পায়ের ছাপ আবিষ্কার করে। ছেলেকে ডেকে তোলে। চোর এসেছিল, বুঝলি! ছেলে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলায়। মা আর ছেলে তো ছোট থেকে একসঙ্গেই ঘুমোয়। এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও ছেলে মা ছাড়া ঘুমোতে পারে না। বুড়ি হাঁপ ধরে বলে অনেকদিনই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে পারে না। তাই মা-ছেলের শোওয়ার ঘরটা বউকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কবেই। বৃষ্টি না পড়লে, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়েই উঠে আসে গুলটি। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়েই ফেরে।

মাস তিনেক পর পান্টা মারা গেল। যেতই। সবাই ধরে নিয়েছিল। তাই কান্নার রোল উঠল না তেমন।

কিন্তু কান্না শোনা গেল তার দিন দশেক বাদে। প্রবল হাঁউমাউ কান্না। গুলটি-পান্টাদের বাড়িতে নয়। পাশের বাড়িটায়। সকালবেলা। বাড়ির কাজের লোক ঘরে ঢুকে দেখে বউদিমণি মরে পড়ে আছে। জিভ বেরোনো। চোখটা খোলা। কষে শুকনো রক্ত। শাড়ি হাঁটুর ওপর পর্যন্ত উঠে আছে। বন্ধ মুঠোয় একটা সবুজ কাপড়ের টুকরো।

বুড়ির চিৎকারে লোক জমল। পুলিশ এল। পাঁচিলের ধারে পায়ের ছাপ দেখা গেল। আগের দিন প্রথম রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। সহজেই গুলটিকে ধরল পুলিশ। গুলটির খাটের ওপর পাওয়া গেল একটা শার্ট, যার বুকপকেটের সামনেটা নেই। শার্টটা লুকোনোর কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি গুলটি। গুলটির টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া গেল গোটা ছয়েক সুপুরি। চিরকুট-মোড়া সুপুরি। জমিয়ে রেখেছিল গুলটি। ফেলতে পারেনি। তাছাড়া এমনি চিঠিও ছিল গোটা দুয়েক।

শোনা গেল জোরাজুরি করতে হয়নি মোটেই। পুলিশের কাছে গুলটি সব স্বীকার করেছে।

হ্যাঁ। আমি মেরেছি। ও আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে, তাই আমি ওকে মেরেছি।

মেরে ফেলেছে মানে? বাড়ির বউ কী করে কাউকে মারবে?

গুলটি অনড়। মেরে ফেলেছে। ভাই ওর কাছ থেকে ফেরার সময় লাফ দিতে দিয়ে নিচে পড়ে গেল।

কী করে জানল গুলটি?

পান্টার শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরদিন রাত্তিরে গুলটিকে নিজেই নাকি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল বউটি। সঙ্গে সঙ্গে গুলটি গলা টিপে মেরে ফেলেছে। মারার পরেও নাকি চড় মেরে মেরে দেখেছে সাড়াশব্দ করে কি না। করেনি যখন, তখন বৃষ্টির মধ্যে বাঁকানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। গুলটি নাকি বলেছে, বেশ করেছি মেরেছি। ভাইকে ডাকত

~ www.amarboi.com ~

কেন ও? আমি তো তখনও ছিলাম। আমাকে ডাকতে পারত। মাঝখান থেকে ভাইটা মরে গেল।

যেদিন পুলিশ এসে গুলটিকে ভ্যানে তুলছে—পাড়ার লোক ভিড় করে আছে, গুলটির বাবা দারোগার হাতে-পায়ে ধরছে—তখন কিন্তু গুলটির মুখ অদ্ভুত শান্ত। কোনোদিন অত শান্ত গুলটিকে দেখা যায়নি। সবসময় ছটফট করত। এখন চুপ। মুখে কোনো টেনশন নেই। বুড়ি শুধু তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন। বুড়ির অভিযোগ গয়না নিতে চেয়েছিল তাই খুন করেছে। কিন্তু গয়নায় আমি বউকে কোনোদিন হাত দিতে দিইনি। একতলার সিন্দুকে রেখেছি। চাবি আমার বালিশের তলায়। তাই নিতে পারেনি। পাড়ার দুজন মহিলা বুড়িকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। 'মরা ডাক্তার'-ও শান্ত। শুধু চুপচাপ তাকিয়ে আছে। দেখাতে আসা পেশেন্টদের দুজন কম্পাউন্ডার-ই বলে দিচ্ছে আজ চেম্বার বন্ধ। পেশেন্টরা ফিরে যাওয়ার বদলে একবার মরা ডাক্তারকে দেখছে আর একবার গুলটিকে।

'মরা ডাক্তার' কিন্তু গুলটিকে দেখছেও না। এমনিই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। একজন কম্পাউন্ডার এসে বলল, দেখবেন ডাক্তারবাবু, ও শালার নিশ্চয়ই ফাঁসি হবে। কম্পাউন্ডারের দিকে তেমনি ছুঁচলো করে তাকাল 'মরা ডাক্তার'। চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাল। তার মুখে কোনো রেখা কাঁপছে না। যেভাবে রোগীর বাহ্যে কীরকম হয় বা জিহ্বা তেতো লাগে কি না শুনে প্রতিক্রিয়া দেয়, সেইভাবে 'মরা ডাক্তার' শুধু বলল, 'ও-ও-ও'!

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বড় দারোগার বাবা

আব্‌রিত্‌তি লিখঅস? আব্‌রিত্‌তি? অ্যাঁয়? বাংলার মাস্টার মিত্‌তুনজয় বাবু কইছিল? কী লিখঅস? আব্‌রিত্‌তি? না স্যার। আবার মিসা কথা কয়। থাবড়া খাবি-ই? থাবড়া-আ?

না স্যার।

তবে মিসা কথা কস ক্যান? দুই পৃষ্ঠা, তিন পৃষ্ঠা কইরা আব্‌রিত্‌তি লেইখ্যা কি না রেগুলার জমা দিস বাংলার মাস্টাররে? বলিস কিনা কারেকশন কইরা রাইখবেন! অ্যাঁয়?

না স্যার দুবার দিয়েছিলাম।

তবে 'না, স্যার' কস ক্যান? 'হাঁ স্যার' ক।

এঁর নাম মুশকো স্যার। মুশকো স্যারের খুব রাগ কেউ কবিতা লিখলে। উনি অঙ্কের শিক্ষক। অনন্ত মণ্ডল। ক্লাসেই বলেন, জোর গলায় : রুবি ঠাকুর কী কঅরছিল? না, আব্‌রিত্‌তি ল্যাখসিল। শন্‌সোয়িতা-খান ভইরা-বইরা আব্‌রিত্‌তি ল্যাইখ্যা এক্কেরে শ্যাষ কইরা রাখছিল। বিবাহে একখান শন্‌সোয়িতা পাইছিলেন আমার ইস্তিরি। ইনি দ্যাহ রাখছেন কবেই। শুদ্ধু বইখান আসে এহন। কুন কামে লাগে? বাড়িতে রাইতে চুর আইলে, গ্যারোস্তো হাতের কাছে কিছু না পাইলে, ওইখান, ছুইড়া মারা ছাড়া আর কুনো কাম অইবো না শন্‌সোয়িতা দিয়া।

ক্লাসের মধ্যে একজন বলে উঠল : কেন স্যার, রবি ঠাকুর তো নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন?

এক্কেবারে মাইরা রাখসে দ্যাশটারে তো ওইতেই। নুবেল প্রাইজ পাওনাটাই কাল অইল। ক্যান, যাদব চক্‌কোত্‌তিরে কেউ একখান নুবেল প্রাইজ দ্যায় নাই ক্যান?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সায়েবগুলান চিরুকাল জমিদার চাটা। চিরুকাল-ই। যাদব চক্কোত্তি যে কত্তো বড় বিদ্দান! অ্যাঁ! উনির যে গ্রান্থো...গানিতের যে গ্রানথো খান উনি...তা ল্যাখতে বুকের পাটা লাগে। ব্রেইন লাগে। ব্রেইন। অ্যাঁ? আব্রিত্তি ল্যাখনের মতো সহজ না। রুবিঠাকুর, অ্যাত্তো সব বই ল্যাখসে...নাটক, নুবেল...অর ওপর, অরে জানি কী কয়! হ, হ, প্রু-বান্ধো-ও...তাও ল্যাখসে...গানবাজনাও ল্যাখসে! নাইচ্? নাইচ্ও ল্যাখসে...এই যে হ্যামনলিনী বিদ্যালয়ের মাইয়ারা নাচে, নিত্তোনাইট্যো, হেই নাইচ্গুলান তো রুবি ঠাকুরই ল্যাখসে! অহক্কল-এ ল্যাইখ্যা থুইসে! শুদ্দু একখান অঙ্কের বই ল্যাখে নাই! একখানাও না! ক্যান? একখানা পাটিগণিত ল্যাখ্তে কী অইছিল রুবি ঠাকুরের? কও? ক্যান ল্যাখে নাই? অ্যাঁয়?

কেন লেখেননি স্যার!

ব্রেইন লাগে। ব্রেইন। পারে নাই। সাইধ্যো অয় নাই। যাদব চক্কোত্তির ব্রেইন আছিল।

গালে, কপালে চিবুকে গর্ত গর্ত দাগ। বসন্ত-র। কুচকুচে কালো গায়ের রং। ঘন ভুরু। জোড়া। বড় চ্যাটালো কান। কানে চুল। মাথায় খাড়া কদমছাঁট। সব কালো। ফতুয়া থেকে বেরিয়ে আসা পুরু হাতে গোছা গোছা লোম। ফতুয়ার গলার কাছে লোম। ধুতি হাঁটু অবধি। পিছনে ঘুরলেন তো পায়ের দাবড়া ডিম দেখা যাবে। শীতকালে ধুতির ওপর কালো কোট। বৃষস্কন্ধ যাকে বলে, তাই। কপাটবক্ষ। হাইট, পাঁচ ফুট দশ-টশ তো হবেই। সেই পরিমাণে চওড়া। চক্ষুদ্বয় গোল ও বড়ো। নাসারন্ধ্র দুটি ডানদিক বাঁদিকে একটু করে ওঠানো। নাক সর্বসময় কুঁচকে আছে।

একদিন চিৎকার করছেন ক্লাসে—অ্যাই লইখ্যা! কী ল্যাখ্সো? এডা কী ল্যাখসো? বাপ-মায়ে আবার নাম রাখসে লোকখীমনতো!

ছাত্রটির নাম সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত মজুমদার। কী-ই ল্যাখ্সো? 'প্রুদইত্তো বাসি মাল'! অ্যাঁয়!

ছাত্রটি 'প্রদত্ত রাশিমালা' লিখতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় 'র'-এ ফুটকি আর 'ল'-এ আকারটা দিয়ে উঠতে পারিনি। ক্লাসে তার নাম-ই হয়ে গেল 'বাসি মাল'।

ওদিকে একজন কবিতা লেখার চেষ্টা করে স্কুল ম্যাগাজিনে দিয়েছে, আর বাংলা স্যার উৎসাহ দিতে তাঁকে মাঝে মাঝে দেখাতেও গিয়েছে। জানাজানি হতে কী কাণ্ড, সে তো দেখাই গেল। কিন্তু এরপরে আরও আছে।

অঙ্কে কত পাইছিস, জানোস? উনোত্তিরিশ। পাশ করো নাই! পাস মার্ক নাই তোমার! থাকবে কী জইন্য! কী-অ জইন্য থাকবে, শুনি? অ্যাঁ? আব্রিত্তি ছাপাইতে চাও? ম্যাথোমেইটিক্সে পাশ মার্ক তুমারে দিমু না। দিমু-ই না আমি! আমারে মাইর‍্যা ফ্যাললেও দিমু না। গরগর করতে করতে ক্লাস ছাড়লেন মুশকো স্যার!

ক্লাসের মধ্যেই ব্যক্তিগত কথা বলার অভ্যেস স্যারের।

অ্যাই যে আমি। ছুটো থেকেই শুনছি রুবিঠাকুর-রুবিঠাকুর।

~ www.amarboi.com ~

জিব্বা থেকে লাল-ঝুল ফেইল্যা দেয় লুকজনে, রবিঠাকুরের নাম কইরা। আমি কখুনও পইড়াও দেখি নাই। কখুনো না। কুনো রবিঠাকুর না-পইড়াই আমার ষাইট বৎসর বয়স পুন্নো অইল। ইস্কুল কমিটি আমারে এক্সটেইনশন দিসে আরও দুই বৎসরের জইন্য। আমারে অশিক্ষিত কইতে পারবা? কও? অশিক্ষিত অইলে স্কুল কমিটি কি আমারে এক্সটেইনশন দিত? অ্যাঁ!

অ্যাই যে আমার বড়ুছেলে! সে মেজোবাবু অইসে থানায়। সে গ্রাজুয়েট। গ্রাজ-উ-য়ে-এট। বুঝলা! সে-ও কখুনও কুনো রুবিঠাকুরের আব্‌রিত্‌তি পড়ে নাই। ইস্কুলের সিলেবাসে যা আছিল, তা ছাড়া পড়ে নাই। ভিলেজে অহঙ্কলে তারে মানে। মানে থানার বড়োবাবুও। চুর-ডাকাতে মানে। অনেক উপরি পায়। অ-নে-ক। রুবিঠাকুরের আব্‌রিত্‌তি না-পইড়াই আমাদের কুনো অভাব নাই। আমার বড়ছেলে আইজ মেজোবাবু। তারে কেউ অশিক্ষিত কইতে পারবা! কও? অ্যাঁ?

কে কী বলবে? মানে কইবে? বলা-কওয়ার আর কী আছে? মুশকো স্যার যেমন বেচারা লক্ষ্মীমন্ত মজুমদারের নাম 'বাসি মাল' করে দিয়েছিলেন, তেমনই ক্লাসের ছাত্ররাও মুশকো স্যারকে ছাড়েনি। এমনিতেই বলত 'মুশকো স্যার'। আড়ালে। সেই নামটা হঠাৎ আড়ালেই বদলে গেল।

যে ছাত্রটি পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা লেখা প্র্যাকটিস করত সে ছিল নিরীহ ধরনের বদমাইশ। মিনমিনে শয়তান যাকে বলে। তার স্বভাব ছিল ডিকশনারি ঘাঁটা। আর জুতসই ওয়ার্ড-এর সন্ধান করা। সে একদিন বাড়ি থেকে ডিকশনারি বগলদাবা করে স্কুলে এল। তখন সবে ইলেভেন-এ উঠেছে তারা। ডিকশনারি খুলে দেখাল ছেলেপুলেকে। দেখ, মুশকো স্যার বলি তো আমরা? মুশকো মানে কী সেটা দ্যাখ!

ছেলেপুলের একটা সময় লাগল বুঝতে। বুঝেই হইহল্লা জুড়ল সব। ম্যাচ জেতানো প্লেয়ারের মতো, ওই নিরীহ বদমাইশটাকে, কাঁধে তোলে আর কী!

টিফিনে, গাছতলায় বসে, ডিকশনারি খুলে, নিরীহ বদমাইশটা ওদের দেখিয়ে দিল 'মুষ্ক' বলে একটা ওয়ার্ড আছে। সেটার মানে অণ্ডকোষ। বানানটা শুধু 'তালব্য শ' দিয়ে নয়। 'মূর্ধন্য ষ' দিয়ে। আর যুক্তাক্ষর।

সমস্ত স্কুলে রটে গেল বি-স্যার। ওই যে 'বি' আসছে। মানে বিচি স্যার। সংক্ষেপে বি। বিচি-র ক্লাস আছে। সত্যিকারের ভালোমানুষ লক্ষ্মীমন্ত মজুমদার প্রতিশোধের আনন্দে মৃদু হাসে আর মিনমিনে শয়তানটাকে ডেকে ডেকে চালতার আচার খাওয়ায়। এক্সট্রা হজমিগুলি দিয়ে দেয় বুকপকেটে। লক্ষ্মীমন্ত মজুমদারের মুখ প্রতিশোধের আলোয় স্নিগ্ধ হয়ে থাকে।

মুশকো স্যার আরও কিছুকাল এক্সটেনশনে থেকে রিটায়ার করলেন। কিন্তু দাপট কমল না, বরং বাড়ল। কারণ মুশকো স্যারের বড়ছেলের দাপট বাড়ল। মুশকো স্যারের বড়ছেলে আগে মেজোবাবু ছিল কোন গ্রামে—এখন প্রোমোশন পেয়ে বর্ডারের দিকে আছে। বড়ছেলে অনেকদিন আগেই বড়বাবু হয়েছে। এ বাড়িকে বড় দারোগার বাড়িও বলে এখন লোকে।

~ www.amarboi.com ~

বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন মুশকো স্যার। একটা ছেলেও হয়েছে। তারপর একদিন দোতলার ঘর থেকে নিচু রেলিং-এর বারান্দায় ছুটে এল বউটা। মুখে বলছে, আর না আর না। পিছন পিছন বেল্ট হাতে ইউনিফর্ম পরা বড় দারোগা। বেল্ট পড়ছে পিঠে-মুখে। বউটা, টাল রাখতে না-পেরে নিচু রেলিং-এ আছড়ে পড়েই বেকায়দায় ঘুরে সটান নিচের উঠোনে। টিউকলে কোমরটা লাগল, মাথাটা উলটো হয়ে ধাক্কা দিল কলের নিচে সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে। ব্যস! ওখানেই শেষ। ছেলেটা তখন বছর সাতেকের। উঠোন-সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখছে মা পড়ল।

কিচ্ছু হল না। বউটার বাবা-মা-দাদা এসে বড় দারোগার উঠোনে দুদিন কান্নাকাটি করে পথ দেখল। কী আবার হবে? থানার বড় দারোগা। গাঁয়ের গরিব মেয়ে বিয়ে করে এনেছিল।

পরের বারও তাই আনল। মেয়েটা এবার আরও গরিব। বয়স আরও কম, মাত্র ৮/৯ বছরের ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিল বোর্ডিং স্কুলে। ছুটিতেও ছেলেটাকে বাড়ি আনে না। নতুন বউটাকে শুধু পুজোবাড়ি যেতে দেখা যায় মাঝে মাঝে।

মুশকো স্যারের ছোটো পুত্র আগেই বাবা-দাদার অমতে রেজিস্ট্রি করে সস্ত্রীক বাড়ি ঢুকেছিল। মুশকো স্যারের তর্জন চলছে। নিচু পাঁচিলের ওপারটায় উঁকিঝুঁকিতে পাড়ার মা-কাকি-জেঠিরা। উঠোনে নতমুখী নবপরিণীতা। এসময় বড় দারোগা বেরিয়ে এসে এক থাপ্পড় মারে ভাইকে। ভাই ঘুরে মাটিতে। নতুন বউ ঝুঁকে পড়ে তুলল। তুলে সেই যে স্বামীকে নিয়ে বিদেয় হল, আর এ-টাউনে ঢোকে না। মুশকো স্যার গর্বের সঙ্গে বলেন, তাড়িয়ে দিয়েছেন ছোট ছেলেকে।

কোথায় বলেন? প্রধানত টিউশন ছাত্রদের। বাড়িতে মাদুর পেতে দু'-বেলা টিউশনি করা আর দু-বেলা টানা এক মাইল হাঁটা চালিয়ে যাচ্ছেন মুশকো স্যার।

শোনা যায়, ছোটো ছেলের বউ শিক্ষিত, হাইস্কুলে পড়ায়, ডানকুনি না কোথায় যেন। তার বর সেখান থেকে চাকরিতে যায় ডালহৌসিতে। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। টাউনের লোকের সঙ্গে দেখা হলে বাড়ির কথা তোলে না। কেউ বললেও শুনতে চায় না।

বড় দারোগার ছেলেটা একেবারে পাঁচ-ছ বছর পর এল। পাড়ার লোক অবাক। বছর ১৫ বয়স ছেলেটার, লম্বা চওড়ায় প্রায় বাবার সমান, এখনই! এ-বাড়ির পুরুষরা উঠোনের টিউকলে চান করে। ছেলেটা কী জানি কেন চান করতে নদীতে যায় রোজ। বড় দারোগা যদি বাড়ি থাকে, ধমকায় তাহলে চান না করে রুক্ষ মাথায় খেতে বসে যায় ছেলেটা। একদিন দেখা গেল, বাড়ির সামনের টাইম কলে একটা গেলাস নিয়ে ঢকঢক দু-গেলাস জল খেল। অন্য যারা জল নিতে এসেছে তারা অবাক। ধুয়ে নিয়ে, কাঁসার গ্লাস থেকে হাতের ঝাঁকিতে জল ঝরাতে ঝরাতে ঢুকে গেল সদর দিয়ে।

দিন সাতেকের মধ্যে বোর্ডিং-এ ফেরত। আবার আসে না আসে না। দু বছর। তারপর এল। চান করতে নদীতে যায়। কী তাগড়া! বছর সতেরো বয়স হবে। মাথাটা বড়। এ

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

বাড়ির ধারা। সব কিছু বাবা আর ঠাকুরদার মতো। শুধু গায়ের রংটা মায়ের। ফলে, তাকিয়ে দেখতেই হয়।

ছেলেটা কারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেই না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ-হাঁ করে উত্তর দেয়। এখন রাস্তার কল থেকে এক বালতি করে জল নেয় রোজ। টাইম কলে জল আসে সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যায়, নিয়ম করে। মিউনিসিপ্যালিটি-র কল। জড় হওয়া বউ-ঝিদের মাঝখানে এসে ছেলেটা তার বিরাট চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। হাতে একটা প্লাস্টিকের নীল বালতি। তখনই বাকি সবার কথা বন্ধ। তাড়াতাড়ি নিজের বালতি বা ঘড়া সরিয়ে ছেলেটাকে জল নিতে দেয় সকলে। বড় দারোগার বাড়িতে প্লাস্টিকের বালতি ব্যবহার হয় না। কেউ কেউ রেলবাজারে তাকে দেখেছে। ট্রেন থেকে নামার পর, হাতের সুটকেস রিকশায় উঠিয়ে প্লাস্টিকের মগ-বালতির দোকানের সামনে ছেলেটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ছেলেটার দাঁড়িয়ে থাকাটা অদ্ভুত! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অত মহিলার মাঝখানে। অথবা একা। একটা পাহাড়ের মতো। মাথাটা ভারী। চোখে যেন দৃষ্টি নেই। একটা বড় পাথর পড়ে আছে যেন।

একদিন ছেলেটা নদী থেকে স্নান করে সদর দরজায় ফিরেছে। তখন নিচু পাঁচিলের বাইরে জিপ। ভিতরে চ্যাঁচামেচি।

বড় দারোগা চ্যাঁচাচ্ছে—তুই বাইরের ছাড়া-কলে জল আনতে গিয়েছিলি ক্যান?

দ্বিতীয় বউয়ের ক্ষীণ গলা, তবুও শোনা যাচ্ছে এখন—লাগছে, আহ্—লাগছে—মা গো।

ক্যান গেছিলি ক।

দ্বিতীয় বউয়ের গলা, রাজু এসে খেতে বসবে। খাওয়ার পর জল খাবে, তাই! আহ্, ছাড়ো।

বড় দারোগার গলা, জল খাইব? মানে? মানে কী? টিউকল রইসে তো। বাড়ির বউ জল আনতে বাইরে যাবি?

রাজু, ছাড়া-কলের জল খায়। এই জল খেতে পারে না। নিজেই আনে। আজ দেখি ওর ঘরে বালতিতে জল নেই। ভুলে গিয়েছে। রাজু ফিরতে ফিরতে যদি জলের টাইম হয়ে যায়, জল চলে যায়—এই ভেবে এনে রেখেছিলাম।

বড় দারোগার গর্জন, এই টিউকলের জল রাজুর বাবায় খায়, ঠাকুরদায় খায়। রাজুরও খাইতে হইব। রাজু খাইতে বাইধ্য। ফ্যাল বলছি! ফ্যাল। বালতির জল ঢাইল্যা ফ্যাল। আমার চোক্ষের সামনে ফ্যালবি ওই জল।

ছেলে এগিয়ে এল। দিন। আমি ফেলে দিচ্ছি। বড় দারোগার হাত থেকে শান্তভাবে বালতি নিয়ে উঠোনের সামনের নালায় ঢেলে দিল ছেলে। স্বামীর হাত থেকে চুলের গোছা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল দ্বিতীয় বউ।

ছেলে এরপর আরও তিনদিন জল খায়নি। বাড়ির কাজের লোকের কাছে পড়শিরা শুনল। দুজন ঠিকে মেয়েলোক ও-বাড়িতে কাজ করে।

~ www.amarboi.com ~

ছেলের আসা আরও কমে গেল এরপর। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে একবার এল দু-দিনের জন্য। চলে গেল আবার। কোন কলেজে যেন পড়ছে। পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে বাড়ি আসে না। মেসে থাকে। তার ঠাকুরদাই বলেন এসব পাড়াপড়শিদের।

বড় দারোগার বাড়িতে সারাদিন এমনিতে আওয়াজ নেই। ঠান্ডা, চুপচাপ। দ্বিতীয় বউয়ের সন্তান হয়নি তো। শ্বশুর বলেন, বউমা বাঁজা। পাড়ার অন্য বুড়োদের কাছে বলেন। বড় দারোগার চিৎকারও শোনে পড়শিরা—অ্যাই বাঁজা মাগি! ইদিকে আয়।

পাড়ার লোক বলাবলি করে এই বাড়িতে তো কোনো বউ বাঁচে না, এই বউটা টিকে গেল কী করে কে জানে?

আগে কলবল করে স্টুডেন্টরা আসত দুবেলা। এখন অনেকদিন মুশকো স্যারের টিউশনি বন্ধ। বাড়ির সামনের জঙ্গুলে গাছপালা নিজে নিজে কাটছিলেন মুশকো স্যার। কী একটা গাছের রস চোখে ছিটকে লাগে। তারপর থেকে চোখ খারাপ। অপারেশন। দু-বার। তাও সারেনি। এক চোখে পুরু কাচ। অন্য চোখ কালো দিয়ে ঢাকা। বেশি চলফেরা করতে পারেন না। তার ওপর সুগার ধরা পড়ল। রোয়াকে বসে থাকেন। সদর দরজার বাইরে। রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করা কাউকেই জানাতে ভোলেন না, তিনি গ্র্যাজুয়েট। তাঁর ছেলে গ্র্যাজুয়েট। এখন তাঁর নাতিও গ্র্যাজুয়েট হয়ে গিয়েছে।

নাতির কাকাও তাই। কিন্তু মুশকো স্যার ছোটো পুত্রের নাম মুখে আনবেন না।

নাতি নাকি আর্মিতে চান্স পেয়েছে। নিজের চেষ্টায়। বিজ্ঞাপন দেখে। এখন অনেকদিন ট্রেনিং-এ আছে। তাই বাড়ি আসতে পারে না।

বাড়ি অবশ্য এল। বড় দারোগার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে। বড় দারোগার এক মেয়েমানুষ রাখা ছিল। তার বাড়ি থেকে অনেক রাতে ফেরার সময় বর্ষার রাস্তায় পিছলে গিয়ে বড় দারোগার জিপ গাছে মারে ও তৎক্ষণাৎ উলটে পাশের পুকুরে অর্ধেক ডুবে যায়। ড্রাইভার মৃত। বড় দারোগার প্রাণ বেঁচে গিয়েছে। কোমরের হাড় তিন টুকরো। তারপর? হাসপাতাল-বাড়ি-হাসপাতাল। শেষমেশ আবার বাড়ি। বড় দারোগা শয্যায়।

বড়দারোগার ছেলে এবার আসতে লাগল। এসে থাকতেও লাগল। মাঝে মাঝেই। বড় দারোগার অবস্থা কী?

বড় দারোগার অবস্থা কিছুকাল একইরকম। ক্রমশ অধিক-অধিকতর খারাপ।

নিরীহ বদমাইশটাও এখন কলকাতা শহরেই থাকে। মাঝে মাঝে দেশের বাড়ি আসে। একদিন ওই পাড়া দিয়ে যেতে যেতে দেখল মুশকো স্যার বসে আছেন, রোয়াকে। পাশেই বড় সদর দরজা খোলা। ভিতরে উঠোন। পায়রা ঘুরছে।

প্রণাম করল। চিনতে পারলেন না। ছাত্তরও তো সেই স্কুলেরটি নেই। সেও মাঝবয়সি হল। কিন্তু নাম বলতে চিনলেন। তুমার নামতো প্রাইজকাল প্যাপারে বার অয়। পাড়ার লুকেও বলে। টিভিতেও দ্যাখায় তুমায়, শুনসি। আমার টিভি দ্যাখ্যা নিষেধ আছে। চুখের জইন্য।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কবজিটা ধরলেন। তুমি তো বাবা অহন গইন্যমাইন্য অইসো। আমার দুটা কথা শুনবা?

~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন স্যার।

বইস্যা শুনতে হইব কিন্তু। আমার পাশে বইসো। এই রুয়াকে। মাদুর না-ই কিন্তু। আমি অমনিই বইস্যা পড়ি।

নিরীহ দেখতে ছাত্রটি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়েও মতলববাজ (অভিসন্ধিপ্রবণ?) হয়েছে। এই বৃদ্ধ তার কাছে একটা সাবজেক্ট। সে বসে পড়ল।

বলুন না স্যার, কী বলবেন?

আমার বড্ডু ছেলের তো উঠনের ক্ষ্যামতা নাই।

জানি স্যার। জিপ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল।

ওঃ। তুমি জানো? অ্যাঁয়?

জানি স্যার, বাড়িতে তো আসি। টাউনের লোকেও মাঝে মাঝে যায় আমার কাছে। খবর পাই।

আমার চুখটা—

জানি। গাছ কাটতে গিয়ে।

ডুমুর গাছ অইছিল। দা-ও দিয়া ডালগুলান কাটছিলাম। আঠা ছিটকাইয়া পঅড়লএ...

আপনার ছোটো ছেলে কেমন আছে স্যার?

জানি না। বড্ডুর অ্যাক্সিডেন্টের পরেও ছুটো আসে নাই। বৌমাডা বদ। আসতে দ্যায় না। দুইডা কইন্যা উদের। চুক্ষেও দেখি নাই। উদের মা-র নাকি কইয়া দিছে, ওই বাড়িতে কুনো মাইয়ার পা দেওন-ই উচিত না। কও! কী কইব্যা অ্যাঁ?

তখন বিকেল সাড়ে তিনটে। অঘ্রানের শুরু। রোদ হেলে গিয়েছে তাড়াতাড়ি। মুশকো স্যারকে এখন আর মুশকো বলা যায় না। সুগরের আক্রমণে দশাসই চেহারাটা কুঁকড়ে গিয়েছে। মাথাটা ন্যাড়া করে রাখেন। কালো একটা লোহার শিকের মতো সোয়েটার। ফতুয়াটা ঠিকই আছে। ফতুয়ার হাতা থেকে সরু হয়ে যাওয়া হাত বেরিয়ে কোলের ওপর রাখা। সাদা হয়ে গিয়েছে হাতের লোম।

তুমারে একটা কথা কই। শুধু ছুটো বউমা-ই নয়। নাতিডাও কী কয় জানো! আসে। থাকে। টাইম কলের জল খায়। বাড়িতে টিউকল। দ্যাখ্সো তো। কবে থিকা...

ছাত্তর ঘাড় ঘুরিয়ে দ্যাখে। টিউবওয়েল, উঠোন প্রান্তে। পায়রা উড়ে বসছে তার ওপর।

নাতি কয়, মায়ের হাড়িকাট-ধুয়া জল খাইমু না। মানে জুপোকাইসঠো। অর মা-য়, উই দু'তলার বারাইন্দা থিকা নলকূলের ওপরই পঅড়ছিল তো। হ্যাই নলকূপ তো না-ই আর। না-ই। অইন্য কল বসানো অইসে। তাও কইব হাঁড়িকাঠ। কও দেখি!

ছাত্তর চুপ। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা সাইকেল যাচ্ছে। দুটো লোক যাচ্ছে। মুশকো স্যার চুপ করে যাচ্ছেন।

হঠাৎ মুখটা কাছে এনে ফিশফিশ করেন, নাতিটা আসে। থাকে। বউমা আর নাতি একোই ঘরে শুইতে যায়। বড্ড ছেলে [illegible]। সব বুঝে। কয়, বাবা আপনে নজর করবেন উঁয়াদের।

~ www.amarboi.com ~

ছাত্তরটি যত আশ্চর্য। তত উৎসুক। সাবজেক্ট, সাবজেক্ট। মুখে বলে, বলেন কী স্যার? তারপর? নজর করেন, আপনি?

আবার সামনে দিয়ে লোক যাচ্ছে। মুশকো স্যার চুপ। ছাত্তরটিকে কেউ জিজ্ঞেস করছে, আরে তুমি, কবে এলে?

কাল এসেছি।

ক'দিন থাকছ!

সকালে চলে যাব।

মুশকো স্যার কাপড় দিয়ে ঢাকা হাঁটুর ওপর একটা মশা মারতে থাপড় ফ্যালেন। স্প্রে কইরা মাইরতে অইবে উয়াদের! ছাত্তর চমকে ওঠে, কাদের?

অ্যাই মশাগুলোর কথা কইছি। ধুতি সরিয়ে মুশকো স্যার শুকনো কালো হাঁটু বার করে দেখার চেষ্টা করেন মশাটা মরল কি না। মরেনি। পালিয়েছে। এই মশাগুলান অইসে শুয়ারের বাচ্চা। ধুতিটা উপর দিয়া রক্ত খায়।

পুরনো প্রসঙ্গে ফেরেন এরপরই। কী কইরা নজর করুম? অহইনধ্যার পর তো চুখে কিছু দেহি না। আমি অহন রাইতকানা অইসি। তবে কানে আউয়াজ আসে। রাইতে তো ঘুমাইতে পারি না। এমনি-ই বয়অসে ঘুম কইম্যা যায়। তাই আউয়াজ পাই। কানে আইস্যা পড়ে।

শ্রোতা অসম্ভব উৎসুক। সাবজেক্ট! কী কানে আসে স্যার?

আউয়াজ। আউয়াজ। নানা প্রকারের আউয়াজ অইতে থাকে বউমার ঘরে। মাইন্‌সের আউয়াজ। ঠিক কইরা কইলে মাইয়ালোকের আউয়াজ। আউয়াজ যে এমুন অয়, কুনোদিন জানি নাই।

শ্রোতার আগ্রহ শেষ সীমায়। কী আউয়াজ স্যার? কী আউয়াজ?

তুমারে বুঝাইতে পারুম না। নিজেও বুঝি না সব। আগে ফিশফিশ করত। চাপাচাপা আউয়াজ। অহন জুরেই হয়। গুঙ্গাইয়া-গুঙ্গাইয়া য্যান কাঁন্দে কেউ। মাইয়ালুকের গুঙ্গানি। একদিন ভুরবেলা উঁই আওয়াজ। আলো ফুটছে। লাঠি লইয়া বারইলাম ঘর থিকা। বউমার জানলায় উঁকি দিছি। ভুরের আলোয় দেহি, একোই খাইটে, একোই ল্যাপের তলে, দুজনায়। আর ল্যাপ নড়তাসে। কী বএলব তুমারে! এক্কেরে গাঙ্গে বানের সুময় য্যামুন ঢেউ দ্যায়, ত্যামুন ঢেউ উঠত্যাসে...ল্যাপে...ধরো গিয়া এত্তোডাই নড়াচড়া। আর গুঙ্গানি।

সদর দরজায় কারও পায়ের শব্দ। বাবা।

ছাত্তর ফিরে তাকাল। মহিলাও তাকাল ছাত্তরের দিকে।

মহিলার হাতে ছোটো প্লেটে বসানো চায়ের গেলাস। তাতে দুটো নোনতা বিস্কুট। আপনার চা, বাবা।

মুশকো স্যার ব্যস্ত হন। বউমা, এক কাপ দ্যাও। এরে চিনো? আমার ছাত্তর। প্যাপারে নাম উঠে। ছুবিও দ্যায়।

~ www.amarboi.com ~

মহিলা ঘোমটা একটু টানে-কী-টানে না। স্মিতমুখে বলে, চিনি। এখানকার মানুষ। আপনার বই দেখেছি রানি মা টকিজে।

মুশকো স্যার বলেন, হ, হ। সিনেমাও ল্যাখসো শুনছি। অরে চা দাও বউমা।

এবার শ্রোতা ব্যস্ত। না, না, আমি চা একেবারে খাই না।

অম্লান মিথ্যে। মহিলারও কোনো গরজ নেই। ও আচ্ছা, খান না বুঝি। বলে ঘুরে চলে যেতে থাকে মহিলা।

ছাত্তরের নিচু নজর। এক্ষুনি এত সব শুনেছে। সে লক্ষ করে। বয়স? তার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোটই হবে। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। তা-ই হওয়া উচিত। বিয়ে হয়েছিল কবে? ছাত্তর মনে মনে হিসেব করে। তারপর সিদ্ধান্তে পৌছয়।

হ্যাঁ। ধরে রেখেছে। ধরে রেখেছে বটে। হঠাৎ ঘুরে আসে মহিলাটি। বাবা চা খাওয়া হলেই কিন্তু ঘরে চলে আসবেন। বাইরে মশা। আর ঠান্ডাও পড়ছে।

এরপর মহিলাটি তাকায় ছাত্তরের দিকে। এত সোজা তাকায় তার চোখে, যে, ছাত্তর অস্বস্তি বোধ করে। কেন অস্বস্তি? কারণ মহিলার চোখ বলছে : আমার শ্বশুর এতক্ষণে আমার সম্পর্কে সবই জানিয়ে দিয়েছে, সে কথা আমি জানি।

আর মহিলার কণ্ঠস্বর বলছে : রোদ পড়ে গেলে বাবা তো কিচ্ছু দেখতে পান না। তাই আগে আগেই ঘরে চলে আসতে বলি।

মহিলা চলে যেতে থাকে। দর্শকের নিচু নজর। সে আবার যাওয়াটা লক্ষ্য করে। শাঁখা-সিঁদুর, অথবা অন্য কোনো বিবাহচিহ্ন ধারণ না করলেও, এই দর্শক জানে, কোনো কোনো নারীকে দেখে বোঝা যায় এর সদ্য বিয়ে হয়েছে, আর এ দাম্পত্যজীবনে এই মুহূর্তে সুখী। এবং সুখটা নতুন।

আবার, কোনো সদ্য-বিধবাকে আগে না চিনলেও তেমনই ধরা যায় এ বিধবা হয়েছে—কারণ, সেই নারীর মুখে একটা ছাপ পড়ে থাকে। একটা ছায়া। সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের নারী—সদ্য বৈধব্য এলে—এক। ট্রেনে যেতে যেতে উলটোদিকের সিটে বসা নারীকে দেখেও বোঝা যায় এর কিছু ঘটেছে সদ্যই। এই দর্শক, বুঝতে পারে। অনেক সময় মিলিয়ে দেখেছে। মিলেও গিয়েছে।

আজ এই মধ্যবয়সিনীকে দেখে, নিজের তীক্ষ্ণ ও নিচু নজর দ্বারা দর্শকের মনে হল, এ যেন নববিবাহিতা। এর শরীরে সত্যিই বানের জল খেলছে। মুখে, গালে, নতুন চিক্কন। অথচ প্রথম যখন একে দেখা যেত মন্দিরে যেতে, নতুন বিয়ের পর, একে মনে হত—বিধবা। শাঁখ-সিঁদুর পরা বিধবা।

হঠাৎ ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ মেশানো গর্জন শোনা গেল। অ্যা-ই, অ্যা-ই, অ্যা-ই বাঁজা মাগি-ই। কুথায় গেলি। অ্যা-ই।

শ্রোতা চমকে ভিতরে তাকাল। বারান্দা ইংরেজি 'এল' আকারে ঘুরে ওদিকে গিয়েছে। সেখান থেকেই আসছে গর্জনটা। বোধহয় বাইরের দিকের কোন ঘর থেকে।

বাবা-আ! বাবা-আ। দ্যাখেন তো, উই খানকিটা কুথায়।

~ www.amarboi.com ~

গর্জনটি ভাঙা ভাঙা ও কাতর। শুনে বোঝা যায় গর্জনের মালিকের দাপটও এখন সম্পূর্ণ ভগ্ন, তার ধ্বজের মতোই।

ছাত্তর দেখল, সামনের লম্বা বারান্দা দিয়ে একজন কাজের মেয়ে দৌড়োচ্ছে।

আবার শোনা গেল, তুই ক্যান? খানকিটারে ডাক! বাবা-আ! বাবা-আ! আপনি কুথায়? আমি মুইত্যা ফেলছি। আমার শীত লাগতে আছে। বাবা-আ। শীত লাগতে আছে আমার চাদর আর লুঙ্গিটারে পাল্টায়ে দিবার কন। বাবা-আ।

লাফিয়ে উঠলেন মুশকো স্যার। মানে, তাঁর পক্ষে যতটা লাফিয়ে ওঠা সম্ভব।

ডাকে-এ। আমারে বড়ুছেলে ডাকত্যাসে। যাই। খানিকটা অবিন্যস্তভাবে এগোলেন উঠোনের দিকে। ছাত্তর এগিয়ে গিয়ে ধরল স্যারের বাহু। চলুন,আমি ধরছি। চলুন, আমি ধরছি। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখা গেল মহিলাকে। মহিলার গতিমুখ, বারান্দা দিয়ে দ্রুত সেদিকেই, যেদিকে কাজের মেয়েটি দৌড়েছিল। পুরো বারান্দা জুড়ে দেখা গেল মহিলার দলমলে যাওয়াটা।

স্যার সেই যাওয়াটা দেখতে পেলেন না, যেটা তাঁর মধ্যবয়সি ছাত্তর নজর করল কিন্তু স্যারও একরকম করে দেখলেন। আর আশ্বস্ত হলেন। যাউক। টিক অইব অ্যাইবার। বউমায় গ্যালো তো? গ্যালো না বউমায়?

ছাত্তর বলে হ্যাঁ, গেলেন তো।

স্যার বলেন, অ্যাইবার আমিও যাই একবার। বড্ড বাবা-বাবা করে আইজকাল। খিদা লাগলে বাবা। হাইগ্যা ফ্যাললে বাবা, মুইত্যা ফ্যাললে, বাবা। অর মা-য়ে তো হেই কবেই গলায় দড়ি দিয়া আমার হাত থিকা র‍্যাহাই নিসে। অহন, আমি কী করুম? কও! অ্যাঁয়?

বারান্দাটা কাছে এসে গিয়েছে। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে ছাত্তর। উঠতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরলেন মুশকো স্যার। গাছপালার ফাঁক দিয়ে তাঁর মুখে পড়ল মরে আসা রোদ। জোড়া ভুরু সাদা। কুচকুচে কালো মুখমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ির ফুট বেরিয়েছে। ন্যাড়া মাথার জন্য কান দুটো আরও যেন বড়। কালো রঙের দুই কানের পিঠে সাদা সাদা চুলের গোছা। এক চোখে কালো ঢাকনা।

মুশকো স্যারকে প্রেতের মতো দেখায়। দীর্ঘ, বাঁকা, শীর্ণ এক প্রেত। বিকেলের প্রেত। গলাটা নামিয়ে ছাত্তরকে বলেন মুশকো স্যার। শুনো, তুমারে একখান কথা কই। রাখবা আমার কথাডা?

বলুন স্যার, নিশ্চয়ই রাখব।

এই অনাচার, এই ব্যভিচার, শুনলা তো? এইডা অহক্কলরে জানাইয়া দিতে পারবা, অ্যাকখান আব্‌রিত্‌তি লেইখ্যা? ল্যাখবা? আমার ফ্যামিলির এই যে একডা ফ্যাক্ট, এইডা লইয়া ছাপাইতে পারবা, ব্যাশ জুরালো দেইখ্যা অ্যাকখান আব্‌রিত্‌তি? অ্যাঁয়?

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

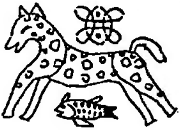

ঘোড়াওয়ালার সংসার

সকাল হয়েছে নিশ্চয়ই। পাখিডাক ভেদ করে তীক্ষ্ণ একটা গলা কানে আসছে। তার মানেই সকাল। দু'-একদিন বাদ দিলে, রোজ এই গলার আওয়াজটাই জানিয়ে দেয়, সকাল হয়েছে। বিছানা থেকে উঠে পাতকুয়োর ধারে এসে দড়িবাঁধা বালতি ফেললাম জলে। টেনে তুলছি বালতি। কুলকুচি করছি। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা। সামনে প্রভাতসূর্য। উঠোনের একটা দিক শিউলিতে-শিউলিতে সাদা। রাতে বৃষ্টি এসেছিল একবার। গন্ধরাজ গাছ তার সারা গায়ে সাদাফুল নিয়ে সুঘ্রাণ পাঠাচ্ছে বারান্দায়। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে রান্নাঘরে যাচ্ছি দেশলাই খুঁজতে। জনতা স্টোভ জ্বালাব। সকালের চা বানাতে হবে। বাড়িতে কেউ নেই।

আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার উঠছে। অভিসম্পাত আর বিলাপ। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার ভিতর এই চিৎকৃত অভিসম্পাত রোজই এসে পৌঁছয় আমাদের বাড়ি। শুধু আমাদের বাড়িই নয়, ঠিক আমাদের রান্নাঘরের পিছনের বাড়িটিতেও। নিশ্চয় সেখানে আরও জোরে শোনা যায়। রান্নাঘরের পিছনের বাড়িটি যাদের, তাদের মা-কাকিমার মুখেও শুনেছি : ওহ্, টেকাঁ যায় না এই চেঁচানিতে।

ওই বাড়ির পিছনে বেশ খানিকটা জঙ্গুলে ঝোপঝাড়-ভরা জমি। সে-সময়ে এই টাউনে, প্রোমোটার শব্দটি কেউই শোনেনি। ফাঁকা জমি 'ফাঁকা'-ই পড়ে থাকে বছরের-পর-বছর। জংলা আগাছায় ভরে ওঠে প্রত্যেক বর্ষাকালে। এখন শরৎ। বর্ষা যায়নি পুরো। তাই ঝোপজঙ্গলের রমরমা। ওই জংলা জমির পিছনেই ছাইগাদা, নোংরা ফেলার আঁস্তাকুড়। তার সামনে ব্যারাকবাড়ি। ব্যারাকবাড়ি জিনিসটা কী? সেটা কি মিলিটারিদের পরিত্যক্ত ব্যারাক? রামোঃ! মিলিটারি কই? চানাচুর ফেরি-করা হকার, বাবুদের বাড়িতে কাজের মেয়েলোক—যাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোয়ামি কিছু করে না, রাতে দুগ্গার দোকানে দেশি মদ খাওয়া ছাড়া, এছাড়া মুদিখানার অত্যল্প মাইনের আধবুড়ো কর্মচারী যে কিনা অপরিকল্পিতভাবে পরিবার বাড়িয়ে ফেলেছে, একজন হতভাগ্য দরজি, ব্যবসা পড়ে গিয়েছে বলে নিজের দোকানঘর বিক্রি করে দিয়ে এখন সেই দোকানেই অন্য মালিকের কাছে কাজ করে—এইরকম সব সৈন্যসামন্ত থাকে, এক-একখানা ঘর নিয়ে, অল্প ভাড়ায়, এই ব্যারাকবাড়িতে। যদিও সেই ভাড়া তাদের কাছে মোটেই অল্প নয়। খোপ-খোপ ঘর। গোটা চারেক পায়খানা। উঠোনে সবার সামনে টিউবওয়েলের হ্যান্ডেল টিপে চান। পাড়ার টাইম কলে জল আসার সময় যে বাড়ি থাকবে, সে গলির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। কখন আশেপাশের গেরস্তঘরের কাজের বউরা জল নিয়ে কল খালি করে দেবে, তখন মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধিয়ে দেওয়া কল-চাতালে বসে চান সারবে সেই পুরুষলোক। তারপর হয়তো বিকেলে রিকশা নিয়ে বেরবে। হাজার হোক, ব্যারাকবাড়ির টিউবওয়েল অঞ্চলের তুলনায় রাস্তার কলতলা অনেক পরিষ্কার।

সোজাকথায়, বস্তি। কিন্তু 'বস্তি' তো বলে না কেউ! বলে ভরত পরামানিকের ব্যারাকবাড়ি। এক-একখানা ঘরে ছ'-সাতজনের একটা পরিবারও সেঁধিয়ে থাকে। সরস্বতী পুজোর সময় চাঁদা তুলতে বেরতাম বন্ধুদের পিছু নিয়ে। ওই ব্যারাকবাড়িতে ঢুকে চাঁদা চাওয়ার কথা কেউই কখনও ভাবতে পারত না। তবে বাড়িটার খানিকটা ভাঙা ছিল বলে ওর উঠোনের মধ্যে দিয়ে পাড়ার লোকের শর্টকাট করার একটা পথ হয়ে গিয়েছিল ওপারের বড় রাস্তায় ওঠার জন্য। রাস্তার মুখেই শান্টু মুদির দোকান। খুচরো জিনিসপত্র কিনতে হামেশাই লোক যাওয়া-আসা করছে ব্যারাকবাড়ির ভিতর দিয়ে। ও বাড়ির আবার আব্রু কী?

আমরাও চাঁদা তুলতে বেরিয়ে ওই ব্যারাকবাড়ির মধ্যে দিয়ে গলে গেলাম সকলে। মেয়েরা চান করত খোলা চাতালে, ঘরের সামনে বসে থাকত। সে-ও একটা আকর্ষণ ছিল বটে অনেকের। তবে ওই ব্যারাকবাড়ির কিশোরীদের দেখলে, আমার গলায় কী একটা দলা পাকিয়ে উঠত। ওরা প্রায় কেউই ইস্কুলে যায় না।

কিন্তু অনেকে সাজে। বিকেলের দিকে। এক-একখানা হাত-আয়না নিয়ে। একটু বেরোয়, ওই সামনের মন্দির পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে এল। যাদের একটু পা হয়েছে, বাড়ির বকাঝকা গেরাহ্যিতে আনে না, তারা স্টেশনবাজারের দিকেও যায় এক-একদিন। কিছু কেনে না যদিও। কিনবে কোত্থেকে? এরা দু'-তিনটে মেয়ে, ওই হাত-আয়নার মেয়েরা, সিনেমা হলেও যায়। হলের ভিতরে ঢোকার উপায় তো নেই। টিকিট কাউন্টারের সামনে উত্তম সাবিত্রী অসিতবরন পাহাড়ি সান্যাল সন্ধ্যারানি—এঁদের বড়-বড় স্টিল ছবি আমাদের ইস্কুলের নোটিস বোর্ডের মতো বাক্স করে ঝোলানো। বাংলা সিনেমার ক্রেডিট টাইটেলে একটা নাম তখন প্রায়ই দেখা যেত। স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ। সেই 'স্থিরচিত্র' আর কী। একাধিক বাক্স ঝুলছে। তাতে একাধিক স্টিল ছবি। সেগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত ওই সব মেয়ে। নিজেদের মধ্যে হাসত। আর যারা হল ভাঙলে বেরিয়ে আসত, তাদের দিকে কেমন একটা চোখ নিয়ে থাকিয়ে থাকত। ওই সব হাত-আয়নার মেয়েরা তাদের মধ্যে যারা ফ্রক পরত, শাড়ি নেই বলে, তাদের পায়ে ছোটবেলার পাঁচড়ার কালো-কালো দাগ। ওরা কোথায়? ওরা কি মরে গিয়েছে? ওদের তো

~ www.amarboi.com ~

আমার মতো বাষট্টি বছর বেঁচে থাকার মতো খাওয়া, পুষ্টি, আশ্রয় কিছুই ছিল না কোনও দিনই। কী রোগা আর ফ্যাকাশে ওই মেয়েরা, যারা খুব কমদামি পাউডার মেখে নিজেরা না-বুঝে নিজেদের মুখ আরও ফ্যাকাশে করে ফেলত! তারা এই 'যুগ'-কে নিশ্চয়ই দেখে যায়নি, যখন খবর কাগজে কোনও উচ্চবিত্ত কিশোরীর ছবি দিয়ে লেখা হয় : ন্যাপকিন ছিল না। সাহস ছিল।

তাদের, ওই ব্যারাকবাড়িতে একটা ঘরে ছ'-সাতজন করে থাকা পরিবারের মেয়েদের কি কোনও সাহস ছিল?

হ্যাঁ, আমি যাদের কথা বলছি, তাদের তো সাহস ছিলই। ওই স্টেশনবাজার পর্যন্ত এসে, সিনেমা হল-এ ঢোকা পর্যন্ত সাহস তো ছিলই। উত্তম সুচিত্রা সন্ধ্যারানি অসিতবরনের ঝুলিয়ে রাখা ওইসব স্টিল ছবি দেখে-দেখে গল্পটা আন্দাজ করত তারা। কেননা, যারা সাহসিনী নয়, তারা হাপিত্যেশ করে বসে থাকত, কখন ফিরবে ওই দু'-তিনজন। ফেরার পর গলির মুখে দাঁড়িয়ে তারা অন্যদের গল্পটা শোনাতে চেষ্টা করত—যে-যেমন আন্দাজ করেছে। মতবিরোধও হত। শ্রোতাদের মধ্যে নয়। বক্তাদের মধ্যে। তখন কলরব উঠত, নারীকণ্ঠের। তখন তারা যে কোনও তরুণী, তাদের অভাব-অনাহার পার হয়ে তারা হাসছে, এ-ওকে ঠেলে দিচ্ছে লাস্যভরে। তাদের চোখে ঝলক এসে যাচ্ছে যখন সুচিত্রা-উত্তমের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের স্টিল ছবি নিজেদের মতো করে তারা রাঙিয়ে নিচ্ছে আর কলহাস্য তুলছে—সেই কলধ্বনি, সত্যিই বলছি, এই বুকে হাত দিয়ে বলছি, ভরা বর্ষার চূর্ণীর কলধ্বনির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় তখন, বরং বেশিই জীবন্ত।

ওরা আমার স্বপ্নের মেয়েরা। সিনেমার অভিনেত্রীরা নন। টেলি সিরিয়ালের ঝকঝকে মুখেরা নন মডেলদের মতো সাজগোজ করা অপরূপারা নন—ওরা, যাদের ক্ষুধার অন্ন ছিল না, মাথার উপর ছাদ ছিল না, সম্পন্ন অভিভাবক ছিল না—তারা আজ কোথায়?

ওই তিনজনের একজন ছিল ঘোড়াওয়ালার মেয়ে। হ্যাঁ, একজন ঘোড়াওয়ালাও থাকত ওই ব্যারাকবাড়িতে। ঘোড়াওয়ালা মানে? মানে, যার একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ছিল। ছ্যাকড়া গাড়ি কাকে বলে তা পুরনো লোকরা জানবে। একটা কাঠের শক্ত পাটাতন, তার তলায় দু'টো চাকা লাগানো। কাঠের চাকা। টায়ার কেনার পয়সা কোথায় পাবে! আর একটা ঘোড়া সেই গাড়ি টানত। ওই কাঠের পাটাতনের ওপর স্তূপ করে রাখা হত কখনও সিমেন্টের বস্তা। কখনও বালির বস্তা। কখনও স্রেফ থান ইট। উঁচু-করা থান ইট নিয়ে ঘোড়াটা চলতে পারছে না। আস্তে-আস্তে এগোচ্ছে আর ঘোড়াওয়ালা প্রাণপণে তাকে হাতের লাঠিটা দিয়ে মারছে—এ প্রায় প্রত্যেক দিনের দেখা দৃশ্য। মাঝে-মাঝে, রাস্তার পথচারী কিংবা রিকশাওয়ালারা বলত—আরেঃ, অত মারো ক্যান? অই অৎখানি বুজা তুলসো, তখন খ্যাল সিল না। ঘোড়াটা মার খেয়েও তেমন এগোতে পারত না। নাদি ফেলত।

ভোরবেলায় যে-চিৎকারটা শুনতাম, তা ঘোড়াওয়ালার বউয়ের। সারা দিনই, যখন-যখন ঘোড়াওয়ালা বাড়ি আসত, এমনকী রাতের বেলাতেও ওই ঘোড়াওয়ালার বউয়ের অভিযোগ শোনা যেত। কিন্তু দিন তো স্বাভাবিক কোলাহলে ভরা, সন্ধেও তাই। সেইজন্য ভোরবেলা পাড়া যখন ভাল করে জাগেনি, সেই সময় ওই কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে কানে আসত।

~ www.amarboi.com ~

ঘোড়াটা বাঁধা থাকত ছাইগাদার পাশে একটা গাছে। তার জাবনা দেওয়ার পাত্র সামনে রাখা। খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ঘোড়াটা সেই পাত্র চাটত লম্বা জিভ দিয়ে। গাছের বাকল চাটত। সামনেই ছিল একটা ভাঙা ঘর। কেউ থাকে না। তার ইট বের করা দেওয়াল চাটত। চাটতে-চাটতে মাঝে-মাঝে জিভ দিয়ে রক্ত পড়ত ঘোড়াটার।

ঘোড়াওয়ালা যখন ওই ব্যারাকবাড়ির ভিতরকার সরু রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে খুলে রাখা গাড়িটাকে ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ত, তখনও মারত ঘোড়াকে। মুখে একটা কিছু গালাগাল দিতে দিতে মারত। কান করে শুনে দেখেছি, গালাগালটা ঘোড়াওয়ালা দিচ্ছে ঘোড়াওয়ালার বউকে। কারণ ভিতর থেকে ভেসে আসছে ঘোড়াওয়ালার বউয়ের অভিসম্পাত। একদিন মুদির দোকানে পাঁউরুটি কিনতে যাচ্ছি, দেখি ছুটতে-ছুটতে একজন মহিলা বেরিয়ে এল, গলি থেকে। তখন ঘোড়াওয়ালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মুখের দড়িটা ধরে গাড়িটাকে ঘোরাচ্ছে। মহিলা দৌড়ে এল, এসেই ঘোড়াওয়ালাকে মারতে লাগল হাতের খুন্তি দিয়ে। পিঠ কেটে রক্ত পড়ছে ঘোড়াওয়ালার। কলে জল নিচ্ছিল যারা, তারা হাঁ-হাঁ করে এসে ঠেকিয়ে দিল। গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াওয়ালা। আর মারছে ঘোড়াটাকে।

ঘোড়াওয়ালার বউ ফিরে যাচ্ছে, তার অভিযোগ অভিসম্পাত-সহ। ওজগার করার মুরোদ নেই। পরিবার চালাতে পারে না। বিয়ে করিছিলি কেন? মেয়েটা ভিতর থেকে চলে এসেছে ততক্ষণে। মা-কে নিয়ে যাচ্ছে বকতে-বকতে। ঘোড়াওয়ালার বউ দেখলাম খোঁড়াচ্ছে। ভালরকম খোঁড়াচ্ছে। সামনের দিকের চুল কাঁচা-পাকা। মোটাসোটা ভারী চেহারা। শাড়িটা দু'-তিন জায়গায় ছেঁড়া, মেয়েটা মায়ের পাশে-পিছনে এসে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ঘোড়াওয়ালা রোগা। কালো কুচকুচে। মাথায় কোঁকড়া চুল। মাঝে-মাঝে নেড়া করে ফ্যালে। হয়তো গরম লাগে বলে। আবার কদম ছাঁট দাঁড়িয়ে যায় পনেরো দিনেই।

এই সময়টায় ভ্যান-রিকশা এসে পড়ল টাউনে। যারা রিকশা চালায় তারা ভ্যান-রিকশায় মাল টানছে। বালির বস্তা, সিমেন্ট। ইট। ঘোড়াওয়ালা তার ছ্যাকড়া গাড়িতে যা-যা টানত। ঘোড়াওয়ালা বসে থাকে গলির মুখটায়। দিনেদুপুরে। কাজ পায়নি আজ। ঘোড়াটা মাঝে-মাঝে ডাকে। আমি দুপুরে খেয়েদেয়ে একখানা 'বনলতা সেন' বা 'হারানো অর্কিড' খুলেছি। ঘোড়াটার ডাক ভেসে আসছে। কাজ না-পেলে ঘোড়াকে খাওয়াবে কী?

মধ্যে-মধ্যে যখন কাজ পায়, তখন যত পারে ভার চাপায় গাড়িতে। বেশি রোজগার করবে। ঘোড়ার বয়স হয়েছে। খাওয়া পায় না। ঘোড়া চলতে পারে না জোরে। মার পড়ে পিঠে। দরদর করে ঘামছে ঘোড়াওয়ালা মে মাসের রোদ্দুরে। আর গালাগাল দিতে-দিতে মারছে ঘোড়াটাকে। ঘোড়া নাদি ফেলছে। একদিন পাড়ায় শোরগোল, ব্যারাকবাড়ির সামনে ভিড়। ঘোড়াওয়ালার ঘোড়া বসে পড়েছে। আর উঠছে না। ঘোড়াওয়ালা মারতে-মারতে হাঁফিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘোড়া আর ওঠে না। দাতব্য পশুচিকিৎসালয় নদীর ওপারে। নিয়ে যাবে কী করে, যদি ঘোড়া না-ই উঠে দাঁড়ায়? সেই প্রামাণিক সিনেমার সামনে দিয়ে ব্রিজ পার হয়ে তবে নিতে হবে হাসপাতালে। ডাক্তারবাবুকে ডাকলে পয়সা লাগবে। নিয়ে গেলে খরচ নেই।

~ www.amarboi.com ~

ডাক্তারবাবুকে ডাকা হল অবশেষে ঘোড়া যখন শুয়ে পড়েছে। তার লম্বা গলা মাটিতে এলিয়ে দিয়ে পা-গুলো ছুড়ছে তখন ঘোড়া। তার বড়-বড় চোখ আধবোজা।

ওই আধবোজাই রইল চোখ, যখন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে গাড়ি এসে ঘোড়ার দেহটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে তখনও। যারা তুলল গাড়িতে, যারা গাড়ি আনল, তাদের মাথাপিছু টাকা দিতে হল। পাড়ার লোকে তুলে দিল সেই টাকা।

গাড়িটা একদিক উঁচু একদিক নিচু অবস্থায় কিছু দিন গাছের তলায় পড়ে ভিজছে। বৃষ্টিতে-রোদ্দুরে শুকোচ্ছে। অনেকটা পার্কের বাচ্চাদের খেলার জন্য যে-ঢেঁকি রাখা থাকে—তার মতন দেখাত গাড়িটাকে। তারপর কাঠগোলার দালাল এসে চাকা থেকে খুলে নিয়ে গেল গাড়িটাকে। চাকাগুলো পড়ে রইল ছাইগাদার পাশে। ওগুলো নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছে। নেওয়া যাবে না। কেন যাবে না কে জানে! ছাইগাদা বড় হয়ে দিনে-দিনে ঢেকে ফেলতে লাগল চাকা দু'টোকে... ভোরবেলার চিৎকার কিন্তু থামেনি। রোজই শুনতে পাই। ঘোড়াওয়ালার গলাটা ছিল নিচু গোছের। তার উত্তর শোনা যেত না।

ঘোড়াওয়ালার বউয়ের গলা সেরকম নয়।

একদিন ঘোড়াওয়ালার গলা শোনা গেল। দিনে নয়। রাতের বেলা। ঠিক গলাও শোনা গেল না। পড়শিদের দরজা ধাক্কার আওয়াজ শোনা গেল। ব্যারাকবাড়ির পড়শিদের ঘরে নয়। পাড়ার গেরস্থদের বাড়ির দরজায় ঢকঢক আওয়াজ উঠছে। একবার এই বাড়ি। একবার তার পরের বাড়ি। একবার তারও পাশের দরজাটায় আওয়াজ। সব লোক বেরিয়ে পড়ল। রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা।

ঘোড়াওয়ালা একটা কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি কিনেছে। আর দু'দিন দু'টো ইঁদুর-মারা বিষের প্যাকেট কিনেছে। কোথা থেকে কিনল, পয়সা কোথায় পেল কারও মাথায় আসবে না তখন। কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল কেন? বাবু, আমি বিষ খাইলাম। আমারে হসপিটালে লইয়া চলেন কেউ। বাবু, আমি বিষ খাইসি, আমারে বাঁচান আপনারা।

কোয়ার্টার পাউন্ড পাউঁরুটিতে মাখিয়ে ইঁদুর-মারা বিষ চিনি দিয়ে খেয়েছে।

একজন রিকশাওয়ালাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল। পাড়ার দু'জন সাইকেলে যাবে, একজন ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে রিকশায়। হাসপাতাল দূর আছে, সেই কোর্টপাড়া ছাড়িয়ে। তরুণ সংঘের মাঠের কাছে। ঘোড়াওয়ালাকে নিয়ে যাবে কী করে, সে তো রিকশার সিটে বসতেই পারছে না এত ছটফট করছে আর 'ওয়াক' তুলছে। মুখের গ্যাঁজলা তার বুকে পড়ছে এখন। দু'হাতে জাপটে ধরে ভাবলুদা তাকে নিয়ে চলল। ভাবলুদা ফুটবল খেলে। পারল তাই।

পুরো পাড়া বেরিয়ে এসেছে। ঘোড়াওয়ালার বউ আসেনি। মেয়েটা রিকশার পিছন-পিছন একা-একা ছুটল।

আবার পাড়ার লোককে চাঁদা তুলতে হল পরদিন। ঘোড়াওয়ালার ঘাটখরচা লাগবে তো! শান্টু মুদি শুধু বলল, আমি কেন চাঁদা দেব? ইঁদুর-মারা বিষ আর পাঁউরুটি তো আমার কাছেই ধারে নিয়েছিল। পাড়ার চায়ের দোকান থেকে শোনা গেল, তাদের কাছে নাকি একটু চিনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চেয়ে নিয়েছিল। আবার, একটা ছেঁড়া কাগজও নেয় ঘোড়াওয়ালা। নইলে ওই চিনিটা মুড়িয়ে নেবে কীসে।

এরপর স্টেশনে টিকিট ঘরের একপাশে দেখতাম মা-মেয়ে বসে থাকত দুপুরবেলা। আর একটা করে বাটি নিয়ে বাজারের দোকানে-দোকানে ঘুরত—যদি কেউ পয়সা দেয়। ট্রেন এসে দাঁড়ালে, তার জানলাতেও বাটি হাতে যেতে দেখেছি মা'কে, মেয়েকে। শেষ যেটুকু মনে পড়ছে, ঘোড়াওয়ালার বউ টিকিট ঘরের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। পা দু'টো সামনে। পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তোলা। পায়ের রংটা কালচে হয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়ির ঠিকে-কাজের বউয়ের মুখে শুনলাম, পায়ে হাজা ছিল, বিষিয়ে যায় রোজ স্টেশনের নোংরা প্ল্যাটফর্মে হাঁটাহাঁটির জন্য। সেই বউটাও ওই ব্যারাকবাড়ি থেকেই কাজে আসত।

পরে আর দেখিনি ঘোড়াওয়ালার বউকে। অন্তত ওই টিকিট ঘরের নিচে তো নয়ই। অন্য কোথাও দেখিনি টাউনের। ভোরবেলার সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার ও অভিসম্পাতও অনেক দিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে 'বন্ধ' যে হয়েছে তা-ও আবার মনে নেই কারও।

মেয়েটাকেও অনেকদিনই চোখে পড়েনি। সে-ও ছিল ওই হাত-আয়নার মেয়েদের একজন। বছর দু'য়েক বাদে, স্টেশনে যাচ্ছি একদিন ট্রেন ধরতে, কাছাকাছিই কোথাও একটা যাব—স্টেশনের মুখটায়, তিন-চারটে রিকশা, ভ্যানরিকশা, একটা ম্যাটাডোরের থেমে থাকা জটলা কাটিয়ে-কাটিয়ে এঁকেবেঁকে বাজার পেরোচ্ছি—হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে। সেই ঘোড়াওয়ালার মেয়েটা না? হ্যাঁ, সে-ই তো! সেই মেয়েটা! বিরাট একটা পেট নিয়ে মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার চাইছে। তারা বলছে, যা, যা এখন। মেয়েটা বলছে, একখান শিঙাড়া দিবা? একখান শিঙাড়া? একখানা শিঙাড়ায় কী লুকসান তুমাদের? দিবা? কর্মচারী বলছে—পূর্ণগর্ভিনী, ফসলসম্ভবা সেই মাতৃকা-প্রকৃতিকে বলছে—যা, ভাগ বেশ্যামাগি। ভাগ রেন্ডি।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ল্যাঠামামা

ল্যাঠামামা বড় বারান্দার ধারে এসে বসল। বারান্দা না-বলে দাওয়া বললে ঠিক হয়। ল্যাঠামামার মেয়ে কুনু একটা ছোট জলচৌকি নিয়ে পিছন-পিছন আসছে। লুঙ্গি-পরা ল্যাঠামামার মাথার ওপর দিয়ে ধীরে-ধীরে গেঞ্জি খুলে নিল কুনু। সামনে একবালতি জল আর মগ। কুনু গামছা ধরে দাঁড়িয়ে। ল্যাঠামামার গলার কাছে একটা শিরা টিকটিক করছে। চলাচল-করা রক্তবেগ দেখা যায় যেন। বুকের ঠিক নিচে, ওপর-পেট থেকে অপারেশনের লম্বা দাগ লুঙ্গির কষির নিচে অদৃশ্য। দাগটা শুকিয়ে কুঁকড়ে লালচে থেকে কালোর দিকে। ল্যাঠামামা মগে জল তুলে মাথায় ঢালে। পাঁজরগুলো বেরিয়ে আছে চামড়ায়, তার ওপর দিয়ে জল নামে। দু'মগ জল কোনওমতে ঢেলে সাততাড়াতাড়ি উঠতে যেতেই কুনু ধরে—কিন্তু ল্যাঠামামা হাতঝাপটা দেয় : যাঃ যাঃ! কুনু গামছায় গা-মাথা যত্ন করে মোছা শেষ করার আগেই হাত বাড়ায় ল্যাঠামামা। পরিষ্কার ফতুয়া আর লুঙ্গি এগিয়ে দেয় কুনু। ভিজে লুঙ্গিতে ছপছপ ঘর ভিজিয়ে দরজার আবডাল নেয় ল্যাঠামামা। কাচা লুঙ্গি পরছে। আবডাল থেকে ল্যাঠামামার গলা শোনা যায় : রান্না হয়েছে?

ভাঙা-ভাঙা স্বর ল্যাঠামামার।

কুনু বলে, সে তো কখন হয়ে গিয়েছে!

চিরুনি, চিরুনি দে।

ভাঙা-ভাঙা গলায় বলতে-বলতে সামনের ঘরে ঢোকে ল্যাঠামামা। কুনু হাত বাড়িয়ে বলে, এই যে চিরুনি। ল্যাঠামামা আয়নার সামনে দাঁড়ায় : ভাত বাড়তে বল্...

বাড়ছে, ভাত বাড়ছে—কুনুর জবাব।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আয়নার সামনে চিরুনি হাতে নিলে ল্যাঠামামার এক মিনিটের তিন ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। মাথায় কোনও চুল নেই। তাও পিছন দিকটা আঁচড়ানোর ভঙ্গিই করে যেন ল্যাঠামামা। দাড়ি-গোঁফ কিছুই নেই। ভুরু পর্যন্ত না। ড্রেসিং টেবিলে ঠক্ করে চিরুনি ফেলে দেওয়ায় বোঝা যায় খেতে বসার জন্য ল্যাঠামামা আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

ওঘরে একটা টেবিল, খাওয়ার টেবিল নয়, কুনুর পড়ার টেবিল ছিল এক সময়। এখন সেটাতেই খেতে বসে ল্যাঠামামা। পিছন থেকে চেয়ারটা টেনে বসার সুবিধে করে দেয় কুনু।

কই, ভাত কই?

ভাঙা-গলা এবার বেশ রাগত।

ভাতের থালা নামিয়ে দেওয়া হয় সামনে। থালার ধারে বাটি বসতে থাকে একে-একে। ল্যাঠামামা বলে, কুমড়োর ছোকাটা কই? আর কাঁচকলার কোপ্তা? এইটা? এই বাটিটা তো? আর পাবদা মাছ কোথায় গেল?

কুনু চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বলে, এই যে, এই যে পাবদা। এইটা তো কুমড়োর ছোকা। কাঁচকলার কোপ্তা তো তোমার সামনেই।

আর মাছের মাথা দিয়ে ডালটা কোথায়?

আনছে, আনছে। কুনু বলে।

কুনুর বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ডালের বাটি এসে নামে ভাতের থালার পাশে।

সবে বসন্তকাল শুরু হয়েছে। সকাল সাড়ে ন'টার রোদ অসহ্য নয়। খোলামেলা বাড়ি। পাড়াটা ছোট। পাড়া শেষ হয়েছে এই বাড়িতে। বাড়ির পরেই মাঠ। মাঠের ওপারে রেললাইন। এ-বাড়ি থেকে রেললাইন স্পষ্ট দেখা যায়। স্টেশন দূরে নয়। ল্যাঠামামার সাইকেল করে মাঠ পেরিয়ে ট্রেন ধরার অভ্যাস তো ছিলই, এই পল্লির আর সকলের মতো। রানাঘাট লোকাল ধরাই সবচেয়ে ভাল। স্টেশনে সাইকেল রাখার জায়গা আছে। মাত্র দু'টো স্টেশন আগেই রানাঘাট। ট্রেনে জায়গা পাওয়া যায় সহজেই। খুব ভর্তি হয়ে আসে না। তবে খুব ফাঁকাও থাকে না রানাঘাট লোকাল। কিন্তু বসার জায়গা, এই ছোট্ট স্টেশনের সব যাত্রীই পায়। লোক কমই ওঠে এখান থেকে। এই বাড়ির জানলা থেকে তাকালে দেখা যাবে, পলাশ গাছ মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি। পলাশ জ্বলজ্বল করছে রোদে। হাওয়া আসছে। মার্চ মাসের হাওয়া। এই বাড়িতে, এই ঘরটায়, কেন যেন, জানলায় পরদা টাঙানোর কথা মনে হয়নি কারও।

ল্যাঠামামা ভাত ভাঙল। থালায় বেশ চেপে-চেপে সুন্দর করে উঁচু ভাত বেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভাত ভেঙে, মাছের মুড়ো দিয়ে বানানো ডালের বাটিটা ধরে নাকের কাছে নিয়ে এল ল্যাঠামামা। তারপর বাটি কাত করে খানিক ঢেলে দিল ভাতের ওপর। মাখতে শুরু করল কঙ্কালসার আঙুল দিয়ে। খুব ভাল করে মাখল। তারপর হঠাৎ কী মনে করে মাখা ভাতটা ঠেলে-ঠেলে সরিয়ে দিল থালার এক পাশে। আবার ভাত ভাঙল একটু। কুমড়োর ছোকা ভরা বাটিটা তুলে আনল মুখের কাছে গন্ধ নেবে বলে। ছোকার বাটিটা রেখে কাঁচকলার কোপ্তা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টেনে আনল সামনে। কোপ্তারা বড়-বড় কালচে বড়ার মতো। তুলনায় লম্বা ও পেটমোটা। ঘন থকথকে রসায় ডুবে টইটম্বুর। ভারভারন্ত একটা কোপ্তা বেছে ল্যাঠামামা তার মধ্যে গর্ত করল আঙুলে। তারপর পাতে ঢালল আবার। মাখছে-মাখছে। মাখা আর থামছে না। এবার ওই একদিকের মাখা ভাত ফেলে উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিল থালাটা। পাবদা মাছের একটা কোনা উঁচু হয়ে উঠে আছে বাটি থেকে। বাটি তুলে ল্যাঠামামা পুরো উপুড় করে দিল ভাতের ওপর। মাছটা একটু-একটু বাছছে। ভাত আর মাখছে না, ঝোল গড়িয়ে থালার একপাশে জমছে, যেন পুকুর। ভুরুহীন চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে ল্যাঠামামার।

কুনু বলল, হাত ধোবে? হাতটা ধুয়ে নাও এবার? ল্যাঠামামা উঠল। ঘরের উলটো দিকে ছোট একটা বারান্দা।

বারান্দার পিছনে ঝোপজঙ্গল। শিয়ালকাঁটার বন। ছাই-ছাই সব কর্কশ পাতার ফাঁকে ফুল জ্বলছে রোদে। পলাশের রাঙা আভা নয় এদের। রোদ লাগলে এদের আলো হলদে।

কুনু জল ঢেলে দিচ্ছে। হাত ধুচ্ছে ল্যাঠামামা। চোখ দিয়ে এখনও জল পড়েই যাচ্ছে। কুনু তার ভিজে হাত ল্যাঠামামার মুখের দিকে তুলতেই ল্যাঠামামা মাথা নাড়ল।

না, মুখ ধোওয়ার দরকার নেই। সত্যিই।

কুনু গামছা দিয়ে ল্যাঠামামার হাত মুছে দিচ্ছে। রান্নাঘর থেকে একটা গলার আওয়াজ ভেসে এল : 'খেতে পারবে না তবু আমাকে গতরপাত করিয়ে রান্না করাবে রোজ! এতগুলো ভাত নষ্ট, খাবার নষ্ট! আমার গতরটা যেন গতর না। রোজ এত বাজার! খরচটা আসবে কোত্থেকে? থালাটা দ্যাখো, যেন রাস্তার আঁস্তাকুড়।'

গলাটা নতুন মা-র। কুনুর মা-র মৃত্যুর পরের বছর ল্যাঠামামার এই দ্বিতীয় বউ আনা। কুনু তখন সবে বিএ পরীক্ষা দিয়ে উঠেছে। ওই কলেজেরই ছোকরা ক্লার্ক-এর পছন্দ ছিল কুনুকে। কুনুরও ছিল। রেজিস্ট্রি করে বাড়ি ছাড়ে কুনু। ল্যাঠামামাকে খরচা করতে হয়নি। তার বিয়ের খরচ নিয়ে বাবাকে যাতে নতুন মা-র মুখ শুনতে না-হয়, তাই কুনুর এই ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা ছিল না। এখন একটা ছেলে ওর। পাঁচ পূর্ণ করে ছয়ে পড়েছে। ছেলেকে পেয়ে মা-র কথা ভুলতে চায় কুনু। কুনু লম্বা, একহারা। পিঠময় চুল এখন এলোখোঁপা। রোগা হাতে শাঁখা-পলা, সরু সোনার চুড়ি দু'গাছি। ছেলে আছে ঠাকুমার হেপাজতে। প্রায় রোজই সন্ধেবেলা বর এসে একবার ঘুরে যায়। ঠিক আগের স্টেশনেই তার কলেজ। ওখানেই তাদের বাড়ি। এক-একদিন ছেলেকেও নিয়ে আসে সঙ্গে। দেখতে ইচ্ছে করে তো! এখন ল্যাঠামামার কাছেই থাকছে কুনু। ক'দিন থাকবে অবশ্য জানে না। এটা জানে, তার চেয়ে পনেরো বছর বড় নতুন মা-কে এই বাড়ি লিখে দিয়েছে ল্যাঠামামা। জমিজমাও।

কিন্তু কুনু চলে এসেছে।

আটটা কেমো হয়ে গিয়েছে ল্যাঠামামার। শরীরের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এখন। ডাক্তার বলে দিয়েছে বাড়ি নিয়ে যান। একমাস যদি যায় তো বেশি। হয়তো একমাসও নেই।

হাত ধুইয়ে দেওয়ার পর কুনু ল্যাঠামামাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে এবার বসিয়ে দিচ্ছে বিছানায়। পিছনে দু'টো-তিনটে বালিশ সামাল দিল যাতে আধশোওয়া হয়ে বসতে পারে ল্যাঠামামা।

~ www.amarboi.com ~

দূরে ট্রেনের হুইশল। এ ঘরে পরদা আছে। পরদাটা সরিয়ে দিল কুনু। মাঠের ওপার দিয়ে ট্রেন যায়। কুনু জানে, বাবা ট্রেন দ্যাখে।

এরপর বেশিদিন দেখবে না, তাও জানে কুনু।

আজকের দিনটা তো দেখুক।

দেখতে পাচ্ছ বাবা, রেললাইনটা? কুনু বলে।

চোখ দিয়ে জল পড়া এখনও থামেনি ল্যাঠামামার। কুনু আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে ল্যাঠামামার চোখ। দ্রুত ভেতরে গিয়ে একটা গ্লাস এনে বলল : নাও, তোমার হরলিকস্। এরপর গ্লুকোজের জলটা নিয়ে আসব। নাও।

ল্যাঠামামা নেয় না।

কুনু খাটের পাশে তেপায়া টেবিলে রাখে গ্লাসটা।

বলে, ঠান্ডা করাই আছে। একটু পরে চামচ দিয়ে খাইয়ে দেব, কেমন?

হঠাৎ ল্যাঠামামা মাথা একটু ডানদিকে ফিরিয়ে নিল। কুনুও, কী যেন বুঝে, তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়াল একটু।

বাবার খাটের পিছনে মেয়ে। দু'জনই জানালার দিকে তাকিয়ে।

রানাঘাট লোকাল দেখা দিয়েছে মাঠের ওপারে।

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্নজল আর নরক

কেদার ভটচাযের রোয়াকের সামনে কালকাসিন্দার ডালগুলো শুকিয়ে কাঠি-কাঠি। বড় শ্যাওড়া গাছেরও পাতা প্রায় নেই এখন। বাবলা গাছ দু'টোও বলতে পারো গায়ের কাঁটা আর সরু কাঠের মতো হাত বাড়িয়ে দাঁড়ানো। তবে একটু দূরেই পুকুরের জলে টলটলে রোদ। শীতকালের সকালে রোদই তো দিগ্বিজয়ী। ঘাসে কেমন শিশির এখনও চিকচিক করছে দ্যাখো বাবা, দ্যাখো।

কথাটা কেদার ভটচায বললেন। উনি আমাদের হাই স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষক। পুরোহিতের বৃত্তিও নিয়েছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। এই মুহূর্তে তাঁর বাড়ির রোয়াকে আমি বসে আছি। পড়াশোনা ছেড়ে দিলেও কেদারজ্যাঠার কাছে এসে বসে থাকি মাঝে-মাঝে। মুখের কথা শুনব বলে। এক্ষুনি যেমন বললেন, শীতের সকালে রোদই তো দিগ্বিজয়ী।

গায়ে একটা এন্ডির চাদর। বেশি শীতের জন্য শালও আছে দু'টো। আহ্নিকে বসলে গায়ে জড়ান একখানা। সেটি আলাদা। উঠে খুলে রেখে অন্যটি নেন। গরমকালে রোয়াকে বসেন যখন, ঊর্ধ্বাঙ্গে কেবল ধবধবে সাদা উপবীত। ঘরে-কাচা ধুতি। ইস্কুলে যান একটা ফতুয়া চাপিয়ে। চৈত্র-বৈশাখ থেকে শরৎকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত ওই একই পোশাক। হাতে একটা বাঁশের হ্যান্ডেল দেওয়া বড় ছাতা। আমাদের ইস্কুলের লম্বা বারান্দা দিয়ে যখন হাঁটতেন একখানা 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ধরা থাকত বুকের কাছে। কেদারজ্যাঠা বললেন, ওই পুষ্করিণীর দিকে তাকিয়ে একবার দ্যাখো। দেকেছ?

আমি ঘাড় নাড়লাম। হ্যাঁ জ্যাঠা, দেখেচি। কেদারজ্যাঠা বললেন, কী মনে হয়?

বুদ্ধি করে বলি, আপনি বলুন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেন সরস্বতীর চোখের হাসি। দ্যাখো বাবা, দ্যাখো। সকালের সূর্যকিরণ। সরস্বতী পুজো তো এসে গেল ইস্কুলে। ছেলেপুলেরা তোড়জোড় করছে। মাস্টারমশাইরা আছেন। তাই মনে পড়ল। তাঁরই তো দয়ায় একমুষ্টি অন্ন পাই। সরস্বতীর দয়ায়।

দু'টো কাক এসে নেমেছে সামনে। কয়েকটা শালিক নির্ভয়ে ঘুরছে। কেদারজ্যাঠার বাড়িটা এমন একটা কোনা ঘেঁষে যে এর সামনে দিয়ে আর কোথাও যাওয়া যায় না। পুকুরটা আছে তো। পথ তৈরি হয়নি। লোকচলাচলও নেই। কেদারজ্যাঠার কাছে যে আসতে চায়, সে-ই শুধু আসবে এতটা। কেদারজ্যাঠা উঠে বাড়ির মধ্যে গেলেন আর এলেন। দেখি তাঁর দু'মুঠো ভরা গম। ছড়িয়ে দিচ্ছেন কাক-শালিকদের দিকে। কয়েকটা পায়রাও এল। তারা ডানা ঝাপটে ঠোঁটে তুলে নিতে লাগল।

গোম দিলাম। গোম। কেদারজ্যাঠা হাসলেন। হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় কেদারজ্যাঠাকে। কিন্তু অত ভাল যাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ, বাংলা অত মিঠে—সে মানুষ, গমকে 'গোম' বলেন কেন সেটা আমার কাছে ধাঁধা। রেশনের গোম আনি তো ওই ওদের জন্য। সকালে ওরা এসে ঘুরে গিয়েছে।

গোলাকার মুখ, চকচকে কপাল। সেখানে চন্দনের তিলক। শীত-গ্রীষ্ম সকালে স্নান করে নেওয়া তাঁর স্বভাব। চাদরের বাইরে ফরসা হাতের আঙুলে সুতো দিয়ে একটি সাদা ফুল বাঁধা। রোজই থাকে। গৃহদেবতার পুজোর সময় ওইটি বেঁধে নেন। গা থেকে জবাকুসুম তেল তার চন্দন-মেশানো একটা গন্ধ পাওয়া যায় কেদারজ্যাঠার পাশে বসলে। কেদারজ্যাঠা বললেন, তুমি কি ভাবছ ওই শ্যাওড়া-বাবলা, আর ওই কালকাসিন্দার ডাঁটিগুলো খুব দুঃখে আছে? মোটেও না। কেন বলো তো?

আমার আর 'কেন' ছাড়া কীই-বা বলার আছে। বললাম।

কেদারজ্যাঠা আবার হাসলেন। ওরা জানে সরস্বতী পুজো এসে পড়া মানেই গায়ে-গায়ে ফাল্গুন মাস আসবে। তক্ষুনি তো নতুন-নতুন পাতা এসে যাবে ওদের। ওরা অপেক্ষা করে আছে। ওদের দুঃখিত বলে ভেবো না মোটেই।

এই সময় ছুটতে-ছুটতে উতু এসে পড়ল। পাশের বাড়ির উতু। পাশের বাড়ি মানে, ঠিক পাশেই নয়। কেদারজ্যাঠার পৈতৃক এই ভিটের পরের বাড়িটা খানিক দূরই বলা যায়। একচিলতে জমি পেরিয়ে তবে আসতে হয়। উতু তাড়াতাড়ি আসবে বলে দৌড়চ্ছে।

উতুর পরনে কিচ্ছু নেই। সারা গায়ে মাখানো সরষের তেলের ঝাঁজালো গন্ধ। উতুর বয়স আড়াই। উতু আঙুল দিয়ে নিজের নুঙ্কুর দিকে দেখাতে-দেখাতে বলছে : এই দে। এই দে। দাদু। এইতা।

এই যে। এই যে। দাদু এইটা। উতু নিজের নুঙ্কুর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে কেন?

রুপোর চকচকে একটা ঘুনসি সেখানে বাঁধা। গুনতি গুনতি। থাকমা পলিয়ে দিল। ঠাকুমা এই নতুন ঘুনসিটা পরিয়ে দিয়েছেন বলে সে দাদুকে দেখাতে এসেছে। দ্রুত পায়ে যথাসম্ভব জোরে কদমছাঁট বেঁটে-খাটো শ্যামলা ঠাকুমাকে এদিকপানে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ধরুন ধরুন ঠাকুরমশাই, ও ছেলে, ধরো না বজ্জাতটাকে, ওই পুকুরের দিকে চলে যায় যদি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা অবশ্য গেল না উতু। গুনতি আমাল গুনতি। বলে লাফাতে লাগল। ঠাকুমা চোখের নিমেষে তাকে কোলে তুলে নেওয়ায় সে হাত-পা ছুড়ছে। ঠাকুমা বলছেন কুয়ো থেকে জল তুলে বালটিতে ঢালছি, তেল-মাখা অবস্থায় দরজা খোলা পেয়ে ছুটল। ওই ভেমো গয়লা দুধ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় উঠোনের সদর বন্ধ করেনি। বলে যাবি তো, আমি যাচ্ছি। গয়লার নাম ভীম ঘোষ। 'ভেমো' বলে ডাকে সবাই।

ঠাকুরমার কথা আর উতুর আপত্তিসূচক কান্নাকাটি ওই বাড়ির সদর পেরিয়ে অদৃশ্য হল। আমি ওই দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম এতক্ষণ। ঠাকুমা-সহ উতু দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর আমার সম্বিত ফিরল আর আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম পুরো ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে। কেদারজ্যাঠার দিকে মুখ ফেরাতেই আমার হাসি থেমে গেল। কেদারজ্যাঠার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

কেদারজ্যাঠা বললেন, কৃষ্ণের বাল্যলীলা। কৃষ্ণের রূপ। দেখলে না? তিনি এই মুহূর্তে ওই শিশুর মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের দেখা দিয়ে গেলেন। তাঁর বন্দনা... তাঁর বন্দনা... মনে পড়ছে না কেন... বলতে-বলতেই শুরু করলেন কেদারজ্যাঠা : গিরিগোবর্ধনও গোকুলওচারী/ যমুনাতীরও নিকুঞ্জবিহারি। ভরাট গলার গান। সংস্কৃত-ঘেঁষা উচ্চারণ গোবর্ধন ও বিহারির 'ব' শোনাচ্ছে খানিকটা 'ওয়'-র মতো। কী মধুর সুর। তারপরেই গাইতে লাগলেন 'শ্যামসুন্দরও মদনও মোহনও জাগো মেরে লালা।'... 'প্রাতও ভানু প্রকট ভঈযগোয়ালবাল মিলন আয়ি/তুমহারি দরস দোয়ার খাড়ি/মোহন মুরলীওয়ালা! জাগো মোরি লালা...' এই 'জাগো মোরি লালা' কথাটি বারবার গাইতে-গাইতে হঠাৎ কী খেয়াল হল অন্য গানে চলে গেলেন : কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখী শ্যামচন্দ্র নাহি রে। আবারও ফিরে-ফিরে 'শ্যামচন্দ্র নাহিরে...' গাইছেন আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। শুনলো শুনলো বালিকা রাখ কুসুম মালিকা... ভৈরবী। বাবা বুঝলে সবই ভৈরবী...

এসব গান, বাবা, বুঝেছ তো হাসিমুখে গাইতে হয়! হাসিমুখে। বলে কেদারজ্যাঠা হাসলেন, চোখ দিয়ে জল পড়ছে আর মুখে হাসি। হাসলে, কেদারজ্যাঠাকে সুন্দর দেখায়, আগেই বলেছি। কিন্তু এত সুন্দর কখনও দেখিনি!

এই দ্যাখো এই শীতকালের সকাল কেমন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। আজ বালকৃষ্ণের রূপ এই সকালও দেখতে পেল। অভিমানে রাধারানি অবশ্য দেখতে চাননি তিনি বলেছিলেন : আমি হেরিব না ওই কালোবরণ। তাই অভিমান। কেন? ওই যে কুঞ্জে-কুঞ্জে ফিরে দেখল শ্যামচন্দ্র নেই। আবার গান। আমি হেরিব না... আবার 'ব'-এর উচ্চারণ 'ওয়'-এর মতো। হাসি আর অশ্রুর মধ্যে কী এক আনন্দ নিয়ে কেদারজ্যাঠা বললেন, এটা অবশ্য বেহাগ। সকালে গাইবার কথা নয়। কিন্তু রাধারানির কথা উঠতেই এসে পড়ল বেহাগ। যেমন, ওই হঠাৎই কৃষ্ণ এসে পড়ে তাঁর বাল্যরূপ দেখিয়ে গেলেন।

গেলবার কথা কি মনে নেই? গিলতে হবে না এবার? খ্যাঁটের জোগাড় করতে-করতে তো হাড় কালি হল। এবার দয়া করে-সরে আসা হোক। দপ করে আলো নিভে যাওয়ার মতো উদ্ভাসিত মুখটা কালো হয়ে গেল কেদারজ্যাঠার। যাই। আমার অন্নগ্রহণ করার সময়

~ www.amarboi.com ~

পার হয়ে যাচ্ছে। গৃহিণী ব্যস্ত হয়েছেন। যাই। বাবা, আরেক দিন এসো। কী একটা অসম্ভব ভয় পাওয়া চোখ নিয়ে প্রায় দৌড়ে বাড়ির ভিতরে পা চালালেন কেদারজ্যাঠা। আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, চলে আসব। আমারও গায়ে চাদর। বেলা বাড়ছে। চাদরটা ভাঁজ করে কাঁধে নিচ্ছি, বড় পুরনো কাঠের দরজার ভিতর দিয়ে তাড়াহুড়োয় প্রশস্ত উঠোন পেরচ্ছেন কেদারজ্যাঠা—অলক্ষ্য থেকে শোনা গেল, দরজাটা দেবে কে? গেরস্থবাড়ি। হাট করে উঠোনদরজা খোলা। এদিকে সারাক্ষণ ধম্ম-ধম্ম। উঠোনের পর লম্বা বারান্দায় উঠতে যাচ্ছিলেন কেদারজ্যাঠা, তৎক্ষণাৎ ঘুরে দরজার দিকে আসতে লাগলেন। মুখটা দেখে মনে হল যেন চাবুক খেয়েছেন। আমার চোখে চোখ পড়ল। ভাবতে পারেননি এখনও আমি দাঁড়িয়ে আছি। বোঝামাত্রই অমনি দরজার সামনে থেকে সরে এলাম। হাঁটতে-হাঁটতে শুনলাম পিছনে পুরনো পাল্লা বন্ধ করার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ।

কেদার ভটচায এ অঞ্চলে পুজাপাঠের চেষ্টা করেছিলেন কিছুকাল। বড় ক্লাবের পুরুত তিনি এক-আধবার ছাড়া হতে পারেননি। ছোট-ছোট দুগ্গোপুজো, কালীপুজো। তা ছাড়া কথকতার একটা নিয়মিত চল আছে এখানে। সন্ধেবেলা বুড়োবুড়িরা, মন্দিরের ঢাকা চাতালে বসে শোনেন। সেখানে বসলেও কিছু আয় হয়। কিন্তু কেদার ভটচায ঠাঁই করতে পারলেন না। তিনি থেকে-থেকে গান গেয়ে ওঠেন। যে-প্রসঙ্গে বলছেন, তা ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। গেলেন তো গেলেনই। কথাই বলে যাচ্ছেন। কেমন কথা? আজকের সন্ধেটা দেখেছেন, মায়েরা? যেন শ্রীরাধিকার আঁখিতারার মতো কালো। মেঘ করেছে তো আজ। তাই না! মেঘের মতো কালো কি বলব? না না। বলব না। বলেই কেদার ভটচায নিজের কথায় নিজেই হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করেছেন। বলব, ঘন শ্যামের মতো কালো। তা হলে, শ্রীরাধিকার আঁখিতারার মতো কালো, আর ঘনশ্যামের মেঘ রঙ—দু'য়ে মিলে কী হলো? বলেই গাইছেন : শ্যাম সুঠাম কিশোর ত্রিভঙ্গিম চিত্ত বিনোদনকারী। পুরো উচ্চারণটাই হচ্ছে এইরকম 'শিয়ামো সুঠামো কিশোরো ত্রিভঙ্গিমো'... 'য'-ফলাটা ঠিক 'হ্রস্ব-ই' নয়, আবার 'অ্যা' উচ্চারণও নয়, মাঝামাঝি, ভারি মধুর শোনায় কেদার ভটচার্যের ওই আবেগদীপ্ত গলায়। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, তা হলে কী হল? বলেই আবার গাইতে শুরু করলেন। শুন অলি কুঞ্জবনে, অবশ হইল তনু, মরমেতে ফুলধনু, বাজিল কানুরও বেণু, কিশোরী বধিতে... মাঝপথে থেমে গিয়ে বললেন, কিন্তু মায়েরা, বেণু বাজুক না-বাজুক, ওই দেখুন বাইরে যে শ্রাবণ মাসের মেঘ, তার রং তো রাধের চোখের তারার মতো, আবার শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণের মতো—তা হলে? তা হলে ওইখানেই তো মিলন হয়ে গেল। আমাদের এই রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাইরের আকাশের দিকে তাকালেই দেখবেন আকাশে মেঘের মধ্যে যুগলমূর্তি! বামে শ্রীরাধিকাকে নিয়ে মুরলীধারী দাঁড়িয়ে আছেন। মনে-মনে একবার ডাকুন। বলতে-বলতে কেদার ভটচায কাঁদছেন। সামনে যত বৃদ্ধা তাঁরাও কান্নায় আকুল। কেদার ভটচায গাইছেন : পথের ধুলারে কানু ভাবি গোরা ধুলায় মুরছি পড়ে, বলে ধুলা পরশনে কানু পরশন সুখে গড়াগড়ি করে... শ্রীগৌরাঙ্গ তো এই নদিয়ায় এসেছিলেন, এর পথে-পথে ঘুরেছেন। বলতে-বলতে আবার গাইতে শুরু করেছেন কেদার ভটচায 'ও গো তুমি যে আমার রাধা, গোকুলে যে প্রেম হল না কো সাধা

~ www.amarboi.com ~

নদিয়ায় হবে সাধা...' দেখুন মায়েরা, এই তো আমাদের নদিয়ার আকাশে, আজই এই শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যায়, মেঘের ভিতরে যুগল মূর্তির মিলন...

বৃদ্ধারা হাপুস নয়নে কাঁদতে-কাঁদতে মন্দির চাতাল ছাড়লেন।

কিন্তু কেন এসেছিলেন এই রাধাগোবিন্দতলায় কেদার ভটচায? এসেছিলেন গীতাপাঠ করতে। তিনমাস প্রতি সন্ধ্যায় গীতাপাঠ ও মন্ত্র ব্যাখ্যা করবেন তিনি, এই কড়ারে। আজকের বিষয় ছিল : বিষাদ যোগ। কেদার ভটচায অর্জুন থেকে শ্রীকৃষ্ণে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ থেকে রাধিকায়। রাধিকা থেকে শ্রীগৌরাঙ্গে ... অর্জুনে আর ফিরে এলেন না।

গীতাপাঠের কাজটি গেল। ভাগবতেরও সেই অবস্থা। দু'-চারজন মাস্টার কথকতার ব্যবস্থা করলেন, সেখানেও এই হাসছেন, এই গান গাইছেন, গাইতে-গাইতে চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর শ্রোতারাও অশ্রুবিহ্বল। আখেরে কিছুই টিকল না। শুনতে যারা আসছে তারা খুব সুখ্যাত্ করছে। কিন্তু মন্দিরের লোকজন বলছেন, ব্যাখ্যা কই? ইস্কুলের হেড মাস্টারমশাই কেদার ভটচাযের জন্য চেষ্টা করতেন, তিনি বললেন, কেদারবাবু, এই অঞ্চলের পণ্ডিত আর পুরোহিতরা আপনাকে একেবারেই পছন্দ করেন না। কেন বলুন তো? কেদার ভটচায কিছুই বুঝতে পারেন না। হতভম্ব হয়ে যান। সেদিনই ইস্কুল থেকে ফেরার রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। স্বাভাবিক প্রসন্নতা নেই মুখে। কী জ্যাঠামশাই? কেদারজ্যাঠা বললেন। শুনে আমিও চুপ। দু'জনে চুপচাপ হাঁটছি টাউনের মধ্যে দিয়ে। এদিক থেকে এসে একজন প্রণাম করলেন। এক বৃদ্ধ। তিনি বাড়ির সামনের বারান্দায় বসেছিলেন। সেই প্রণাম নেওয়া সারা হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ শোনা গেল, ঠাকুরমশাই, ও ঠাকুরমশাই একটু দাঁড়ান দয়া করে।

কেদারজ্যাঠাকে ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া একটা সাইকেল রিকশা আচমকা তার প্যাসেঞ্জারের নির্দেশ পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। রিকশা থেকে এক মহিলা নামতে চেষ্টা করছেন। পাশ থেকে যে নেমে পড়ল এক্ষুনি, সে সম্ভবত তাঁর পুত্রবধূ। আস্তে মা, আস্তে। দাঁড়ান। নিয়ে যাচ্ছি। মুখে বলছে বটে একথা, কিন্তু কুঁচকে থাকা ভুরু ও মুখের রেখায় বিরক্তি। শশব্যস্ত শাশুড়িকে ধরে পুত্রবধূটি নিয়ে হাজির করল কেদারজ্যাঠার সামনে। তিনিও প্রণাম করলেন। ছোটখাটো একটা ভিড় হয়ে গেল কেদারজ্যাঠাকে ঘিরে। স্থানীয় বুড়োবুড়িদের।

অপরাহ্ণের আলো পড়েছে কেদারজ্যাঠার কপালে। মুখের সাময়িক চিন্তাকালিমা মুছে ভিতরের নরম প্রসন্নতার রৌদ্রালোক আবার দেখা দিয়েছে। কেদারজ্যাঠা জানেনও না তাঁর সৌম্যরূপ কত লোক তাকিয়ে দ্যাখে যখন তিনি সাদা বা হালকা-গেরুয়া ফতুয়া আর ধুতি পরে রাস্তায় হাঁটেন। সেই রূপ আরও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে যখন তিনি শ্রীরাধিকার কথা বলেন, গান গেয়ে ওঠেন, চোখে জল নিয়ে হাসেন বলতে-বলতে।

এই মুহূর্তে রাস্তার ধারে তাঁকে ঘিরে যে ভিড় তার সামনে দিয়ে একটি রিকশা চলে গেল। সেই রিকশা থেকে একজন এই ভিড়েও কেদার ভটচাযের দিকে একঝলক তাকালেন। আমি দেখতে পেলাম।

ঠুকরে পণ্ডিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই সময় ভিড়ের মধ্যে একজন বয়স্কা তাঁকে বললেন, আপনি আর রাধাগোবিন্দতলায় বসছেন না কেন ঠাকুরমশাই? আরেকজন বললেন, কালীবাড়ির চাতালে যে বসতেন, তাও তো আর বসেন না। কেন ঠাকুরমশাই?

কেদারজ্যাঠার মুখের আলো আবছা করল না-দেখা-যাওয়া কোনও মেঘ। আমি যাই মায়েরা। আমার কাজ পড়ে আছে বাড়িতে। ভিড় সরিয়ে পথ করে নিচ্ছেন কেদারজ্যাঠা। আমি সঙ্গে-সঙ্গে চলেছি।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকে এটুকু একাই যাই, কেমন? আরেক দিন এসো বাড়িতে। আমি বলি, আমি তো প্রায়ই যাই জ্যাঠামশাই। নিশ্চয় আসব।

দুই

ঠুকরে পণ্ডিতের চাউনিটা আমি দেখেছিলাম। ঠাকুরদাস চক্রবর্তী। রোগা দড়ি পাকানো ক্ষয়াটে। চোখ দু'টো গর্তে বসা। খদ্দরের পাঞ্জাবি-ধুতি। কাঁধে বারোমাস চাদর। এখানকার সবচেয়ে বড় ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই। এবং এ অঞ্চলের সবচেয়ে নাম-করা পুরোহিত। লোকে ঠাকুরদাস চক্রবর্তীকে যতটা মান্য করে তার চেয়েও ভয় পায় বেশি। কীরকম?

বারোয়ারিতলায় দুর্গোৎসবের আয়োজন চলছে। পায়ে-পায়ে আমি গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি, কেননা, প্রতি বছর পুজোর ঠিক পরপর একটা প্লে হয়। দ্বাদশী, ত্রয়োদশীর দিনও হতে পারে। লক্ষ্মীপুজোর পরদিনটাও ধার্য হয় কখনও। কিন্তু প্লে হওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু হয় বেশ আগে থেকে। শৈলেশকাকা মাস্টার। 'পার্ট' বলা শেখান। রিহার্সাল করান। সেইটা সন্ধে থেকে শুরু হয়। রোববার হলে বিকেল থেকেই। অ্যাক্টরদের অফিস যেতে হয় না সেদিন। অন্যদিন সব ডেলি প্যাসেঞ্জাররা অফিস থেকে ফিরে রিহার্সাল শুরু করতে-করতে সন্ধে গড়িয়ে ৮টা সাড়ে আটটা। ওই রিহার্সালটা রোজই দেখি। তাই আমার যাওয়া। সকলে একে-একে জড়ো হচ্ছে। একটা রিকশা এসে থামল বারোয়ারিতলার সামনে। রিকশা থেকে নামলেন ঠুকরে পুরুত। হ্যাঁ, শোনো ছেলেরা। এবার তোমাদের এই মায়ের পুজোটা আমিই করব।

কাবলুদা, পোলাইকাকা, হাবু পা-ব্যাঁকা, লোটনমণি, রাম, সবাই চমকে গেল। পোলাইকাকা বললেন, পণ্ডিত স্যর, এটার জন্য তো পুজোকমিটির বড়দের সঙ্গে কথা বলতে হবে। পুজো কমিটিতেই তো ঠিক হয় কে পুরোহিত হবেন। পণ্ডিত স্যর বলার কারণ, বলেইছি তো, তিনি শ্যামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের শিক্ষক।

ঠুকরে পুরুত বললেন, পুজোকমিটি-কে বলব কেন? আমি ভাইস চেয়ারম্যানকে বলব। চেয়ারম্যানকে বলব। সের'ম বুঝলে এম.এল.এ-কেও বলতে পারি।

সবাই চুপ।

মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান এই পাড়ারই লোক। এই পাড়া থেকেই জিতেছেন। বারোয়ারি পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট। অবশ্য, মিটিংয়ে আসার সময় করতে পারেন না। আর চেয়ারম্যানের সঙ্গেও ভাল খাতির ঠুকরে পুরুতের। তবে সবচেয়ে খাতির হচ্ছে এম.এল.এ-র সঙ্গে। শ্যামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির প্রধান এই এম.এল.এ। আর কমিটিতে

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা প্রতিনিধি ঠুকরে পুরুত। এম.এল.এ-র বাড়িতে সত্যনারাণের সিন্নি চড়ানো হলেও ঠুকরে পুরুতই চড়াতে যান। এম.এল.এ-র নাতি ঝুলন করলে বারান্দায়—সেই বারান্দার সামনে গিয়ে বিকেলে আধঘণ্টা এম.এল.এ-র নাতি, পুত্রবধূ এবং গিন্নির সঙ্গে কথা বলে আসেন। ঠুকরে পুরুত এম.এল.এ দেখাতেই পারেন। আমরা সবাই চুপ।

ঠুকরে পণ্ডিত দাঁড় করানো রিকশাকে 'অ্যাই চল ব্যাটা' বলে রওনা হলেন। এদিকে শৈলেশকাকা এসে পড়েছেন, বারোয়ারিতলার যে-ঘরে ভোগপ্রসাদ রাখা হয়, সেই ঘরটাতেই পুজোর আগে রিহার্সাল। সবাই সেদিকে চলল। আমি মনে-মনে চিন্তা করছি, গত বছর তো এখানে বারোয়ারিতলার দুর্গোৎসবে পুরোহিত ছিলেন কেদারজ্যাঠা। এবার কি থাকবেন না? না, থাকলেন না। ঠুকরে পুরুতই কাজটা পেলেন। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের চাতালে, যে 'বিষাদ যোগ' বলতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ বলে, কেঁদে-হেসে গান গেয়ে কাজটা খুইয়েছিলেন কেদারজ্যাঠা, তার পিছনে অবশ্য ঠুকরে পুরুতই ছিলেন না শুধু। ঠুকরে পুরুতের স্ত্রী খুবই ভক্তিপ্রাণা একজন মহিলা। নম্রভাষিণী প্রৌঢ়া। তিনি কেদার ভটচাযের কোথাও কোনও পাঠ থাকলে একবার ঘুরে দেখে আসতেন পিছন থেকে।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের যিনি প্রধান পুরোহিত এবং ওই মন্দিরের যিনি এখন বংশপরম্পরায় মালিক হয়েছেন, মধুমঙ্গল রায়, আসলে এর ঠাকুরদা একজন 'রায়বাহাদুর' ছিলেন, তাঁরা প্রায় সন্ধ্যাতেই মন্দির চাতালে বসেন। তাঁদের গিয়ে ঠুকরে গিন্নি বললেন, খুব ভাল। খুব ভাল। তবে, এর মধ্যে শাস্ত্রকথা কই? গীতার শ্লোক তো কথকমশাই বললেন মোটে একটি। ভাষ্য তো নেই-ই। ব্যাখ্যা? উঁহু। শুধুই ভাবের কথা। গম্ভীর হয়ে গেলেন মালিক মধুমঙ্গল আর সেবাইত পঞ্চানন গাঙ্গুলি। মিষ্টভাষিণী এই মহিলাকেও সকলেই একটু ভয় করে চলে। রাধাগোবিন্দমন্দিরে কিছু কাল পর খিনখিনে গলায় দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে গীতা পাঠ শুরু করলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী। তাঁর জন্য একটি মাইকের ব্যবস্থা দরকার হল। কেননা তাঁর দাপটের সঙ্গে তার কণ্ঠস্বরটি চিরকালই বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে।

ব্রজবল্লভ মন্দির, কালীতলার প্রাঙ্গণ, শিবদুর্গা মন্দির ইত্যাদি কোনও ঠাকুরদালানের পাঠে-ভাষ্যেই আর ঢুকতে পারলেন না কেদার ভটচায। সব ওই একদিন-দু'দিন বসলেন। তারপর বাদ চলে গেলেন। সব জায়গাতেই ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী শুনতে যেতেন। তা ছাড়া, এই সব মন্দিরের সামনে, সন্ধে ঘনালে, বিভিন্ন পুরোহিতরা, নানা ইস্কুলের পণ্ডিতমশাইরা এসে বসতেন। আলাপ-আলোচনা চলত। সেসব জায়গায় ঠুকরে পণ্ডিতের খুব সমাদর। কিন্তু তিনি এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়ান না। অন্তত কোথায় কী ঘটছে সে-খবরটা নেওয়া দরকার। তাই সব মন্দিরেই যাওয়া চাই তাঁর। কেদারজ্যাঠা কোনও দিনই সন্ধেবেলার এই পুরোহিতদের সমাবেশে গিয়ে বসেননি। তিনি বাড়িতে বসে বই পড়তেন। কিংবা উতুদের বাড়ি গিয়ে উতুর সঙ্গে খেলা করতেন। উতুর বড় ভাই, চিতু, যার বয়স এখন ছয়, তার সঙ্গেও কেদারজ্যাঠার খুব বন্ধুত্ব। তা ছাড়া তিনি কলের গান শোনেন।

একটা ফিয়েস্টা রেকর্ড প্লেয়ার, তাঁর ভাগ্নিজামাই তাঁকে কিনে দিয়েছিল। পুরনো চোঙঅলা যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে। ৭৮ আর.পি.এম-এর গালার রেকর্ড ফিয়েস্টাতে ঘোরে বটে।

~ www.amarboi.com ~

তিনি আধুনিক ফিয়েস্টাকেও 'কলের গান' বলেই অভিহিত করেন। ঠাকুরদাস চক্রবর্তী সবার সঙ্গে কথা বলার সময়েই একটু ঠুকরে দেন। তাই ওঁকে আড়ালে 'ঠুকরে পুরুত' বলা হয়। তা ছাড়া, ঠুকরে পণ্ডিতের কোনও প্রসঙ্গে কোনও কথাই চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, এম.এল.এ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। আরও বড় ব্যাপারও আছে। কালীতলা মন্দিরের শতবর্ষ হচ্ছে। এম.এল.এ, চেয়ারম্যান আর ভাইস চেয়ারম্যানকে নিয়ে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী গিয়ে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। মানে দেখা করাটা সম্ভব করে ছাড়লেন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নাকি বিনীতভাবে বলেছেন, তাঁর অনেক ব্যস্ততা। পিএম আসবেন, সেজন্য তাঁকে খুব কাজের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। তাই তিনি পারছেন না। কথাটা সত্যি। ক'দিন পরে কাগজে দেখা গেল বিমানবন্দরে সিদ্ধার্থশঙ্কর অভ্যর্থনা করছেন ইন্দিরা গান্ধীকে।

তবে ঠুকরে পণ্ডিত ব্যর্থ হয়ে ফেরেননি। অজিত পাঁজাকে আনতে সক্ষম হলেন। কালীতলার মন্দিরের সামনের মাঠে বিরাট আয়োজন হল।

অজিত পাঁজা খুব সুন্দর বললেন শেষে। আর প্রথমে, খুবই ঘ্যানঘ্যানে গলায় অর্ধেক অসম্পূর্ণ উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করলেন ঠুকরে পণ্ডিত। অজিত পাঁজা তাঁর ভাষণে পণ্ডিতমশাইকে শ্রদ্ধা জানালেন একবার, তাঁর স্তোত্রপাঠের জন্য।

ব্যস, আর যায় কোথায়! ঠুকরে পুরুত বাজারে গিয়েছেন, বাজারে, ভোম্বলের বাবা শসা কিনছেন। ওই যে শসা দেখছ? শসা? যখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ঘরে ঢুকলাম তখন চাকা-চাকা করে শসা কেটে তার টেবিলে দেওয়া ছিল। কাঁটাচামচ ছিল। তিনি কাঁটায় গেঁথে একটা-একটা মুখে তুলছিলেন।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ঘরে যখন তিনি ঢুকেছিলেন, তখন, তাঁর সঙ্গে শুধু এম.এল.এ ছিলেন। এটুকু জানা যায়। এম.এল.এ-কে গিয়ে কে জিগ্যেস করবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কাঁটাচামচ দিয়ে দপ্তরে বসে শসা খাচ্ছিলেন কি না! তখন সবে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা হয়েছে। ভোম্বলের বাবা তো জিগ্যেস করবেনই না। কী থেকে কী হয়ে যায়!

পাড়ায় ছেলেপুলে বসে রয়েছে বোস দাদুর বাড়ির সামনে। সাইকেলের পিছনে-সামনে ঝাঁক-ঝাঁক ডাব ঝুলিয়ে ডাবঅলা যাচ্ছে সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে। তার গন্তব্য নিকটবর্তী ইস্কুল। ১০টায় ছাত্ররা আসতে শুরু করবে। মাস্টাররাও আসবেন। বিক্রি হবে।

বিক্রি তার আগেই হল। কাবলুদা ডাকল। খাবে। ভোম্বলেরও খেতে ইচ্ছে হল। লোটনমণি তাঁরও ইচ্ছে যাচ্ছে ডাবের প্রতি। তিন-চারটে ডাব হাতে-হাতে নিয়ে গলায় উপুড় করছে ছেলেরা। কাটারি হাতে আরেকটা ডাবের মুখ খুলল ডাবঅলা।

ঠুকরে পণ্ডিত যাচ্ছেন। সেদিন হেঁটেই। দাঁড়ালেন। দেখলেন। বললেন, ডাব খাচ্ছ? ডাব? খাওয়া ভাল। এই তো অজিত পাঁজা মশাইয়ের বাড়ি যেদিন গেলাম উনি ডাব খাওয়ালেন।

সুন্দর কাচের গ্লাসে করে দিয়ে গেল। মানে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলাম তো!

সেদিন ঠুকরে পুরুতের সঙ্গে চেয়ারম্যান গিয়েছিলেন। আমরা কি চেয়ারম্যানকে জিগ্যেস করব, ডাব খেলেন বুঝি? আমরা সব ছেলে-ছোকরার দল।

এই ঠুকরে পণ্ডিত সব জায়গা থেকে বের করে দিলেন কেদার ভটচাযকে। যুক্তিসিদ্ধ

~ www.amarboi.com ~

কারণ দেখিয়ে। কারণ উনি শাস্ত্রকথা বলেন না। শাস্ত্র উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করতে জানেন না। ভাবের কথা বলে যান।

এদিকে রাস্তাঘাটে যত সাধারণ বয়স্ক মহিলা আর বৃদ্ধ, এমনকী মধ্যবয়সিরাও কেদারজ্যাঠার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে। কেননা, যে-দু'চারদিন তারা এখানে-ওখানে বলতে শুনেছে, তাদের মনে হয়েছে, কই কেদার ভটচাযের মতো এমন করে তো কেউ বলে না! এরা গৃহস্থ মানুষ সব, পরিণত বয়সে এসে কেদারজ্যাঠার ওই ভক্তিরসের পাগলামির টানে পড়ে যায়। তবে পণ্ডিতদের কাছে, কঠিন শাস্ত্রকথা আরও কঠিন করে যে না-বলবে তার দর উঠবে না।

কেদারজ্যাঠারও দর পড়ে গেল। এইরকম অবস্থা যে, কালীতলা মন্দিরের শতবর্ষের অনুষ্ঠানে কেউ তাঁকে একবার যেতে বলল না। ওই মন্দিরে অন্তত তিনদিন তো কেদার ভটচায কালীকীর্তন শুনিয়েছেন। কেউ ডাকল না। কিন্তু তিনি গেলেন। পিছনের দিকে জায়গা পেলেন। বাড়ি আসার সময় ওই পাড়ার ছেলেরা যারা ভলান্টিয়ারি করছিল, তাদের দু'জন পিছন থেকে দৌড়ে এসে থামাল কেদারজ্যাঠাকে। মিষ্টির বড় প্যাকেট দেওয়া হচ্ছিল বিশেষ-বিশেষ অতিথিদের। সেই প্যাকেট একটা জোর করে হাতে ধরিয়ে দিল।

বাড়ি ঢোকার আগে উতু-চিতুদের ওখানে ঢুকলেন কেদারজ্যাঠা। দু'ভাইকে দিলেন প্যাকেট। চিতু খুব খুশি। কিন্তু উতু বলতে লাগল, হাকিম খাব। হাকিম এনে দাও দাদু। অর্থাৎ সে আইসক্রিম খাবে। কাঠির ওপর বরফ জমানো মিষ্টি-মিষ্টি একরকমের খাবার, দু'হ্যান্ডেল লাগানো দু'চাকার কাঠের গাড়ি ঠেলে-ঠেলে সব পাড়ায় নিয়ে যায় ফেরিঅলা। এ-পাড়াতেও আসে। কিন্তু, ঠাকুমা উতুকে তা খেতে দেন না। উতুর সর্দিকাশির ধাত।

উতু আবার বলে হাকিম খাবো। হাকিম দাও। ঠাকমা বললেন, আরে তোর দাদু হাকিম কোথায় পাবেন। উনি ভালমানুষ। ঠুকরে পুরুতকে বললে জজ ম্যাজিস্টর, হাকিম, এম.এল.এ—সব এনে দেবে।

কেদারজ্যাঠার রোয়াকে বসে পরের দিন শুনেছিলাম ঘটনাটা। তখন গ্রীষ্ম এসে পড়েছে। তাত বাড়ছে দুপুরের দিকে। কিন্তু পুরনো দিনের ভাঙা বাড়ির রোয়াকে পুরনো নিমগাছের ছায়া। নিমের হাওয়া পাতার ফাঁক দিয়ে এলে জুড়িয়ে যায় শরীর।

তখন রোদ নেমে যাচ্ছে। কেদারজ্যাঠার মুখটা আজ বড় ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। শরীর কি ভাল নেই জ্যাঠা? না, তা নয়। আজকে আহারাদির বড় কষ্ট হয়েছে।

কেদারজ্যাঠার আহারাদির কষ্ট? সে আবার কী! কেদারজ্যাঠার খাওয়া বলতে আলোচাল ফুটিয়ে তাতে একটু ঘি। অবশ্য সবজি পড়ে ভাতে। আলু, কাঁচকলা, পেঁপে। পটল উঠলে দু'টো ছোট দেখে পটল। সব ওই আতপ চাল ফুটানোর সময় ফেলে দেওয়া হয়। সেদ্ধ হল। সেদ্ধ সবজিগুলো নুন-সরষের তেল দিয়ে মাখলেন। আর ভাতে একটু গাওয়া ঘি ছড়িয়ে নিলেন। ওই হল আহারাদি। রাতে দুধমুড়ি বা খইদুধ। বিকেলে একটু মুড়িমাখা সরষের তেল, কাঁচালঙ্কা। না, পেঁয়াজ-টেঁয়াজ বাদ। আমি জানি কেদারজ্যাঠা আর-একটা জিনিস ভালবাসেন। কাপড়ে পুঁটলি বেঁধে মুগ বা মুসুরির ডাল যদি ওই আতপ চালের সঙ্গে সেদ্ধ

~ www.amarboi.com ~

করে নেওয়া যায়, সে-জিনিসও কাঁচালঙ্কা সরষের তেল দিয়ে... কিন্তু, তা তো আর সম্ভব নয়।

আজ কী ব্যাঘাত ঘটল আপনার আহারাদির জ্যাঠামশাই?

কেদার ভটচাযের সারাজীবনের বাসনা তিনি স্বপাক আহার করবেন। কিন্তু তিনি উনুন ধরাতে শিখলেন না। এই বয়সেও শেখেননি। আর জ্বলন্ত উনুনে কোনও বাটি বা হাঁড়ি বসাতেও তিনি পারেন না। কারণ ছোটবেলা থেকে কেদারজ্যাঠা আগুনকে খুব ভয় পান। এমনকী, কারও বাড়ি যজ্ঞ করার ডাক যদি কালেভদ্রে আসে, তখন কেদারজ্যাঠার ভাবভঙ্গি দেখেই বাড়ির মহিলারা বুঝতে পেরে যান ভুল পুরোহিতকে ডাকা হয়েছে। অথচ তাঁর উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ, তাঁর গৌরবর্ণ ঊর্ধ্বগাত্র, আয়ত চক্ষু সমস্ত কিছু যেন নিবেদিত হতে থাকে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে—শেষে একসময় যখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সামনে বসে তিনি ক্রিয়াকর্মগুলি পালন করতে থাকেন, তখন তার সমস্ত উপস্থিতি জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে—সেই সময়টায় কেদার ভটচায সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন যে কোন্ শৈশবে রক্ততিলকধারী এক জ্যোতিষার্ণব তাকে বলেছিল : অগ্নিতে এই জাতকের মৃত্যু। অগ্নি থেকে জাতক যেন দূরে অবস্থান করে, আজীবন। তবেই তার মঙ্গল। এই ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী ক্বচিৎ কখনও তিনি ভুলে যান—যখন যজ্ঞে হোমে নিবিষ্ট হন।

তবে কালীপুজো কখনও করেননি। কারণ সেদিন বাজি ফাটে। রাস্তায় বেরন না কেদারজ্যাঠা। আজ কী হল? আজ গৃহিণী অনেক সকালে বেরিয়ে গিয়েছেন তাঁর দিদির বাড়ি মাঝদিয়ায়। সকালের ট্রেন ধরে। বেরবার আগে ওই আতপ চাল আলু কাঁচকলা পেঁপে উনুনে বসিয়ে স্নান করতে ঢোকেন। আর পুরো ভাতটা পুড়ে যায় অনেকখানি। আতপ চালের ফেনাভাত গরম অবস্থায় না-খেলে তা জমে শক্ত হয়ে যায়। স্বাদ থাকে না। কেদারজ্যাঠাকে সেই পোড়া শক্ত ভাত চামচ দিয়ে কেটে-কেটে খেতে হয়েছে। ভুল করেছিলেন ঘি দিয়ে। তাতে আরও বিস্বাদ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভাতটা খেতে পারেননি।

দু'গাল মুড়ি নিয়ে খেলাম। ম্লান হাসলেন কেদারজ্যাঠা। উনুন ধরাতে পারি না। গৃহিণীই আহার প্রস্তুত করে দেন। আজকে পরমকারুণিক চাইলেন আমার ক্ষুধা যেন নিবৃত্ত না-হয়। তাই হল। কত ভিক্ষুক, কত পশুপাখি, আহার খোঁজে সারাদিন। ব্যর্থ হয়। আজ আমাকে যেটা হৃদয়ঙ্গম করালেন তিনি। বলে ওপরদিকে তাকালেন কেদারজ্যাঠা। অপরাহ্নের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে।

আমি বললাম, জেঠিমা কি ফিরেছেন? কেদারজ্যাঠা বললেন, সন্ধ্যার আগে ফেরার কথা।

শুনেই আমি উঠে পড়লাম। এইটুকু রাস্তা পা চালিয়ে পার হতে হবে। বড় রাস্তায় পৌঁছেই আমার ডানদিকে ঘুরতে হয়। বাড়ি ওইদিকে। আর স্টেশন বাঁদিকে। কেদারজ্যাঠার বাড়ি থেকে বড়রাস্তায় পৌঁছতে মিনিট পাঁচেক লাগে, হেঁটে।

যাচ্ছ? এসো। বলেছিলে 'চৈতন্যচরিতামৃত'খানা আরেকবার নিতে চাও। আনব? নেবে? বের করে রেখেছি।

নেব জ্যাঠামশাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেদারজ্যাঠা বাড়িতে ঢুকে গেলেন। পুকুরের জলে অস্তসূর্যের রাঙা আভা। গাছে-গাছে ঝাঁক-ঝাঁক পাখি ফিরছে। চিতু-উতুকে নিয়ে তার ঠাকুমা বেরলেন বড় রাস্তার দিকে। বড় রাস্তায় পড়ার আগেই একটা মণিহারি দোকান আছে। সেখান থেকে হয়তো লজেন্স কিনে দেবেন ওদের।

কেদারজ্যাঠা ফিরে এসে বইটা আমার হাতে দিলেন। বললেন, গৃহিণী ফিরবেন যখন আমিও একটু বেরব। ব্রজবল্লভ মন্দিরে গিয়ে চাতালটায় বসব।

আমি আঁতকে উঠলাম, সেখানে তো ঠুকরে পণ্ডিত সন্ধে হলেই যান একবার। ওখানে যাবেন কেন?

কেদারজ্যাঠার মুখ অপ্রসন্ন! ছিঃ, ওরকম নামে ডাকছ কেন পণ্ডিতমশাইকে? সেদিন উতুর ঠাকুমাও ওইরকম বললেন। আমি কিছু বলতে পারিনি, কিন্তু দুঃখ পেয়েছি।

আমি হাঁ। ঠুকরে পুরুতের জন্য দুঃখ। দুঃখ পেয়েছেন? কেন জ্যাঠামশাই?

কেদারজ্যাঠা রোয়াকে বসলেন, অস্তসূর্যের রাঙা আভা ম্লান হয়ে এল আরও। বললেন, পুকুরের জলে ওই অস্তরং কেমন ঝাপসা হয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে দেখেছ?

আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, দেখছি তো। কেদারজ্যাঠার হাসিটা এখন মলিন। আমার বয়স ওই অস্তসূর্যের মতো। ৩ বছর এক্সটেনশনে আছি, চৌষট্টিতে পড়লে আর এক্সটেনশন পাব কি না জানি না। অবসরের সময় হয়ে গিয়েছে। জীবন থেকেও অবসর। বলে থামলেন।

পুকুরের জলের রং এখন ধূসর ময়লা। সেদিকে তাকিয়ে কেদারজ্যাঠা বললেন, একটু পরেই জলটা আর দেখা যাবে না।

সারা দিন রোদ্দুরে ঝকঝক করা পুকুর এবার শুধু অন্ধকার। কেউ বুঝবেও না ওখানে পুষ্করিণী আছে। আমারও দিন অস্ত যাচ্ছে। বাঁচব আর ক'দিন?

আমি জোরে আপত্তি করলাম, এসব কী বলছেন জ্যাঠামশাই! ছিঃ ছিঃ।

কেদারজ্যাঠা ঘাড়ের কাছে একটা মশা মারলেন। কেন বলছি শোনো।

কেদার জ্যাঠার গলাটা গম্ভীর। একটু অস্বাভাবিক শান্ত। তিনি বলছেন, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী আমার জ্ঞাতি হন।

আমি স্তম্ভিত। বলি, উনি আপনার আত্মীয়? জানি না তো!

উনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। তা ছাড়া, উনি একজন শিক্ষক। আমিও একজন শিক্ষক। একই বিষয়ের শিক্ষক। উনি একজন পুরোহিত। ওঁর মতো না-হলেও আমিও এ অঞ্চলে কিছু পুজো-পাঠ হোম-যজ্ঞ করি। উনি 'কাব্যব্যাকরণ তীর্থ'। আমিও তাই। একই বৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে অন্ন সংগ্রহই করি আমরা। উনি আমার অন্নসূত্রে জ্ঞাতি। বিদ্যাস্থানে জ্ঞাতি। বৃত্তিসূত্রে জ্ঞাতি।

আমি এমন কথা কখনও শুনিনি। অন্ধকার নেমেছে জঙ্গুলে বাড়িটা ঘিরে। কেদারজ্যাঠা উঠলেন, যাই, বাড়ির ভিতরে গিয়ে তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাব। গৃহিণীর আসতে দেরি হচ্ছে। আমারই কর্তব্য এখন।

~ www.amarboi.com ~

বাড়ির ভিতরটাও অন্ধকার। দরজা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে কেদারজ্যাঠা বললেন, একই পাত্র থেকে আমরা অন্ন গ্রহণ করি। এই শেষ বয়সে মনে জ্ঞাতিবিদ্বেষ লালন করব? কেন? জ্ঞাতিনিন্দা শুনব কেন? সবাই পণ্ডিতমশাইকে যে-নামে ডাকে, তোমার মুখে পণ্ডিতমশাইয়ের সেই নাম শুনে আমার আঘাত বাজল। আমি তো গিয়ে চাতালে বসে থাকব। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে। তাই তো যাই। উনি এলে হাত তুলে নমস্কার করি।

আবার বসে থাকি কৃষ্ণরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে। আর কখনও অমন বোলো না!

অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে গেলেন কেদারজ্যাঠা। চলে আসার সময় মনে হল সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া হয়নি কে বলল? ওই তো একটি প্রদীপ জ্বলছে অন্ধকারে। কেদারজ্যাঠা নিজেই এক দীপালোক।

তিন

পরের রোববার বিকেলে গিয়েছি বইটা ফেরত দিতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনকথা শুনেছি একদিন, আজকে আরও একটু শোনার বাসনা। দেখি গৌরবর্ণ মুখে কালিমা।

বসো, বাবা।

জ্যাঠামশাই, শরীর কি খারাপ হল আপনার?

নিমগাছটার দিকে তাকালেন। কত দিন বেঁচে আছে বলো তো এই নিমগাছ? আমি তখন বালক। সেই সময় থেকে এই নিমগাছ আমাকে দেখছে। আমার এই পরিণতি দেখছে। আচ্ছা গাছ তো অন্ধ, না? গাছের তো চোখ নেই।

কিছুই বুঝতে পারছি না। দূরে ট্রেনের ভোঁ শোনা গেল। কাছাকাছি একটা লেভেল ক্রসিং আছে। কাছাকাছি মানে মাইল দেড়েক। সেখানে ধুধু মাঠ আর ধানখেত। ট্রেনের ভোঁ আর চলে যাওয়া রেলগাড়ির ঘটাংঘট আওয়াজ, ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসতে থাকে লোকালয়ে। এই রোয়াকের কাছে এখন যেমন আসছে।

নরক! একটা নরক নিয়ে বাস করতে হয় আমাকে! আবার পুজোআচ্চা! ঘেন্না-ঘেন্না! গু-মুত বাদ রাখল না। ছ্যা! ছ্যা!

বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল এই আওয়াজ।

এত গালাগাল কোথায় গিয়ে জমা হচ্ছে জানো?

কথাটা বলার পর কেদারজ্যাঠা তাকালেন আমার দিকে।

আমি মাথা নাড়ি, জানি না।

‘নরক’ বললেন না গৃহিণী? শুনেছ তো!

আমি ঘাড় হেলাই।

সেই নরকে। নরক কোথায় জানো?

আমার আবার নীরবে মাথা নাড়া।

আমার মনে। আমার মনের ভিতরকার রসাতলে। সেখানে নরক। জমা হচ্ছে। বলেই হাসলেন। হাসিটি এমন যা কান্নার চেয়ে বেশি।

আমার বই

কী ঘটেছে? সকালে সাড়ে ছ'টায় বাজার গিয়ে ৭ টায় সোয়া সাতটায় বাড়ি আসেন কেদারজ্যাঠা। তারপর এককাপ চা খান। চা খেলেই তাঁকে পায়খানা যেতে হয়। কিন্তু গৃহিণীর নিষেধ আছে। বড় কলঘর। টিনের চাল। যেখানে স্নানের জায়গা। চৌবাচ্চা ভরা জল। তার অন্য পাশে স্যানিটারি পায়খানা। দু'টো ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় সেখানে পৌঁছতে। গৃহিণী আগে তাঁর নিজের স্নান, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আসবেন, এমনকী নিজের কাচাকুচিও করে নেবেন—তবে সেখানে যাওয়ার প্রবেশাধিকার পাবেন কেদারজ্যাঠা।

তিনি পাংশু মুখে চুপ করে বারান্দায় বসে থাকেন, যতক্ষণ না গৃহিণী কলঘর থেকে বেরচ্ছেন। ৮টা সাড়ে আটটা বেজে যায় রোজই। তারপর কলঘরে ঢোকার অনুমতি পান কেদারজ্যাঠা। স্নান সেরেই আসেন। গৃহদেবতার পূজা সমাপন করে আহারে বসেন। তাও কোনও দিন শোনেন আজ ঘি বাড়ন্ত। এমনকী, খেতে বসার আগে বললেও ছুটে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে ছোট্ট ঘিয়ের শিশি আনতে পারতেন কেদারজ্যাঠা, কিন্তু পাতে বসে কি ওঠা যায়? ওইটুকু আহারাদির মধ্যে এত বিঘ্ন কেদারজ্যাঠার?

কেদারজ্যাঠা সকালে চা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন অনেক দিন। চা না-খেলে বেগ তৎক্ষণাৎ আসে না। আজকে, লোভ করে এককাপ খেয়ে ফেলেছিলেন, কারণ গৃহিণী ওই সময়টায় রোজই চা নিয়ে বসেন বারান্দায়। কেদারজ্যাঠাও আজ এক কাপ নিয়েছিলেন। তারপরই তাঁর পায়খানা পায়। অনেক মিনতি সত্ত্বেও, গৃহিণী তাঁকে ধমক দিয়ে, হাতের পাঁচটা কাজ সেরে, কাচার বালতি নিয়ে কলঘরে ঢোকেন। গৃহিণী বেরিয়ে বলেন, এ কী গয়লা কতক্ষণ থেকে থেকে সদর ধাক্কাচ্ছে, খুলছ না কেন?

অপরাধীর মতো মুখ করে উঠোনের মাঝখানে তখন কেদারজ্যাঠা দাঁড়িয়ে। তাঁর কাপড়চোপড় নষ্ট। এবং পা বেয়ে বিষ্ঠা নামছে। তিনি গয়লাকে এ-অবস্থায় দরজা খুলবেন কী করে? গয়লা রাগারাগি করে বাইরে থেকে ফিরে গেল। আর সব নোংরা কাপড়জামা একটা বাজারের ঝোলায় ভরে পাশের পাড়ার 'ভুতোর বাগান' নামক সাপখোপ-ভরা জঙ্গুলে জায়গাটায় ফেলে আসতে হল কেদারজ্যাঠাকে। কেদারজ্যাঠা বললেন, আমার তো ওঁর ওপরেই নির্ভর। ঈশ্বর গৃহিণীকে পাঠিয়েছেন আমার জীবনে। তাঁর দয়া। আর গৃহিণী দু'টি রেঁধে দেন তাই আমার অন্নজল জোটে। গৃহিণীই আমার অন্নজল। তিনি না-থাকলে আমি অনাহারে থাকতাম।

আমি না-বলে পারি না। দু'টো আলোচাল ফুটিয়ে নিতে পারেন না জ্যাঠামশাই? নিজেই তো পারতেন কাজটা। আঁতকে ওঠেন কেদারজ্যাঠা। অগ্নি থেকে দূরে অবস্থান করা প্রয়োজন। অগ্নিই আমার নিয়তি। মস্ত বড় জ্যোতির্ষাণব বলেছিলেন আমার বালক বয়সে। তিনি রাজজ্যোতিষী ছিলেন।

আমি একদিন এসে বাইরে অপেক্ষা করছিলাম কেদারজ্যাঠার খাওয়ার সময়ে। একটানা তিরস্কার কানে আসছিল বাইরের রোয়াকে বসে। কত অপদার্থ কেদারজ্যাঠা! দু'টো ভাল যজমান ধরতে পারেন না। শান্তিস্বস্ত্যয়ন পুজোআচ্চায় কি রোজগার হয়? একটা বড় দুর্গাপুজোর বায়নাও আদায় করতে পারেন না। ইস্কুলের ওই ক'টা টাকায় কী হয় সংসারের?

~ www.amarboi.com ~

আমি ভাবছিলাম, দু'জনের তো সংসার। সন্তানাদি নেই। তবে কেদারজ্যাঠা নিজেই বলেছিলেন কথায়-কথায়। গৃহিণীর পিত্রালয়ে কিছু অর্থ পাঠাতে হয় প্রতিমাসে। আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, কেননা তাঁরা তো আমার জ্ঞাতি।

কেদারজ্যাঠা আবার অপরাহ্নের আলো মুখে নিয়ে বসে আছেন। বললেন, নোংরা মেখে খোলা উঠোনে যখন দাঁড়িয়ে আছি আর গোয়ালা সদর নাড়ছে, যেতে পারছি না, মনে হল, এর চেয়ে বেশি আর কী আছে, নরকে?

সেদিন আমি আর বসে থাকতে পারিনি, চলে আসি। তারপর ধীরে-ধীরে যাওয়া কমিয়েও দিলাম। পুজো এল, চলে গেল। শীতকাল পড়ল আবার। আমি যাই না, যেতে পারি না আর। একদিন রাস্তায় দেখা কেদারজ্যাঠার সঙ্গে। মুখ নিচু। রাস্তার একপাশে শাল গায়ে হাঁটছেন। প্রণাম করলাম। বললেন বড় চিন্তায় আছি। গৃহিণী পনেরো দিনের জন্য বোনঝি-র কাছে যাচ্ছেন। আমায় আহারাদির ব্যবস্থার জন্য একটা প্রাইমাস স্টোভ কিনতে বলায় এনে দিয়েছি। পাম্প করে জ্বালাতে হয়।

আমি বলি, জ্যাঠা একজন রাঁধুনি মহিলাকে রাখুন। আমাদের বাড়িতে যে রান্নার মাসি, তাকে বলছি, আপনার রান্না সকালে আপনি ইস্কুলে বেরনোর আগে করে দিয়ে তারপর আমাদের বাড়ি আসবে। মা-কে গিয়ে বলে রাখছি। সকালেই আমি গিয়ে আপনার বাড়ি চিনিয়ে দেব। বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লেন কেদারজ্যাঠা। রাঁধুনির কথা উতুর ঠাকুমাও বলেছিলেন। কিন্তু গৃহিণী বাইরের লোক ঢুকতে দেবেন না হেঁশেলঘরে। আমাকে পায়খানায় যেতে দেন না, তিনি কলঘরে যাওয়ার আগে। সব নাকি অশুদ্ধ অশুচি হয়ে যাবে। যাই বাবা।

চার

খবর পেলাম, কেদার ভটচায কল্যাণী হাসপাতালে ভর্তি। স্থানীয় হাসপাতাল নিতে চায়নি। সকালে স্নান করে পুজো সেরে ভাত বসিয়েছিলেন। প্রাইমাস স্টোভ সাফল্যের সঙ্গে জ্বালিয়ে নিতেও পেরেছিলেন। ভাত হয়ে যাওয়ার পর নামিয়েও নিতে পারেন হাঁড়ির কোনা রান্নাঘরে রাখা হাত মোছার কাপড় দিয়ে ধরে। শীতকাল বলে গায়ে ছিল শাল। প্রাইমাস স্টোভ জ্বলছিল। শালের একটা প্রান্ত স্টোভের ওপর পড়ে আছে, কেদারজ্যাঠা ভাত বাড়ার থালা নামাচ্ছেন। ওই নামানোটুকুই। খেতে বসা আর হয়নি। হাসপাতালে গেলাম আমরা। জেনারেল বেডে ছটফট করছেন। গায়ের চামড়া খানিক ব্রাউন খানিক কালো হয়ে ফোলা। কিছু চাপা দেওয়া যাচ্ছে না গায়ে। নিচের দিকটায় তাকানো যায় না। জননাঙ্গ স্তূপ হয়ে ফুলে থসথসে। ইউরিন হচ্ছে না। ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন এ তো যা অবস্থা ক্যাথিটার করা যাবে না। কেদারজ্যাঠা কথা বলছেন তখনও। ডাক্তাররা চ্যানেল করতে চেষ্টা করছে। পারছে না। মেন ভেইন কেটে আইভি চ্যানেল করতে হচ্ছে। আর্তনাদ করলেই ধমক খাচ্ছেন কেদারজ্যাঠা। তিরস্কার কখনওই তাঁর পিছু ছাড়ল না। ডাক্তাররা বললেন, এখানে ভিড় করবেন না। বাইরে যান। বেরিয়ে আসছি। গলা তুলে, কী যেন বলছেন আমাকে কেদারজ্যাঠা কী যেন... কী যেন... দাঁড়াতে চাই না, শুনতে চাই না। তাও কানে এল।

~ www.amarboi.com ~

পরদিন থেকে আমি ভেতরে ঢুকি না। বন্ধুরা যায়। শুনলাম ব্লাডারে নল ঢুকিয়ে ইউরিন রিলিজের চেষ্টা করা হচ্ছে। দু'দিন পর সেপ্টোসেমিয়া শুরু। অর্ধাচ্ছন্ন অবস্থা। চারদিনের দিন বডি বাড়ি এল। আমি আর দেখতে যাইনি।

উতুর ঠাকমার সঙ্গে একদিন দেখা রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে। পুজো দিয়ে ফিরছেন। রাস্তার ধারে দাঁড়ালাম দু'জন। ঠাকুমশাইয়ের পরিবার তো একদিন দেখতেও যাননি হাসপাতালে। আমি পাড়ার বউদের সঙ্গে গেলাম দেহ উঠোন থেকে তুলে সদর দরজা দিয়ে বেরনোর পর। ঠাকুরমশাইয়ের পরিবার বললেন, ও তো চিরকালই তলপোড়া লোক! একটা সন্তান দিতে পারল না আমাকে।

আমি শিউরে উঠলাম। ঠাকুমা বললেন, এমনও হয়েছে, থালায় ভাত বেড়ে দেওয়ার পর শুনেছেন নুন বাড়ন্ত। নুন ছাড়া আতপসেদ্ধ কাঁচকলা সেদ্ধ খাবেন কী করে? থালা ফেলে রেখে ঠাকুরমশায় ছুটেছেন নুন আনতে মোড়ের দোকানে। আমি তখন ডাল আর সরষের তেল নিয়ে ফিরছি। যা হোক, তুমি যাওনি ভালই করেছ। চেনা যাচ্ছিল না। আমি বলি, থাক ঠাকমা। থাক।

উনি বলেন, ঠাকুরমশাই পায়ে ধরেছিলেন পরিবারের। তুমি যেও না, আমি রান্না করতে জানি না। দু'দিন চিঁড়ে-দুধ খেয়েছেন। তিন দিনের দিন খিদেয় আর থাকতে পারেননি। তাতেই এই সব্বোনাশ। হাসপাতালে আমার ছেলেই তো নিয়ে গিয়েছিল, উতু-চিতুর বাবা, তাকে এই সব বলেছেন ঠাকুরমশায়। উতু-চিতু বড্ড কেঁদেছে। ওদের অবশ্য দেখতে দিইনি। দেখলে ভয় পেত। ঠাকমাকে রিকশা ধরে দিলাম। চলে গেলেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি। এগোতে পারছি না এক পা। তলপোড়া। মানে পুরুষত্বহীন। তাই ছিলেন কেদার ভটচায? সেজন্য স্ত্রী-র এত গঞ্জনা আজীবন?

হঠাৎ মন্দিরের চাতাল থেকে একজন পুরুষকে বেরতে দেখলাম। তাঁর দু'পাশে মন্দিরের সেবাইত আর মন্দিরের মালিক। আরও দু'তিনজন গলায় চাদর দেওয়া লোক। পুরুষটি হাত নেড়ে কিছু বলছেন। বাকিরা ঘাড় হেঁট করে শুনছে। একটা রিকশা এসে দাঁড়াল পুরুষটির জন্য। সে সামনেই অপেক্ষা করছিল। পুরুষটি রিকশায় উঠে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় আমার দিকে একবার তাকালেন। আমাকে চেনার কথা নয়। কিন্তু কেদার ভটচাযের সঙ্গে-সঙ্গে এই ছোকরাটা ঘুরত না? ঠিক চিনেছি! এইরকম একটা চাউনি চোখে নিয়ে চলে গেলেন পুরুষটি।

ঠুকরে পুরুত।

পুরুষ তবে উনিই! ওঁর গৃহিণী, ওঁর চলার পথ কত যত্নেই না পরিষ্কার করে রাখতেন!

টাউনের মন্দিরগুলোর চাতালে সন্ধেবেলা পুরোহিতদের মেলামেশা, গীতাপাঠ, কথকতা চলতে লাগল। কেদার ভটচাযকে কারও মনে রইল না।

আমি টাউনের রাস্তায় গলিতে ঘুরে বেড়াই, আর আমার যাওয়া-আসার পথে এক-একদিন এক-একটি মন্দির পেরতে হয়। কখনও রাধাগোবিন্দ মন্দির, কখনও ব্রজবল্লভের ঠাকুরদালান, কোনও দিন কালীতলা। স্মরণে আসে এই সমস্ত জায়গা থেকে একবার করে বাদ গিয়েছিলেন

~ www.amarboi.com ~

কেদারজ্যাঠা। শুনতে না-চাইলেও, কানে-ঢুকে-আসা কথাগুলো মনে পড়তে থাকে। ঝলসানো শরীর নিয়ে মাথা তুলে বলছেন কেদারজ্যাঠা আর আমি বেরিয়ে আসছি। বলছেন, আমার শ্রীরাধিকা আমার শ্যামচাঁদ আমাকে রক্ষা করলেন না।... আমি একলা বাড়িতে আগুনে পুড়ে গেলাম... একবেলা অন্নজলের জন্য এই নরক আমার... একবেলার অন্নজল শুধু... তার জন্য এই শাস্তি...

রোববার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও